দান ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিন্যাস : দার্শনিক পর্যালোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে পি.এইচ.ডি (আর্টস) উপাধিপ্রাপ্তির

আবশ্যিক অংশরূপে উপস্থাপিত গবেষণাসন্দর্ভ

গবেষণাকারী

সুদীপ্তা সামন্ত

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২২

তত্ত্বাবধায়িকা

অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণী সান্যাল

প্রাক্তন অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০০৩২

২০২২

Certified that the thesis entitled

Daan O Dainandin Jiban Japoner Binyas : Darshonik Paryalochona

(দান ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিন্যাস : দার্শনিক পর্যালোচনা)

Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Professor Indrani Sanyal , Former Professor, Department of Philosophy, Jadavpur University, Kolkata and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere .

Countersigned by the

Supervisor : Indrani Sanyal

Dated : 27.04.22

Candidate : Sudipta Samanta

Dated : 27/04/2022

-----: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :-----

একটি গবেষণাপত্রের পূর্ণতা প্রাপ্তি গবেষণাকারীর একক কৃতিত্ব নয়, বরং তা বহু মানুষের অকৃত্রিম প্রযত্ন ও সহযোগিতার সার্থক রূপায়ণ । আমার গবেষণাপত্রটিও তার ব্যতিক্রম কিছু নয় । দান ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিন্যাস : দার্শনিক পর্যালোচনা শিরোনামাঙ্কিত গবেষণাপত্রটির যাত্রাপথ আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধীনে অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণী সান্যালের তত্ত্বাবধানে পূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছি । তিনি তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় করে আমাকে অতি সযত্নে আমার গবেষণার মূল লক্ষ্য বিষয়ে অবগত করে তার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন গ্রন্থাদি পড়িয়েছেন এবং বুঝিয়েছেন । কীরূপ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করলে আমি আমার গবেষণার মূল লক্ষ্যে উপনীত হতে সমর্থ হবো তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে আমাকে ঋণপাশে আবদ্ধ করেছেন । এই প্রসঙ্গেই বলতে চাইবো, কেবল তত্ত্বাবধায়িকারূপেই নয়, বরং ব্যক্তিগতভাবেও তাঁর অমূল্য পরামর্শে আমি আমার জীবনে সমৃদ্ধ হয়েছি । গবেষণাকালে আমার ব্যক্তিগত জীবনের নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ম্যাডাম বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ প্রদান করে আমাকে সাহস ও শক্তি যুগিয়েছেন । তাঁর সুপরামর্শে আমি সেই সকল প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে নতুন উদ্যমে দৃঢ় মনোভাবে আমার গবেষণা পূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছি । তাঁর প্রতি আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ চিত্তে সশ্রদ্ধ প্রনাম ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বর্তমান প্রধান অধ্যাপিকা অপরাজিতা মুখোপাধ্যায়ের প্রতি, আমার প্রয়োজন অনুসারে গবেষণাকালীন বিধি বিষয়ে তাঁর সুপরামর্শে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপকৃত হয়েছি । এর সঙ্গেই আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁদের কাছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য লাভ করে আমি উপকৃত হয়েছি ; এই প্রসঙ্গে আমি দর্শন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা রত্না দত্ত শর্মাসহ , অধ্যাপক সৌমিত্র বসু, অধ্যাপিকা মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা অতসী চ্যাটার্জ্জী সিন্হা, অধ্যাপিকা গার্গী গোস্বামীর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । গবেষণার পরিসরে বিবিধ প্রয়োজনে তাঁদের পরামর্শে আমি উপকৃত হয়েছি । এই প্রসঙ্গেই আমি আন্তরিক দায়বদ্ধতায় বিশেষভাবে অধ্যাপক গোপীনাথ মন্ডলের প্রতি আমার ঋণ স্বীকার করি । তাঁর সুপরামর্শ আমাকে গবেষণাকালীন পরিসরে বহু বিধি বিষয়ে অবগত করে তা পূর্ণ করতে সাহায্য করেছে । কৃতজ্ঞ চিত্তে ঋণ স্বীকার করি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা কুন্তলা ভট্টাচার্য্যের প্রতি, তাঁর কাছেও আমি বিশেষভাবে উপকৃত । ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি আর্টস সেলের সেক্রেটারি ও সেলের মাননীয়া ম্যাডাম লিপি চট্টোপাধ্যায় এবং ম্যাডাম মেহুলি ঘোষের প্রতি । এঁদের সুপরামর্শ ও

সহযোগিতায় গবেষণালালীন পরিসরে নানা বিধি বিষয়ে অবগত হয়ে আমি আমার কাজ পূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছি। আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাইবো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান গ্রন্থাগারিক শ্রী বিদ্যুৎ বিহারী সরকার এবং সহায়িকা গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী কাকলি পালের প্রতি । যাঁদের অকৃত্রিম সহযোগিতায় আমি আমার গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অসংখ্য বই পড়ার সকল সুযোগ সুবিধা লাভ করেছি । কৃতজ্ঞতা জানাই রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচার গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারের সকল কর্মীবৃন্দদের প্রতি । এই গ্রন্থাগার থেকেও আমার গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বহু গ্রন্থ পড়ার সুযোগ পেয়েছি এবং এই প্রসঙ্গে সেখানকার কর্মীবৃন্দগণ আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন । বিশেষভাবে সাহায্য পেয়েছি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার এবং তার কর্মীবৃন্দদের । এই গ্রন্থাগারে গবেষণার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন গ্রন্থ পড়ার সুযোগ লাভ করেছি । গ্রন্থাগার এবং তার কর্মীবৃন্দদের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ।

ঋণভার স্বীকার করি আমার বর্তমান কর্মক্ষেত্র দমদম মতিঝিল কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ প্রদীপ্ত গুপ্ত রায়, কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি এবং অন্যান্য সকল সদস্যদের প্রতি যাঁরা আমার গবেষণার কাজ সমাপ্ত করার জন্য প্রয়োজন মতো নিয়মানুসারী ছুটি মঞ্জুর করে আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছেন । এই প্রসঙ্গে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই দমদম মতিঝিল কলেজের দিবা বিভাগের প্রাক্তন হিসাব নিরীক্ষক মাননীয় শ্রী অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি । গবেষণার পরিসরে বিভিন্ন প্রয়োজনে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শে আমি উপকৃত হয়েছি । আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান আমার সহকর্মী অধ্যাপিকা শম্পা বসুসহ বিভাগীয় সহ অধ্যাপিকা আবিদা সুলতানার প্রতি। গবেষণাকালীন পরিসরে চলার পথে সাহায্য পেয়েছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী এবং সহপাঠী অধ্যাপিকা সৌমিতা চৌধুরী, অধ্যাপিকা সুস্মিতা সাহার । তাদের সুপরামর্শ, সহযোগিতা আমার চলার পথ সুগম করেছে । ধন্যবাদ জানাই সহপাঠী দোলা কুন্ডু চৌধুরী, বৈশালী দাস, সায়ন্তনী বিশ্বাস এর প্রতি । এরা প্রভূত সময়ে আমায় সাহায্য করেছেন।

আমি আন্তরিক ঋণ স্বীকার করি শ্রী সারদা মঠের সন্ন্যাসিনী চৈতন্য প্রাণা মাতাজীর কাছে । তিনি বহু সময়েই আমার গবেষণার কাজ পূর্ণ করতে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ এবং স্নেহাশির্বাদ প্রদান করে আমায় ধন্য করেছেন । পার্থিব জগতে উপস্থিত না থেকেও যিনি সর্বক্ষণ উপস্থিত থেকেছেন, আমার গবেষণা পূর্ণ করার পথে যাঁর ইচ্ছা আমাকে ব্যাপৃত রেখেছে তিনি আমার বাপী, স্বর্গীয় শ্রী কানাই লাল সামন্ত, তাঁর প্রতি এবং আমার মা শ্রীমতী

শিখা সামন্ত এবং ভাই শ্রী সুপ্রিয় সামন্তর প্রতি আন্তরিক দায়বদ্ধতায় বিশেষ ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি । এঁদের সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও উৎসাহ আমার গবেষণার কাজ পূর্ণ করতে সাহায্য করেছে ।

কর্মক্ষেত্র ও ব্যক্তিগত জীবনের নানাবিধ কার্যাবলী সামলে গবেষণার কাজ পূর্ণ করতে যে মানুষটির নিরন্তর উপস্থিতি, ঐকান্তিক সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান, প্রদত্ত সাহস এবং অনুপ্রেরণা আমাকে নিয়ত উদ্যমী করেছে তিনি আমার জীবন সঙ্গী শ্রী অভিজিৎ মন্ডল । ঋণ স্বীকারের প্রান্তে এসে সেই মানুষটির প্রতি কৃতজ্ঞ চিত্তে আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় আমি বিশেষ ঋণ স্বীকার করি। পরম স্নেহে ঋণ স্বীকার করি আমার ছোট্ট পুত্র শ্রীমান অভিদীপ্ত মন্ডল, অর্থাৎ আমাদের অতি আদরের বাবীনের প্রতি । বাবীন ওর মতো করেই যেন আমার প্রতি নিজের অধিকার খর্ব করে, আমাকে আমার গবেষণার কাজ করার মত সময় উপহার দিয়েছে । এদের উভয়ের উপস্থিতি ও বিশ্বাস আমার চলার পথের প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলিকে নিয়ত অনুকূল করে আমাকে আমার লক্ষ্য পথে এগিয়ে গিয়ে তাকে পূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর করেছে ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় --------- বিনীতা

দর্শন ভবন, কলকাতা - ৭০০০৩২ সুদীপ্তা সামন্ত

সূচিপত্র

অধ্যায় : **পৃষ্ঠা**

- **ভূমিকা** ১ - ৭

প্রথম অধ্যায় : শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে দান ৮ - ৯৩

ঋগ্বেদ সংহিতায় দান ৮ - ১৬

- ঋক্‌বেদে বর্ণিত দান ব্যবস্থা ১০ - ১০
- দান ক্রিয়ার ফললাভে দাতা ও গ্রহীতার কর্ত্তব্য ১০ - ১২
- দান কর্মের প্রশংসা ১২ - ১৩
- ঋগ্বেদে দান প্রসঙ্গের বর্ণনায় সমাজচিত্র ১৩ - ১৫
- তথ্যসূত্র ১৬ - ১৬

মনুসংহিতায় দান ১৭ - ৫৪

- মনুসংহিতায় দান ও দানের গুরুত্ব ২০ - ২২
- দান ও ধর্ম ২২ - ২৪
- রাজার কর্ত্তব্যরূপে দান ২৪ - ২৬
- ব্রহ্মজ্ঞান দান ২৬ - ২৮
- দানের পাত্র ও অপাত্র নির্ধারণের নিয়ম ২৮ - ২৯
- উঞ্ছশিলবৃত্তি ৩০ - ৩০
- যাচ্ঞা বা প্রার্থনা ৩০ - ৩২
- প্রতিগ্রহ ৩২ - ৩৪
- প্রতিগ্রহ বিষয়ে গ্রহীতাদের প্রতি মনুসংহিতার নির্দেশ ৩৪ - ৩৯
- দাতার জন্য দান বিধি ৪০ - ৪৩
- দানের উদ্দেশ্য ৪৩ - ৪৪
- দাতার দান ক্রিয়া সম্পাদনকালীন মনোভাব ৪৪ - ৪৫

- দান ও তার ফললাভ ৪৫ - ৪৬
- ভিক্ষা দান ৪৬ - ৪৮
- মনুসংহিতায় নির্দেশিত দানতত্ত্বে ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার পরিচয় ৪৮ - ৫০
- মনুসংহিতায় শূদ্রের বিদ্যাজ্ঞান দানের অধিকার ৫০ - ৫৩
- তথ্যসূত্র ৫৪ - ৫৪

<u>যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য সংহিতায় দান</u> ৫৫ - ৬৮
- যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় ধর্ম ও দান এবং দানের প্রকার ৫৫ - ৫৬
- দাতা ৫৬ - ৫৭
- দানের পাত্র বা গ্রহীতা ৫৭ - ৫৮
- ভিক্ষা যাচ্ঞা ও গ্রহণ বিধি ৫৯ - ৬০
- গৃহস্থের নিত্য দান কর্ত্তব্য ৬০ - ৬০
- দানের গুরুত্ব ও ফল ৬১ - ৬৫
- শ্রাদ্ধ দান ৬৫ - ৬৬
- শ্রাদ্ধ দান ও সমাজ চিত্র ৬৬ - ৬৭
- তথ্যসূত্র ৬৮ - ৬৮

<u>উপনিষদে দান</u> ৬৯ - ৯৩
- শিক্ষাদান ৭০ - ৭২
- দান বিষয়ক বিধি ৭৩ - ৭৭
- বিদ্যাদানের সার্থকতা ৭৭ - ৭৮
- আত্ম -তত্ত্ব জ্ঞান বা ব্রহ্ম জ্ঞান দান ৭৮ - ৮৫
- অন্ন দান ৮৫ - ৯১
- তথ্যসূত্র ৯২ - ৯৩

দ্বিতীয় অধ্যায় : ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রে দান ৯৪ -১৪৮

মহাকাব্যে দান

রামায়ণ ও দান ৯৪ - ১০৯

- পরিচয় অর্থে দান শব্দটির ব্যবহার ও উল্লেখ ৯৫ - ৯৭
- সম্প্রদান অর্থে কন্যা ও পুত্র দান ৯৭ - ৯৯
- উপদেশ দান ৯৯ - ১০০
- সান্ত্বনা দান ১০০ - ১০৩
- সম্মতি দান ১০৩ - ১০৪
- অভিশাপ দান ১০৪ - ১০৪
- জীবন দান ১০৫ - ১০৮
- তথ্যসূত্র ১০৯ - ১০৯

মহাভারত ও দান ১১০ - ১২৫

- বিষয় দান অর্থে ব্যবহার ১১১ - ১১২
- অন্যান্য বস্তু দান ও সুবর্ণ দান ১১২ - ১১৩
- দক্ষিণা অর্থে ‘দান’ শব্দটির উল্লেখ ও ব্যবহার ১১৪ - ১১৪
- অন্ন দান বা আহার দান ১১৫ - ১১৫
- জীবন দান অর্থে ব্যবহার ১১৫ - ১১৬
- প্রশংসনীয় কর্ত্তব্য কর্ম অর্থে ব্যবহার ১১৬ - ১১৭
- ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কর্ম অর্থে ব্যবহার ১১৭ - ১১৮
- ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পুণ্যজনক কর্ম অর্থে ব্যবহার ১১৮ - ১১৮
- ঋণ পরিশোধকারী ও স্বর্গে যাওয়ার উপায় অর্থে ব্যবহার ১১৮ - ১১৯
- শাস্তি প্রদান অর্থে ব্যবহার ১১৯ - ১২০
- নিরর্থক বা নিস্ফল অর্থে ‘দান’ শব্দটির ব্যবহার ১২০ - ১২০
- পাপের উদ্ধারকারী ক্রিয়া অর্থে ‘দান’ শব্দটির উল্লেখ ও ব্যবহার ১২১ - ১২১
- লঘু বা নিন্দনীয় এবং ভীতিপ্রদ অর্থে ব্যবহার ১২১ - ১২২
- দানের গুরুত্ব ১২২ - ১২৪
- তথ্যসূত্র ১২৫ - ১২৫

শ্রীমদ্‌ভগবদগীতায় দান ১২৬ - ১৩৫

- গীতায় ভগবান ও জীবের শক্তি বর্ণনা ১২৬ - ১২৭
- যজ্ঞ ১২৭ - ১২৮
- যজ্ঞের প্রকার ১২৮ - ১২৯
- ভগবদগীতায় দান ১২৯ - ১৩০
- দান ও যজ্ঞ সম্বন্ধ ১৩০ - ১৩১
- দানের প্রকার ১৩১ - ১৩১
- সাত্ত্বিক দান ১৩১ - ১৩২
- রাজসিক দান ১৩২ - ১৩২
- তামসিক দান ১৩২ - ১৩৩
- শ্রেষ্ঠ দান বিচার ১৩৩ - ১৩৪
- তথ্যসূত্র ১৩৫ - ১৩৫

কৌটিল্যের পররাষ্ট্রনীতিতে দান প্রসঙ্গ : একটি বিশ্লেষণ ১৩৬ - ১৪৮

- রাজার ধর্ম ও গুণ ১৩৮ - ১৩৯
- ষাড়গুণ্য নীতির প্রয়োগ ও চতুরুপায় ১৪০ - ১৪৩
- অর্থশাস্ত্রে ‘দান’ উপায় ১৪৩ - ১৪৪
- অর্থশাস্ত্রে দান নীতির প্রয়োগ ও ধর্ম - নীতিবোধের মূল্যায়ণ ১৪৪ - ১৪৭
- তথ্যসূত্র ১৪৮ - ১৪৮

তৃতীয় অধ্যায় : জৈন দর্শনে দান ১৪৯ - ১৮০

(১)

- পঞ্চমহাব্রত ও মূলব্রতরূপে অহিংসার গুরুত্ব ১৫২ - ১৫৪
- অহিংসা, অস্তেয় এবং অপরিগ্রহ ব্রতে দান প্রসঙ্গ ১৫৪ - ১৫৭
- জৈন মতে মানুষের নিত্য কর্ত্তব্য সমূহ ১৫৭ - ১৫৮
- মূলব্রত ও উত্তরব্রতে দান ভূমিকা ১৫৮ - ১৫৯
- অণুব্রত ১৬০ - ১৬০
- গুণব্রত ও দান প্রসঙ্গ ১৬১ - ১৬১
- দিগব্রত ১৬১ - ১৬১

- ভোগপোভোগ - পরিমাণব্রত ১৬১ - ১৬১
- অনর্থদণ্ডব্রত ১৬১ - ১৬২
- শিক্ষাব্রত ও দান প্রসঙ্গ ১৬২ - ১৬২
- দেশাবকাশিকা বা দেশব্রত ১৬২ - ১৬৩
- সামায়িকা ১৬৩ - ১৬৩
- প্রষধোপবাস ১৬৩ - ১৬৩
- অতিথি সংবিভাগ ব্রত বা দান ১৬৩ - ১৬৪

(২)

- জৈন মতানুসারে দাতার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ১৬৪ - ১৬৫
- গ্রহীতা ১৬৫ - ১৬৫
- সুপাত্র ১৬৬ - ১৬৬
- কুপাত্র ১৬৬ - ১৬৬
- অপাত্র ১৬৬ - ১৬৬
- উত্তম ১৬৬ - ১৬৬
- মধ্যম ১৬৬ - ১৬৬
- জঘন্য ১৬৬ - ১৬৬
- দানের বিষয় ১৬৭ - ১৬৮
- দানের শর্তাবলী ১৬৮ - ১৬৮
- সাত্ত্বিক দান ১৬৮ - ১৬৮
- রাজস দান বা রাজসিক দান ১৬৮ - ১৬৯
- তামস বা তামসিক দান ১৬৯ - ১৬৯
- দানের বিভিন্ন প্রকার ১৬৯ - ১৬৯
- আহার দান ১৬৯ - ১৭০
- ঔষধ দান ১৭০ - ১৭০
- বিদ্যা দান বা শাস্ত্র দান ১৭১ - ১৭১
- অভয় দান ১৭১ - ১৭১
- অন্নয় দান ১৭১ - ১৭২
- সাম দান ১৭২ - ১৭২
- অনুকম্পা দান ১৭২ - ১৭৩

- জ্ঞান দান ১৭৩ - ১৭৩
- দানের পদ্ধতি ১৭৩ - ১৭৪
- দানের উদ্দেশ্য ১৭৪ - ১৭৫
- দানের ফল ১৭৫ - ১৭৬
- জৈন দান তত্ত্বের সামাজিক প্রেক্ষাপটে দার্শনিক বিশ্লেষণ ১৭৬ - ১৭৯
- তথ্যসূত্র ১৮০ - ১৮০

চতুর্থ অধ্যায় : ত্রিপিটকের ভিত্তিতে বৌদ্ধদানতত্ত্বের পর্যালোচনা ১৮১ - ২২০

- বৌদ্ধদর্শনে দানের গুরুত্ব ১৮২ - ১৮৫
- বুদ্ধদেবের জীবনে দানের ভূমিকা ১৮৫ - ১৮৬
- ব্যাঘাপহ্য সূত্র ১৮৬ - ১৯০
- দানের প্রকার ১৯০ - ১৯১
- আমিষ দান ১৯১ - ১৯১
- বুদ্ধের দৃষ্টিতে ধর্ম ও ধর্মদান ১৯১ - ১৯৫
- দাতার মানসিকতার স্তর অনুসারে দানের শ্রেণীকরণ ১৯৫ - ১৯৬
- গ্রহীতার প্রকারভেদ অনুসারে দানের শ্রেণীকরণ ১৯৬ - ১৯৬
- ব্যক্তিবিশেষকে দান বা প্রাতিপুদগলিক দান ১৯৬ - ১৯৭
- স্রোতাপন্ন ১৯৭ - ১৯৭
- সকৃদাগামী ১৯৮ - ১৯৮
- অনাগামী ১৯৮ - ১৯৮
- অর্হৎ ১৯৮ - ১৯৮
- সংঘ দান ১৯৮ - ২০০
- সঙ্ঘ দান ও শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা ২০০ - ২০০
- বুদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে দানের অন্যান্য প্রকার ২০১ - ২০১
- অষ্ট পরিখা দান ২০১ - ২০১
- কঠিন চীবর দান ২০১ - ২০১
- বিহার দান ২০২ - ২০৩

- পুকুর ও পুষ্প উদ্যান দান ২০৩ - ২০৩
- বেণুবনদান ২০৩ - ২০৪
- পুণ্যদান ২০৪ - ২০৫
- প্রেত দান ২০৫ - ২০৫
- দানের সময় অনুসারে দানের শ্রেণীকরণ ২০৫ - ২০৫
- বুদ্ধ বচনের নিরিখে দান ও তার ফল ২০৫ - ২০৭
- মিলিন্দ প্রশ্ন ২০৭ - ২০৯
- দান ও কূটদন্তের যজ্ঞ ২০৯ - ২১২
- বৌদ্ধ দান তত্ত্বে অভিনবত্ব ও তদানীন্তন সমাজচিত্র ২১২ - ২১৭
- তথ্যসূত্র ২১৮ - ২২০

পঞ্চম অধ্যায় : ইসলামধর্মে দান ২২১ - ২৩৯

- ইসলাম মতাদর্শে বাধ্যতামূলক দান বা আবশ্যিক দান বা ‘জাকাত’ (Zakat) ২২৩ - ২২৫
- জাকাত দান - এর গ্রহীতা ২২৫ - ২২৮
- জাকাত দানের ফল ২২৮ - ২২৯
- ধর্মীয় স্তরে প্রভাব ২২৯ - ২২৯
- সামাজিক স্তরে প্রভাব ২২৯ - ২৩০
- নৈতিক স্তরে প্রভাব ২৩০ - ২৩০
- ইসলাম মতাদর্শে ঐচ্ছিক দান বা ‘সাদাকা’ (Sadaqa) ২৩০ - ২৩১
- সাদাকা দানের ফল ২৩১ - ২৩১
- ধর্মীয় স্তরে প্রভাব ২৩১ - ২৩২
- সামাজিক স্তরে প্রভাব ২৩২ - ২৩২
- নৈতিক স্তরে প্রভাব ২৩৩ - ২৩৪
- সাদাকা জারিয়া (Sadaqa Zariah) ২৩৪ - ২৩৪
- জাকাত - উল - ফিতর বা সাদাকা - উল - ফিতর ২৩৪ - ২৩৫
- ইদ্ - উল - জোহা (ইদ- উদ্- জোহা) ২৩৫ - ২৩৫
- খুমস্ (Khums) ২৩৫ - ২৩৬
- মূল্যায়ণ ২৩৬ - ২৩৮
- তথ্যসূত্র ২৩৯ - ২৩৯

ষষ্ঠ অধ্যায় : খ্রীষ্ট ধর্ম ও অন্যান্য সভ্যতায় দান : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ ২৪০ - ২৬০

- খ্রীষ্ট ধর্মে দান ২৪২ - ২৪৫
- দানের ফল ২৪৫ - ২৪৭
- পরিবর্তিত বা বিনিময় উপহার ২৪৭ - ২৪৮
- পট্‌লাচ্‌ প্রথা ও তার স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য ২৪৮ - ২৪৯
- নিমন্ত্রণ ও উপহার বিনিময় প্রথার গুরুত্ব ২৫০ - ২৫১
- মায়া, ইনকা এবং আজতেক সভ্যতায় দান ২৫১ - ২৫৭
- খ্রীষ্টধর্ম ও চার সভ্যতায় দান : দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ক এবং সমাজচিত্র ২৫৭ - ২৫৯
- তথ্যসূত্র ২৬০ - ২৬০

সপ্তম অধ্যায় : দান প্রসঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধি ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিন্যাস ২৬১ - ২৮৩

প্রথম পর্ব ২৬২ - ২৭২

- দানক্ষেত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধির প্রয়োগ ও দানের সীমাবদ্ধতা ২৬২ - ২৭২
- সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে সাধিত দান ও দানবিধি ২৬২ - ২৬৪
- দান ক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্ব ও রাজনৈতিক প্রভাব ২৬৪ - ২৬৫
- দাতা ২৬৫ - ২৬৭
- গ্রহীতা ২৬৭ - ২৬৭
- উপহার প্রদান ও দান ২৬৭ - ২৬৯
- বাণিজ্য সংস্থাগুলির গৃহীত দানপ্রকল্পে ও সমাজের দায়িত্ব ২৬৯ - ২৭০
- বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির সামাজিক দায়িত্ব পালনে দানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য ২৭০ - ২৭২

<u>দ্বিতীয় পর্ব</u> ২৭৩ - ২৮৩

- **উপসংহার** ২৭৩ - ২৮২

- দানের ধর্মীয় ভিত্তি ২৭৩ - ২৭৫
- দানের সামাজিক ভিত্তি ২৭৫ - ২৭৭
- দানের রাজনৈতিক ভিত্তি ২৭৭ - ২৭৮
- দানের মনোস্তাত্বিক ভিত্তি ২৭৯ - ২৮২
- তথ্যসূত্র ২৮৩ - ২৮৩

- **গ্রন্থপঞ্জী** ২৮৪ - ২৯৪

------- : ভূমিকা : ------

বৈদিক সাহিত্যের পরিসরে প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত যে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অনুশাসনের সন্ধান পাওয়া যায়, তার মূল কেন্দ্রে ছিল অধ্যাত্মমনোভাবে পরিচালিত আত্ম - সচেতনতা। যেখানে ধর্মের প্রভাব ছিল অতি তাৎপর্য্যপূর্ণ। বেদানুসারী জীবনচর্যায় অভ্যস্ত ভারতীয় সভ্যতায় মানুষের জীবনের চরম বা পরম লক্ষ্য মোক্ষ বা মুক্তি হলেও সেই সময় সমাজ ব্যবস্থায় 'ধর্ম' শব্দটি নানান উপচারে দেব- দেবীর পুজার্চনা করে তাঁদের সন্তুষ্টি বিধান পূর্ব্বক তাঁদের আশির্বাদ লাভ করা কেবল এইরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থেই নয় বরং পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ক্ষেত্রবিশেষে আরও ব্যাপক অর্থে যেমন - ধারক, পোষক, প্রতিপালক এবং রক্ষকসহ কর্ত্তব্য - কর্ম এই অর্থেও গৃহীত হয়েছে। এইরূপে বৃহৎ পরিসরে ব্যবহৃত ধর্ম শব্দটির প্রয়োগে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় 'দান ক্রিয়া' অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিগ্রহণ করেছে। সময়ের ধারাবাহিক পরিবর্তনে বর্তমানে যে ভাবনাতেও ছোঁয়া লেগেছে অভিনবত্বের, কৌশলের এবং অবশ্যই ব্যবহারের। বর্তমান গবেষণামূলক নিবন্ধে দান বিষয়ে আলোচনার সূত্র অনুসন্ধানকালে মূলতঃ প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে দান নামক কর্ম কীভাবে গৃহীত হয়েছে তাই তুলে ধরারই চেষ্টা করা হয়েছে। প্রায় প্রতিটি ধর্মীয় শাস্ত্র লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে দানের একটি বিশেষ ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে এবং এই বিষয়ে নানাবিধ দানের স্বরূপ পর্যালোচনা করা হয়েছে। 'দান ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিন্যাস : দার্শনিক পর্যালোচনা' শিরোনামাঙ্কিত গবেষণাপত্রে তাই আমার লক্ষ্য হল বেদ - উপনিষদ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত 'দান' বিষয়ক বিভিন্ন দার্শনিক মতের উল্লেখপূর্ব্বক তার বিচার বিশ্লেষণ ও দার্শনিক তাৎপর্য্য নির্ধারণ করা। এই প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখ্য যে, দান বিষয়ে এই সকল ধর্ম ও দর্শন অতিরিক্ত অন্যান্য ধর্মে, শাস্ত্রে এবং বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের দান বিষয়ে বহু নির্দেশ ও মতবাদ পাওয়া যায়। তবে দান বিষয়ে গবেষণাকালীন স্বল্প পরিসরে সেই সকল মতের আলোচনা এই গবেষণাপত্রে করা সম্ভব নয়। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য অনুসারে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিত থেকে আমার গবেষণাপত্রের সমগ্র আলোচনা বিন্যস্ত হয়েছে সাতটি অধ্যায়ে, যেখানে দান বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র সহ জৈন, বৌদ্ধ, ইসলাম ও খ্রীষ্টান দর্শন তথা ধর্মাদর্শে বর্ণিত দানতত্ত্ব ও সাম্প্রতিক কালে প্রচলিত বাণিজ্য সংস্থাগুলির দান প্রকল্প ও তার সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিধির প্রভাব ও দান সম্পর্কিত ধর্মীয়, সামাজিক ও মনোস্তাত্ত্বিক বিধি বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের তাৎপর্য্য নির্ধারণ করেছি।

গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায় : শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে দান । এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ঋগ্বেদ, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য সংহিতাসহ উপনিষদে বর্ণিত দানতত্ত্ব ও বিধি বিষয় । বৈদিক সাহিত্যের পরিসরে অধ্যাত্মমনোভাবের প্রাধান্যে যে আত্ম সচেতনতার উল্লেখ পাওয়া যায়, তার সূচনা ঘটেছে ঋগ্বেদ সংহিতার পরিসরে । এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদে বর্ণিত হয়েছে মোক্ষ বা মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত ধর্মীয় সদাচারে দান প্রসঙ্গ । এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে বিশিষ্ট উপাসনা রীতিরূপে যজ্ঞ এবং তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে । নিত্য জীবন যাপনের পরিসরে অন্যতম কর্ত্তব্য - কর্মরূপেও ঋগ্বেদ সংহিতায় দান ক্রিয়ার উল্লেখ হয়েছে । সেখানে দেখা যায়, দান অন্যতম প্রশংসনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য রূপে নির্দেশিত হলেও ক্ষেত্রবিশেষে এই বিষয়ে নিন্দামূলক মনোভাবও উল্লিখিত হয়েছে । দান বিষয়ক এইরূপ ভিন্ন মতের তাৎপর্য্য কীরূপ ? তা এই আলোচনায় বিবেচিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে 'দেবতা'এই পদটিরও ব্যাপকার্থে উল্লেখ হয়েছে ।

মনুসংহিতা অংশে দান প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে, বর্ণধর্মানুসারী কর্ত্তব্য কর্ম ও জীবিকা ব্যবস্থায় দানের গুরুত্ব। এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে মেধাতিথিভাষ্যে বর্ণিত ব্যক্তির 'নৈমিত্তিক দানাধিকার' । সাময়িক প্রদান প্রকৃত অর্থে দান পদবাচ্য কীনা ? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে । আলোচিত হয়েছে, রাজার কর্ত্তব্যরূপে দান, ব্রহ্মজ্ঞান দান , দানের পাত্র ও অপাত্র নির্ধারণের বিধি বিষয় ও প্রতিগ্রহ দান বিধি ব্যবস্থা । বিশুদ্ধ ব্যক্তির (যিনি শাস্ত্র বিহিতকর্মের সম্পাদন করেন) কাছ থেকে দান গ্রহণ করাই শাস্ত্রে 'প্রতিগ্রহ দান'রূপে বিবেচিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে প্রতিগ্রহের গ্রহীতা, দাতা, তাদের বিশুদ্ধতা বা সামর্থ্য বিধি ও নৈতিক শর্ত ইত্যাদির আলোচনা করা হয়েছে । দান বিষয়ে গ্রহীতার সামর্থ্য বিচার্য্য হলেও ক্ষেত্রবিশেষে বিধি-বর্হির্ভূত দানেরও সমর্থন করে বলা হয়েছে - যাচ্ঞাকারীর যাচ্ঞানুসারে কিছুমাত্র হলেও দান করা উচিৎ। কোন যুক্তিতে এইরূপ বিধি-বর্হির্ভূত দানের সমর্থন করা হয়েছে সেই বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে । আলোচিত হয়েছে, ভিক্ষা দান প্রসঙ্গ এবং ব্রহ্মজ্ঞান দান বিষয়ে মনুসংহিতার অবস্থান । দানের ফললাভ বিষয়ে মনুসংহিতার নির্দেশ, দুঃখজীবি স্বজনকে অবহেলা করে যে লোক পরজনে দাতা তার দান পরিণামে বিষময়, তীর্থে খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে দানও সেইরূপ । মনুসংহিতায় দান প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে প্রাধান্য পেয়েছে শূদ্রদের দানাধিকার প্রসঙ্গের আলোচনা এবং অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে বর্ণিত অপশূদ্রাধিকরণ প্রসঙ্গ । কী অর্থে মনুসংহিতায় শূদ্রদের জন্য বেদ পাঠের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেও আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দানের অধিকার প্রদান করা হয়েছে, এইরূপ নির্দেশের দার্শনিক তাৎপর্য্য কীরূপ এবং তার প্রেক্ষিতে সমাজব্যবস্থার কী পরিচয় পাওয়া যায় তা দেখতে চেষ্টা করেছি । দান বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য সংহিতা অনুসারে আলোচিত হয়েছে যাচিত অযাচিতরূপে দানের দ্বিবিধ প্রকার, দানক্ষেত্রে দাতারূপে 'কুৎসিৎমানের জীবিকা গ্রহণকারীদের' নিষেধ ও গ্রহীতার বিধিবিষয় । এই প্রসঙ্গে

আলোচিত হয়েছে, শ্রেষ্ঠ দান রূপে ব্রাহ্মণকে দান এবং 'সম্পূর্ণ' ও 'অসম্পূর্ণ' পাত্রভেদে শ্রেষ্ঠ দানের বিচার প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ বর্ণের শ্রেণীকরণ ব্যবস্থা । আলোচিত হয়েছে দৈনন্দিন জীবন যাপনে ব্যক্তির নিত্য কর্ত্তব্যরূপে দান প্রসঙ্গ । দানের গুরুত্ব ও ফল বিষয়ে অন্নদান ও অযাচিত দানের প্রাধান্য তত্ত্ব এবং এই সকল বিষয়ে ব্যাস, অত্রি, হারীত, শঙ্খ প্রভৃতি সংহিতার সমর্থন ।

উপনিষদে আলোচিত হয়েছে, আশ্রম ব্যবস্থানুসারী সমাজব্যবস্থায় বিদ্যাদান বা শিক্ষাদান এবং তার প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতা , আত্ম -তত্ত্ব জ্ঞান বা ব্রহ্ম জ্ঞান দান এবং অন্ন দান প্রসঙ্গ। শিক্ষাদান প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে ব্রহ্মচর্য্যকালে শিষ্যের উদ্দেশ্যে আচার্য্যের উপদেশ দান, শিষ্যের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও জীবন যাপনে তার গুরুত্ব এবং দান বিষয়ক বিভিন্ন বিধি ইত্যাদি । আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান দান বিষয়ে আলোচিত হয়েছে দান মাত্রেই পুণ্যফলদায়ক নয় । এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে রাজা বাজশ্রবশের দানকাহিনী ও পুত্র নচিকেতার আশঙ্কা । আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে যথাক্রমে জীবের অন্তঃকরণ বা চিত্তশুদ্ধি তথা চিত্তের স্থিরতা এবং ব্যক্তির স্বভাব বা প্রকৃতির উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে, ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত 'প্রজাপতি ও ইন্দ্র বিরোচন সংবাদ' এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে নির্দেশিত 'দ দ দ দাম্যত দত্ত দয়ধ্বম্ ইতি' তত্ত্ব । দৈনন্দিন জীবন যাপনে ব্যক্তির নিত্য কর্ত্তব্যরূপে উপনিষদে বর্ণিত অন্নদান ও প্রাণদান এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কসহ ঐজাতীয় দানের মূলে রয়েছে যে অধ্যাত্মতত্ত্বের ভূমিকা তাও গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রে দান । এই অধ্যায়ে দান বিষয়ে আলোচিত হয়েছে রামায়ণ ও মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত কিছু দানক্ষেত্র যেখানে দান শব্দটি প্রচলিত অর্থ যেমন - বিষয় দান , দক্ষিণা দান, অন্ন বা আহার দান ইত্যাদি সহ ব্যাপকার্থে পরিচয় দান, সান্ত্বনা দান, বর দান, জীবন দান, আশ্বাস দান, সম্মতি দান, পরামর্শ দান এইরূপেও ব্যবহৃত হয়েছে । এইসূত্রে দান শব্দটির এইরূপ ব্যাপকার্থে ব্যবহারের সঙ্গে এর প্রচলিত ব্যবহারের সঙ্গতি এবং তাৎপর্য্য কীরূপ তা নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছি । আলোচনা করেছি মোক্ষার্থে দানের গুরুত্ব বিষয়ে ভগবদগীতার মত । এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে, মুক্তি লাভের লক্ষ্যে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি মার্গের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি আত্মনিবেদনের সহায়করূপে যজ্ঞ এবং দানের ভূমিকা । আলোচিত হয়েছে, যজ্ঞের বিভিন্ন প্রকার এবং সেই বিষয়ে দানের গুরুত্ব । স্বর্গাদি ফললাভের জনকরূপে দান নামক কর্ত্তব্যবুদ্ধি, ও সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিকভেদে দানের ত্রিবিধ প্রকার প্রসঙ্গ। কৌটিল্যের অর্থনীতিতে

আলোচিত হয়েছে রাজ্যের সুষ্ঠু পরিচালনা ও পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে রাজার সহজাত ও আহার্য গুণ ও তার প্রকার, ষাড়গুণ্য বিধি এবং তার প্রয়োগে দান উপায়, কৌশল ইত্যাদির গুরুত্ব ।

তৃতীয় অধ্যায় : জৈন দর্শনে দান । অহিংস আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জৈন ধর্মের তত্ত্বার্থসূত্রে উল্লিখিত হয়েছে , 'অহিংসা' নীতি অভ্যাসের একটি অন্যতম মাধ্যম হল দান । কারণ একজন ব্যক্তি যখন অপরের প্রয়োজনে নিজ বিষয়ের অধিকার বা স্বতঃবোধের পরিত্যাগ করবেন তখন সেই বিষয়ে তার স্বার্থ মনোভাবের সংযম হবে যা হিংসার ত্যাগ ব্যতীত আর কিছু নয় । এইরূপ উদ্দেশ্যে নীত হওয়ার লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় অনাগারী বা শ্রমণ এবং আগারী বা শ্রাবক সমাজের অন্যতম প্রধান এই দুই সম্প্রদায়ের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্যরূপে পঞ্চমহাব্রত এবং অণুব্রতে উভয়ের দান কর্ত্তব্য, ভূমিকা ও তার গুরুত্ব । অহিংস আদর্শে পরিচালিত মূলব্রতে বিশেষ ভাবে অস্তেয় এবং অপরিগ্রহব্রতে দানভূমিকা । আগারী বা শ্রাবকদের জন্য মূলব্রত অতিরিক্ত ব্রতরূপে নিত্য কর্ত্তব্য প্রসঙ্গে গুণব্রত ও শিক্ষাব্রতের বিভিন্ন বিভাগ ও তার গুরুত্ব । দানের প্রকার প্রসঙ্গে আহার, ঔষধ, বিদ্যা ও অভয় এইরূপ চতুর্বিধ দানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব । দানের পদ্ধতি বিষয়ে আলোচিত হয়েছে, দাতার জন্য নির্দেশিত সাতটি বৈশিষ্ট্য, গ্রহীতার বিধি, দানের উদ্দেশ্য, বিষয়, শর্ত ও ফলাফল । জৈন ধর্মীয় অনুশাসনে বর্ণিত দানতত্ত্বের এইরূপ উল্লেখের মধ্যে দিয়ে আলোচিত হয়েছে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক উপযোগিতা প্রসঙ্গে বাস্তুসংস্থানের বিভিন্ন প্রাণিদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জীব বৈচিত্র্যকে অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াস এবং কর্ম ও নীতি উপযোগবাদের সহাবস্থান । জৈন দর্শনানুসারে নির্দিষ্ট বিধির নিরিখে পরিচালিত দানক্ষেত্রে দানাধিকারের বিচারে দাতা ও গ্রহীতাভেদে প্রকৃত দাতা কে সেই প্রশ্নেরও উল্লেখ হয়েছে ।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম ত্রিপিটকের ভিত্তিতে বৌদ্ধদানতত্ত্বের পর্যালোচনা । শ্রমণ পরম্পরার অন্যতম অপর একটি দর্শন হল বৌদ্ধ দর্শন । বৌদ্ধ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ । বুদ্ধদেবের ধর্মবিষয়ক মত, উপদেশাবলী ও বাণীগুলি সংকলিত করে যে বৌদ্ধশাস্ত্র প্রস্তুত হয়, তার নাম দেওয়া হয় ত্রিপিটক। এই ত্রিপিটকের তিনটি ভাগ সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম । ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্য্যবাহী এই বৌদ্ধসাহিত্যে দান বিষয়ক আলোচনা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে । তবে কেবল বুদ্ধ বাণী অনুসারেই নয় বরং বিভিন্ন সূত্র গ্রন্থ অনুসারে আমি এই অধ্যায়ে দান বিষয়ক আলোচনা করেছি । এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে, বৌদ্ধ দর্শনানুসারে নির্বাণ সাধনার প্রারম্ভিক অঙ্গরূপে দান প্রজ্ঞালাভের সহায়ক এবং প্রজ্ঞা দ্বারাই নির্বাণ লাভ করা যায় । বৌদ্ধমতানুসারে দানের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি নির্বাণ লাভ করা না গেলেও পরোক্ষভাবে কীরূপে দান

নির্বাণলাভের পথ সুগম করতে পারে সেইবিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে । 'দান' শব্দটির অর্থ হল সকল স্বত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক দানীয় বস্তু প্রদান করার সচেতন ইচ্ছা । কোন ব্যক্তির নিজের উপার্জিত বা প্রাপ্ত পার্থিব স্থাবর কিংবা অস্থাবর - সম্পত্তির প্রতি সচেতনভাবে নিজের যাবতীয় স্বত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর কোন ব্যক্তি কিংবা কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে প্রদান করাই হল দান। দান সম্পর্কে এইরূপ বর্ণনার মধ্যে দিয়েই বৌদ্ধধর্মে নির্দেশিত হয়েছে 'দানধম্ম' এবং 'ধম্ম দান' বিষয়ক উপদেশাবলী । এই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে সাধারণ সংসারী বা গৃহী এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু সমাজের এই দুই প্রধান শ্রেণীর পারস্পরিক অনোন্য নির্ভরতার সম্পর্ক । আলোচনা করা হয়েছে, দাতার মানসিকতা, দানীয় বিষয়, দানের সময়, গ্রহীতার প্রকারভেদে দানের বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধে । ব্যাঘাপহ্য সূত্র অনুসারে আলোচিত হয়েছে ব্যক্তির জাগতিক ও ধর্মীয় মানের উন্নতি কল্পে দানের গুরুত্ব বিষয়ে ভগবান বুদ্ধের নির্দেশাবলী । আলোচিত হয়েছে সঙ্ঘদান ও অনাথপিন্ডিকের 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা দান' প্রসঙ্গ । অতিদান যে নিস্ফল নয় সেই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে মিলিন্দপ্রশ্নে বর্ণিত বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেন এবং গ্রীক রাজা মিলিন্দের কথা । অহিংস আদর্শে পরিচালিত দানও যে অনায়াসে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল সমাজচিত্রের নির্ণায়ক হয়ে উঠতে পারে সেই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে সূত্ত নিপাতের মাঘ সূত্তে বর্ণিত যজ্ঞ সম্পর্কিত বুদ্ধের উপদেশ ও কূটদন্ত যজ্ঞের গুরুত্ব ।

পঞ্চম অধ্যায় : ইসলামধর্মে দান । ইসলাম ধর্মের মূল গ্রন্থ কোরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যেকোন সুষ্ঠু ও নিয়মশৃঙ্খল পরায়ণ সমাজব্যবস্থায় অবশ্য কর্ত্তব্যমূলক ক্রিয়া হল 'জনকল্যাণ সাধন' করা । যার অন্যতম মাধ্যম হল 'দান ক্রিয়া' । এই প্রসঙ্গে 'দান ক্রিয়া' কেবল ধর্মীয় অনুশাসনের অঙ্গ রূপেই নয় বরং তা ব্যক্তির স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যরূপেই স্বীকৃত এবং আলোচিত হয়েছে । এই ধর্মানুসারে 'দান' করার তাগিদ ব্যক্তির অভ্যন্তরীন বা স্বরূপগত । তাই সংশ্লিষ্ট ধর্মের ব্যক্তিগণ তাদের অভ্যন্তরীন কর্ত্তব্যবোধের দায়বদ্ধতায় 'দান কর্ম' সম্পাদন করেন । এই ক্রিয়ার যথাযথ সম্পাদন বা দায়িত্ব পালন করা যেমন একাধারে সমাজ তথা সমাজবাসীর অন্যতম কর্ত্তব্য তেমনি তা লাভ করা বা পাওয়াও সমাজের ব্যক্তিবিশেষের অধিকার । দানের প্রকার সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়েছে এর দ্বিবিধ ভাগ বাধ্যতামূলক দান বা আবশ্যিক দান এবং ঐচ্ছিক দান । সংশ্লিষ্ট ধর্মানুসারে প্রথম প্রকার দানটি 'জাকাত' এবং দ্বিতীয় প্রকারটি 'সাদাকা' নামে উল্লিখিত হয়েছে । জাকাত দানের গ্রহীতা হতে পারেন কারা ? সমাজে এই জাকাত এবং সাদাকা দানের প্রভাব কীরূপ ? এই প্রশ্নে আলোচিত হয়েছে সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক স্তরে ব্যক্তির আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক উভয় প্রকার দানের গুরুত্ব । এছাড়াও দানের প্রকার প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে অন্যান্য কয়েকটি 'দান' যেমন - উশ্র, খুমস্, ইদ্ - উল - ফিতর, ইদ্ -উদ্ - জোহা ইত্যাদি বিষয়ে । যেগুলি - উক্ত দুই প্রকার দান ব্যবস্থার বৃহৎ পরিসরের মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত ।

সমাজচিত্রে এইরূপ দানতত্ত্বের প্রভাব প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে দানক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণের হিতসাধনের আদর্শ। এইরূপ জনকল্যাণের মানোন্নয়নের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় অনুশাসনের দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠা এবং সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের উপর গুরুত্ব প্রদান করার এক প্রয়াস ।

ষষ্ঠ অধ্যায় : খ্রীষ্ট ধর্ম ও অন্যান্য সভ্যতায় দান : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ । এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে খ্রীষ্টান ধর্মের মূল গ্রন্থ বাইবেল অনুসারে কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছায় ও স্বতোপ্রনোদিত ভাবে অপরের সাহায্যে কোন কিছু দেওয়াই হল দান । এখানে 'দান' শব্দটির অর্থ হল পরম ভালবাসা যেখানে স্বার্থের উদ্দেশ্য থাকবেনা, থাকবেনা সমাজের নিয়ম নীতিজনিত কোন দায়বদ্ধতা, থাকবে শুধু অন্তরের আকুতি । নিঃস্বার্থ মনোভাবে অসহায় ও আর্তের উদ্দেশ্যে এইরূপ সাহায্য দান এবং তাকে ভালবাসার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসার তত্ত্ব । এইরূপ ব্যবহারে বাইবেলের পুরাতন ও নতুন উভয় নিয়মে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত ও নির্দেশিত 'দান' প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে, অন্যের হিত সাধন, মঙ্গল সাধনের গুরুত্ব ও তার ফল । যা ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্বরূপেও নির্দেশিত হয়েছে । অসহায়ের প্রতি সাহায্য দানের উপদেশে দান বিষয়ে যে আন্তরিক দায়বদ্ধতার উল্লেখ খ্রীষ্ট ধর্মীয় অনুশাসনে নির্দেশিত হয়েছে সেইরূপ দায়বদ্ধতামূলক দান প্রসঙ্গ পাশ্চাত্যে উত্তর আমেরিকার পলিনেশীয় সভ্যতায় প্রচলিত পটলাচ্ প্রথায় 'উপহার দান' ও 'বিনিময় উপহার দান' উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই উভয়দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই দান বিষয়ে এইরূপ আন্তরিক আকুতি বা দায়বদ্ধতার গুরুত্ব এই অধ্যায়ে বিবেচিত হয়েছে । দান শব্দটি তার পরিসরে উপহার প্রদান এই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে বিনিময় উপহার প্রাপ্তির অবশ্যসম্ভব্যতার এক নতুন মাত্রার যেমন সংযোজন করেছে তেমনি আবার কোথাওবা এইরূপ দানকর্ম ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে সাধিত হলেও তার পদ্ধতি হয়েছে অতি কঠিন ও কঠোর । খ্রীষ্ট ধর্মে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কৃত পাপকর্মের ক্ষয় সাধন এবং শুচিতা প্রসঙ্গে নির্দেশিত হয়েছে ধর্মীয়ভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে 'উৎসর্গ' দান প্রসঙ্গ। এই বিষয়ে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে রচিত মথি গ্রন্থের বহু নির্দেশ আলোচিত হয়েছে । এইরূপ উৎসর্গ দান প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে মায়া, ইনকা এবং আজতেক পৃথিবীর অন্যতম এই তিন প্রাচীন সভ্যতায় বর্ণিত পশু বলিদান প্রথা ও তার পদ্ধতির সঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্মীয় অনুশাসনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য । সমাজের এবং ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন কল্যাণের লক্ষ্যে দানের ফল বিষয়ে আলোচিত হয়েছে প্রচারহীন দানের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠ দান প্রসঙ্গ ।

সপ্তম অধ্যায় : দান প্রসঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধি ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিন্যাস । দর্শনে বিশেষতঃ নীতিদর্শনে যে উপযোগিতা তত্ত্বের আলোচনা পাওয়া যায় , তা মুলতঃ হিতসাধনের নীতির উপর

প্রতিষ্ঠিত । অন্যের হিতসাধনে যা উপযোগী কিংবা আরও সুনিশ্চিত করে বলা হয়, যে কাজ সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক পরিমাণ হিত সাধনের উপযুক্ত তাই উপযোগী । যার প্রাথমিক লক্ষ্যরূপে অন্যের মঙ্গল সাধন বা হিতসাধন নির্ধারিত বা ঘোষিত উদ্দেশ্য হলেও তা যে সবক্ষেত্রেই স্বাধীন বা নিরপেক্ষভাবে সম্পাদিত হতে পারে এমন নয় এবং এই মর্মে বিভিন্ন সম্ভাবনারও উল্লেখ হয়েছে। যে সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কীভাবে জনসাধারণের হিতকল্পে পরিচালিত দান ক্রিয়াও এইরূপ প্রচলিত পরিসরের বাইরে বিভিন্ন পরিস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হয়েও 'দান' নামেই অভিহিত হয় । এই প্রসঙ্গে এই অধ্যায়ের প্রথম পর্বে আলোচিত হয়েছে সাম্প্রতিক কালে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির বিভিন্ন দান প্রসঙ্গ এবং সেই সম্পর্কিত সামাজিক, রাজনৈতিক, আইনী ইত্যাদি বিবিধ বিধির প্রয়োজনীয়তা, প্রভাব ও সীমাবদ্ধতা। দান সম্পর্কে এইরূপ হিত সাধনের নীতির মূলে অন্যতম প্রধান আদর্শ হল পরার্থবাদ । তাই এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বে উপসংহার অংশে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় বর্ণিত এইসকল দান ব্যবহারের মধ্যে দানের অন্যান্য ভিত্তির মধ্যে মূলতঃ ধর্মীয়, সামাজিক এবং মনোস্তাত্ত্বিক ভিত্তির নিরিখে বর্ণিত দানতত্ত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কীরূপে তাদের মধ্যে কোন সাধারণ ধর্ম নয় বরং যেন এক প্রকার পারিবারিক সাদৃশ্যের নিরিখে এইরূপ পরার্থবাদী আদর্শ ক্ষেত্র বিশেষে চরিতার্থতা লাভ করছে আবার কোথাওবা প্রসঙ্গ বা পরিস্থিতি গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হচ্ছে সেই বিষয়ে আলোচনার মধ্যে দিয়ে দানের দার্শনিক তাৎপর্য্য নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছি ।

প্রথম অধ্যায় : শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে দান

ঋগ্বেদ সংহিতায় দান

বৈদিক জীবনচর্যানুসারী প্রাচীন ভারতবর্ষে সদাচার মূলত মোক্ষ বা মুক্তি প্রাপ্তির লক্ষ্যেই পরিচালিত হত । এইরূপ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার অন্যতম আদর্শ পদ্ধতি রূপে নির্ধারিত হয়েছিল শাস্ত্রনির্দিষ্ট বর্ণানুসারী কর্ত্তব্যকর্ম এবং আশ্রমধর্ম । যে আদর্শগুলি সম্বন্ধে বৈদিক সাহিত্যের পরিসরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু বর্ণনা ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পাওয়া যায় । সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের মূল তিনটি বিভাগ পাওয়া যায়, যেমন- মন্ত্রসংহিতা, ব্রাহ্মণ, সূত্রসাহিত্য । মন্ত্রসংহিতার অন্তর্গত ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ । 'মন্ত্রসংহিতা' হল বৈদিক যাগ- যজ্ঞ ও পূজার্চনা সম্বন্ধে বিভিন্ন মন্ত্র ও স্তোত্রের সংকলন । পরবর্তী 'ব্রাহ্মণ' অংশে বৈদিক যাগযজ্ঞের যথাযথ কর্মপদ্ধতি বা নিয়মনীতি বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা ও উপদেশ পাওয়া যায় । প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের মতে উপনিষদসমূহ এই ব্রাহ্মণ অংশের অন্তর্গত । পরবর্তী সূত্রসাহিত্য প্রকৃত বেদের অন্তর্গত না হয়েও যেহেতু কোন না কোন বেদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই তা বৈদিক সাহিত্য পরিসরেরই অন্তর্গত । সূত্রসাহিত্যের তিনটি প্রধান বিভাগ পরিলক্ষিত হয় - শ্রৌতসূত্র , গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র । শ্রৌতসূত্রে ব্রাহ্মণদের দ্বারা নির্দেশিত শ্রৌতযাগগুলির পদ্ধতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায় । গার্হস্থ্য জীবনের জন্য আচরণীয় কর্ত্তব্য - কর্ম, সংস্কার ও বিভিন্ন যজ্ঞ বিষয়ে আলোচনা গৃহ্যসূত্রে এবং গৃহ্যসূত্রগুলির সঙ্গে প্রায় সমভাবেই গৃহীগণের জন্য যথাযথ ও আচরণীয় বর্ণ অনুসারী কর্তব্যকর্ম ও আশ্রমধর্ম বিষয়ক যাবতীয় নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে ধর্মসূত্রগুলিতে । পরবর্তীকালে এই উভয় প্রকার সূত্রসাহিত্যকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে ধর্মশাস্ত্র। ঋক্ , যজু, সাম ও অথর্ব বেদের এই যে চারপ্রকার বিভাগ মূলতঃ ধর্মগ্রন্থ রূপেই উৎপত্তি লাভ করেছে । বেদ সুবিশাল সাহিত্য ও বহুদূর প্রসারিত চিন্তাভাবনা । বেদ কীভাবে গড়ে উঠেছিল তার সেই ইতিহাস আজও অমীমাংসিত । কিন্তু বৈদিক সাহিত্যের প্রভাব ভারতীয় সমাজ - সংস্কৃতিতে ও জীবন চর্যায় নানাভাবে অমলিন হয়ে বর্তমান যুগে বিরাজ করছে । বেদ বহু যুগ ধরে বয়ে আসা ভাবনার ও সাধনার বাহক বলে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বা বেদার্থ বোধ বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের বেদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় । ঋষি অরবিন্দের বর্ণনায় পাই, পবিত্র জ্ঞানগ্রন্থরূপে বেদ হল কবিতাবলীর সুবিশাল সংগ্রহ । প্রাচীন ভারতবর্ষের মুনি ঋষিগণ যে গ্রন্থটিকে এক অপৌরষেয়, সার্বভৌম, মহৎ ও শাশ্বত সত্যরূপে স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন । এইসকল মুনি - ঋষিগণ সেইসময় 'কবি' এই আখ্যায় আখ্যায়িত হতেন । বলা হত এইসকল কবিগণই ছিলেন সত্যের দ্রষ্টা ও শ্রোতা । 'এইসকল মুনিগণ নিজেদেরকে 'সত্য-শ্রুতঃ' নামে অভিহিত করতেন, তাই তাঁদের শ্রবণলব্ধ জ্ঞানই 'শ্রুতি' নামে অভিহিত হয় '।[১] ঋষিগণই বৈদিক

---

১. *'প্রাককথন ', বেদরহস্য,* শ্রীঅরবিন্দ, পৃ : ১৭

সত্যকে মন্ত্রে রূপ দিয়েছিলেন । তাঁরা অন্যান্য সকল সাধারণ মানুষের তুলনায় মহৎ আধ্যাত্মিক ও লোকোত্তর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন । এঁদের বিশ্বাস অনুসারে সেই সকল ব্যক্তিই বৈদিক বাক্যের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে সমর্থ হবেন , যাঁরা স্বয়ং সত্যদ্রষ্টা ও রহস্যবেত্তা । অন্যথায় তা অধরাই থেকে যাবে । এই প্রসঙ্গে যাস্ক মুনি বলছেন, জ্ঞানের ত্রৈবিধ্যের কারণে তিনটি ভিন্ন অর্থে বৈদিক সূক্তগুলির অর্থ গ্রহণ বা তাৎপর্য্য নির্ধারণ সম্ভব হতে পারে ; যেমন - অধিযজ্ঞীয় বা কর্মকান্ডীয়, আধিদৈবিক বা দেবতা - স্বরূপাত্মক এবং আধ্যাত্মিক । যাস্ক মুনির মতে, এই তিনটি ভিন্ন প্রেক্ষিতের মধ্যে একমাত্র অন্তিম অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়েই বৈদিক সূক্তগুলির প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি সম্ভব । [২] কিন্তু প্রশ্ন হল, সূক্তগুলির তাৎপর্য্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে, বৈদিক বাক্য বা সূক্তগুলির সত্য উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে উচ্চবিচারশীল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্মোচন হয় এইরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা কতদূর সঙ্গত হতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে যাস্কের মতানুসারে বলা যায়, বৈদিক সূক্তগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অধ্যাত্মিকভাবই যথাযথ যা, এইবিষয়ে প্রকৃত অর্থবোধে অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনায় অধিক সমর্থ । প্রাচীনকালের মুনিঋষিদের মতে, বৈদিক মন্ত্রগুলি ছিল দ্ব্যর্থাত্মক । উভয় অর্থের একটি বাহ্য এবং অপরটি অন্তরার্থ বা গুহ্যার্থে ব্যবহৃত হয়েছে । এই উভয় অর্থের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি হলে তবেই বৈদিক সূক্তগুলির প্রকৃত অর্থের উপলব্ধি সম্ভব । যদিও বেদের ভাষ্যকারগণ বেদের দুটি অংশ কর্মকান্ড ও জ্ঞানকান্ডের উল্লেখপূর্ব্বক এর সূক্তগুলিকে কর্মকান্ডীয় এবং ঔপনিষদিক ভাগকে জ্ঞানকান্ডীয় বলে বর্ণনা করেছেন। ভাষ্যকার সায়ণাচার্যও সেই এক মতের অনুসারী হয়ে সূক্তগুলির কর্মকান্ডীয় ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন , আবার কোথাও বা এই বিষয়ে কিছু ঐতিহাসিক দলিলেরও উপস্থাপনা করেছেন । [৩]

প্রতি বেদই আবার সংহিতা নামেও পরিচিত । বর্ণ ধর্ম অনুসারে যে শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্মের উল্লেখ প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় অনুশাসনরূপে মান্যতা লাভ করেছিল তার উল্লেখ মন্ত্রসংহিতাংশেও পাওয়া যায় । ঋক্‌বেদ সংহিতা ছিল তার মধ্যে প্রাচীনতম । [৪] বৈদিক যুগের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য ছিল উপাসনা রীতি । প্রাকৃতিক বিভিন্ন শক্তিতে এই সময় দেবত্ব আরোপ করে তাঁদের পূজার্চনা করে তাঁদের সন্তুষ্টি বা কৃপা লাভ করার প্রবণতা প্রায় অভ্যাসেই পরিণত হয়েছিল । দেখা যায় যে, এইসময়ে যেমন মহাশক্তির উৎসরূপে সূর্য দেবতারূপে পূজিত হয়েছেন, তেমনি পাশাপাশি অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির দেবতারূপে পূজিত হয়েছেন অগ্নি, এবং বায়ুও । জলের দেবতারূপে বরুণ, ভোরের রাঙিমা রূপে উষা এবং পৃথিবীর আকাশরূপে দ্যৌ এরাও

---

২ *'প্রাককথন'* , *বেদরহস্য,* পৃ : ৭
৩. ঐ, পৃ : ২
৪. *'ঋগ্বেদ পরিচয়'*, ঋগ্বেদ সংহিতা, শ্রী হিরণ্ময় বন্দ্যাপাধ্যায় , রমেশচন্দ্র দত্ত (অনুবাদক) , পৃ : ৩১

পূজিত হয়েছেন এবং এদের সকলের উদ্দেশ্যেই উপাসনা পদ্ধতির উপায়রূপে যজ্ঞরীতির প্রচলন দেখা যায় । যজ্ঞের জন্য রচিত হয়েছিল বিভিন্ন মন্ত্র বা স্তোত্র, যেগুলিকে সূক্তও বলা হয় । ঋগ্বেদ যেহেতু এইরূপ মন্ত্র বা ঋক্ এর সংকলিতরূপ তাই তা ঋগ্বেদ সংহিতা নামে পরিচিত । যজ্ঞরীতির প্রয়োজনে এর অন্তর্গত বিভিন্ন মন্ত্র বা ঋক্ এর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল দেবতাদের উদ্দেশ্য স্তুতি বন্দনা করা এবং কৃপাপ্রার্থী হওয়া । এই কৃপালাভের অন্যতম উপায় বা মার্গ রূপে প্রাচীন ভারতবর্ষে 'দান' ক্রিয়ার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ । তাই বর্তমান অধ্যায়ের এই অংশে ঋক, যজু, সাম ও অথর্ব বেদের এই চার প্রকার বিভাগের মধ্যে ঋক বেদে দান কীভাবে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে তাই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে ।

ঋক্‌বেদে বর্ণিত দান ব্যবস্থা :

ঋগ্বেদে দান বিষয়ের বর্ণনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে, প্রথাগতভাবে দান ক্রিয়ার কোন সংজ্ঞা যেমন এখানে প্রদান করা হয়নি তেমনি এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরূপে দাতা এবং গ্রহীতা সম্পর্কেও বিশেষভাবে কোন বিধি বা নির্দেশের উল্লেখ করা হয়নি । যদিও এখানে প্রদত্ত দান বিষয়ক সকল বর্ণনাই দাতা এবং গ্রহীতার কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য এবং দানের ফলাফলের ভিত্তিতেই করা হয়েছে । সেখানে দেখা যায় যে, প্রাথমিকভাবে 'দান' ক্রিয়াকে এক সদাচাররূপে উল্লেখ করা হয়েছে । বলা হয়েছে, বৈদিক সাহিত্যের যুগে উপাসনা পদ্ধতির অন্যতম রীতিরূপে যজ্ঞে দেবতাদের সন্তুষ্ট করার ক্ষেত্রে 'দান' ক্রিয়ার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ । এইক্ষেত্রে যজ্ঞের দেবতা এবং যজ্ঞের আয়োজনকারী যজমানের ভূমিকা ছিল দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ই ।

দান ক্রিয়ার ফললাভে দাতা ও গ্রহীতার কর্ত্তব্য :

'ঋগ্বেদ নিজেই বলেছেন যে দেবতারা হলেন বিভিন্ন নাম ও প্রকাশ, এক বিশ্বাত্মক সৎ - এর যিনি আপনার স্বরূপে বিশ্বকে অতিক্রম করে বর্তমান । .... দেবতারা হলেন এক দেবের বিভিন্ন রূপ, শক্তি ও ব্যষ্টি -প্রকাশ।'[৫] ঋক্‌বেদের বিভিন্ন স্থানে বহু দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায় , যেমন- ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, সবিতা , মিত্র, বায়ু । তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করে যজ্ঞে যে আহুতি প্রদান করার পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়, সেখানে ধর্মীয় সদাচাররূপে 'দান' ক্রিয়া প্রসঙ্গে অষ্টম মন্ডলের চতুর্থ ও পঞ্চম সূক্তে বর্ণিত হয়েছে,

৫ *'আধুনিক মতবাদ', বেদরহস্য, পৃ : ৫৩*

দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে স্তুতি বন্দনা করে যজ্ঞ ও হব্য দান দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি ও কৃপা প্রার্থনা করা হতো। শ্রী অরবিন্দ দেবতাদের বর্ণনায় বলেছেন, দেবতাগণ দেব ও মানবের মধ্যে অন্যোন্য অন্তর্ভাব - বিনিময়ের প্রতীকরূপে সর্বত্রই অন্তর্ভাবের মূর্ত বিগ্রহ ; তাঁরা বহির্যজ্ঞ, আন্তরকর্মের প্রতীকমাত্র । দেবতাগণের উদ্দেশ্যে মানুষ তাঁর জীবনের যাবতীয় সম্বল অর্পণ করে প্রতিদানে অন্ধকাররূপী হিংস্র অসুর শক্তির বিরুদ্ধে আলোকময় বিজয় লাভ করার আশীর্বাদ লাভ করেন ।[৬] যজ্ঞে যজমানের হব্য দান গ্রহণ করে একাধারে তিনি যেমন গ্রহীতা তেমনি আবার যজ্ঞের শেষে যজমানকে তার মনোমত বর প্রদান করার ক্ষেত্রে তিনি আবার একইসঙ্গে দাতাও । একইভাবে যজ্ঞের আয়োজনকারী যজমান তিনিও যখন দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য যজ্ঞে হব্য প্রদান করতেন তখন তিনি দাতা আবার হব্য প্রদান করে তিনি যখন তাঁর মনোমত বর দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে তা প্রাপ্ত হতেন তখন তিনি হতেন গ্রহীতা ।

শুধু তাই নয়, প্রার্থনার ভিন্নতায় দাতাদের ফললাভের যে তারতম্য ঘটে তারও উল্লেখ পাওয়া যায় এই সূত্রে। এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি সহস্র সংখ্যক বজ্রের সমান বীর যোদ্ধা হন । আবার যিনি যজ্ঞে যথাযথ নিয়মে কেবল নমস্কার করে হব্য প্রদান করে তাঁকে সন্তুষ্ট করেন, তিনি শত্রু বিনাশকারী বীর বীর্যের সমান পুত্র লাভ করেন । যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে যথাযথভাবে হব্য প্রদান করেন তিনি কখনোই তাঁর ক্রোধের কারণ হন না । এই সূত্রেই দানের প্রশংসা করে বলা হয়েছে, রাজা কুরঙ্গ যথাযথরূপে দান ধম্ম সম্পাদন করায় স্বর্গলাভ করেছিলেন । দেবরাজ ইন্দ্রকে সুখ ও সৌভাগ্যের পরম দাতা রূপে বর্ণনা করে তাঁর উদ্দেশ্যে স্তুতি বন্দনা ও যজ্ঞ সম্পাদন করে যজমানের নিজের পুত্র, প্রপৌত্র এবং বংশের অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণের জন্য সুখ, সমৃদ্ধির দান যাচ্ঞা করার উল্লেখও পাওয়া যায় ।[৭] আবার কখনোও বা দেবরাজ ইন্দ্রকে বল ও ধনদাতারূপেও কল্পনা করা হয়েছে । বর্ণিত হয়েছে, দাতারূপে ইন্দ্রের দান হল পরম কল্যাণকর, তাই যজ্ঞে তাঁর উদ্দেশ্যে স্তুতি বন্দনা করে স্তুতিকারীগণ নিজেদের জন্য সুখ, সৌভাগ্য বল ও ধনের যাচ্ঞা করেন ।[৮] এইরূপ যজ্ঞকর্ম যজমানের আধ্যাত্মিক উন্নতিরও সহায়ক হয় । এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'দেবতা' শব্দটি 'দিব্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ দ্যোতন বা প্রকাশন । এইরূপ ধাতুগত অর্থে 'দেবতা' শব্দটির দ্বারা পরার্থপর কর্মে দেবতা বা ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নিষ্পন্ন হয়েছেন । সদ্বুদ্ধির দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যজ্ঞ কর্তার ইন্দ্রিয়ের সাত্ত্বিকতা প্রস্তুত হয় এবং চিত্তের মলিনতা দূর হয় । তাদের

---

৬. *'প্রাককথন'* , *বেদরহস্য,* পৃ : ১১
৭. *ঋগ্বেদ সংহিতা,* ৮। ৬৮
৮. ঐ, ৮।৯৮-৯৯

অন্তর আত্মজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাষিত হয় । যে জ্ঞানালোকই যজ্ঞকর্তার জীবনের পরম শ্রেয় সাধন করে । [৯] উল্লেখ্য যে দেবতারূপে শুধু ইন্দ্রের উদ্দেশ্যেই যজ্ঞে এইরূপ স্তুতি বন্দনা করা এবং হব্য প্রদান করে তাঁর কৃপা লাভ করার কথা বর্ণিত হয়েছে এমন নয় , বরং দেখা যায় অন্যান্য দেবতা বরুণ, সূর্য, সবিতা, মিত্র, বায়ু, অগ্নি এঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যেই একইরকমভাবে বন্দনা করে তাঁদের কৃপা দান লাভ করার ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে । যজ্ঞ থেকে যে যজ্ঞকর্তার কেবল এইরূপ পারলৌকিক ফললাভই হয় এমন নয়, বরং যজ্ঞ কর্তার যজ্ঞাগ্নিতে প্রদত্ত হবিষ্যান্ন দানে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতাগণও কর্তার অভিলষিত পশু, অন্ন, সুবর্ণাদি দান করেন । তাতে যজ্ঞকর্তার পার্থিব জগতের চাহিদা বা প্রয়োজন সাধিত হয় [১০] তারও উল্লেখ হয়েছে । যজমান নিজের জন্য কিংবা নিজের বংশের উত্তরাধিকারীদের জন্য যেকোন বিপদ থেকে পরিত্রাণ লাভ করার উদ্দেশ্যে অথবা কেবলই সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি বা শারীরিক এবং বৈষয়িক শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেও এই ধরণের যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ঋক্‌বেদে ‘দেবতা’ শব্দটি দানকারী দাতা অর্থের পাশাপাশি ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনসাধক বিষয়বস্তুর যোগান দাতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন দেখা যায়, অশ্বমেধ যজ্ঞে যজমানের জন্য দেবতারূপে অশ্বের উল্লেখ হয়েছে । সেইসময়ে কৃষি নির্ভর সমাজব্যবস্থাতে বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয়তাও যে স্বীকার করা হতো তারও উল্লেখ ঋক্‌বেদে ‘দান’ প্রসঙ্গের বর্ণনায় পাওয়া যায়। দেখা যায়, একজন কৃষকের কাছে কৃষিকার্যই ছিল প্রধান কারণ তার দ্বারা কৃষকের এবং তার পরিবারের সকলের অন্নের যোগান দেওয়া সম্ভব হতো । কৃষকের কাছে কৃষিকার্যের সহায়ককারী রূপে জল, লাঙ্গল বা বলীবর্দ যেমন দেবতারূপে গ্রাহ্য হয়েছে তেমনি ক্ষেত্রপতিও দেবতারূপে পূজিত হয়েছেন । এইপ্রসঙ্গে সীতার উল্লেখ হয়েছে, তবে এই সীতা জনক কন্যা কীনা সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় না । [১১] বলা বাহুল্য যে, এক্ষেত্রে ‘দেবতা’ শব্দটির ব্যাপকার্থে ব্যবহারই শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে ।

দান কর্মের প্রশংসা :

ঋক্‌বেদের অষ্টম মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তে ‘দান’ কর্মের প্রশংসা করে বলা হয়েছে, রাজা কুরঙ্গ যথাযথরূপে দান ধম্ম সম্পাদন করায় স্বর্গলাভ করেছিলেন । এইরূপ দান বর্ণনার মধ্যে দিয়ে আরও জানা যায় যে, সে যুগের সমাজ ব্যবস্থায় ধন ও অন্নদান ব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রসংশিত ছিল । সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে দাতা হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে । এইপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সৃষ্টির সময় দেবতা প্রাণির দেহে যে ক্ষুধার

---

৯. *ভগবদগীতা,* পন্ডিত শ্রীযুক্তভূতনাথ সপ্ততীর্থ, ৩।১১, পৃ : ৩০৪
১০. ঐ, ৩।১২, পৃ : ৩০৪
১১. *‘ঋগ্বেদ পরিচয়, ’ ঋগ্বেদ সংহিতা,* পৃ : ৬৪

সৃষ্টি করেছেন তা নিবারণে অসহায় ও আর্ত ব্যক্তিদের দাতারূপে উদার মনে সাহায্য করতে হবে । অন্নের জন্য যাচ্ঞাকারী কোন ব্যক্তি যদি কোন গৃহে এসে অন্নের জন্য যাচ্ঞা করেন তবে বিনা শর্তে গৃহকর্তাকে অন্ন দিয়ে যাচ্ঞাকারীর প্রাণ রক্ষা করতে হবে । দাতা হিসেবে তাঁকে সর্বদাই সচেতন থাকতে হবে যাতে কোন যাচ্ঞাকারীই তাঁর গৃহ থেকে অভুক্ত অবস্থায় ফিরে না যান । অন্নদানকারীদের এই সূত্রে ঋগ্বেদে ভোজ বা দাতা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে । এই প্রসঙ্গে অন্নের অদাতাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কেবল নিজে ভোজন করে তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তির নিবারণ করেন তাঁর কাছে তাঁর ভোজন মৃত্যুতুল্য । আবার যিনি যথার্থ অর্থে অন্নের দান করে যাচ্ঞাকারীর প্রাণ রক্ষা করেন তিনি দাতারূপে দেবতা । একইসঙ্গে ধন প্রসঙ্গের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, অর্থ বা ধন হল রথের চাকার মত ঘূর্ণায়মান । কাজেই আজ যা একজনের কাছে আছে আগামিকাল তা অন্যজনের হস্তগতও হতে পারে । তাই কোন দরিদ্র, আর্ত ও অসহায় ব্যক্তি যদি কোন ধনী ব্যক্তির কাছে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন তবে ধনী ব্যক্তির অবশ্যই তাকে সাহায্য করা উচিৎ । অন্যথায় কালের নিয়মে কোন একদিন ভবিষ্যতে তিনি নিজেও হয়তো ঐ একইভাবে কষ্ট পেতে পারেন । তাই দাতা ব্যক্তি তাঁর গুণমানে সর্বদাই অদাতাদের উর্দ্ধে অবস্থান করেন। দাতার ধন কখনও হ্রাস পায় না আর অদাতা কখনও সুখী হতে পারেন না । তাই যাচিত ব্যক্তিদের সর্বদাই দান করা উচিৎ । [১২]

ঋগ্বেদে দান প্রসঙ্গের বর্ণনায় সমাজচিত্র :

দানক্রিয়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে ঋগ্বেদে দশম মন্ডলের ১১৭ সংখ্যক সূক্তে যেমন একাধারে এর প্রশংসা করা হয়েছে তেমনি এর মধ্যে দিয়ে সমাজের শ্রেণী বৈষম্যেরও উল্লেখ হয়েছে । অর্থনৈতিক সাম্য যে সেই সমাজব্যবস্থায় ছিল না, তার উল্লেখ করেই বলা হয়েছে ধনী ব্যক্তি দান করেন, দরিদ্র ব্যক্তি তা গ্রহণ করেন । এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, অর্থ ও সহায় - সম্পদের ভিত্তিতে নির্ধারিত সমাজের ধনী ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে দরিদ্র কিংবা অল্প ধনী ব্যক্তিরা স্তুতি করতেন, তাদের বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দান কর্ম যে ঋগ্বেদে সর্বদাই প্রশংসিত হয়েছে এমন নয় বরং ক্ষেত্র বিশেষে তার সম্বন্ধে নিন্দার মনোভাবও পোষণ করা হয়েছে। যদিও এই প্রসঙ্গে দাতা ও গ্রহীতা এই দুই প্রকার প্রেক্ষিতের পার্থক্য আছে । দেখা যায় যে, দাতার প্রেক্ষিত থেকে দান কর্ম ঋগ্বেদে সর্বদাই প্রশংসনীয় কর্মরূপে বর্ণিত হলেও গ্রহীতার প্রেক্ষিত থেকে দান যাচ্ঞা করাকে ক্ষেত্র বিশেষে যেন নিন্দার বলেও ইঙ্গিত করা হয়েছে । গ্রহীতার প্রেক্ষিতটি এক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন দিক থেকে গৃহীত হয়েছে । প্রথমতঃ যাচ্ঞার স্বীকৃতি । যেখানে যজমান যজ্ঞের আয়োজন করে দেবতাকে সন্তুষ্ট করে তাঁর কৃপা

১২.. *ঋগ্বেদ সংহিতা,* ১০। ১১৭

লাভ করবেন এবং নিজের আধ্যাত্মিকভাবের উন্নতি ঘটাবেন । কিংবা তার প্রয়োজন অনুসারে পার্থিব জগতের সুখ - সমৃদ্ধি ইত্যাদির দান লাভ করবেন অথবা নিজের অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করার জন্যে রাজা কিংবা তুলনায় ধনী ব্যক্তির সাহায্য লাভ করবেন, এই সকল ক্ষেত্রেই দান লাভ করার প্রসঙ্গে যেন গ্রহীতার সম্পর্কে একরকম ঔচিত্যমূলক ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায় । দ্বিতীয়তঃ নিত্য যাচ্ঞায় যাচকের অগৌরব । যাচ্ঞার প্রেক্ষিতে গ্রহীতা তার অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে দান কৃপা প্রার্থী না হওয়ার জন্যেও দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়েছেন । ঋগ্বেদে এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, যজমান যজ্ঞের আয়োজন করে দেবতা বরুণের কাছে প্রার্থনা করেছেন, যাতে তিনি তাঁর পূর্ব - পুরুষের সকল ঋণ পরিশোধ করতে পারেন এবং এই পর্যন্ত তিনি নিজে যে ঋণ গ্রহণ করেছেন , তা যেন পরিশোধ করতে পারেন । তাঁর জীবন যাপনের জন্য যেন আর কোন দিন তাঁকে কারুর কাছে কোন ঋণ গ্রহণ করতে না হয় কিংবা তাঁকে যেন কখনও অন্যের উপার্জিত সম্পত্তির উপর নির্ভর করতে না হয় । কখনও কোন ধনী - দানশীল ব্যক্তির কাছে তাঁর নিজের এবং পরিবারের দারিদ্রের কথা বলে ধন যাচ্ঞা করতে না হয় । পরিবারের সকলকে নিয়ে জীবন যাপন করার মত অর্থের সংস্থান যেন তার থাকে । [১৩] বলা বাহুল্য যে, দান প্রসঙ্গে গ্রহীতার এইরূপ প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে এক প্রকার বিরোধী অবস্থানের ইঙ্গিত পাওয়া যায় । প্রশ্ন হতে পারে, যেখানে দান করা দাতার কর্ত্তব্যরূপে নির্দেশিত হয়েছে এবং দানের প্রশংসা করে অদাতাদের নিন্দা করা হয়েছে সেখানে যজ্ঞে দেবতার কাছে গ্রহীতার এইরূপ দানকৃপাপ্রাথী না হওয়ার প্রার্থনাকি সমগ্র দান ব্যবস্থার প্রশংসাকে ব্যহত করে না ? যদিও ঋগ্বেদ সংহিতায় এইরূপ প্রশ্নের সরাসরি কোন সদর্থক অথবা নঞর্থক উত্তর পাওয়া যায় না। তবে দার্শনিক আলোচনায় বিচার - বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গিতে এই প্রকার বিরোধী অবস্থানের উত্তরে বলা যেতে পারে , ঋগ্বেদ সংহিতায় যেভাবে দান প্রসঙ্গের উল্লেখ ও ফলাফলের বর্ণনা পাওয়া যায়, সেখানে উদ্দেশ্য হল ধর্মীয় সদাচার রূপে দানকর্মের প্রশংসা করা । আবার যেখানে দান করা দাতার কর্ত্তব্যরূপে নির্দেশিত হয়েছে সেখানেও দৈনন্দিন জীবনযাপনে দাতার সংযম ও নিয়ন্ত্রণের প্রশংসা করা হয়েছে । একইভাবে গ্রহীতার প্রতি নির্দেশ করে যেখানে বলা হয়েছে, অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য গ্রহীতা সাহায্য প্রার্থনা করবেন সেখানেও ঋগ্বেদের প্রাথমিক লক্ষ্যরূপে দান প্রসঙ্গে গ্রহীতার কর্ত্তব্যই নির্দেশিত হয়েছে বলে মনে হতে পারে । কারণ এইরূপ সাহায্য প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে কেবল গ্রহীতার নিজের জীবনই নয় বরং তার পরিবারের অপরাপর সদস্যদের জীবনও সুরক্ষিত হতে পারে, কাজেই জীবিকা যাপন করেও যদি জীবন নির্ব্বাহ করা সম্ভব না হয় তবে দান যাচ্ঞা করা অপরাধের নয় । কিন্তু এইরূপ দান গ্রহণ যেন কখোনই গ্রহীতার জন্য কর্মহীন অলস মনোভাব ও অভ্যাসের কারণ না হয়ে ওঠে

১৩.. *ঋগ্বেদ সংহিতা,* ২ । ২৮

সেই উদ্দেশ্যেই দানগ্রহণ যে পরনির্ভর এক ব্যবস্থা তারও এক সুষ্ঠু উল্লেখ করা হয়েছে । তাই বলা যায় যে, দান সম্পর্কে এইরূপ বিপরীত মনোভাব যে ঋগ্বেদে উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরস্পর বিরোধী মনোভাবের সূচনা করার জন্য বর্ণিত হয়েছে এমন নয় । বরং কোন ব্যক্তিই যাতে তার জন্য শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্তব্য - কর্ম সম্পর্কে বিস্মৃত না হয়, সেই লক্ষ্যেই এইরূপে বিপরীত মনোভাব পোষণ করা হয়েছে । কাজেই উল্লিখিত ক্ষেত্রের বিরোধিতা প্রকৃত কোন বিরোধিতা নয় বরং তা হল আপাতবিরোধী অবস্থান । সর্বোপরি 'দেবতা' শব্দটির ব্যাপকার্থে ব্যবহার সেইযুগে 'দাতা' শব্দটিতে যেরূপে এক নতুন অর্থের সংযোজন ঘটিয়েছে তা নিঃসন্দেহে দান সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার সঙ্গে এক নতুন ইঙ্গিতবাহী ও তাৎপর্য্যপূর্ণ বিস্তৃত পরিসরের সূচনা করেছে ।

তথ্যসূত্র :

- অনির্বাণ (শ্রী) , *ঋগ্বেদ - সংহিতা গায়ত্রী মণ্ডল* , (প্রথম খন্ড), সম্পাদনা - রমা চৌধুরী, ২০০১, হৈমবতী - অনির্বাণ ট্রাস্ট, কলকাতা -২৯ ।

- অনির্বাণ, *বেদ - মীমাংসা* (প্রথম খন্ড), ১৯৭৫, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা - ১২ ।

- অরবিন্দ (শ্রী), *বেদরহস্য* (প্রথম খন্ড) ; ২০০১ ; শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী ।

- দত্ত রমেশচন্দ্র (অনুবাদক) , ভূমিকা - বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীহিরণ্ময়, *ঋগ্বেদ সংহিতা* , প্রথম খণ্ড, ১৯৭৬, হরফ প্রকাশনী , কলকাতা - ৭ ।

- দত্ত রমেশচন্দ্র (অনুবাদক) , ভূমিকা - বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীহিরণ্ময়, *ঋগ্বেদ সংহিতা* , দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭৮, হরফ প্রকাশনী , কলকাতা - ৭ ।

- ন্যায়তীর্থ বসু সুমিতা (ডঃ), *ধর্ম-অর্থ-নীতিশাস্ত্রসমীক্ষা,* ২০০৬, প্রকাশক - সদেশ, কলিকাতা।

- বন্দ্যোপাধ্যায় (ডঃ) শ্রীমতী শান্তি , *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা* , ২০০৩, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কোলকাতা - ৬ ।

- মুখোপাধ্যায় (ডঃ) তপতী , *ধর্ম,অর্থ ও নীতি : প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রসমীক্ষা,* ২০০৪, চ্যাটার্জি পাবলিশার্স , কোলকাতা - ৭৩ ।

- সরস্বতী শ্রীমন্ মধুসূদন কৃত টীকা, সপ্ততীর্থ পন্ডিত শ্রীযুক্তভূতনাথ (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত), *শ্রীমদ্ ভগবদগীতা* (প্রথম খন্ড), সম্পাদনা - শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, বঙ্গাব্দ - ১৩৪৫, প্রকাশক - কৃষ্ণ ব্রাদার্স, কলিকাতা ।

মনুসংহিতায় দান

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যে 'মনুসংহিতা' উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থের নাম । কেউ কেউ মনে করেন বৈদিক সভ্যতার উত্তরকালে তার আদর্শ - ভাবধারাসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই ধর্মগ্রন্থটির ভূমিকা তাৎপর্য্যপূর্ণ । 'ধর্মশাস্ত্র' রূপেই কেবল নয় বরং 'স্মৃতিশাস্ত্র' রূপেও এর উল্লেখ হয়। বেদ ও পুরাণ নির্দেশিত বিবিধ যজ্ঞ, পূজার্চনা , বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সদাচার , আরাধনা, প্রায়শ্চিত্ত কর্ম ইত্যাদি বিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম মনুসংহিতার আলোচ্য হওয়ায় একে 'ধর্মশাস্ত্র' এবং বেদোত্তর কালে রচিত হওয়ায় একে 'স্মৃতিশাস্ত্র'ও বলা হয়। এই গ্রন্থের রচয়িতা কে ছিলেন সেই বিষয়ে মতদ্বৈধতা আছে; যেমন- কারো মতে মনুসংহিতাকার ছিলেন 'মনুষ্য জাতির জনক', আবার কেউবা বলেছেন, তিনি ছিলেন 'অগ্নিদেবের সংস্থাপক' ইত্যাদি । মনুসংহিতার রচনাকার কে ছিলেন সেই সম্বন্ধে শাস্ত্রে এই আলোচনাও পাওয়া যায় যে, স্বয়ং ভগবান ব্রহ্মা এই শাস্ত্র রচনা করে প্রথমে তা মনুকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তারপর মনু এই শাস্ত্র বিষয়ে মরীচি এবং ভৃগু মুনিগণকে অধ্যয়ন করান । এর পরবর্তীতে ভৃগু মুনি ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের জন্য মনু নির্দেশিত সকল উপদেশের সংকলন করে তা প্রচার করেন । তাই মনুসংহিতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে বলা হয়েছে, এই গ্রন্থটি মানুষের ধর্মের প্রয়োজনে ভৃগুমুনি কর্তৃক কথিত হয়েছে ।[১] একইভাবে এই শাস্ত্রের রচনা কালকে কেন্দ্র করেও মতদ্বৈধতা পরিলক্ষিত হয় । বিস্তারিতভাবে সেই আলোচনায় না গিয়ে বলা যায় যে, সর্বপ্রাচীনভাষ্য 'মেধাতিথিভাষ্যে' এর উল্লেখ থাকায় একথা অনুমান করা যেতে পারে, গ্রন্থটি নয় শত (৯০০) খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের আগেই রচিত হয়েছিল । ধর্ম তথা ধর্মীয় অনুশাসনের বিধি প্রসঙ্গে মনুসংহিতার মূল আলোচনা এগিয়েছে যে বর্ণবিভাগ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে তা বর্তমানে অত্যন্ত চর্চিত ও বিতর্কিত একটি বিষয় । কারণ বিরাটপুরুষ ব্রহ্মার শরীর থেকে বিভিন্ন বর্ণের যেরূপ ক্রমানুসারী সৃষ্টিতত্ত্ব এখানে স্বীকৃত হয়েছে এবং তাকে কেন্দ্র করে মানুষের যে কর্ম সামর্থ্যের উল্লেখ হয়েছে তা পরবর্তী কালে ক্রমশই বিধি আকারে নির্দেশিত হয়ে জাতিগত বিভেদের রূপ ধারণ করেছে । যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচির পরিবর্তনে বর্তমানে যা নিন্দিত মনোভাবের পরিচায়ক হয়ে উঠেছে। তথাপি উল্লেখ্য বৈদিক ভাবধারা অনুসারী প্রাচীন ভারতবর্ষে মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় 'দান' ব্যবস্থার কীরূপ ভূমিকা তথা অবস্থান ছিল সেই বিষয়ে এই শাস্ত্রে বহু আলোচনা ও নির্দেশ পাওয়া যায় । দান বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে যে নির্দেশগুলির তাৎপর্য্য নির্ধারণ করা অবশ্য প্রয়োজনীয় ।

---

১. *ধর্ম- অর্থ - নীতিশাস্ত্রসমীক্ষা,* ন্যায়তীর্থ ডঃ সুমিতা বসু, পৃ : ১৮

সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, মানুষের নিত্য কর্ত্তব্য ও ধর্মীয় অনুশাসন বিষয়ে মনুর নির্দেশ অনুসারে যে চতুঃবর্ণ বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায় সেই অনুসারেই তাদের কর্ত্তব্য কর্মও নির্দেশিত হয়েছিল । যদিও উল্লেখ্য যে, এই বর্ণব্যবস্থার পরিকল্পনা মনু নিজে করেছিলেন কীনা সেই বিষয়েও বিতর্কের অবকাশ আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র উল্লিখিত এই চারটি বর্ণের বিবিধ কর্ত্তব্যকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গেই মনুসংহিতায় 'দান' এর উল্লেখ ও বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায় । দেখা যায় যে, এই শাস্ত্রে দান যেমন চতুঃবর্ণের নিত্য কর্ত্তব্য বলে নির্দেশিত হয়েছিল তেমনি তা ধর্মীয় অনুশাসনের অঙ্গরূপেও বিবেচিত হয়েছিল । উল্লিখিত দানতত্ত্বের আলোচনার মধ্যে দিয়ে আরও জানা যায়, মনুসংহিতায় ধর্মরূপ কর্ত্তব্যকর্ম প্রসঙ্গে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ এবং ইন্দ্রিয় সংযম এর মতো সকল কর্মগুলিই সাধারণভাবে চতুঃবর্ণের সকলের জন্যেই সমানভাবে ধর্ম বা কর্ত্তব্যকর্ম রূপে নির্দেশিত হয়েছিল [২] এবং গুণ ও কর্ম সামর্থ্যের ভিত্তিতে জীবিকার বৃত্তিভেদ তাদের জন্য শাস্ত্রানুসারে বর্ণভেদে বিহিত হয়েছিল । অর্থাৎ সেই সময়ে সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির নিত্য কর্ত্তব্য ও জীবিকা বৃত্তির মধ্যে প্রভেদ স্বীকৃত ছিল । যেমন - ব্রাহ্মণের কাজ বা ধর্ম ছিল - অধ্যাপনা, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ করা । ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বা কাজগুলি ছিল - প্রজাপালন, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন এবং ভোগবিলাসে প্রসক্ত না হওয়া । বৈশ্যদের কাজ ছিল - পশুপালন, দান , যজ্ঞ , অধ্যয়ন , বাণিজ্য, ধনের বৃদ্ধির জন্য ঋণদান এবং কৃষিকর্ম । আর শূদ্রের কাজ ছিল কোনরকম অসূয়া না করে অর্থাৎ বিষাদগ্রস্ত না হয়ে উপরিউক্ত তিন বর্ণের ব্যক্তিদের সেবা করা । তবে শূদ্র বর্ণের মানুষের জন্য যে, দান কর্মের কর্তব্য নিষিদ্ধ হয়েছিল এমন নয় ।[৩] চারটি বর্ণের কর্ত্তব্যকর্ম নির্দেশের পর তাদের মধ্যে জীবিকাগত প্রভেদ বিষয়ে মনু যে নির্দেশ করেছেন সেখানে ব্রাহ্মণ বর্ণের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে মনু প্রথমেই ব্রাহ্মণ বর্ণকে সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করে বলেছেন, ব্রহ্মার মুখ থেকে উৎপন্ন বলে ব্রাহ্মণ চারটি বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বেদ ধারণ হেতু ব্রাহ্মণ এই সমগ্র সৃষ্টির প্রভু । এই পৃথিবীতে সৃষ্ট সকল প্রানীর মধ্যে বুদ্ধিমান জীবরূপে মানুষ যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ তেমনি সকল মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন ব্রাহ্মণ বর্ণের মানুষ।[৪] মনুসংহিতানুসারে ব্রাহ্মণ বর্ণের মানুষ তাঁদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, বেদাধ্যয়ন এবং সংস্কারাদির প্রাধ্যান্যের বিচারেও প্রধান ।[৫] শাস্ত্রনির্দিষ্ট বর্ণানুসারী কর্ত্তব্যকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে যেসকল ব্রাহ্মণ প্রকৃত অর্থে ধর্মের রক্ষা করেন তারাই ছিলেন মোক্ষলাভের যোগ্যাধিকারী । জীবিকার ভেদ প্রসঙ্গে মনুর নির্দেশ থেকে জানা যায় প্রতি বর্ণের মানুষের জন্য সাাধারণ ধর্ম বা কর্ত্তব্য অতিরিক্ত বর্ণ নির্ধারিত যেসকল কর্ত্তব্যকর্ম বা ধর্ম নির্দেশিত হয়েছিল তার প্রতিটিই কিন্তু তাদের

---

২. *মনুসংহিতা,* শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, (ডঃ) মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত প্রাককথন, ১০।৬৩
৩. *'মনুসংহিতায় সমাজব্যবস্থা,' মনুসংহিতা পরিচয়,* ঐ, পৃষ্ঠা - ৩ ।
৪. *মনু* ১। ৯৩,৯৬
৫. ঐ ,১০।৩

জন্য জীবিকারূপে অনুমোদিত ছিল না । যেমন- ব্রাহ্মণ বর্ণের জন্য নির্ধারিত ছয়টি কর্মের মধ্যে অনুমোদিত জীবিকা ছিল তিনটি ; যাজন বৃত্তি, অধ্যাপনা ও প্রতিগ্রহ করা । ক্ষত্রিয় বর্ণের জন্য জীবিকারূপে অস্ত্র-শস্ত্রধারণ এবং বৈশ্যের জন্য বাণিজ্য, পশুপালন ও কৃষি নির্দেশিত হয়েছিল । শূদ্র বর্ণের জীবিকা ছিল তিন বর্ণের মানুষের সেবা করা। তবে এই সেবা বিষয়ে ব্রাহ্মণ বর্ণের স্থান ছিল প্রথম ও প্রধান । জীবিকার নির্দেশ প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় ব্যক্তির 'বিশুদ্ধতা' অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছিল । শাস্ত্রানুসারে স্বধর্মের বা কর্ত্তব্য কর্মের পালনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির 'বিশুদ্ধতা' নিরূপিত হয় । কাজেই যেসকল ব্যক্তি ঐরূপে নিজ নিজ বিহিত কর্মের পালন করতেন তারাই ছিলেন 'বিশুদ্ধ' ব্যক্তি । উল্লেখ্য যে, সকল বর্ণের জীবিকা প্রসঙ্গে ঐরূপ বিশুদ্ধতার উল্লেখ হলেও সংহিতানুসারে ব্রাহ্মণের জীবিকার প্রয়োজনে ঐরূপ বিশুদ্ধতা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছিল । এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণের জন্য বিহিত প্রতিটি কর্ম যেমন -'যাজন' অর্থাৎ অন্যের গৃহে দক্ষিণা গ্রহণপূর্ব্বক পূজার্চনা করা, 'অধ্যাপনা' বা বেদশিক্ষা দান করা এবং 'দান গ্রহণ করা বা প্রতিগ্রহ করা' কেবলমাত্র 'বিশুদ্ধ' ব্যক্তিদের কাছ থেকেই গ্রহণ করা অনুমোদিত ছিল । বলা বাহুল্য যে, এইরূপ বিশুদ্ধ ব্যক্তির উল্লেখের মধ্যে দিয়ে মনুসংহিতায় স্বীকৃত চতুঃবর্ণ ব্যবস্থাতে স্বধর্মরূপ কর্ত্তব্য কর্মের পালন গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছিল । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের সকলের জন্যেই যেমন তাদের স্বধর্মরূপ কর্ত্তব্যকর্ম ও জীবিকাবৃত্তি নির্দেশিত হয়েছিল তেমনি তাদের সকলের জন্যেই জীবিকাগত প্রভেদ বিষয়ে জীবিকা বৃত্তি থেকে ভিন্ন এক প্রকার বৃত্তিরূপে 'অব্যবহিত পরবর্তী বৃত্তি' এবং 'ব্যবহিত বৃত্তি'রও উল্লেখ হয়েছিল । এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে জানা যায়, সংহিতানুসারে কোন নির্দিষ্ট বর্ণের ব্যক্তি যদি শাস্ত্র বিহিত কর্ম বা স্বধর্ম পালনের দ্বারা নিজের এবং পরিবারের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে সমর্থ না হন তবে সেই ব্যক্তি যথাক্রমে 'অব্যবহিত পরবর্তী বৃত্তি' এবং তার অভাবে 'ব্যবহিত বৃত্তি'র অনুসরণ করতে পারেন, এমন ব্যবস্থা অনুমোদিত হয়েছিল । 'অব্যবহিত পরবর্তী বৃত্তি' বলতে বোঝানো হয় কোন নির্দিষ্ট বর্ণের ব্যক্তির ঠিক পরবর্তী স্তরে অবস্থিত বর্ণের ব্যক্তির জন্য শাস্ত্রবিহিত বৃত্তিসমূহ । অন্যদিকে 'ব্যবহিত বৃত্তি' বলতে বোঝানো হয় বর্ণব্যবস্থায় কোন নির্দিষ্ট বর্ণের ব্যক্তির পরবর্তীর পরবর্তী বর্ণের ব্যক্তির জন্য শাস্ত্রবিহিত বৃত্তি । সংহিতানুসারে প্রতিটি বর্ণের মানুষই যদি নিজ নিজ জীবিকা পালনের দ্বারা নিজেদের এবং পরিবারের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে সমর্থ না হন তবে বর্ণব্যবস্থায় তাঁরা নিজেদের অবস্থান অনুসারে প্রথমে 'অব্যবহিত পরবর্তী বৃত্তি' এবং তার অভাবে 'ব্যবহিত বৃত্তি' পালন করতে পারেন কিন্তু কখোনই তার পূর্বের শ্রেণির বৃত্তি সম্পাদন করে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারেন না এমন নিয়ম বা বিধিই নির্দেশিত হয়েছিল । যেমন - একজন ব্রাহ্মণ বর্ণের ব্যক্তি তাঁর জন্য শাস্ত্রবিহিত সকল বৃত্তি পালনের দ্বারা যদি তাঁর এবং তাঁর পরিবারের পালনে অসমর্থ হন তখন তাঁকে 'অজীবন্' বলা হয় । এই অবস্থায় তিনি নিজের এবং পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য 'অব্যবহিত পরবর্তী

বৃত্তি'রূপে ক্ষত্রিয়ের জন্য শাস্ত্র নির্ধারিত ও নির্দেশিত অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করা, রাজ্য এবং গ্রাম রক্ষা করা ইত্যাদি অবলম্বন করতে পারেন যেহেতু এগুলি তাঁর জন্য শাস্ত্রানুমোদিত । কিন্তু তার অভাবে বা এই কর্মগুলি পালন করেও যদি তাঁর প্রয়োজন সম্পূর্ণ রূপে সাধিত না হয় তবে তিনি 'ব্যবহিত বৃত্তি' রূপে বৈশ্য বর্ণের জন্য শাস্ত্রবিহিত বৃত্তি যেমন - কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য করতে পারেন (যদিও শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের পক্ষে দ্রব্য বিক্রয় বিষয়ে বেশ কিছু বিধি নিষেধ নির্দেশিত হয়েছে) । এগুলি তাঁর জন্য শাস্ত্রানুমোদিত 'ব্যবহিত বৃত্তি' । একই নিয়ম ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের ব্যক্তিদের জন্যেও প্রযোজ্য ছিল । বিপন্ন ক্ষত্রিয় নিজের জীবিকার দ্বারা জীবন যাপনে অসমর্থ হলে বৈশ্যদের জন্য নির্ধারিত জীবিকা পালন করতে পারতেন । একইভাবে বৈশ্যরাও নিজেদের জীবিকার দ্বারা জীবন নির্ব্বাহে অক্ষম হলে শূদ্রদের জীবিকা গ্রহণ করতে পারতেন। চতুর্থ বর্ণরূপে শূদ্রদের জন্য অবশ্য ধর্ম বা কর্ত্তব্য কর্মরূপে যেভাবে তিন বর্ণের সেবা নির্দেশিত হয়েছিল সেখানে ব্রাহ্মণ বর্ণের ব্যক্তিদের সেবাই ছিল প্রধান । এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'ব্রাহ্মণসেবক' এই নামের দ্বারাই শূদ্র বর্ণের ব্যক্তি কৃতার্থতা লাভ করতে পারেন, স্বর্গলাভের অধিকারী হন । তবে নিজের এবং পরিবার পালনার্থে নির্দিষ্ট জীবিকা নির্ব্বাহের অক্ষমতায় 'অব্যবহিত পরবর্তী বৃত্তি' এবং 'ব্যবহিত বৃত্তিরূপে' যথাক্রমে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণের ব্যক্তিদের সেবা করাও তাদের জন্য শাস্ত্রানুমোদিত হয়েছিল।[৬] এইরূপে দেখা যায় চতুর্বর্ণের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত সাধারণ ধর্ম বা কর্ত্তব্যসমূহে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ বর্ণের ব্যক্তিদের জন্য জীবিকাব্যবস্থাতেও সংহিতানুসারে 'দান' এর গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ হয়েছিল ।

মনুসংহিতায় দান ও দানের গুরুত্ব :

মনুসংহিতায় 'দান' - এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'দানং দেয়ম' অর্থাৎ 'যা দেওয়া যায় তাই দান' ।[৭] সুতরাং 'দান করা' এই ক্রিয়াটীকেই দান বলা হয় । সংহিতানুসারে মূলতঃ নয় প্রকার ব্রাহ্মণকে দান করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য বলে নির্দেশিত হয়েছে, যেমন - যিনি বংশরক্ষার জন্য সন্তান কামনা করে বিবাহ করতে চেয়ে সাহায্যপ্রার্থী, যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞ সম্পাদন করার জন্য যাঙ্ঞা করছেন, যিনি পথিক, কিংবা যিনি নিজের সর্বস্ব দান করেও যজ্ঞ করেছেন, যিনি গুরুকে দক্ষিণা দেওয়ার জন্য অর্থ সাহায্য চাইছেন, কিংবা নিজের পিতা - মাতার ভরণপোষণের জন্য যিনি সাহায্যপ্রার্থী, বেদ অধ্যয়ন কালে যার নিজের এবং তার পরিবারের প্রয়োজন পূরণের

---

৬. *মনু*১০।১২০,১২১
৭. *মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য,* সপ্ততীর্থ শ্রীভূতনাথ (অনুবাদক), ১১।১ -২

জন্য যার অর্থের প্রয়োজন আছে অথবা যিনি রোগগ্রস্ত । এই নয় প্রকার ব্রাহ্মণের দান যাচ্ঞা করা যেমন শাস্ত্রানুসারে অনুমোদিত বা ধর্মস্বরূপ বা সঙ্গতঃ তেমনি যাচ্ঞাকারীর বিদ্যা বিচার করে তাদের দান করা ব্যক্তির বা দাতার পক্ষেও কর্ত্তব্য । এইরূপে দান যাচ্ঞা করা এবং যাচ্ঞাকারীর অনুরোধে তাকে দান করা উভয়ই সংহিতানুসারে স্বীকৃত হয়েছে । মেধাতিথিভাষ্যে এই ব্যবস্থাই ব্যক্তির 'নৈমিত্তিক দানাধিকার'[৮] বলে উল্লিখিত হয়েছে । বলা হয়েছে, উক্ত নয় প্রকার নির্ধন ব্রাহ্মণকে দাতা ধর্মভিক্ষুক স্নাতকরূপে গণ্য করবেন এবং এরা নিঃস্ব হলে তাঁদের বিদ্যাবত্তা অনুসারে যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মাননা প্রদর্শন সহ অন্ন ও দক্ষিণাস্বরূপ অর্থ দান করবেন [৯] এবং এই সকল ক্ষেত্রেই দান ক্রিয়া সম্পন্ন হবে যজ্ঞবেদীর অভ্যন্তরেই । দান বিষয়ে মনুর এইরূপ নির্দেশের ভিত্তিতে একথা অনুমান করা যেতে পারে যে, উক্ত সকল ক্ষেত্রে দান ক্রিয়া ছিল কোন যজ্ঞানুষ্ঠানে সম্পন্ন দান, যেখানে দাতা ঐ নয় প্রকার ব্রাহ্মণকে তাঁদের বিদ্যাবত্তানুসারে প্রয়োজনমতো দান করে তাদের অভাব পূরণ করতেন যজ্ঞবেদীর মধ্যে থেকেই । তবে শুধু যজ্ঞবেদীর মধ্যে থেকেই নয় বরং এর বাইরেও মনুসংহিতায় দান ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়েছে, যেখানে দাতা এই নয় প্রকার ব্রাহ্মণ অতিরিক্ত অপরাপর অতিথি ও অভ্যাগতদের সমাদর ও সেবা করবেন । মনুসংহিতায় এই প্রসঙ্গে যজ্ঞবেদীর বাইরে থেকে গৃহীদের উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ন দান প্রসঙ্গে যারা অন্নপাক করে না, তাদের অন্নদান করার নির্দেশ করা হয়েছে । [১০] এছাড়াও অন্যান্য বিষয় দানের নির্দেশ করে বলা হয়েছে, - গৃহস্থ তাঁর অতিথিকে নিজের সামর্থ্য অনুসারে বসার জন্য আসন, খাওয়ার জন্য ফল-মূল ইত্যাদি পানীয় রূপে জল, বিশ্রাম নেওয়ার জন্য শয্যা, এই সকল বস্তু দান করবেন বা সেগুলি দ্বারা তাদের যথাশক্তি আপ্যায়ন করবেন এবং সকল গৃহীই এই বিষয়ে সচেতন হবেন যে, কোন অতিথিই যেন অনাদৃত হয়ে না থাকে।[১১] এক্ষেত্রে তাৎপর্য্য এইরূপ যে, সংহিতানুসারে আসনাদি অর্থাৎ আসন, ভোজন, শয়নের জন শয্যা, পানীয় এবং ফলমূল ইত্যাদি সকল উপচার দান দ্বারা গৃহস্থ তাঁর অতিথির সেবা বা সমাদর করবেন; তার অর্থ এই নয় যে, ভোজন ও পানীয় ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয় বা দ্রব্য যেমন - শয্যা , আসন ইত্যাদি বিষয় থেকে দাতা অর্থাৎ গৃহী নিজের অধিকার চিরকালের মত ত্যাগ করবেন । বরং এক্ষেত্রে অতিথির সেবার জন্য গৃহী তাঁর নিজের শয্যাসনটি সাময়িকভাবে প্রদান করে অতিথির সম্মাননা ও সমাদর করবেন । এখন প্রশ্ন হতে পারে, এইরূপ 'প্রদান' অর্থে 'দান' শব্দটির যে ব্যবহার এক্ষেত্রে করা হয়েছে তা কি প্রকৃত অর্থে 'দান' শব্দ পদবাচ্য হয় ? যদি বলা হয় হ্যাঁ, তবে তো একথা বলতে হয় যে, 'দান' -

---

৮ .*মেধাতিথি,* ১১।১ -২

৯. *মনু*১১।২

১০ .*মেধাতিথি,* ৪।৩২

১১ . ঐ, ৪।২৯

এর লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষের আশংকা হয় । কারণ সেক্ষেত্রে যে বিষয়গুলির প্রতি দাতা তাঁর অধিকার বা স্বত্ব ত্যাগ করেননি সেই বিষয়গুলিও দানীয় বিষয়রূপে গ্রাহ্য হয় বা দান করা হয়েছে এমন বিষয়রূপে পরিগণিত হয়। উত্তরে একথাই বলা যেতে পারে যে চিরকালের মত স্বত্বাধিকার ত্যাগ না করলেও এক্ষেত্রে অতিথি যতক্ষন ঐ বিষয়গুলি নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করবেন ততক্ষন দাতার ঐ বিষয়গুলির প্রতি কোন অধিকার থাকবে না এই অর্থে হয়তো সংহিতায় 'দান' শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে । আবার মেধাতিথিভাষ্যে 'যা দেওয়া যায় তাই দান'[১২] এইরূপ লক্ষণের দ্বারা অর্থাৎ যে সকল বিষয়গুলির দানীয় বিষয় হওয়ার যোগ্যতা আছে বা যেসকল বিষয়গুলির ব্যবহারিক মূল্যমান আছে কেবল সেইগুলিই দানের যোগ্য এই দৃষ্টিকোণের নিরিখেও ঐ বিষয়গুলি সাময়িকভাবে হলেও মনুসংহিতায় দান বলে বিবেচিত হয়েছে । এই ধরণের দান স্বত্বনিবৃত্তিরূপ আত্যন্তিক দান না হলেও এক্ষেত্রে দাতা বিষয়গুলির প্রতি নিজের অধিকার সাময়িকভাবে প্রতিনিবৃত্ত করে কেবল গ্রহীতাগণের প্রয়োজনে তাদের হিতার্থে প্রদান করেন, তাই এইরূপ দানও শাস্ত্রানুসারে প্রকৃত অর্থে 'দান' পদবাচ্য বলে নির্দেশিত হয়েছে। সংহিতানুসারে এইরূপে কেবল গ্রহীতার স্বার্থে প্রদত্ত বিষয়ের যথাযথ দান অদৃষ্ট বা ফল উৎপন্ন করতে পারে। [১৩]

দান ও ধর্ম :

মনুসংহিতায় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরূপেও 'দান' বিবেচিত হয়েছে। সংহিতানুসারে ধর্মই মানুষের প্রকৃত বন্ধু এবং সঠিক পথের দিশা দেখায় । অন্যান্য সব কিছুই দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হলেও ধর্ম ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও তার সঙ্গে পরলোকে অনুগমন করে । [১৪] এই ধর্ম যেমন সদাচারে পালনীয় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও তার ফল হতে পারে তেমনি তা ক্ষেত্রবিশেষে কর্ম এইরূপেও উপলব্ধ হতে পারে । মনুর মতে উভয় ক্ষেত্রেই সদাচারে ধর্মের যথাযথ সম্পাদন ব্যক্তির সহায় হয় । বলা হয়েছে, ধর্ম চতুঃষ্পাদ্ ; অর্থাৎ ধর্মের চারটি অংশ । তবে এক্ষেত্রে অংশ বলতে কোন অবয়বকে নির্দেশ করা হয়নি। বরং কোন অর্থে ধর্ম চতুষ্পাদ তার বিচার প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় চারটি ভিন্ন প্রেক্ষিতের উল্লেখ হয়েছে । যেমন - প্রথমতঃ যাগ,

---

১২ . *মেধাতিথি,* ১১৷১ -২
১৩ . ঐ, ৪৷২২৯
১৪. *মনু* , ৮ ।১৭

দান, তপঃ, জ্ঞান এই চারটি ভিন্ন উপায়ে ধর্ম তথা ধর্মীয় আচার - অনুষ্ঠান পালন করা যায়, এই অর্থে ধর্ম চতুঃপ্রকার । দ্বিতীয়তঃ মেধাতিথিভাষ্যে যজ্ঞকেই কেবল ধর্ম বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, যখন যজ্ঞাদি ধর্মীয় ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তখন প্রয়োজন হয় চারজন ঋত্বিক বা ব্রাহ্মণের । এঁরা হলেন - হোতা, ব্রহ্মা, উদ্‌গাতা, এবং অধ্বর্য্য । এই অর্থেও ধর্মের চারটি অংশ বলা যেতে পারে । তৃতীয়তঃ মনুসংহিতানুসারে ধর্ম অর্থে ধর্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রীয় বাক্যের নির্দেশ । এই সকল শাস্ত্রীয় বাক্যের চারটি করে পাদ বা পদ থাকে এগুলি হল - নাম, আখ্যাত, উপসর্গ এবং নিপাত । শ্রুতিতেও বলা হয়েছে, বাক্যের পদসকল চারি ভাগে বিভক্ত ।[১৫] চতুর্থতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চতুঃবর্ণের সকল মানুষই ধর্ম প্রতিপাদক অনুষ্ঠানের আয়োজক হতে পারতেন সেই অর্থেও ধর্মকে চতুঃষ্পাদ বা চারটি অংশ বিশিষ্ট বলা যায়। এখন যে অর্থেই ধর্মকে চতুষ্পাদ বলা হোক না কেন, যথাযথরূপে তার সম্পাদন যে সর্বদাই পরিপূর্ণভাবে কাম্য ফললাভ ঘটাবে এইবিষয়ে কোন মতদ্বৈধতা ছিল না । ধর্ম তথা ধর্মীয় কর্মের সঙ্গে দানের সাদৃশ্যের ইঙ্গিত করে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে,'দান' হল ধর্ম বা ধর্মীয় ক্রিয়ার একটি অঙ্গ এবং এরও অন্ততঃপক্ষে চারটি অংশ আছে - দাতা, পাত্র বা গ্রহীতা, দানের উদ্দেশ্য ও দানের ফল । এগুলি ছাড়াও দানীয় দ্রব্য, দানীয় মনোভাব ইত্যাদিও দানের অংশ । সুতরাং অন্ততঃপক্ষে এইরূপ চারটি অংশের নিরিখে 'দান' ও এক অর্থে ধর্মীয় কর্ম সদৃশ । শুধু তাই নয়, এই 'দান' কর্মও যে অন্যান্য ধর্মীয় কর্মের মতোই দাতাকে পরিপপূর্ণ ফল দান করতে পারে সেই বিষয়েও মনুসংহিতায় বহু আলোচনা আছে । এবং এই বিষয়ে দাতার জন্য মনুসংহিতায় বহু বিধি নির্দেশেরও উল্লেখ করা হয়েছে । আবার পরবর্তীকালে এই নিয়মের ব্যতিক্রম স্বীকার করে ধর্ম এবং দান উভয় ক্ষেত্রেই যে ফলের বিচারে যুগহ্রাসানুরূপ, মনুসংহিতায় তারও উল্লেখ করা হয়েছে । সংহিতানুসারে এখানেও উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের ইঙ্গিত আছে। আলোচনা করলে দেখা যায়, শাস্ত্রানুসারে যুগ মূলতঃ চার প্রকার, সত্য, দ্বাপর, ত্রেতা এবং কলি । এই চার প্রকার যুগের মধ্যে সত্য যুগে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় 'সত্য' এর বিশিষ্ট স্থান ছিল। সত্য ও হিত কথন, সৎ ভাবনা, সৎ চিন্তা, সদাচার ইত্যাদির আদর্শে পরিচালিত হত তদানীন্তন সমাজ । সত্য যুগের সমাজ ব্যবস্থা ছিল সত্যতায় পরিপূর্ণ । আর সেকারণেই সেই সমাজে সব মানুষই যেকোন ধর্মীয় কর্মে পরিপূর্ণরূপে ফললাভ করতেন । কিন্তু যুগের পরিবর্তনে পরবর্তীকালে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে । পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে মানুষের চিন্তায়, রুচি বোধ এবং সামর্থ্যেও । মানসিক অস্থিরতা, চাতুর্য্য ইত্যাদির কারণে বেদ শ্রবণ, মনন ও তার অর্থ উপলব্ধকরণ বিষয়ক শক্তির সামর্থ্য ব্যক্তিভেদে ধীরে ধীরে শিথীল হতে শুরু করে। তার ফলরূপে দেখা দিল ব্যক্তির মানসিক দৃঢ়তা ও সততার অভাব । যে অভাবে পরবর্তী যুগ গুলিতে মানুষের

---

১৫. *মেধাতিথি,* ১ ।৮১

সকল ধর্মীয় কর্মের পরিপূর্ণ ফল দান করার শক্তি হ্রাস পেতে শুরু করল । কারণ এই যুগগুলিতে সমাজে মানুষের মননবোধে 'সত্য' - এর গুরুত্বকে শিথীল করে মিথ্যা ও অরাজকতা নিজের স্থান করে নিল। সততা ও সত্যের পরিবর্তে মানুষের চিন্তায় ও কর্মে সংকীর্ণ মনস্কতা, স্বার্থপরতা ও চাতুর্য্য প্রবৃত্তির সঞ্চার হল । যা অবশ্যসম্ভাবীভাবে ধর্ম কর্মকেও প্রভাবিত করল, আর তারই ফলরূপে সত্য যুগের পরবর্তী যুগগুলি থেকে ধর্ম কর্ম জনিত ফললাভের ক্ষেত্রে অবশ্যসম্ভব্যতার মাত্রায় শৈথিল্য দেখা দিল । মেধাতিথিভাষ্যানুসারে, কাল বা সময়ের ভেদে ধর্ম-কর্ম রূপে কারণ এবং কার্য্যরূপে তার ফল এর মধ্যে যুগের ভেদে এইরূপ স্বরূপের ভেদ হয়ে থাকে, যাকে ''যুগহ্রাসানুরূপতঃ'' [১৬] বলে উল্লেখ করা হয়েছে । বলা হয় যে এটিও পদার্থের এক প্রকার ধর্ম । মনুসংহিতায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি যুগের ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের উল্লেখ করা হয়েছে । যেমন- সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতা যুগে জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ, দ্বাপর যুগে যাগযজ্ঞ এবং কলি যুগে দান প্রধান বা শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে উল্লিখিত হয়েছে । পুরাণ মহাকাব্য ইত্যাদিতেও এইরূপ উল্লেখ মেলে তবে তার অর্থ এই নয় যে, কোন যুগে অপর কোন যুগের প্রধান বা শ্রেষ্ঠ ধর্মাচারণের অনুমোদন ছিলনা । বরং এই প্রসঙ্গে মনুসংহিতাকার বলেছেন, উল্লিখিত প্রতিটি ধর্মাচারণেরই অনুমোদন সকল যুগেই ছিল । কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ধর্ম কোন নির্দিষ্ট যুগে প্রধান বা শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে বিবেচিত হয়েছিল সেই যুগের মানুষের গুণ ও সামর্থ্যের বিচারে । এইরূপে দানের উল্লেখ প্রসঙ্গে মহাকাব্যে বর্ণিত হয়েছে, যেহেতু 'দান' ক্রিয়া অত্যন্ত সহজসাধ্য, অনায়াসেই সম্পন্ন করা যায় এবং তার জন্য কোনরূপ সংযম তথা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না, এতে শরীরের কোন ক্লেশ হয় না, তাই কলিযুগের অল্পজীবি শক্তিহীন মানুষের কাছেই এই 'দান' ক্রিয়া কলিযুগের প্রধান বা শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে উল্লিখিত হয়েছে ।[১৭] বলা বাহুল্য যে, এইরূপ বর্ণনার মধ্যে দিয়ে যুগের ভেদে ধর্ম তথা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের পালন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে দৃঢ় মনোভাবের হ্রাস ঘটে শিথীল হয়েছে তেমনি যুগের পরিবর্তনে মানুষের সামর্থ্য যে সীমিত হয়েছে তাও বলা হয়েছে । তাই এই প্রসঙ্গে ধর্ম বিষয়ে যুগহ্রাসানুরূপতার উল্লেখ হয়েছে । দান ও ধর্ম বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় ধর্মীয় আচরণের পাশাপাশি রাজার কর্ত্তব্যকর্ম ও দান বিষয়েও বহু নির্দেশ পাওয়া যায় ।

রাজার কর্ত্তব্যরূপে দান :

'ধর্ম' শব্দটির দ্বারা মনুসংহিতায় কর্ত্তব্য কর্মরূপে রাজার কর্তব্য কর্মও বিহিত হয়েছে । তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় 'রাজা'বলতে বোঝাত যিনি জনপদের অধীশ্বর, যিনি নগরের অধিপতি এবং যাঁর রাজ্যাভিষেক হয় এমন ব্যক্তি ।

১৬.. *মেধাতিথি,* ১ ।৮৫
১৭. ঐ, ১ ।৮৬

সংহিতায় এইসকল রাজাদের রাজকার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার করার লক্ষ্যে প্রভূত বিধি ও কর্ত্তব্যসমূহ নির্দেশিত হয়েছে, যেখানে দানও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া বলে বিবেচিত হয়েছে । বলা হয়েছে, রাজ কার্য্য পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজা অবশ্যই ক্ষত্রিয়োচিত সকল বিধির পালন করবেন । এবিষয়ে তিনি অবশ্যই 'সাম', 'দান' 'ভেদ' ও 'দণ্ড' নীতির প্রয়োগ করবেন। এছাড়াও পুরুষার্থ লাভের জন্য মনুসংহিতায় রাজার জন্য চতুর্বিধ কর্ত্তব্যের কথা নির্দেশিত হয়েছে । যেমন - প্রথমত ঃ রাজা নিজে যা লাভ করতে পারেননি তা লাভ করা বা জয় করার ইচ্ছা রাখবেন । অর্থাৎ রাজা তাঁর ক্ষত্রিয়োচিত বল ও বীর্যে এযাবৎ যা লাভ করেছেন কেবল তাতেই সন্তুষ্ট না থেকে অতিরিক্ত ধন, ঐশ্বর্য্য ও প্রাচুর্য্য লাভে অবশ্যই সচেষ্ট হবেন । দ্বিতীয়তঃ এই পর্য্যন্ত রাজা যা কিছু নিজ দক্ষতায় অর্জন করেছেন, তার অতিরিক্ত আরও অধিক সঞ্চয় করবেন এবং নিজ সম্পদ, ঐশ্বর্য্য সম্মান ইত্যাদি যা রাজা লাভ বা জয় করেছেন, তা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রক্ষা করবেন । তৃতীয়তঃ এই পর্য্যন্ত রাজা যা কিছু নিজ দক্ষতায় অর্জন করেছেন, তার অতিরিক্ত আরও অধিক সঞ্চয় করবেন এবং নিজ রাজ্যের কোষাগারের সমৃদ্ধি ঘটাবেন । চতুর্থতঃ রাজা তাঁর ক্ষমতা বলে তাঁর রাজ্যের কোষাগারে এই পর্য্যন্ত যেসকল সম্পদ ও ধনৈশ্বর্য্য সঞ্চয় করেছেন তার কিছুটাসৎপাত্রে দান করবেন । [১৮] এইরূপে নিত্য কর্ত্তব্য ছাড়াও রাজকার্য্য পরিচালনা করার জন্য রাজার পক্ষে যে চতুর্বিধ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড নীতির[১৯] উল্লেখ সংহিতায় নির্দেশিত হয়েছে, তার ব্যাখ্যায় মেধাতিথিভাষ্যে দান এই বিধি ব্যবস্থাটি স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতায় 'উপহার প্রদান' - এই অর্থেও গৃহীত হয়েছে । যেমন, বলা হয়েছে - রাজা প্রথমেই কারুর সঙ্গে সহসা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন না । বরং বিপরীত পক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা প্রতিস্থাপনপূর্ব্বক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে 'সাম' নীতির প্রয়োগ করবেন। শুধু তাই নয়, বিপরীত পক্ষের সঙ্গে প্রীতি ও সন্তোষ উৎপাদনের জন্য 'দান' নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যাদির উপহার প্রদান করবেন । তাসত্ত্বেও যদি বিপরীত পক্ষের রাজার সন্তুষ্টি না হয় তবে রাজা কৌশলে 'ভেদ' নীতির প্রয়োগ করে তাঁকে তার অপরাপর মিত্র পক্ষ থেকে ভিন্ন করে 'দণ্ড' প্রদান করবেন । এই হবে রাজার রাজ্য পরিচালনার বিধি বা কৌশল। বলা বাহুল্য, যে চতুর্বিধ উপায় বা বিধির উল্লেখ রাজার রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে 'দান' নীতির এইরূপ ব্যবহারিক প্রয়োগে উক্ত শব্দটি তার স্বরূপগত তাৎপর্য্য থেকে কিছুটা ভিন্নরূপেই গৃহীত হয়েছে । কারণ 'দান' ক্রিয়া দাতার জন্য বিশেষভাবে ফলদায়ক হলেও প্রাথমিক ক্ষেত্রে এটি নিঃস্বার্থভাবেই সম্পাদিত হয় । যেখানে 'দানের পাত্র' নির্ব্বাচন এই ব্যাপারটিও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু এই দুটি বিষয়ের কোনটিই খুব বিশেষভাবে রাজার রাজকার্য্য পরিচালনা

---

১৮. *মনু*, ৭ ।৯৯
১৯. ঐ, ৭।১০৮

করার বিধি রূপে 'দান' নীতির ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় নি। কারণ 'দান' নীতির দ্বারা কোন রাজা যদি তাঁর বিপরীত পক্ষের রাজার প্রীতি বা সন্তোষ উৎপাদনের জন্য তাকে 'উপহার প্রদান' করা এই ব্যাপারটিকেই বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন বা এটিই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য বলে স্থির করেন, তবে সেক্ষেত্রে কিন্তু দান ক্রিয়াটী যেমন নিঃস্বার্থ থাকেনা তেমনই আবার দানের পাত্ররূপে সেই রাজা উপহার প্রদানের জন্য যোগ্য কিনা তার বিবেচনাও এক্ষেত্রে তাৎপর্য্যহীন হয়ে পড়ে । এইভাবেই দেখা যায় যে, 'দান' এই শব্দটী এক্ষেত্রে তার মূল অর্থ বা লক্ষ্য অর্থাৎ গ্রহীতার প্রয়োজন পূরণ তার থেকে কিছুটা ভিন্নরূপেই ব্যবহৃত হয়েছে । তবে তার অর্থ এমন নয় যে, চিরাচরিত বা প্রথাগতভাবে কেবলই গ্রহীতার প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে রাজার 'দান' ক্রিয়ার অনুমোদন নিষিদ্ধ ছিল । বরং এপ্রসঙ্গেও রাজার জন্য ভাষ্যে কতকগুলি বিশেষ বিধি নির্দেশিত হয়েছিল । যেমন, ব্রাহ্মণের সেবা করা, প্রজাদের সন্তান জ্ঞানে প্রতিপালন করা, জনহিতকর কল্যাণ কর্মের সাধন করা ইত্যাদি । এছাড়াও, কতকগুলি নিত্য কর্ত্তব্যও মনুসংহিতায় রাজার জন্য নির্দেশিত হয়েছিল, ব্রাহ্মণ গুরুকূল থেকে বেদের পাঠ শেষ করে ফেরার পর রাজা সেই ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে তার প্রয়োজন অনুসারে প্রভূত পরিমাণ খাদ্য সামগ্রীসহ অন্যান্য বিশেষ বিশেষ দ্রব্য সামগ্রীর দান করবেন; তিনি অসহায়কে অভয় দান করবেন । মনুসংহিতানুসারে রাজার এইরূপ অভয়রূপ দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ সর্বদা এবং সর্বত্র প্রশংসনীয় ছিল । কারণ তার যশ সর্বদাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।[২০]

ব্রহ্মজ্ঞান দান :

মনুসংহিতানুসারে ধর্ম শব্দটি স্বধর্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম রূপে গ্রহণ করে বিভিন্ন বর্ণের জন্য যে নিত্য কর্ত্তব্য কিংবা জীবিকার উল্লেখ হয়েছিল , তার মধ্যে 'ব্রহ্মজ্ঞান দান' ছিল অন্যতম । মনুর মতে, সকল দান - এর মধ্যে 'ব্রহ্মদান' বা 'ব্রহ্মজ্ঞান দান' বা 'বেদজ্ঞান দান' ছিল শ্রেষ্ঠ দান ।[২১] প্রশ্ন হল, 'ব্রহ্মজ্ঞান দান' বলতে কী বোঝায় ? কোন ব্যক্তির পক্ষে এবং কিরূপ ব্যক্তিকে এই প্রকার 'ব্রহ্মজ্ঞান দান' সম্ভব ? বেদের রহস্য অনুধাবন করে গুরুর শিষ্যকে উপলব্ধি করানো কিংবা তাকে ঐ রহস্য আয়ত্ত করানোই শাস্ত্রে 'ব্রহ্মজ্ঞান দান' নামে পরিচিত । সুতরাং বলা যায় এইরূপ 'ব্রহ্মজ্ঞান দান' সম্ভব হয় গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে । যেখানে গুরু হলেন দাতা এবং শিষ্য হলেন গ্রহীতা । সংহিতানুসারে দান পূর্বেই ধর্মরূপে উল্লিখিত হয়েছে এবং আরও বিশেষভাবে 'দান' ক্রিয়াকে ব্রহ্মচারীর ধর্মরূপে উল্লেখ করে ব্রহ্মচারীর জন্য অধ্যাপনা বিষয় সংক্রান্ত বিধির নির্দেশ করা

---

২০. *মনু* ৮ ।৩০৩
২১. ঐ, ৪ ।২৩৩

হয়েছে । যাদের ক্ষেত্রে ঐ অধ্যাপনা বিধি প্রযোজ্য হয় তাদের ক্ষেত্রেই ঐ প্রকার দান সম্ভব হয় । এখন প্রশ্ন হতে পারে, 'অধ্যাপনা বিধি' বলতে এক্ষেত্রে কি বোঝানো হয়েছে ? সংহিতানুসারে বলা যায়, যদি কোন ব্রহ্মচারী ধর্ম, অর্থ, গ্রন্থ কিংবা অন্য যেকোন বিষয় সম্পর্কে আচার্য্য ব্যতিরেকে অপর কোন ব্যক্তির কাছ থেকে জ্ঞাত হন (যে ব্যক্তিকে সংহিতায় 'জ্ঞানদ্' বলা হয়েছে) যেহেতু তাঁর আচার্য্যের কাছে বিষয়টি অজানা, সেইরূপ বাক্তির সঙ্গে ব্রহ্মচারীর বিদ্যাবিনিময়কে বলা হয় 'অধ্যাপনা' । এইরূপ 'অধ্যাপনা' প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় মোট দশ প্রকার ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হয়েছে, 'আচার্য্যপুত্র , শুশ্রুষাপরায়ণ ব্যক্তি, অন্য বিষয়ে যিনি জ্ঞান বা বিদ্যা দান করেন , ধার্ম্মিক ব্যক্তি, শুচি বা শুদ্ধ ব্যক্তি , নিকট আত্মীয় বা বন্ধু - বান্ধব, বিদ্যাগ্রহণ এবং ধারণে সমর্থ ব্যক্তি, অর্থদানকারী বা ধনদাতা, সাধু বা সজ্জন ব্যক্তি এবং নিজপুত্র বা জ্ঞাতি কিংবা উপনীত শিষ্য এই দশ জনকে বেদ অধ্যয়ন করানো কর্ত্তব্য।' [২২]এই সকল ব্যক্তিকে বেদজ্ঞান দান করাই সংহিতানুসারে ব্রহ্মজ্ঞান দান নামে আখ্যাত হয়েছে। যদিও এইসকল দান বিষয়ে কিছু সতকর্তাও নির্দেশিত হয়েছে । যেমন - বেদধ্যাপক সেই ব্রহ্মচারীকেই এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান দান করবেন, যিনি সংযত, পবিত্র, ধর্মচারী, সৎ এবং সাবধানী।[২৩] অন্যদিকে ব্রহ্মজ্ঞানের গ্রহীতা বিষয়ে বলা হয়েছে, যিনি অন্যায়ভাবে অনুমতি ব্যতিরেকে বেদের জ্ঞান গ্রহণ করেন, কিংবা যারা ধর্মকথা শোনার ইচ্ছা নেই তিনি এইরূপ দান ক্ষেত্রে অপাত্র । বরং স্বেচ্ছায় - উৎসাহের সঙ্গে যিনি এই বিষয়ে দান গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তার যোগ্যতা বিচার পূর্ব্বক বেদধ্যাপক তাকে জ্ঞান দান করবেন, এবং গ্রহীতা তার জন্য তাঁকে অভিবাদন করবেন । [২৪] বেদ তথা বৈদিক আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান দানসহ অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান দান প্রসঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আচার্য্য, উপাধ্যায়, গুরু এবং ঋত্বিক এইরূপ বিভিন্ন ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় । আচার্য্য, উপাধ্যায়, গুরু এবং ঋত্বিক প্রসঙ্গে ভাষ্যে বলা হয়েছে, 'যে ব্রাহ্মণ শিষ্যকে উপনীত করে কল্প ও রহস্যসমেত বেদ অধ্যয়ন করান ঋষিগণ তাঁকে আচার্য্য বলেন ।' [২৫] অর্থাৎ বলা যায় যে, যে ব্রাহ্মণ তাঁর শিষ্যদের বেদের রহস্য অনুধাবন পূর্ব্বক সেই বিষয় তাদের আয়ত্ত করান তিনিই হলেন আচার্য্য । উপাধ্যায় সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যিনি জীবিকা নির্ব্বাহের প্রয়োজনে বেদের কিছু অংশ কিংবা কেবল বেদাঙ্গ বিষয়ে অধ্যাপনা করেন তিনি হলেন উপাধ্যায় ।[২৬] 'উপাধ্যায়' এর পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে এইরূপ উল্লেখের মধ্যে দিয়ে জানা যায়, জীবনযাপনের প্রয়োজনে জীবিকা স্বরূপ বেদাধ্যাপনাও তখন সমাজে অনুমোদিত ছিল । যদিও তা সীমাবদ্ধ ছিল সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে । অন্যদিকে 'গুরু' সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'যিনি শাস্ত্র বিধি

---

২২. *মনু* ২ ।১০৯
২৩. ঐ, ২ ।১১৫
২৪. ঐ, ২।১১৭
২৫. ঐ, ২।১৪০
২৬. ঐ, ২।১৪১

অনুসারে ‘নিষেকাদি’ অর্থাৎ গর্ভধানাদি প্রভৃতি কর্ম করেন এবং অন্ন দ্বারা প্রতিপালন করেন তিনিই হলেন গুরু। ’[২৭]

দানের পাত্র ও অপাত্র নির্ধারণের নিয়ম :

দানের পাত্র - অপাত্র নির্বাচন প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় গুণহীন ও গুণবান এই দুই প্রকার পাত্রের উল্লেখ করা হয়েছে । দাতা তাঁর ইচ্ছানুসারে যেমন পাত্রে দান করবেন সেইরূপ ফল লাভ করবেন । যেমন তিনি যদি কোন গুণহীন পাত্রে দান করেন তবে দানজন্য তার ফল লাভ হবে অল্প । আবার তিনি যদি কোন গুণবান পাত্রে দেশ, কাল ও দানজন্য সুবিহিত বিধি অনুসারে স্বেচ্ছায় এবং স্বহস্তে দান করেন তবে তার ফল হবে যেকোন ধর্মীয়কর্ম জন্য ফলের তুলনাতেও অধিক শ্রেষ্ঠ । মনুসংহিতানুসারে এক্ষেত্রে ‘দেশ’ বলতে দাতার নিজের বসবাস করার স্থান ভিন্ন অপর কোন স্থান, ‘কাল’ অর্থে সুনির্দিষ্ট ও শুভ সময় এবং ‘দান জন্য সুবিহিত বিধি’ অর্থে দানের সময় জলের ছিটে পূর্ব্বক স্বস্তি ইত্যাদি বচন বলার উল্লেখ করা হয়েছে । বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সর্বদাই ‘দান’ ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে পূজিত হয়েছেন । তাই মেধাতিথিভাষ্যে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণকে দানই হল শ্রেষ্ঠ দান। কারণ ‘ব্রাহ্মণকে যে অর্থ দান করা হয় তা কোন কারণেই নষ্ট হয় না, শত্রূরা অপহরণ করতে পারে না, এমনকী অন্য কোন কারণ যেমন, বিস্ফোরণবশতও নষ্ট হয় না।’[২৮] ব্রাহ্মণকে দান করাই হল সর্বোৎকৃষ্ট এমনকী তা অগ্নিহোত্র যজ্ঞের তুলনাতেও শ্রেষ্ঠ । এই প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, ‘ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠতা হয় জ্ঞানের দ্বারা , ক্ষত্রিয়ের বীর্য্যের দ্বারা এবং বৈশ্যের ধন - ধান্য দ্বারা ; শূদ্রেরই কেবল জন্ম দ্বারা জেষ্ঠ্যতা হইয়া থাকে।’[২৯] এইরূপে দেখা যায় যে, চতুঃবর্ণ ব্যবস্থার ক্রমে জ্ঞানের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে সেইরূপ জ্ঞানের একমাত্র অধিকারীরূপে ব্রাহ্মণকে প্রথম বর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে । ক্ষত্রিয় বর্ণের স্থান দ্বিতীয় । কারণ ক্ষত্রিয়গণ তাদের শৌর্য্য ও বীর্য্যের বলে যে জ্ঞানের অধিকারী হন তা ব্রাহ্মণদের জ্ঞানের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ। তারও থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ হল অর্থ, ধন - ধান্য , তাই এইসবের অধিকারী রূপে সমাজব্যবস্থায় বৈশ্যগণের স্থান তৃতীয় । শেষতঃ শূদ্র বর্ণের মানুষ চতুর্থ শ্রেণীর । কারণ এদের জ্যেষ্ঠতা তথা সম্মান জন্মানুসারেই নির্ধারিত হত । এইরূপে বর্ণ ব্যবস্থার ক্রমের ব্যাখ্যায় যেরূপে যথাক্রমে জ্ঞান থেকে শুরু করে শৌর্য্য - বীর্য্য, ধন ও সম্পদ এবং জন্মের উল্লেখ পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে, যে এই জ্ঞানের অধিকারী কি

২৭. *মনু* ২।১৪২
২৮. ঐ , ৭ ।৮৩
২৯. *মেধাতিথি,* ২।১৫৫

কেবল ব্রাহ্মণগণই হতে পারেন ? অন্য কোন বর্ণের মানুষ নন ? কিন্তু মানুষমাত্রেই কোন না কোন জ্ঞানের অধিকারী হয় । তাহলে ঐরূপ নির্দেশের তাৎপর্য্য কি ? এর উত্তরে বলা যায় যে 'জ্ঞান' শব্দটিকে ভাষ্যে এরূপ সাধারণ জ্ঞান অর্থে নয় বরং এখানে বেদ জ্ঞান বা শাস্ত্র জ্ঞান অর্থে গৃহীত হয়েছে । তবে শুধু তাই নয়, একথা বললে বেদ অধ্যয়নের অধিকারী অপর সকল বর্ণের (যথা - ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) মানুষগণও এই শ্রেণীর অধিকারী হবেন । কারণ, এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনুসারে বেদাধ্যয়নে সমর্থ । তাই বলতে হবে যিনি বা যেসকল ব্যক্তি ঐরূপ শাস্ত্র ও বেদ জ্ঞান অপর ব্যক্তিকে দিতে সমর্থ তারাঁই প্রথম শ্রেণীর , তাঁরাই হন ব্রাহ্মণ । তাই তাঁদের স্থান সকলের শীর্ষে । এর পর স্থান রাজ্য বা দেশের রক্ষক ক্ষত্রিয় রাজার । তিনি ব্রাহ্মণদের দ্বারা নির্দেশিত হয়ে শাস্ত্রানুসারে আপন শৌর্য ও বীর্য্যের প্রদর্শনপূর্ব্বক দেশের বা রাজ্যের অধিবাসীকে রক্ষা করেন । আর তার জন্য প্রয়োজন হয় অর্থের। এইরূপে ধন সম্পদের গুরুত্ব বা প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয় তৃতীয় স্তরে । ফলতঃ সেই অর্থের উপার্জনকারী বৈশ্য বা বণিকদের স্থান হয় শ্রেণীক্রমের তৃতীয় সারিতে । আর যথাযথ নিয়ম নিষ্ঠাসহ অপর তিন বর্ণের সেবা শুশ্রূষা করে শূদ্ররা সমাজের প্রয়োজন অনুসারে শ্রেণীক্রমের চতুর্থ সারিতে অবস্থান করেন । তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ব্রাহ্মণদের স্থান যেমন সকল বর্ণের শীর্ষে উল্লিখিত হয়েছিল তেমনি তাঁদের জন্য কিছু নিয়ম বিধিও ছিল চূড়ান্ত । যেমন প্রতি ব্রাহ্মণের জন্যই বেদ জ্ঞান ছিল আবশ্যিক, নচেৎ তাঁরা ব্রাহ্মণ বর্ণের সম্মানের অধিকারী না হয়ে 'অকেজো' রূপে অবহেলার পাত্র বলে বিবেচিত হতেন । এই প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় নির্দেশিত হয়েছে, আপদ্‌কাল ছাড়া অন্য সকল সময়েই ব্রাহ্মণগণ এমন জীবিকার দ্বারা জীবন যাপন করবেন যাতে কোন প্রাণীর অনিষ্ট না হয়। এই প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণ বর্ণের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে বেদ অধ্যাপনা ছাড়াও ঋত অর্থাৎ উঞ্ছশিল, অমৃত বা অযাচিত ভিক্ষা, মৃত বা যাচিত ভিক্ষালব্ধ খাদ্য, প্রমৃত বা কর্ষণ এবং সত্যানৃত বা বাণিজ্য বৃত্তিও অনুমোদিত হয়েছে । [৩০] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মনুসংহিতানুসারে, জীবিকার অভাবে ব্রাহ্মণ বর্ণের জন্য যে, 'উঞ্ছশিলবৃত্তি', 'যাচ্ঞা', 'প্রার্থনা' ,'প্রতিগ্রহ' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ছিল তা তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় দানাদি ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে উচ্চারিত হত এবং 'দান' শব্দটির সঙ্গে অভিন্ন অর্থ বলে যেন সমাজব্যবস্থায় গন্য হত; কিন্তু মনু দেখিয়েছেন, উক্ত শব্দগুলি মূল 'দান' শব্দটির সঙ্গে উচ্চারিত হলেও, তারা অভিন্নার্থক নয় । তাই এই প্রসঙ্গে মনুর মতের তাৎপর্য্য নির্ধারণ অবশ্য আলোচ্য ।

---

৩০. *মনু*, ৪ ।২-৬

উঞ্ছশিলবৃত্তি :

মাঠে শষ্য উৎপাদন করার পর তা সংগ্রহ করে মাঠ থেকে বাড়ী নিয়ে যাওয়ার সময়, যে শষ্যকণা মাঠে পড়ে থাকে তা সংগ্রহ করে জীবন যাপন করাকে বলা হয় 'উঞ্ছশিলবৃত্তি' । মেধাতিথিভাষ্যানুসারে এই বৃত্তি সম্পাদনা নিয়মেই অত্যন্ত সৎ ও পবিত্র । মাঠে পড়ে থাকা ঐ সকল তুচ্ছ শষ্যকণা সংগ্রহ করে নিজের জীবনযাপন করার মধ্যে কোথাও কোন কালিমা বা হীনবোধ নেই । কারণ ঐসকল শষ্যকণাগুলি উদ্বৃত্ত এবং সেগুলির কোন দাবীদার বা অধিকারী নেই ফলতঃ তাদের দ্বারা নিজের জীবিকা অর্জনের মধ্যে কোথাও কোন অপরাধ বা অন্যায় নেই । এছাড়াও আরও যে বিষয়টি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য তা হল, এইরূপে জীবনযাপন করার মধ্যে ব্যক্তির যেমন রয়েছে স্বল্পাহারে নিজের ক্ষুধা নিবারণ করার প্রয়াস তেমনি অন্যদিকে রয়েছে নিজের চাহিদা, কামনা ও বাসনাকে সংযত রাখার অন্যোন্য প্রচেষ্টা । শাস্ত্রানুসারে যা মুক্তিকামী ব্যক্তির জন্য একান্ত অপরিহার্য্য । যদিও এর ব্যাখ্যা এইরূপ নয় যে মুক্তিকামী ব্যক্তি মাত্রই এইরূপ জীবিকা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে । বরং এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, একজন সাধারণ ব্যক্তির পাশাপাশি একজন মুক্তিকামী সাধক ব্যক্তিও একইভাবে কর্ম করতে পারেন এবং তাতে তার কোন অপরাধ হয় না । এর জন্য শষ্যকণা সংগ্রহকারীদের কারুর দয়া, করুণা কিংবা দানের উপর নির্ভর করতে হয়না । এইভাবে দেখা যায় যে, 'উঞ্ছশিলবৃত্তি' দানের সঙ্গে সমানার্থক নয় ।

যাচ্ঞা বা প্রার্থনা :

'দান' বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় আলোচিত অতিপরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ দুটি শব্দ হল 'যাচ্ঞা' বা 'প্রার্থনা'। যা সংঘটিত হয় অন্ততঃপক্ষে দুজন ব্যক্তির মধ্যে । এদের মধ্যে একজন দাতা আর অপর জন গ্রহীতা রূপে অভিহিত হন । মনুসংহিতায় এই 'যাচ্ঞা' সম্পর্কে নিন্দামূলক মনোভাব পোষণ করে বলা হয়েছে, যাচ্ঞাবৃত্তি হল মৃতের সমান । বরং ভাষ্যানুসারে যা যাচ্ঞা না করেই পাওয়া যায়, তাই অমৃত । [৩১] যেহেতু তা কারুর কাছে প্রার্থনা না করেই পাওয়া যায় । এইরূপে যে বস্তু বা বিষয়টি কারুর কাছে যাচ্ঞা না করেই দাতাগণের স্ব-প্রবৃত্তিতেই পাওয়া যায় তাই হল অমৃত । কারণ তাতে থাকে সম্মাননার প্রীতি, সুখ ও আনন্দ । অন্যদিকে 'যাচ্ঞা'কে ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে তুলনা করে তাকে মৃতের ন্যায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এমন নয় যে, ঐরূপ নিন্দনীয় অর্থে প্রযুক্ত হলেও ভিক্ষাবৃত্তি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনুসংহিতায় বিবেচিত হয়েছে। বরং এবিষয়ে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা এইরূপ যে, 'ভিক্ষা' শব্দটি 'ভৈক্ষ' এই অর্থে একমাত্র আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে

৩১. *মনু*, ৪।৫

অবশ্য স্বীকার্য । এক্ষেত্রে একজন প্রার্থনাকারী ততটুকুই প্রার্থনা বা যাচ্ঞা করবেন যতটুকু তাঁর নিজ জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয়, তার অতিরিক্ত নয় । যেমন একজন ব্রহ্মচারীর জন্য সিদ্ধান্নের 'যাচ্ঞা', গৃহস্থের জন্য খাদ্য ছাড়াও প্রয়োজনীয় অপরাপর জাগতিক দ্রব্য ইত্যাদির 'প্রার্থনা' বা 'যাচ্ঞা' স্বীকৃত হতে পারে কিন্তু তাও প্রয়োজনের ভিত্তিতে তার অতিরিক্ত নয় । কারণ প্রয়োজন অতিরিক্ত ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির দ্বারা অপরজনের কাছে বারংবার 'যাচ্ঞা'র মধ্যে দিয়ে দাতাকে বিব্রত করার বিষয়টি স্বাভাবিক ভাবেই দাতার অস্বস্তির কারণ হয়। যার ফলে যাচ্ঞাকারীর প্রতি দাতা অশ্রদ্ধা, গ্লানি ও বিরক্তি মনোভাব পোষণ করতে পারেন, যেটি তার (যাচ্ঞাকারীর) জন্য অবশ্যই নিন্দনীয় এবং অসম্মানজনকও । তাই এ প্রসঙ্গে ভাষ্যের নির্দেশ, যাচক যাচ্ঞা দ্বারা নিজের জীবন ধারণ করার সময় অবশ্যই এ বিষয়ে সতর্ক হবেন যে, তিনি অবশ্যই সময়ের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিভেদে যাচ্ঞা করবেন । কারণ একজন ব্যক্তির কাছে বারংবার একইভাবে যাচ্ঞা করে তাঁকে বিব্রত করে নিজেদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করার কাজও যাচ্ঞা বা প্রার্থনাকারীকে স্বাবলম্বনহীন বা মৃতের সমান বলা হয়েছে । মনুসংহিতার এইরূপ মতের প্রেক্ষিতে প্রশ্ন হতে পারে যে, তবে কি সংহিতানুসারে মৃত্যু নামক ঘটনা নিন্দিত হয়েছে ? কিন্তু এই সত্য তো প্রতিটি জীবনের জন্যেই অনিবার্য্য সত্য । যাকে কখোনই অস্বীকার করা যায় না । এইরূপ অনিবার্য্য সত্য নিন্দিত হলে ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত বিদেহ মুক্তির (মৃত্যুর পর আত্মার সম্পূর্ণ মুক্তি কিংবা দেহ বিযুক্ত আত্মার মুক্তি বা কৈবল্য) ঘটনা কিরূপে মনুসংহিতায় ব্যাখ্যাত হবে তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ । এইভাবে দেখা যায়, 'দান' প্রসঙ্গে যাচ্ঞা বা প্রার্থণার ভূমিকা থাকলেও উভয় শব্দের কোনটিই মূল 'দান' শব্দটির সঙ্গে অভিন্নার্থক নয় । আবার যাচ্ঞা ও প্রার্থনার মতো ভাষ্যে কৃষিকার্য সম্পর্কেও নিন্দামূলক মনোভাব পোষণ করে তাকে মরণাপেক্ষাও নিকৃষ্ট কর্ম বলা হয়েছে । কিন্তু প্রশ্ন হল, যে কৃষি আমাদের অন্নের সংস্থান যোগায় সেই কৃষি বৃত্তিকে কেন সংহিতায় নিম্নমানের বলে উল্লেখ করা হল ? মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, চাষের সময় যে লোহার লাঙ্গলের ব্যবহার করা হয়, তা চালনা করার মধ্যে দিয়ে জমিকে এবং জমিতে যে সকল প্রাণি আছে তাদের আঘাত করা হয় বা নষ্ট করা হয়, তাই তা নিন্দিত।[৩২] মেধাতিথিভাষ্যে বলা হয়েছে, ভূমি বিদীর্ন করণের জন্য । কৃষিকার্য্যের সময় লোহার লাঙ্গল দিয়ে ভূমির কর্ষণ করা হয় । এইরূপে লাঙ্গলের সাহায্যে চাষের জমি বা ভূমি কর্ষণের সময় পায়ের চালনা করতে হয়, লোহার লাঙ্গলের ভার বহন করতে হয় । এইরূপ ভার বহন করা মুটের কাজ । এই অর্থে কৃষিবৃত্তি নিন্দনীয় । সেক্ষেত্রে পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে, কৃষিকর্ম সম্পন্ন না হলে শষ্যের উৎপাদন হবে না এবং তার ফলে অন্নেরও সংস্থান হবে না, এই ব্যবস্থাও কি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ বা স্বীকৃত হবে ? সংহিতানুসারে এর উত্তরে বলা যায়, 'কৃষি

৩২. *মনু*, ১০ ।৮৪

বৃত্তি নিন্দনীয় 'বলার অর্থ এই নয় যে, কৃষি বৃত্তি নিষিদ্ধ । কারণ সেক্ষেত্রে বৈশ্য বর্ণের জন্য গোরক্ষা ও বাণিজ্যের পাশাপাশি যে কৃষিবৃত্তিও শাস্ত্রে বিহিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না । বরং এক্ষেত্রে বলা যায়, আপদ্‌কাল ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ বর্ণের জন্য 'অব্যবহিত বৃত্তি' রূপে 'কৃষি বৃত্তি' বর্জ্জনীয় এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের জন্য যথাক্রমে বৈশ্যদের অপরাপর বৃত্তিগুলির প্রশংসা এবং উৎকর্ষতা প্রদান করার লক্ষ্যেই এমন নির্দেশ করা হয়েছে । তবে এমন নয় যে, কৃষিকাজের কোন প্রয়োজনই সংহিতায় স্বীকৃত হয়নি । কারণ যিনি 'মহাপরিবারে কর্তা' অর্থাৎ 'মহাপরিগ্রহ' বা বহু পরিবারের কর্তা তিনি তাঁর প্রয়োজনে অনুসারে ক্ষেত্র বিশেষে যে ছয়টি ভিন্ন কর্ম সাধন পূর্ব্বক নিজ নিজ জীবিকা অর্জন করতে পারেন বলে উল্লিখিত হয়েছে তার মধ্যে কৃষি কার্য্যও অন্যতম একটি কার্য্য বলে মনুসংহিতায় স্বীকৃত হয়েছে ।

প্রতিগ্রহ :

'প্রতিগ্রহ' সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেসকল আলোচনা পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে 'দান' শব্দটির সঙ্গে আমরা দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় বহুল পরিচিত হলেও 'প্রতিগ্রহ' শব্দটির সঙ্গে সেই অর্থে পরিচিত নই। প্রতিগ্রহ বিষয়ে ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, এটি যেন দাতার একপ্রকার গুণ । দাতা তাঁর ধর্মানুসারে দানের বিষয় বিবেচনা করে বিধিপূর্বক নির্দিষ্ট মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে যা দান করেন গ্রহীতাও যদি সেই মননানুসারে সেই দান গ্রহণ করেন তবেই তাকে 'প্রতিগ্রহ' বলা হয় । ভাষ্যানুসারে, বিশুদ্ধ ব্যক্তির (যিনি শাস্ত্রবিহিত কর্মের সম্পাদন করেন) কাছ থেকে দান গ্রহণ করাকে বলা হয় 'প্রতিগ্রহ' । জীবন নির্ব্বাহের প্রয়োজনে 'দান' এর উল্লেখ সেই সমাজে ভিন্ন নামে যেমন - 'প্রতিগ্রহ' শব্দের দ্বারা পরিচিত ছিল । প্রশ্ন হতে পারে, প্রতিগ্রহ কী দানের মধ্যেও কোন বিশেষ ধরণের দান ? কিংবা কোন উন্নত মানের দান ? উত্তরে বলা যায় যে, শাস্ত্রে নির্দেশিত 'দানের' আদর্শ অনুসারে কর্ত্তব্য কর্ম বিহিত যে দানক্রিয়া তা যেমন সাধারণভাবে সম্পন্ন হতে পারে তেমনি তা বিশেষ বিধি ব্যবস্থা বা নিয়মানুসারেও সংগঠিত হতে পারে । ঐরূপ নিয়মানুসারে সংগঠিত দান ক্রিয়াকে 'প্রতিগ্রহ' বলা হয় । মেধাতিথিভাষ্যে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে যা দান করে, তা গ্রহণ করার নাম 'প্রতিগ্রহ' । শাস্ত্রে এইরূপ প্রতিগ্রহ ও তা গ্রহণকারী গ্রহীতাগণের সম্বন্ধে বেশ কিছু বিধি ও নিষেধের উল্লেখ করা হয়েছে । যেমন - সহ্য করার সামর্থ্য, ক্ষমা করার সামর্থ্য ইত্যাদি । এখানে সহ্য করা বলতে, গ্রহীতাগণের কষ্ট সহ্য করার সামর্থ্যের প্রতি আর ক্ষমা করার সামর্থ্য অর্থে দাতাগণের প্রতি গ্রহীতাগণের সন্তুষ্টি মনোভাবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । মনুসংহিতায় গ্রহীতা সম্পর্কে 'প্রতিগ্রহ' বিষয়ে যে সকল সামর্থ্য

বিধির কথা উল্লিখিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল - গ্রহীতা কখনোই দাতার কাছে বারংবার প্রতিগ্রহ করে তার উপরেই নির্ভরশীল হয়ে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন না । এছাড়াও তাঁর মধ্যে থাকতে হবে 'শাস্ত্রজ্ঞান, শাস্ত্র অধ্যয়ন, সদাচার পরায়ণতা এবং দ্রব্য সম্বন্ধে বিধি নির্দেশের জ্ঞান ' - কারণ এইগুলিই ঐ সামর্থ্য' [৩৩] । এই প্রসঙ্গে কতকগুলি বিধি নির্দেশ করে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ জীবিকার অভাবে প্রতিগ্রহ করবেন এমন অনুমোদিত হলেও তিনি এই বিষয়ে অভ্যস্ত বা আসক্ত হয়ে পড়বেন না, কারণ অতি প্রতিগ্রহে ব্রহ্মতেজ বিনষ্ট হয় । মেধাতিথিভাষ্যে এই প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে , কাম উপভোগ প্রভৃতির জন্য প্রতিগ্রহ করা কর্তব্য নয়। বরং নিত্য কর্ত্তব্যের সম্পাদন এবং নিজের পরিবার পরিজনদের প্রতিপালনের জন্যেই প্রতিগ্রহ করা কর্ত্তব্য, অন্য কোন কারণে নয় ।[৩৪] শুধু তাই নয়, এবিষয়ে গ্রহীতার প্রতি মনুসংহিতার কঠোর নির্দেশ যে, বিদ্বান্ ব্যাক্তি ক্ষুধায় অবসন্ন হলেও কোন দ্রব্যের ধর্ম্মসঙ্গত বিধি কি তা বিশেষরূপে না জেনে প্রতিগ্রহ করবে না। কারণ গ্রহীতা দাতার কাছে যে বিষয়ের যাচ্ঞা বা প্রতিগ্রহ করবেন সেই সকল বিষয় এবং তার উপযোগিতা সম্পর্কে যদি তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান না থাকে তবে সেই সকল দ্রব্যগুলির ব্যবহারে তাঁরা সমর্থ হবেন না । তাই প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ সম্পর্কে যথাযথ বিধি বিষয়ে অবগত হয়ে প্রতিগ্রহ করবেন। অজ্ঞ ব্যক্তি স্বল্প প্রতিগ্রহেও ভীত হবেন । কারণ যে দ্বিজ তপস্যা করেন না, বেদ অধ্যয়ন করেন না কেবলই প্রতিগ্রহ পরায়ণ হয়ে জীবনযাপন করতে চান তিনি জলে পাথরের ভেলার মত নিমজ্জিত হন । [৩৫] সুতরাং প্রতিগ্রহ অনুষ্ঠান সম্পাদন করার ক্ষেত্রে দাতা যেমন সতর্ক হবেন তেমনি অনাসক্ত হতে হবে গ্রহীতাকেও । তবেই তা যথাযথরূপে ফলপ্রদায়ক হবে, নচেৎ নয় । এইভাবে দেখা যায়, ব্রাহ্মণের জন্যে জীবিকার অভাবে মনুসংহিতায় অনুমোদিত হয়েছে যে উঞ্ছ ও শিল বৃত্তি বা 'ঋত' তা কিন্তু ঐরূপ প্রতিগ্রহ থেকে ভিন্ন । কারণ দুটির বিষয় সম্পূর্ণ ভিন্ন । এই দুই ক্ষেত্রে (উঞ্ছ ও শিল বৃত্তিতে) গ্রহীতার কোন যাচ্ঞা থাকেনা । আবার এমনও নয় যে, যাচ্ঞাদি ভিক্ষা প্রভৃতি ক্রিয়া মানেই তা 'প্রতিগ্রহ' । কারণ মনুসংহিতানুসারে প্রতিগ্রহ স্থলে যেরূপ মন্ত্র পাঠের নির্দেশ পাওয়া যায়, তা ভিক্ষাদান প্রভৃতি স্থলে থাকেনা । কোন ব্যক্তি আনন্দের সঙ্গে যখন কাউকে কিছু দান করেন যা ভাষ্যানুসারে 'অমৃত' বলেও অভিহিত হয়েছে, সেই 'অমৃত'ও প্রতিগ্রহ থেকে ভিন্ন । শুধু তাই নয়, কোন দাতা যদি নিজ বিবেক বোধের তাড়নায় কিংবা কারুণ্যবোধে দয়াপরবশতঃ অপরকে কিছু দান করেন সেই ক্রিয়াও 'প্রতিগ্রহ' নয় । কারণ এই সকল ক্ষেত্রে শাস্ত্র নির্ধারিত কোনও নিয়ম বা বিধির পালন কিংবা কোন বৈদিক মন্ত্র পাঠ ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায় না । কাজেই দান ক্রিয়ার পূর্বোক্ত ক্ষেত্রদুটিও প্রতিগ্রহ থেকে ভিন্ন । সুতরাং উক্ত

৩৩. *মেধাতিথি,* ৪ । ১৮৬
৩৪. ঐ, ৪ । ১৮৭
৩৫. *মনু* , ৪ । ১৮৬-১৯১

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, প্রতিগ্রহ হল এমন একটি দান ক্রিয়া যা অবশ্যই শাস্ত্র নির্ধারিত নিয়ম বা বিধি অনুসারে নির্দিষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সম্পাদিত হবে । অন্যথায় কোন দান ক্রিয়া সম্পন্ন হলেও তাকে ‘প্রতিগ্রহ’ বলে উল্লেখ করা যাবে না । তাই একথা বলা যায় যে , সকল ‘প্রতিগ্রহ’ অনুষ্ঠানে ‘দান’ সম্পন্ন হলেও ‘দান’ ক্রিয়া মাত্রেই ‘প্রতিগ্রহ’ নয় ।

প্রতিগ্রহ বিষয়ে গ্রহীতাদের প্রতি মনুসংহিতার নির্দেশ :

দান বিশেষতঃ প্রতিগ্রহ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এর অন্যতম দুটি স্তম্ভ, দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের সম্বন্ধেই মনুসংহিতায় প্রভূত বিধি নির্দেশের উল্লেখ পাওয়া যায় । দেখা যায় যে প্রতিগ্রহ বিষয়ে গ্রহীতাদের সতর্ক করে মনুসংহিতায় নির্দেশিত হয়েছে, ‘যিনি ক্ষত্রিয় সন্তান নন সেরূপ রাজার কাছ থেকে প্রতিগ্রহ করা যাবে না । সূনা, চক্র ও ধ্বজ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির এবং বেশজীবী ব্যক্তিরও দান গ্রহণ করিবে না ।’ [৩৬] এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ করার আগে যে বিষয়টি অবশ্য উল্লেখ্য তাহল, যদিও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় চতুঃবর্ণের জন্যই দান ক্রিয়া স্বীকৃত ছিল তথাপি এবিষয়ে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজা বা অধিপতি । কিংবা আরও স্পষ্টভাবে বলা যায় ক্ষত্রিয়জাত সন্তান । এবিষয়ে শাস্ত্রের স্পষ্ট নির্দেশ, যে রাজা ক্ষত্রিয় ঔরসজাত সন্তান নন তাঁর কাছ থেকে কোন দান কিংবা প্রতিগ্রহ স্বীকৃত নয় । কাজেই এইরূপ নির্দেশের ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, দান ক্রিয়া ব্যবস্থায় সকল বর্ণের জন্য অধিকার স্বীকৃত হলেও এবিষয়ে ক্ষত্রিয়জাত অধিপতিদেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল । মনুসংহিতানুসারে নিম্নোক্ত দশটি ক্ষেত্রে গ্রহীতার দান গ্রহণ বা প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল ।

প্রথমত ঃ ক্ষত্রিয় সন্তান নন এমন রাজার কাছ থেকে প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ । এক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় সন্তান বলতে ‘রাজা’ কে ইঙ্গিত করা হয়েছে । কারণ সেই সময় ‘রাজা’ শব্দটির ব্যবহার ব্যপক অর্থে প্রচলিত ছিল তখন ক্ষত্রিয় বলতে বোঝানো হত, ক্ষত্রিয় রাজার ঔরস জাত সন্তান কিংবা কোন জন বা দল গোষ্ঠীর প্রধানকে। যিনি মনুস্মৃতিতে ‘জনপদের অধীশ্বর’ বলেও অভিহিত হয়েছেন। প্রশ্ন হতে পারে, বর্ণভেদে তো জনগোষ্ঠী বিভিন্ন হতে পারে ফলতঃ সেই জনগোষ্ঠীর প্রধান কিংবা দলপতিওতো সেই একই বর্ণেরই ব্যক্তি হবেন ।

---

৩৬. *মেধাতিথি*, ৪ ।৮৪

তাহলে তিনিও কি 'জনপদের অধীশ্বর' বলে অভিহিত হতেন ? কিংবা তার কাছ থেকেও কি প্রতিগ্রহ শাস্ত্রসম্মত ছিল ? এর উত্তরে মনুসংহিতানুসারেই বলা যায়, শাস্ত্রসম্মত দান গ্রহণ সর্বদা ক্ষত্রিয় বর্ণজাত রাজার কাছ থেকেই হওয়া কাম্য ছিল। তবে রাজা কেবল ক্ষত্রিয় বর্ণজাত হলেই যে তিনি দান করতে সমর্থ হবেন বা তাঁর কাছ থেকে প্রতিগ্রহ শাস্ত্রসম্মত হবে এমন নয় বরং এবিষয়ে মনুসংহিতার অন্যতম নির্দেশ ছিল, রাজা অবশ্যই শাস্ত্রানুসারী হবেন । কারণ এমন ক্ষত্রিয় রাজা যিনি শাস্ত্রানুসারী নন, বরং ক্ষেত্রবিশেষে শাস্ত্রের বিরুদ্ধাচারী হয়েছেন, তাকে 'লুব্ধ' বলা হয়, এমন রাজার কাছ থেকে প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল ।

দ্বিতীয়ত ঃ যে ব্যক্তি 'সৌনিক' তাঁর কাছ থেকেও প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ হয়েছে । প্রশ্ন হয়, 'সৌনিক' বলতে কাকে বোঝানো হয় ? কিংবা এদের কাছ থেকে প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধই বা হয়েছে কেন ? উত্তরে মনুস্মৃতি অনুসারে বলা যায়, যিনি ''সূনা' অর্থাৎ পশুবধ করে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন তাকে বলা হয় সৌনিক । যে ব্যক্তি বধ করা পশুর মাংস ক্রয় বা বিক্রয় করে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন তিনি 'সূনাবান্' । লৌকিক ভাষায় ইহাদের খটিক বা কসাইও বলা হয় । '[৩৭] শাস্ত্রে এহেন সৌনিকের কাছ থেকে প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ হয়েছে । প্রশ্ন হতে পারে, শাস্ত্রানুসারে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অচৌর্য্য এবং ইন্দ্রিয় সংযম প্রভৃতির পালন সকলের জন্য কর্ত্তব্য কর্ম বা সাধারণ ধর্মরূপে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে এইরূপ হিংসা আশ্রিত জীবিকার কেন অনুমোদন করা হল ? কেন জীবিকা রূপেও তা নিষিদ্ধ হল না ? মেধাতিথিভাষ্যানুসারে উত্তরে বলা যায় যে, ক্ষেত্রবিশেষে নিষাদ ও ক্ষত্ত্ব প্রভৃতি জাতির মানুষের জন্য তাদের জীবিকার কারণে পশু বা প্রাণিবধ কোনরূপ অহিংসা নয় বরং কর্ত্তব্য । যে অর্থে 'মাংস ভক্ষণ' শাস্ত্র স্বীকৃত সেই অর্থেই পশুবধও ক্ষেত্র বিশেষে শাস্ত্র অনুমোদিত । তবে এই প্রসঙ্গে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যেসকল পশু বা প্রাণি জীবিকার জন্য বধ্য বলে শাস্ত্র কর্ত্তৃক নির্দিষ্ট হয়েছে তার অতিরিক্ত অন্য কোন প্রাণীর হত্যা কিন্তু হিংসা বলেই গন্য হবে ; যা শাস্ত্র অনুমোদিত নয় । তাই যেকোন অনুষ্ঠানে অতিথিগণের ভোজনের জন্য আবশ্যক কিংবা পরিবারের প্রতি নিজ দায়িত্ব পালন করার কর্ত্তব্য ভিন্ন অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয় প্রাণি হত্যা শাস্ত্র স্বীকৃত নয় ।

তৃতীয়ত ঃ এর পরবর্তী স্তরে আলোচনা করা হয়েছে 'চক্র' দের সম্বন্ধে । ''চক্র' শব্দটির দ্বারা মনুসংহিতায় তেল ব্যবসায়ীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । সংহিতানুসারে যেসকল ব্যক্তি এইরূপ 'ঘানি' বা 'তৈল নিষ্কাষণ' যন্ত্র দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন'[৩৮] তাঁরাই ঐরূপ 'চক্র' । তাদের কাছ থেকেও প্রতিগ্রহ

---

৩৭. *মেধাতিথি*, ৪ ।৮৫
৩৮. ঐ,. ৪ ।৮৪

নিষিদ্ধ হয়েছে । প্রশ্ন হতে পারে , কেন ‘চক্র’ গণের জীবিকা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয়েছে ? উত্তরে বলা যায়, ধর্ম্মার্থে প্রয়োজন যেমন- বিবিধ যজ্ঞ ,স্বাধ্যায় কিংবা দানাদি ক্রিয়া ভিন্ন অপর কোন উদ্দেশ্যে কিংবা অধিক লাভ করার মনোকামনায় তিল বহুদিন ধরে রেখে দিয়ে তা বিক্রয় করা কিংবা তা থেকে তেল উৎপন্ন করা নিষিদ্ধ বলে শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে । কারণ তাতে ব্যক্তি মনের স্বার্থানুভূতি ও অধিক লাভ করার লোভ বা মনোবাসনা প্রকাশ পায় । এতে ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধের অবনমন ঘটে । তাই ঐরূপ জীবিকা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্ষেত্রে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয়েছে ।

চতুর্থত ঃ শাস্ত্রানুসারে দান করতে সমর্থ নন ‘ধ্বজ’গণও । মনুসংহিতানুসারে ‘যিনি সুরা বা নেশাকারক বস্তু যেমন মদ্য ক্রয় - বিক্রয় জনিত কোন ব্যবসার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন,’ [৩৯] তাকে ‘ধ্বজ’ বলা হয় । এঁদের কাছ থেকেও প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ । যেহেতু এরা সামাজিক ক্ষতির কারণ । এঁদের দ্বারা সমাজের শৃঙ্খলা ব্যবস্থার অবনমন ঘটে । তাই দাতা রূপে এঁদের অবস্থান শাস্ত্রানুমোদিত ছিল না ।

পঞ্চমত ঃ প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল ‘বেশ’ দের কাছ থেকেও । শাস্ত্রে ‘‘বেশ’ বলতে ইঙ্গিত করা হয়েছে দেহপোজীবিকাদের প্রতি ।’ [৪০] জীবন নির্ব্বাহ করার প্রয়োজনে এইরূপ জীবিকার দ্বারা উপার্জিত আয় সমাজে নারী জাতির পক্ষে সমাজে অবমাননাকর এবং অসম্মানীয় ছিল । তাই তা সংহিতানুসারে নিন্দিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পূর্বোক্ত সকল ক্ষেত্রগুলির তুলনামূলক বিচারে দোষজনকতা প্রদর্শনের জন্য স্মৃতিতত্ত্ব অনুসারে বলা যায় , ‘একটী চক্র দশটী সুনার সমান দোষপ্রদ ;একটী ধ্বজ দশটী চক্রের সমান দোষজনক ; একটী বেশ দশটী ধ্বজের সমান দোষাবহ , এবং একটী নৃপতি দশটী বেশের সমান দোষজনক ; এদের কাছ থেকে দান গ্রহণ দোষজনক হয় ।’ [৪১] দেখা যায় যে, দোষজনকতা প্রদর্শনের তুলনামূলক বিচারে মনুসংহিতানুসারে পূর্বোক্ত সকল ক্ষেত্রগুলির তুলনায় নৃপতি বা রাজাই সর্বাধিক নিন্দিত ছিলেন । তবে এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সকল রাজা বা ‘জন-পদের অধীশ্বর’ এর কাছ থেকেই যে দান গ্রহণ বা প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল তা নয় । বরং এক্ষেত্রে সেইসকল নৃপতিগণই নিন্দিত হয়েছেন যাঁরা শাস্ত্রনিষিদ্ধ পথের অনুসারী হয়েছেন, বা যাঁরা শাস্ত্রানুসারে ‘লুব্ধ’ । সংহিতানুসারে এইসকল নৃপতি বা রাজা পূর্বোক্ত সকল কর্মের তুলনাতেও অনেক বেশী নিন্দিত একজন ব্যক্তি। তাই এইরূপ রাজার কাছ থেকে প্রতিগ্রহ করা বা দান গ্রহণ করা ‘নরকভোগ বা নরকবাসের সমতুল্য’ । কাজেই

---

৩৯. *মেধাতিথি,* ৪ ।৮৪
৪০. ঐ,. ৪ ।৮৪
৪১. ঐ, ৪ ।৮৫

এইরূপ রাজার কাছ থেকে প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল । বর্জ্জনীয় বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 'যে অর্থ এবং কাম ধর্ম বর্জিত তা পরিত্যাগ করতে হবে । এইরূপ যে ধর্মের পরিণামে পরবর্তীকালে কষ্টে পড়তে হয় কিংবা যে ধর্ম লোক নিন্দিত তা পরিত্যাগ করতে হবে ' ।[৪২] অর্থাৎ সংহিতানুসারে, যেসকল ধার্মিক অর্থ ও কামাসক্ত তারা যেমন পরিত্যজ্য তেমনি যে সকল কর্ম তা সে ধর্ম কর্মই হোক্ না কেন তা যদি প্রভূত অর্থব্যয় সাধক হয় , যাতে ঐ ধর্ম কর্মের কর্তা কিংবা তাঁর পরিবার ভবিষ্যতে কোন ভাবে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন তবে সেইরূপ ধর্ম - কর্ম অবশ্যই নিন্দনীয় । ফলতঃ তা নিষিদ্ধ । দার্শনিক অনুসন্ধানের দৃষ্টিকোণ থেকে উক্তরূপ আলোচনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রশ্ন হতে পারে। যেমন শাস্ত্রানুসারে কোন ধার্মিক ব্যক্তি অর্থ ও কামাসক্ত হয়ে কোন ধর্ম কর্ম করলে যদি তা নিন্দনীয় হয়, তবে সেক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্ন হবে, মনুসংহিতায় এক্ষেত্রে ধার্মিক বলতে কাদের নির্দেশ করা হয়েছে ? দ্বিতীয়তঃ ধার্মিকের কি কোনরূপ স্তরভেদ হয় ? তৃতীয়তঃ ধর্ম কর্ম অথচ তা শাস্ত্র নিষিদ্ধ এমন কথা বললে কি স্ববিরোধিতা দোষের আপত্তি হয় না ? .সংহিতানুসারে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, যিনি তাঁর আপন বর্ণ অনুসারে শাস্ত্র বিহিত বা নির্দিষ্ট কর্ত্তব্য -কর্ম বা তাঁর আপন ধর্মের যথাযথ পালন করেন, তিনিই প্রকৃত অর্থে ধার্মিক । দ্বিতীয়ত, শাস্ত্রানুসারে সেই অর্থে ধার্মিকের কোন স্তরভেদের উল্লেখ পরিলক্ষিত না হলেও সংহিতানুসারে একথা বলা যায় যে, জ্ঞানের গভীরতায় এবং বর্ণানুসারে নিজ ধর্ম বা কর্ত্তব্যের যথাযথ পালন যেকোন বর্ণের ব্যক্তিকে তাঁর নিজ শ্রেনীতে এক উচ্চ মর্যাদায় আসীন করে । সেই অর্থে তাঁর শ্রেষ্ঠতা নির্ধারিত হতে পারে । তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, 'দান' ক্রিয়া সমাজের সকল বর্ণের ব্যক্তির জন্যই উপদিষ্ট হলেও এবিষয়ে 'দাতা' ও 'গ্রহীতা' সম্পর্কে যে বিশেষ বিধিগুলি নির্দিষ্ট হয়েছে সেগুলির প্রতিটিই বর্ণানুসারে শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য - কর্ম বা ধর্মের প্রেক্ষিতেই উপদিষ্ট হয়েছে । এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি নিজ ধর্ম মনে করে এমন কোন কর্ম সাধনে উদ্যত হন যাতে প্রভূত পরিমাণ অর্থ ব্যায় হয় এবং তাতে তাঁর পরিবার ও পরিজনেরা ভবিষ্যতে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন ; তবে সেই কর্মকে ব্যক্তি নিজ ধর্ম রূপে গণ্য করলেও তা শাস্ত্রবিহিত ধর্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম নয়। কারণ শাস্ত্রানুসারে যেকোন বর্ণের ব্যক্তির কাছেই তাঁদের প্রথম ও পরম ধর্মই হল তাঁদের নিজ নিজ পরিবার ও পরিজনদের প্রতি যাবতীয় দায়িত্ব পালন করা । তাঁদের কে বঞ্চিত করে বা কষ্ট দিয়ে অপরের সেবাও ধর্ম রূপে শাস্ত্রানুমোদিত নয়। তাই এক্ষেত্রে কোন স্ববিরোধিতার আপত্তি হয় না। শাস্ত্রের নির্দেশ এমন কর্ম সাধনে কোন ব্যক্তি অবশ্যই উদ্যত হবেন না, তা সে যতই পুণ্যফল জনক কর্ম হোক্ না কেন। কারণ একজন দাতার কাছে সবার প্রথম তাঁর পরিবার । কাজেই

৪২. *মেধাতিথি,* ৪ ।১৭৬

তিনি অবশ্যই সচেতন হবেন তাঁর পরিবারের প্রতি সকল দায় - দায়িত্ব পালনের জন্য। এবিষয়ে কোনরূপ কর্তব্যের অবহেলা করে তিনি যতই অপরকে দান করুন না কেন সেই দান ক্রিয়া কোনভাবেই দাতার অনুকূলে ফলপ্রসবিনী হবে না । বরং তাঁর আপন পরিবার ও পরিজনদের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা করার জন্য তিনি সমাজে নিন্দিত হবেন এবং এর জন্য তিনি মন্দ কর্মফলও সঞ্চয় করবেন । যার সম্পূর্ণ দায়ভার ঐ ব্যক্তিরই হবে । ফলতঃ এইরূপ দানক্রিয়া নিষিদ্ধ । এবিষয়ে মনুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ে নির্দেশিত হয়েছে - ' নিজের পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি স্বজনবর্গ গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট পাইতেছে অথচ পরকে দান করিবার বেলা যাঁহার শক্তির ত্রুটি নাই , তাঁহার সেই দানধর্ম্ম, ধর্ম্মের ছায়ামাত্র , উহা আপাততঃ মধুর বটে, কিন্তু উহার পরিণাম বিষময়।'[৪৩] দান বিষয়ে দাতাকে সর্বপ্রথমে তাঁর পরিবারের প্রতি দায়িত্ববান থাকতে হবে শাস্ত্রের এমন বক্তব্য থেকে বেশ কতকগুলি প্রশ্ন হয়, যেমন -'পরিবার' শব্দটি মনুসংহিতায় কিরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে ? পারিবারিক সদস্য অতিরিক্ত ক্ষেত্রে কি দাতার দান সংহিতানুসারে প্রসিদ্ধ নয় ? আবার পরিবার বলতে যদি নিজের বাবা - মা ভাই বোন ইত্যাদি বোঝায় তাহলে তো তা সন্ন্যাসীদের থাকে না । তবে কি সংহিতানুসারে সন্ন্যাসীর দান প্রসিদ্ধ নয় ? কারণ তিনি তো সর্বত্যাগী একজন মানুষ তাঁর পরিবার বলতে কিছু নেই । তাহলে গৃহত্যাগী কোন সন্ন্যাসী কি দাতা হতে পারেন না ? মনুসংহিতানুসারে পূর্বোল্লিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে প্রথমটির উত্তরে বলা যায় , এক্ষেত্রে 'পরিবার' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে তা যেমন ক্ষেত্রবিশেষে নিজের 'আত্মীয় - পরিজন' অর্থে গৃহীত হয়েছে তেমনি আবার 'স্বজনবর্গ' কে নির্দেশ প্রসঙ্গেও ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বলা যায়, একজন দাতা তিনি যদি গৃহস্থ হন, তবে তিনি প্রথমে অবশ্যই তাঁর পরিবারের প্রতি বা নিকট আত্মীয় বা পরিজনদের প্রতি দায়িত্ব পালন করবেন এবং তারপর তিনি অন্যান্য অপরিচিত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে দান করার ব্যাপারে শাস্ত্রানুমোদিত হবেন । এক্ষেত্রে 'পরিবার' শব্দটি আত্মীয় - পরিজন অর্থে গৃহীত হয়েছে। আবার কোন দাতা তিনি যদি গৃহস্থ না হয়ে সন্ন্যাসী হন তবে তাঁর দান কর্মও শাস্ত্রানুসারে দুটি ভিন্ন উপায়ে সাধিত হতে পারে । যেমন-

প্রথমত ঃ ধর্ম দান (ধর্মপোদেশ দান) বিষয়ে সকল বিধিই শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ।

দ্বিতীয়ত ঃ তিনি যদি দ্রব্য দান করতে উৎসাহী হন তবে তাঁরও প্রাথমিক দায়িত্ব হবে তাঁর নিজ স্বজনবর্গের উদ্দেশ্যে দান করা, অর্থাৎ তিনি যদি কোপন মঠবাসী সন্ন্যাসী হন তবে তিনি প্রাথমিকভাবে দায়িত্ববান হবেন ওই

---

৪৩. *মনু* ১১।৯

মঠবাসী অপরাপর সভ্য ও সন্ন্যাসীদের প্রতি । এইক্ষেত্রে ‘পরিবার’ শব্দটিকে ‘স্বজনবর্গ’ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে । তারপর তিনি অপরাপর ব্যক্তিসকলকে দান করতে অনুমোদিত হবেন । এইভাবে দেখা যায়, ‘দাতা’ রূপে সন্ন্যাসীর দানও শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ।

শাস্ত্রানুসারে ‘দান’ ধর্ম্ম বলে প্রসিদ্ধ হলেও তা ক্ষেত্র বিশেষে নিন্দনীয়ও ছিল । এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মেধাতিথিভাষ্যের স্পষ্ট নির্দেশিত হয়েছে, স্থল বিশেষে ধর্মও নিন্দিত হয় । তাই ঐরূপ নিন্দিত ধর্ম - কর্ম বর্জ্জনীয় । যেমন - সর্ব্বস্ব দান প্রভৃতি । এতে লোকে মহাপুণ্যবান্ ধার্ম্মিক বলে সুখ্যাতি করিবে বটে, কিন্তু পরিণামে অর্থাভাবে কষ্ট পেতে হবে । একইভাবে নদীর তীরে একপার্শ্বে যদি কেউ প্রতিদিন স্নান করেন তাতে বহুলোক দেখতে পায় এবং তাতে সুখ্যাতি হয় । এই স্নান ধর্মফলক হলেও এর দ্বারা লোককে আকর্ষণ করা হয় । সকলের সমক্ষে বা সকলে যাতে দেখতে পায়, সেইভাবে তা করবার উদ্দেশ্য হল সাধুবাদ লাভ করা। একইভাবে, তীর্থে ভিক্ষুককে যে দান করা হয় তাতে ধর্ম হলেও দাতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করাই তার অপর প্রয়োজন । বস্তুতঃ এইসকল ক্ষেত্রে দান কর্ম ধর্ম থেকে ভিন্নই হয় ।এইরূপে যে ধর্ম্ম কেবলই ‘লোকসংক্রুষ্ট’ বা লোক দেখানো তা বর্জ্জনীয়।[৪৪] এই ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও আরো কতকগুলি ক্ষেত্রেও মনুসংহিতায় প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ হয়েছে ; যেমন - শাস্ত্রানুসারে গ্রহীতা কখনোই নিজের সুখ,সন্তুষ্টি বা আনন্দ উপভোগ করার জন্য দাতার নিকট কোন যাচ্ঞা বা প্রার্থনা করবেন না । অথবা ঐ একই কারণে তিনি প্রতিগ্রহও করবেন না । প্রতিগ্রহ বিষয়ে গ্রহীতাগণের উদ্দেশ্যে মনুসংহিতায় নির্দেশিত সকল নিয়ম, বিধি - সামর্থ্য বিধি ইতাদি পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেই সময় প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় বিদ্যাচর্চার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল । কারণ এই সমাজব্যবস্থানুসারে একজন ব্যক্তি তাঁর প্রয়োজন মতো বিষয় বা দ্রব্যাদি যাচ্ঞা করে বা প্রার্থনা করে তাঁর দিন যাপন করতে চাইলেই যে তা অতি সহজেই সম্ভব ছিল এমন নয় । এর জন্য তাকে এর উপযুক্ত হতে হতো, সেই বিষয় বা দ্রব্যাদি সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত হতে হতো, পাঠ গ্রহণ করতে হতো । অন্যথায় সে গ্রহীতা হওয়ারই উপযুক্ত হতো না । কাজেই একথা খুবই স্পষ্ট যে, সেই সময় সমাজে শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্ব ছিল।

---

৪৪. *মেধাতিথি*. ৪ ।১৭৬

দাতার জন্য দান বিধি :

দান ক্রিয়ায় দাতার কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, দাতা 'বৈড়ালব্রতিক, বকব্রতিক এবং অবেদবিৎ' এই তিনপ্রকার ব্যক্তিকে দ্রব্য দানে বিরত থাকবেন । এখানে দ্রব্য দান বলতে 'ধন' দান এর কথাই বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে । প্রশ্ন হতে পারে, 'বৈড়ালব্রতিক', 'বকব্রতিক' এবং 'অবেদবিৎ' বলতে কীরূপ ব্যক্তির প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে ? উত্তরে ভাষ্যকে অনুসরণ করে বলা যায়, -- যিনি শাস্ত্রের বিধি বা নির্দেশানুসারে নয় বরং নিজের প্রচার কিংবা খ্যাতি লাভের জন্যেই ধর্মানুষ্ঠান করেন তাঁকে শাস্ত্রানুসারে 'বৈড়ালব্রতিক' বলা হয়েছে । এই সকল ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে অন্যদের বঞ্চিত এবং ছলনা করেন । ছদ্মবেশ ধারণ করে অপরের উপকার সাধন করার নামে, প্রকৃত অর্থে তাঁদের অনিষ্টই সাধন করেন । এঁরা অপরের প্রশংসায় নয় বরং সমালোচনায় অভ্যস্ত হন । কপটতা এঁদের স্বভাব। বিড়াল যেমন আমিষ খাবার প্রত্যাশায় কপটভাবে ঘুমের অভিনয় বা ছলনা করে নিজের শিকার ধরে ঠিক সেই রকমই যেসকল ব্যক্তি ঐরূপ ছলনা পূর্ব্বক ধর্ম্মাচারণ করেন তাঁদের বৈড়ালব্রতিক বলা হয় । [৪৫] অন্যদিকে যাঁদের দৃষ্টি নিম্নগামী বা অধোগামী কিংবা হীন, যাঁরা অপলক দৃষ্টিতে কাতরভাবে শুধু নিজেদেরই উপকার এবং লাভের লক্ষ্যে পরিচালিত হন তাঁরা 'বকব্রতচারী' । বক যেমন মাছ শিকার করার লক্ষ্যে অপলক দৃষ্টিতে নীচের দিকে অর্থাৎ জলের দিকে তাকিয়ে থাকে ঠিক সেইরূপ । 'বকব্রতচারী' গণ নিজেদের লক্ষ্য লাভের লক্ষ্যে মিথ্যা কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যেকোন হীন এবং নিষ্ঠুর কাজেও পিছপা হন না । যেভাবেই হোক নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য । [৪৬]

এখন প্রশ্ন হতে পারে, বৈড়ালব্রতিক ও বকব্রতিক উভয়েই প্রসিদ্ধ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার বিষয়ে, এবং শুধু তাই নয়, এরা উভয়েই ক্ষেত্রবিশেষে হিংসাপরায়ণও তাহলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? কিংবা পৃথকভাবে এদের উল্লেখের কারণ কী ? উত্তরে বলা যায়, মনুসংহিতানুসারে বৈড়ালব্রতিক ও বকব্রতিক উভয়েই নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার বিষয়ে উদগ্রীব ও সদৃশ হলেও এদের কর্ম্মের মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে । কারণ বকব্রতিকরা যেকোন ক্ষেত্রে যেকোন উপায়েই কেবল নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার বিষয়েই অত্যন্ত আগ্রহী অন্য কোন বিষয়ে নয় । অন্যদিকে একইভাবে বৈড়ালব্রতিক ব্যক্তিরা যেকোন উপায়েই তা সে যত হিংসাপরায়ণই

---

৪৫. *মনু.* ৪ ।১৯৫
৪৬. ঐ, ৪ ।১৯৬

হোক্ না কেন কেবল ব্যক্তি স্বার্থ পূরণে উৎসাহী । তবে শুধু তাই নয়, এদের ক্ষেত্রে এও দেখা যায় যে, যদি এমন কোন পরিস্থিতি তৈরী হয় যেখানে এরা নিজেদের উদ্দেশ্য বা স্বার্থ চরিতার্থ করতে সক্ষম নন অথচ অন্য কোন ব্যক্তি সেই বিষয়ের সুবিধাভোগী ; তখন সেক্ষেত্রে বৈড়ালব্রতিক ব্যক্তি তৎপর হয়ে এবিষয়ে নিশ্চিত হতে চান যে, কিভাবে ঐসকল ব্যক্তিকে সেই সুবিধালাভে বঞ্চিত করা যায় । কারণ এঁরা কেবল নিজ স্বার্থ বিষয়েই সংশ্লিষ্ট নন, বরং অন্যদের নিন্দামন্দ করে সমাজে তাদের স্থানচ্যুত করার ব্যাপারেও অত্যন্ত আগ্রহী । প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাবসহ এঁরা অপরের উন্নতি সহ্য করতে না পেরে তাদের ক্ষতিসাধন করতেও পিছপা হন না । কিন্তু এইরকম হিংস্র মনোভাব বকব্রতিকদের মধ্যে দেখা যায় না । তাই বলা হয় যদিও এঁদের উভয়ের লক্ষ্যই হল নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করা । কিন্তু বৈড়ালব্রতিকদের মতো করে বকব্রতিকরা অপরের ক্ষতিসাধনে বিশ্বাসী নয়। তাই মেধাতিথিভাষ্যে বলা হয়েছে, ‘বকব্রতিক ব্যক্তি কেবল নিজ স্বার্থটাই সম্পাদন করিতে ব্যগ্র ; সে অন্য কাহারও কার্য্য ব্যাহত করে না । কিন্তু বৈড়ালব্রতিক লোকের স্বভাবই এই যে, নিজের স্বার্থসিদ্ধি না হইলেও সে অপরের উন্নতির প্রতি বিদ্বেষবশতঃ অন্যের কার্য্য নষ্ট করিয়া দেয় ।’ [৪৭] ‘অবেদবিৎ’ বলতে সাধারণতঃ বেদজ্ঞানহীন ও আরও বিস্তৃতক্ষেত্রে বেদ অনধীয়ানদের বা বেদাধ্যয়নবিহীন ব্যক্তিদের নির্দেশ করা হয়েছে । এই তিন প্রকার ব্যক্তিবর্গকে ধন এমন কি শব্দ দান দ্বারাও সম্মাননা করা যাবে না । কারণ তাতে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই অনর্থ সাধন হয় । এই জন্য মেধাতিথিভাষ্যে বলা হয়েছে , ‘বৈড়ালব্রতিক, বকব্রতিক এবং অবেদবিৎ এই তিন প্রকার ব্যক্তিকে যে ধন দান করা হয় তা বিধি সঙ্গত উপায়ে উপার্জিত হলেও তা পরলোকে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই অনর্থ সাধন করে।’ [৪৮] -- পূর্বোক্ত দোষে দুষ্ট ব্যক্তিবর্গকে কোন দ্রব্যই দান করা যাবে না। এমনকি জলও না ; এবং এ বিষয়ে দাতা অবশ্যই সতর্ক ও সচেতন হবেন । কারণ অযোগ্য ব্যক্তির দান পাওয়াও যেমন স্বীকার্য্য নয় তেমনি তাঁকে দান না করা দাতারও কর্ত্তব্য বলে ভাষ্যে উল্লিখিত হয়েছে । তাই বলা হয়েছে -- ‘ ‘‘বারি অপি’’ = জলও ; এখানে এই ‘অপি’ শব্দটীর প্রয়োগ থাকায় সর্ব্বপ্রকার দানের দ্রব্যই নিষিদ্ধ হইতেছে । ’ [৪৯] তবে প্রসঙ্গক্রমে একথাও উল্লেখ্য যে, ‘জল দান ’ বিষয়ে কোন জাতি, বর্ণ, শিক্ষা, ধনী, দরিদ্র ইত্যাদি কোন কিছুর ভিত্তিতেই কোন ভেদ থাকতে পারেনা । তাই ভাষ্যের পূর্বোক্ত বক্তব্যের তাৎপর্য্য এইরূপ যে, ‘জল’ এমন একটি দ্রব্য যা দান করা বিষয়ে দাতা গ্রহীতার কোন দোষ ত্রূটি বিচার বিশ্লেষণে উৎসাহী বা আগ্রহী নন বরং জল হল এমন এক দ্রব্য যা যাচ্ঞাকারী মাত্রেই দান করা

---

৪৭. *মেধাতিথি*, ৪ ।১৯৬
৪৮. ঐ,. ৪ ।১৯৩
৪৯. ঐ, ৪ ।১৯২

উচিৎ । সেখানে যাঞ্চ্ঞাকারীর দোষ - গুণ বিশ্লেষণ একেবারেই বিচার্য্য নয় । তথাপি অযোগ্য গ্রহীতা মাত্রেই এইরূপ জল দানেও বঞ্চিত হওয়া উচিৎ এইরূপ নির্দেশই উল্লিখিত হয়েছে । এখন এইরূপে জল দানও যদি সেই সকল ব্যক্তিদের জন্য নিষিদ্ধ হয় তবে একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, গ্রহীতা রূপে অবিদ্বান ব্যক্তিগণকে অযোগ্য বলে মনু বিবেচনা করেছেন । কিন্তু যেহেতু জল দান কারোর জন্যই নিষিদ্ধ নয় বা হতে পারে না , তাই এক্ষেত্রে তাদের জন্য দানের দ্রব্য নিষেধ বলতে পানীয় জল ব্যতীত অপরাপর জাগতিক দ্রব্যের নিষেধকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে । দান প্রসঙ্গে মনুসংহিতার পূর্বালোচনায় উল্লিখিত নির্দেশানুসারে একথা বলা যায় যে, অযোগ্য ব্যক্তিবর্গ যেকোনরূপ দানেই দাতা কর্তৃক বঞ্চিত হবেন কারণ তাঁরা সে বিষয়ের অধিকারী নন এমনটিই নির্দেশিত হয়েছিল । আবার ঐ একই বিষয় অর্থাৎ অযোগ্য ব্যক্তিগণকে দান প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে মনুসংহিতাতে একথাও নির্দেশিত হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি কিছু বিষয়ের যাঞ্চ্ঞা বা প্রার্থনা করলে তাকে একেবারে ফিরিয়ে না দিয়ে অল্প কিছু মাত্র হলেও দান করা উচিৎ । মনুসংহিতার এইরূপ দ্বিতীয় নির্দেশে অর্থাৎ যাঞ্চ্ঞাকারীকে কিছু না কিছু দেওয়া উচিৎ এই বক্তব্যে কিন্তু কোথাও প্রার্থনা বা যাঞ্চ্ঞাকারীর গুণাগুণ বা যোগ্যতা বিচারের উল্লেখ নেই বরং তা ব্যতিরেকেই প্রার্থনাকারীগণকে অল্প কিছু মাত্র হলেও দাতা অবশ্যই দান করবেন এই মতই প্রকাশিত হয়েছে । বলা বাহূল্য যে, দান প্রসঙ্গে মনুর এইরূপ দ্বিতীয় নির্দেশ তার প্রথম নির্দেশ - ‘অযোগ্য ব্যক্তিগণ যেকোন দানে বঞ্চিত হবেন , কারণ তাঁরা সেগুলির অধিকারী নন’ -এর পরিপন্থী বা বিরোধী। ফলতঃ এই বিষয়ে মনুসংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় প্রকার নির্দেশকে কেন্দ্র করে দাতার মনে এক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় । তবে এইরূপ আপাত বিরোধী বক্তব্যকে কেন্দ্র করে দাতার সকল প্রকার মনোদ্বন্দ্বের অবসান ঘটতে পারে যদি নির্দেশগুলির তাৎপর্য্য এইভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, যখন বলা হয়েছে দাতা অযোগ্য ব্যক্তিগণকে যেকোন দানে বঞ্চিত করবেন তখন সেখানে ‘যেকোন’ শব্দের দ্বারা শাস্ত্র নির্দিষ্ট ‘ধন’, ‘শব্দ’ ও ‘সম্মান বা সম্মাননা’ - কেই মনু নির্দেশ করেছেন । আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যখন মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে, যাচঞাকারীকে অল্প কিছু মাত্র হলেও দান করা উচিৎ তখন সেক্ষেত্রে ঐ ‘অল্প কিছু মাত্র’ বলতে পূর্বোক্ত ‘ধন’ ও ‘সম্মাননা’ ব্যতিরেকে অপরাপর প্রয়োজনীয় জাগতিক বিষয়ের দানকে বোঝানো হয়েছে । কারণ ক্ষেত্রবিশেষে দাতার এইরূপ দান তার পাপ ও নরকমুক্তির কারণ হতে পারে। মনুসংহিতার উভয় নির্দেশের ব্যাখ্যা এভাবে গ্রহণ করলে হয়তোবা উভয় নির্দেশকে কেন্দ্র করে যাবতীয় আপাত বিরোধিতাজনক সমস্যার সমাধান হয় । এই প্রসঙ্গে দুটি বক্তব্যের উল্লেখ অবশ্য প্রয়োজনীয় । প্রথমতঃ সংহিতানুসারে গ্রহীতার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার বিচার কেবল শাস্ত্র নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অর্থাৎ ধন, শব্দ ও সম্মাননা - এর ক্ষেত্রে বিচার্য্য হলেও জাগতিক অপরাপর বিষয়ের জন্য ঐরূপ বিধি বিচার্য্য নয় । দ্বিতীয়তঃ দান বিষয়ে মনুসংহিতার দ্বিতীয় নির্দেশে উল্লিখিত অল্প কিছুমাত্র বলতে যে ধন, শব্দ ও সম্মাননা কেই নির্দেশ করা হয়েছে এমন ব্যাখ্যার সমর্থন মনুর

নির্দেশেই পাওয়া যায় । যখন বলা হয়, দাতা ‘বৈড়ালব্রতিক , বকব্রতিক এবং অবেদবিৎ ’ এই তিনপ্রকার ব্যক্তিকে দ্রব্য দানে বিরত থাকবেন । এখানে দ্রব্য দান বলতে ‘ধন’ দান এর কথাই বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে । প্রশ্ন হতে পারে আচ্ছা একথা তো আগেও বলা হয়েছে যে, বৈড়ালব্রতিক, বকব্রতিক এবং অবেদবিৎ এঁদের কথা দ্বারাও সম্মান করা যাবে না তাহলে তাঁদের জন্য পৃথকভাবে কেন দানের নিষেধ করা হল ? এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রের নিষেধে কী কোন বিশেষ প্রকার দ্রব্য দানের নিষেধ করা হয়েছে ? উত্তরে বলা যায়, ঠিক তা নয় বরং প্রথম প্রকার নিষেধে বিশেষ ভাবে শব্দ ও সম্মানের নিষেধ থাকলেও ধন দানের নিষেধের ব্যাপারে বিশেষভাবে কিছু বলা হয়নি । তাই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মনুসংহিতাকার বিশেষভাবে ধন দানের নিষেধের কথা বলেছেন।[৫০]

দানের উদ্দেশ্য :

মনুসংহিতানুসারে দান ক্ষেত্রে দাতার বিধি বিষয়ে যেসকল বিধি নির্দেশ পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, যেকোন দান কার্য্যে কেবল গ্রহীতাই নয় বরং দাতা নিজেও উপকৃত হন । অর্থাৎ দানকর্ম্মের জন্য নির্দেশিত সকল বিধি নিয়মের ক্ষেত্রে যাঞ্চাকারী বা গ্রহীতা এবং দাতা উভয়েরই প্রয়োজনের দিকটির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে । তাই মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে, ‘ কোন ব্যক্তি যদি কোন বিষয়ের যাঞ্চা করেন, তবে কিছু মাত্র হলেও দান করা দাতার কর্ত্তব্য । কারণ ঐরূপ দান ক্রিয়ায় যদি কোন সৎ যাচক থাকেন তবে তাকে দান করার মধ্যে দিয়ে দাতার পাপ মুক্তি ঘটতে পারে ।[৫১] তাই এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ‘দান নরক মুক্তির হেতু স্বরূপ’ । কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, এইরূপ আশ্বাসের তাৎপর্য্য কী ? বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধান করা যেতে পারে , যেমন - প্রশ্নটির উত্তরে ধর্মীয় ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, ‘দান’ নামক ধর্ম্ম কর্ত্তব্য অর্থেও গৃহীত হওয়ায় তাকে সর্ব্বদাই এমন ভাবে সাধিত হতে হবে যাতে তা কোন ব্যক্তিই যাচিত হয়ে বঞ্চিত না হন । কারণ তা দাতার মন্দ কর্মফলের কারণ হতে পারে। দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে আস্তিক দার্শনিকগণও এমন বক্তব্যেরই সমর্থন করবেন যেহেতু তাঁরা জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদে বিশ্বাসী । অন্যদিকে নাস্তিক দার্শনিকদের মধ্যে চার্বাক মতে যেহেতু কাম বা ইন্দ্রিয় সুখই পরম কাম্য তাই তাঁদের মতানুসারে, যাচিত দ্রব্য

---

৫০. *মেধাতিথি,* ৪ ।১৯২
৫১. *মনু.* ৪ ।২২৮

মাত্রই যাঞ্চাকারীর পাওয়া উচিৎ, অন্যথায় তারা পুরুষার্থ লাভের উপায় থেকে বঞ্চিত হতে পারে । কারণ চার্বাক মতে কাম হল মূখ্য পুরুষার্থ কাজেই এই বিষয়ে তাদের বঞ্চিত করা দাতার জন্য যথার্থ নয় বলেই বিবেচিত হবে। তবে দান জন্য বিধি বিষয়ে মনুসংহিতাকারের এইরূপ মত তার পূর্ব মতের সঙ্গে যেন অসংগতির সূচনা করে । কারণ গ্রহীতাগণের জন্য দান বিধি বিষয়ে ইতিপূর্বেই তাঁদের যোগ্যতার বিচার বা বিবেচনার কথা উক্ত হয়েছে । তাই এইরূপ ভিন্ন মতের তাৎপর্য্য শাস্ত্রে কীভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে সেই প্রশ্ন হতেই পারে । শুধু তাই নয়, দাতা তাঁর নরকমুক্তির জন্য শাস্ত্র নির্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিরেকেই ক্ষেত্র বিশেষে দান কর্ম সম্পন্ন করতে সমর্থ হবেন , - মনুসংহিতার এইরূপ বক্তব্য কি দাতাগণকে কেবল স্বার্থপর মনোভাবাপন্ন করে প্রকাশ করে না ? উত্তরে বলা যায়, সকল ক্ষেত্রেই যে এইরূপ বিধি বহির্ভূত দান সংহিতানুসারে সমর্থনীয় হবে এমন নয়, কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে এইরূপ দান ব্যবস্থা যে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই উপকার সাধন করতে পারে সেই সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করা যায় না । তাই হয়তোবা শাস্ত্রে এইরূপ ভিন্ন মতের উল্লেখ হয়েছে যা আপাত দৃষ্টিতে যেন অসংগতিরও সূচনা করেছে । তবে এইরূপ ভিন্ন ক্ষেত্রের দানও যে ক্ষেত্র বিশেষে তাৎপর্য্যপূর্ণ তা সংহিতায় মনু নির্দিষ্ট দানধর্ম বক্তব্যেও নির্দেশিত হয়েছে। সংহিতানুসারে দানকর্ম 'দানধর্ম' রূপে বিবেচিত হয়েছে । তাই বলা হয়েছে যে, যাঞ্চাকারীর যাঞ্চানুসারে কিছুমাত্র হলেও দান করা উচিৎ । এইরূপে দান ক্রিয়াকে ধর্মরূপে বিবেচিত করার ক্ষেত্রে মনুসংহিতায় নির্দেশিত বিভিন্ন কারণের উল্লেখ করা যায় । যেমন - প্রথমতঃ শাস্ত্রানুসারে, দাতা সেই সকল বিষয়েরই দান করতে সমর্থ হবেন যেগুলি তিনি ধর্মপথে অর্জন করেছেন। দ্বিতীয়তঃ দান ক্রিয়ায় দাতা অবশ্যই গ্রহীতার যোগ্যতার বিচার করবেন । যদিও ক্ষেত্রবিশেষে কতকগুলি বিষয়ের দান যেমন পাত্রাপাত্র বিচার পূর্ব্বক সম্পাদিত হয় না, যেমন - জল দান, অন্ন বা খাদ্যদান ইত্যাদি । তৃতীয়ত ঃ দানপর্বে দাতা নির্দিষ্ট বিধি - নিয়মানুসারেই গ্রহীতা বা যাঞ্চাকারীকে দান করবেন । চতুর্থত ঃ শুধু যাঞ্চাকারীর যাঞ্চানুসারেই যে দান কর্ম সম্পাদিত হয় এমন নয়, বরং বিভিন্ন ধর্মকর্মের সমাপ্তিতেও দান ক্রিয়া সম্পন্ন হয় । পঞ্চমত ঃ দান বলতে যে কেবল বিষয় বা দ্রব্যদানই নির্দেশিত হয় তা নয় । কারণ বিষয় বা দ্রব্যদান ছাড়াও 'ধর্মদান' - এর উল্লেখ বিভিন্ন শাস্ত্রে পাওয়া যায়, যা বিভিন্ন মুনি ঋষিগণ দাতা রূপে সম্পন্ন করে থাকেন ।

দাতার দান ক্রিয়া সম্পাদনকালীন মনোভাব :

দান সম্বন্ধে দাতার মনোভাব প্রসঙ্গে মনুসংহিতাতে নির্দেশিত হয়েছে - দান ক্রিয়া সম্পাদনের সময় দাতা অবশ্যই প্রসন্ন চিত্তে শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহীতাকে দান করবেন । এবিষয়ে তিনি কখোনই নিজের সম্বন্ধে অপরের

কাছে গর্ব বা অহংকারের প্রকাশ করবেন না , দান করে তার ঘোষণা করবেন না । কারণ তাতে দান জন্য ফল বিনষ্ট হয় । [৫২] দান বিষয়ে দাতা গ্রহীতা বা যাচ্ঞাকারীদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ না করে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদাবোধ এর প্রতি যথেষ্ট যত্নবান হবেন । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গ্রহীতার প্রতি দাতার প্রসন্নও অপ্রসন্ন চিত্তে দান জন্য যেরূপ ফলের আলোচনা মনুসংহিতায় পরিলক্ষিত হয় তার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে দান জন্য ফল লাভের এক নতুন দিশার সন্ধান পাওয়া যায় । এবিষয়ে সংহিতায় বলা হয়েছে দাতা যেরূপ মনোবৃত্তি আশ্রয় করে দান করেন গ্রহীতাও ঠিক সেইভাবেই সম্মানিত হয়ে সেইসকল বস্তু লাভ করেন । অর্থাৎ দান জন্য ফল বিষয়ে দাতার দান মনোভাব বিশেষভাবে তাৎপর্য্যপূর্ণ । কারণ 'দান' সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, দাতাগণকে গ্রহীতাগণের প্রতি যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনপূর্ব্বক দান করতে হবে । তিনি দানের সময় অবশ্যই সন্তুষ্টি ও আনন্দ সহকারে দান করবেন । দাতা যদি প্রসন্নচিত্তে শ্রদ্ধা ও আদরের সঙ্গে দান করেন তা হলে তিনি স্বর্গলাভ করেন । বিপরীতে অশ্রদ্ধা সহকারে অবজ্ঞার সহিত দুঃখিতভাবে নাচার হয়ে দান করলে দাতা নরকে গমন করেন ।

দান ও তার ফললাভ :

মনুসংহিতায় দানকর্ম ধর্মরূপে বিবেচিত হওয়ায় অন্যান্য ধর্মকর্মের মতোই দান বিষয়েও একথা নির্দেশিত হয়েছে, দাতা যেমন দান করবেন তিনি তেমন ফললাভ করবেন । দান কার্য্য কেমন হওয়া উচিৎ বা কীরূপ দান ফলজনকতা তৈরী করে সেই বিষয়ে সংহিতায় বলা হয়েছে, সর্বদাই অনলসভাবে শ্রদ্ধা সহকারে হৃষ্ট বা সন্তুষ্ট চিত্তে উপযুক্ত পাত্রে দান করা উচিৎ । এই প্রসঙ্গে সংহিতাতে কোন বিষয়ের দানে দাতা কীরূপ ফললাভ করবেন, তাও সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়েছে , যেমন - 'যে দাতা জল দান করেন তিনি তৃপ্তি পান, ক্ষুধাতৃষ্ণায় তার কষ্ট হয় না ; যিনি অন্ন দান করেন তিনি অক্ষয় বা অবিনশ্বর সুখ প্রাপ্ত হন । তিলদানকারী ব্যক্তি অভিপ্রেত সন্তান এবং দীপ দানকারী উত্তম চক্ষু লাভ করে।' অর্থাৎ জল, খাদ্য বা সিদ্ধান্ন দানকারী দাতা কখোনই ক্ষুধা ও তৃষ্ণাজনিত কষ্টে পীড়িত হবেন না । বরং তাঁরা চিরকাল এসকল বিষয়ের অবিরাম সুখের আস্বাদন করবেন । অন্যদিকে যাঁরা তিল ও দীপ দান কারী দাতা তাঁরা যথাক্রমে নিজেদের মনোমত সন্তান লাভ করবেন এবং চক্ষুষ্মান হয়ে বাহ্য জগতের বিভিন্ন বিষয়ের স্বরূপগত জ্ঞানলাভ করে নিজেদের মনের আলোও জাগ্রত করবেন । এ বিষয়ে আরও বলা হয়েছে, 'যে লোক ভূমিদান করে সে প্রভূত ভূসম্পত্তি লাভ করে,

---

৫২. *মনু* ৪ ।২৩৬, ২৩৭

স্বর্ণদানকারী দীর্ঘ জীবন, গৃহদানকারী উত্তম গৃহ এবং রৌপ্যদানকারী উত্তম রূপের লাভ করে । ...... বস্ত্রদানকারী চন্দ্রলোকে যায় তাঁরা সকল ব্যক্তির মধ্যে প্রিয় হন, এবং ক্ষেত্রবিশেষে স্বর্গে যাবার অধিকারীও হন । অশ্বদানকারী অশ্বিনীকুমারের লোকে যায়, বৃষদানকারী মহতী শ্রী প্রাপ্ত হয় এবং গো দানকারী আদিত্যলোকে যায়।' দানের ফল বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় আরও বলা হয়েছে, যে দাতা যান এবং শয্যা দান করে সে মনোমত জীবন সঙ্গীনি বা উত্তম পত্নী লাভ করে, যে অভয়দান করে সে ঐশ্বর্য্য পায় , ধান্যদানকারী শাশ্বত সুখের অধিকারী হয় এবং বেদদানকারী ব্রহ্মসার্ষ্টিতা, ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় । বেদদানকে ব্রহ্মদান রূপে উল্লেখ করে তাকেই মনুসংহিতায় শ্রেষ্ঠ দান বলা হয়েছে । মেধাতিথিভাষ্যে 'ঐশ্বর্য্য' শব্দটির দ্বারা ঈশ্বররূপ প্রভূত্বকে নির্দেশ করা হয়েছে । আবার ধান্যশষ্য বলতে 'ব্রীহি, মাষ, মুদ্গ' প্রভৃতি শষ্যকে নির্দেশ করা হয়েছে। মনুসংহিতানুসারে ,যে হৃষ্টচিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে যেকোন দান ক্ষেত্রেই দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই স্বর্গাধিকারী হন।[৫৩]

ভিক্ষা দান :

দান ক্রিয়ার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ 'ভিক্ষা'। মেধাতিথিভাষ্য অনুসারে গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত কোন 'ভিক্ষু' বা যাচ্ঞাকারীকে এক মুষ্টি অন্ন দান করাকে বলা হয় 'ভিক্ষা'। 'ভিক্ষু' বলতে সংকীর্ণ অর্থে বোঝায় একজন সন্ন্যাসী । কিন্তু কেবল সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীই নয়, বরং ভাষ্য অনুসারে যিনি ভিক্ষা যাচ্ঞা করেন তাকেই 'ভিক্ষু' বলে সংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে । ভাষ্যানুসারে, একজন ব্রহ্মচারীকে তাঁর গুরু গৃহে বসবাসকালীন পরিসরে যেসকল নিত্য কর্ম করতে হয় তার মধ্যে ভিক্ষাচর্য্যা অন্যতম । গুরু গৃহে বসবাসের সময় ব্রহ্মচারী তার নিজের খাদ্যের জন্য নিত্যদিনই 'ভৈক্ষ্য ' সংগ্রহ করবে । এই 'ভৈক্ষ্য' হল জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অতি অল্প পরিমাণ 'সিদ্ধান্ন'। যা তারা অবশ্যই প্রথমে গুরুকে নিবেদন করবে এবং তার পর বাকী অংশটুকু নিজেরা খাদ্যরূপে গ্রহণ করবে । এই উপায়ে তাদেরকে প্রতিদিনই নিজেদের খাদ্যের সংস্থান করতে হবে । এই 'ভৈক্ষ্য' গ্রহণ করার সময় তাদের সতর্ক হতে হবে, দাতার প্রতি অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে কাদের কাছে তারা যাচ্ঞা করতে পারেন সেই বিষয়ের প্রতি । এবিষয়ে প্রাথমিক ভাবে ব্রহ্মচারী গুরুর গৃহ বা তাঁর পূর্বাশ্রম কিংবা তাঁর আত্মীয় পরিজন এবং বন্ধু অর্থে নিজের মাতুলালয় থেকে ভিক্ষা গ্রহণে বিরত থাকবেন । কিন্তু যদি এছাড়া কোন স্থান থেকে 'ভৈক্ষ্য' গ্রহণ সম্ভব না হয় তবে এদের গ্রহণে বিরত থাকবেন । কিন্তু যদি এছাড়া কোন স্থান থেকে 'ভৈক্ষ্য' গ্রহণ সম্ভব না হয় তবে এদের থেকেও ভিক্ষা নিতে পারবেন । কিন্তু গুরুগৃহে বসবাসকালে ব্রহ্মচারীর

---

৫৩. *মনু.* ৪ ।২২৬ -২৩৫

নিত্য কর্ত্তব্যরূপে 'ভৈক্ষ্য' যাচ্ঞা সম্পর্কীয় মতের সঙ্গে ব্রাহ্মণের উপনয়নকালে 'ভিক্ষা যাচ্ঞা' প্রসঙ্গে মনুসংহিতার বক্তব্য বিসদৃশ । কারণ মনুসংহিতায় প্রথম ক্ষেত্রে যাচ্ঞাকারীর জন্য সুনিশ্চিত দাতারূপে মাতুলালয় থেকে 'ভৈক্ষ্য' যাচ্ঞা প্রাথমিক পর্বে অস্বীকৃত হলেও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের উপনয়নকালে তা সুনিশ্চিতভাবে স্বীকৃত হয়েছে । তাই উভয় বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আপাত বিরোধিতার সূচনা হয় । এক্ষেত্রে বিরোধী স্থলগুলির উল্লেখ প্রয়োজন ।

প্রথমত ঃ সংহিতানুসারে গুরুগৃহে বসবাসকালে ব্রহ্মচারী পরিচিত কোন ব্যক্তি বা গৃহস্থের কাছে যাচ্ঞা করতে পারবে না বলে উল্লিখিত হলেও ব্রাহ্মণ উপনয়নকালে অতি পরিচিত স্থলকেই ভিক্ষাক্ষেত্ররূপে নির্বাচন করে ভিক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হবেন । অর্থাৎ কিনা ভৈক্ষ্য গ্রহণের বিষয়টি ব্রহ্মচারীগণের জন্য আবশ্যক হলেও তাদের ভৈক্ষ্য গ্রহণের স্থলগুলির কোন নিশ্চয়তা ছিলনা । বরং ভিক্ষা স্থলগুলিকে অপরিচিত হতে হত। যা কিনা উপনয়নকালে ব্রাহ্মণগণের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশিত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত ঃ শুধু তাই নয়, যে ক্ষেত্রগুলি ব্রহ্মচারীদের ভৈক্ষ্য গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্টরূপে অস্বীকৃত হয়েছিল ঠিক সেই স্থলগুলিই আবার উপনয়নকালে ব্রাহ্মণের ভিক্ষাগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট ভাবে নির্দেশিত হয়েছিল । যেমন - উপনীত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভিক্ষা যাচ্ঞা করার সময় দাতার কাছে ভবৎ শব্দটিকে যথাক্রমে পূর্বে, মধ্যে ও পরে উচ্চারণ করবেন । তারা প্রথমে নিজের মা , দিদি বা বোন কিংবা নিজের মাসী এদের সকলের কাছে ভিক্ষা যাচ্ঞা করবেন । যেহেতু ভিক্ষার এই ক্ষেত্রগুলি নিশ্চিত । [৫৪] বলা বাহুল্য যে, উভয় ক্ষেত্রে 'ভিক্ষা যাচ্ঞা' এই বিষয়টি মৌলিক হওয়ায় মনুসংহিতার উক্ত দুই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আপাত বিরোধিতা দেখা যায়। কিন্তু উভয় মতের বিশ্লেষণের করলে দেখা যায় যে, বাস্তবে কোন বিরোধিতা নেই । কারণ উভয় বক্তব্যের মধ্যে দিয়েই বলা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে যাচ্ঞাকারী তাঁদের পরিচিত ব্যক্তির কাছে ভিক্ষা যাচ্ঞা না করে অপরিচিত কোন ব্যক্তি বা গৃহস্থের কাছে যাচ্ঞা করবেন কিন্তু যদি এমন পরিস্থিতি হয় যে ঐ যাচ্ঞাকারীর কাছে সেইরূপ কোন অপরিচিত ব্যক্তি বা গৃহস্থের কাছে যাচ্ঞা করার সুযোগ নেই বা ঐরূপ কোন অপরিচিত স্থল নেই তবে তারা প্রয়োজন অনুসারে প্রথমে নিজ মাতুল , তারপর নিকট আত্মীয় বা জ্ঞাতি এবং শেষতঃ গুরুগৃহে যাচ্ঞা করতে পারে, এমনটাই নির্দেশিত হয়েছে । এক্ষেত্রে হয়তো ব্রহ্মচারীর সংযম, ধৈর্য্য ইত্যাদির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেই এমনটিই নির্দেশ করা হয়েছে । অন্যদিকে উপনয়নকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রহ্মচারীদের

---

৫৪. *মনু* ২ ।৪৯-৫০

জন্য দাতা হওয়ার স্থানে প্রথম হলেন তার মাতুলালয়ের কোন ব্যক্তি । কারণ তারা পরম স্নেহে ভিক্ষা দান করে ব্রহ্মচারীর যাচ্ঞা পূর্ণ করবেন, তাকে বিমুখ করবেন না। এইকারণেই উপনয়নকালে ভিক্ষা যাচ্ঞার জন্য মাতুল গৃহের কথা বিশেষভাবে নির্দেশিত হয়েছে । সুতরাং উভয় বক্তব্যের মধ্যে কোথাও কোন বিরোধিতা নেই ।

'দান' বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে অপর একটী ক্ষেত্রেও একইভাবে বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়। গুরুর প্রতি শিষ্যের দান সম্বন্ধে যখন বলা হয়, গুরুগৃহে বসবাসের শেষে অর্থাৎ শিক্ষার সমাপান্তে বা সমাবর্তনে গুরুর আদেশানুসারে শিক্ষার্থী বা ব্রহ্মচারী নিজের সামর্থ্য বা শক্তি অনুসারে গুরুকে যথাবিধ প্রণামী বা অর্থ দান করবে, সমাবর্তনের আগে নয় । [৫৫] কিন্তু গুরুর প্রতি বা গুরুগৃহের প্রতি শিক্ষার্থীর কর্ত্তব্যের আলোচনায় ভাষ্যে অন্যত্র একথাও বলা হয়েছে যে, শিষ্য যতদিন গুরুগৃহে বসবাস করবে ততদিন তারা তাদের সামর্থ্য অনুসারে যথাশক্তি গুরুকে দান করবে । বলা বাহুল্য উক্ত দুই বক্তব্যকে কেন্দ্র করেও বিরোধিতার সূচনা হয়। প্রশ্ন হতে পারে, গুরুর প্রতি শিষ্যের নিবেদনকে কেন্দ্র করে ভাষ্যের এইরূপ বিরোধী বক্তব্যের ব্যাখ্যা কীরূপ ? কারণ একবার বলা হয়েছে, শিক্ষার সমাবর্ত্তনের আগে শিষ্যের গুরুকে কোন অর্থ নিবেদন নিষিদ্ধ আবার অন্যত্র একথাও বলা হয়েছে যে, গুরুগৃহে বসবাসের সময় শিষ্যগণ গুরুর উপকারার্থে প্রয়োজনীয় বিষয়সকল দান করবে। এর উত্তরে বলা যেতে পারে, এক্ষেত্রে বিরোধিতার সূচনা হয় মূলতঃ 'অর্থ' শব্দটির ব্যবহারকে কেন্দ্র করে । ভাষ্যে উভয় ক্ষেত্রে দুটি পৃথক অর্থে 'অর্থ' শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে । উপনয়নপর্ব থেকে শুরু করে সমাবর্ত্তন হওয়ার আগে পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী বা শিষ্য গুরুর প্রয়োজন অনুসারে তাঁর উপকারার্থে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্য যেমন - খাদ্য দ্রব্য রূপে ধান, শাকসব্জি, পরনের জন্য বস্ত্র বা পোশাক, বসবাসের জন্য ভূমি, ছাড়াও ছাতা, জুতোসহ বিভিন্ন বহুমূল্য রত্নাদি দান করতে পারে । এক্ষত্রে 'অর্থ' শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে উপকারী বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাহিদার পূরণ অর্থে । কিন্তু সমাবর্ত্তন পর্বে গুরুর প্রতি শিষ্যের 'অর্থ'রূপ দক্ষিণা দানের ক্ষেত্রে 'অর্থ'শব্দটিকে ঐহিক মূল্য অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে । তবে তা কেবল সমাবর্ত্তনের পর, তার আগে নয় । এইভাবে ব্যাখ্যা করলে উভয় বক্তব্যের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে বিরোধিতা পরিলক্ষিত হলেও বাস্তবে কোন বিরোধিতা নেই বলেই বোধ হয়।

মনুসংহিতায় নির্দেশিত দানতত্ত্বে ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার পরিচয় :

বৈদিক ভাবধারা অনুসারী প্রচলিত চতুঃবর্ণ ব্যবস্থা এবং তাদের ধর্ম বা কর্ত্তব্য-কর্ম ও জীবিকা প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় নির্দেশিত যেসকল নিয়ম বা বিধির উল্লেখ পাওয়া যায় তা বিচার করলে দেখা যায়,

---

৫৫. *মনু*, ২ ।২৪৫

এই বর্ণব্যবস্থায় প্রতিটি বর্ণের জন্যেই পালনীয় কর্ত্তব্য-কর্ম পূর্ব নির্ধারিত ছিল এবং সেই অনুসারেই তারা নিজেদের দৈনন্দিন জীবন যাপন করতেন । এইরূপ দৈনন্দিন জীবন - যাপনের পরিসরে তারা স্বধর্মরূপ কর্ত্তব্য পালনেই অভ্যস্ত ছিলেন কিংবা বলা যায় এক্ষেত্রে তাদের জন্য একে অপরের বিহিত কর্ম পালনের কোনরূপ শাস্ত্রীয় অনুমোদন ছিলো না । যদিও জীবিকার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রমী অবস্থান ছিল । সেখানে দেখা যায়, সমাজে কোন বর্ণের মানুষ কীরূপ জীবিকা গ্রহণ করে নিজের ও পরিবারের জীবন প্রতিপালন করবেন তা পূর্ব নির্দিষ্ট থাকলেও পরিস্থিতি বিশেষে কিছু ব্যতিক্রমী জীবিকা বৃত্তির প্রসঙ্গ মনুসংহিতায় নির্দেশিত এবং অনুমোদিত হয়েছে । এইরূপ ব্যতিক্রমী বৃত্তি মনুসংহিতায় অব্যবহিত বৃত্তি এবং ব্যবহিত বৃত্তি নামে উল্লিখিত হয়েছে। জানা যায় যে, সমাজে প্রথম তিন বর্ণের মানুষ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের সকলে তাদের জন্য শাস্ত্র নির্ধারিত জীবিকা অনুসারে পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম হলে যথাক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের জীবিকাবৃত্তির কিছু অংশ পালন করতে পারতেন । বলা বাহুল্য যে, এই সকল ক্ষেত্রেই মনুসংহিতায় যে আদর্শ কিংবা বিধির উল্লেখ হয়েছে তা সেই সমাজ ব্যবস্থার প্রচলিত অথচ প্রশ্নসূচক একটি চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে । সেখানে দেখা যায়, সেই সমাজে ধর্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম প্রসঙ্গে প্রতিটি বর্ণের মানুষের জন্য যেরূপ বিধি ব্যবস্থা নির্ধারিত হয়েছিল তা ছিল মূলতঃ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গ ভিত্তিক । প্রবৃত্তি অর্থে কোন নির্দিষ্ট বর্ণের মানুষ শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্ত্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারেন, শাস্ত্রের এইরূপ অনুমোদন। আবার বিপরীতে নিবৃত্তি মার্গ বলতে কোন বর্ণের মানুষ অন্য বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট ধর্মের আচরণ করবেন না শাস্ত্রের এমন নির্দেশই বোঝানো হয়েছে । বলা বাহুল্য যে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গ ভিত্তিক বর্ণ ব্যবস্থার এই ধারায় শাস্ত্রের এইরূপ কঠোর অনুশাসনে যে সকল বর্ণের মধ্যে অধিকার ভেদনীতির গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য্য স্বীকৃত হয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না । [৫৬] কর্ত্তব্য কর্মের প্রেক্ষিতে সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণ বৈষম্য ছিল । যেখানে সবার প্রথম বা উচ্চ সারিতে ব্রাহ্মণ বর্ণের স্থান নির্ধারিত হয়েছিল । মনুসংহিতায় বর্ণভেদে কর্ত্তব্য - কর্ম কিংবা জীবিকাযাপন প্রসঙ্গে যেসব বিধির অনুমোদন হয়েছিল সেখানে সকল ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণেরই অগ্রাধিকার ছিল । শুধু তাই নয়, অন্যান্য সকল বর্ণের মানুষের জন্যেও যে সকল কর্ত্তব্য কর্মের উল্লেখ করা হয়েছিল তা যেন খানিকটা নিম্নমানের বলেই তা ব্রাহ্মণের জন্য পূর্ব নির্ধাারিত কর্ত্তব্য- কর্ম কিংবা জীবিকা নয় বরং ব্যবহিত বৃত্তিরূপেই অনুমোদিত হতে পারে এমনটিই উল্লিখিত হয়েছিল । বলা বাহুল্য যে, এখানেও ব্রাহ্মণ বর্ণের অবস্থান ছিল সকলের শীর্ষেই । মনুসংহিতায় নির্দেশিত দানতত্ত্বেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি । সেখানেও দেখা যায় যে, গৃহস্থের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান যেমন তার জন্য সর্বাধিক ফল জনক হতে পারে বলে উল্লিখিত হয়েছে তেমনি আবার শ্রেষ্ঠ দান রূপে 'ব্রহ্মজ্ঞান দান'- এর

---

৫৬. *'শ্রুতি হিন্দু নৈতিকতার ভিত্তি স্বরূপ'*, শ্রীলেখা দত্ত, *ধর্মনীতি ও শ্রুতি*

উল্লেখের মধ্যে দিয়ে যেন একথাই পরোক্ষে ঘোষিত হয়েছে যে, এইরূপ শ্রেষ্ঠ দানের অধিকার কেবল ব্রাহ্মণ শ্রেণিরই ছিল। কারণ ব্রহ্মজ্ঞান দান অর্থে যে বেদের জ্ঞান দান করার কথা মনুসংহিতায় বলা হয়েছে তার অধিকার তো কেবল ব্রাহ্মণ বর্ণেরই ছিল । কারণ বেদ অধ্যাপনা তো শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্ম রূপে ব্রাহ্মণ বর্ণের জন্যেই নির্ধারিত ছিল, অপর কোন বর্ণের জন্য নয় । তাই বলা যায়, শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারেই ব্রাহ্মণ বর্ণ ব্যতীত অন্যান্য বর্ণ যেমন, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণের মানুষের বেদাধ্যয়নের অধিকার থাকলেও বেদ অধ্যাপনার অধিকার না থাকায় তারা এইরূপ শ্রেষ্ঠ দান করার অধিকার থেকে বঞ্চিতই হয়েছেন । তবে ব্রাহ্মণ বর্ণ ব্যতীত অপর কোন বর্ণেরই এইরূপ শ্রেষ্ঠ দানের অধিকার মনুসংহিতায় স্বীকৃত হয়নি এমন বক্তব্য সুনিশ্চিত করে বলা যায় না । কারণ দানাধিকার প্রসঙ্গে শূদ্র বর্ণের জন্য মনুসংহিতায় কিছু ভিন্ন মতের উল্লেখ পাওয়া যায় । যাকে কেন্দ্র করে অবশ্যই কিছু প্রশ্ন বা বিতর্কের পরিসর তৈরী হয় ।

মনুসংহিতায় শূদ্রের বিদ্যাজ্ঞান দানের অধিকার :

বর্ণ প্রসঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্বের যে পরিকল্পনা মনুসংহিতায় স্বীকৃত হয়েছে এবং সেই অনুসারেই সেখানে তাদের কর্ত্তব্যকর্মও বিহিত হয়েছে । সেখানে কোথাও শূদ্র বর্ণের মানুষের জন্যে বেদ পাঠের অধিকার স্বীকৃত হয়নি। বলা বাহুল্য যে সেই সূত্রে, দানাধিকার প্রশ্নে গ্রহীতারূপে বৈড়ালব্রতিক, বকব্রতিকদের মতো যখন অবেদবিৎদের কথা মনুসংহিতানুসারে নিষিদ্ধ হয়েছে তখন শূদ্র বর্ণের মানুষের জন্য যে এই অধিকার নিষিদ্ধ ছিল তাও সুস্পষ্ট হয়েছে । কিন্তু মনুসংহিতার এই নির্দেশেরই বিরোধ হয়েছে দানাধিকার প্রসঙ্গে শূদ্রদের জন্য নির্ধারিত অপর কতকগুলি নির্দেশকে কেন্দ্র করে । সেখানে দেখা যায়, মনুসংহিতানুসারে চতুঃবর্ণের জন্য নির্ধারিত কর্ত্তব্যকর্ম প্রসঙ্গে শূদ্রের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল কেবল অপর তিন বর্ণের সেবা করা । এই সেবার মধ্যে দিয়েই যেমন তার ধর্ম-অধর্মের প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি সাধিত হবে তেমনি জীবন যাপনের সহায়ক বা উপযুক্তরূপে তার জীবিকাও পালিত হবে । তাই এই তিন বর্ণের সেবাই ছিল শূদ্রের জন্য সাক্ষাৎ শ্রেষ্ঠ ধর্ম ।[৫৭] এইরূপ ধর্ম ব্যবস্থায় শূদ্রের জন্য বেদ অধ্যয়ন কিংবা অধ্যাপনার কোন প্রসঙ্গেরই উল্লেখ হয়নি । কিন্তু দানাধিকারের প্রশ্নে শূদ্রের জন্য মনুসংহিতায় গ্রহীতাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, ‘শ্রদ্ধাসহকারে মঙ্গলজনক বিদ্যা শূদ্র থেকেও গ্রহণ করবে, চন্ডালের কাছ থেকেও (আত্মজ্ঞানাদি) শ্রেষ্ঠ ধর্ম শিক্ষণীয়, নিকৃষ্ট বংশের থেকেও উত্তম স্ত্রীকে বিবাহ করবে।’[৫৮] শুধু তাই নয় এই প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় আরও নির্দেশিত হয়েছে, ‘যেমন করে বিষ থেকেও অমৃত, বালকের

---

৫৭. *মনু* ২ ।২৩৭
৫৮. ঐ, ২ ।২৩৮

থেকেও সৎকথা, শত্রুর থেকেও সদাচার এবং অপবিত্রস্থান থেকেও সোনা গ্রহণ করা বিধেয় কিংবা স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম, শুচিতা, হিতকথা ও নানাবিধ শিল্প সকলের কাছ থেকে গ্রহণীয় তেমন করেই বিপদ্‌কালে অব্রাহ্মণের কাছে অধ্যয়ন বিধেয় এবং অধ্যয়নকাল পর্যন্ত গুরুর অনুগমন ও শুশ্রূষা করণীয়। বলা বাহুল্য যে, দানাধিকারের প্রশ্নে মনুসংহিতায় যেভাবে মঙ্গলজনক বিদ্যা শূদ্রের কাছ থেকেও গ্রহণ করা যায় এবং আত্মতত্ত্বের জ্ঞান চন্ডালের কাছ থেকেও গ্রহণ করা যায় বলে নির্দেশিত হয়েছে সেখানে স্পস্টতই শূদ্রের বিদ্যা দানের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে । আবার আত্মতত্ত্বের জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান অর্থে বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্ম ও আত্মার বা জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে অভেদ জ্ঞান বোঝায় যা বেদ অধ্যয়ন করা বা বেদজ্ঞান ব্যতিরেকে সম্ভব নয় । সেইরূপ বিদ্যাজ্ঞান দানের অধিকারও এক্ষেত্রে শূদ্রের জন্যে স্বীকৃত হয়েছে । আমাদের বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনায় শূদ্র জ্ঞান দান করতে পারে এমন সম্ভাবনা স্বীকার করতে হলে সেই সব জ্ঞান আয়ত্ত করার অধিকার শূদ্রের আছে কীনা দেখতে হবে । শূদ্রের জ্ঞান দান করা সম্ভব বলতে হলে শূদ্রের জ্ঞান আয়ত্তের অধিকার স্বীকার করতে হবে। তারপর জ্ঞানদান বলতে কোন ধরণের জ্ঞানের দান সেটাও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন । শূদ্র ব্রহ্মজ্ঞান দান করতে পারবে বা শূদ্রের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব বলতে হলে অবশ্যই শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব স্বীকার করা চাই । এই সূত্রে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে আলোচিত অপশূদ্রাধিকরণের প্রসঙ্গে শংকরাচার্যের মত অবশ্য উল্লেখযোগ্য ।

মোক্ষ বা মুক্তি লাভের পর্যাপ্ত শর্তরূপে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে যে আত্মতত্ত্বের জ্ঞান বা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান উল্লিখিত হয়েছে, তা সকল বর্ণের জন্যেই সমান কীনা ? সেই প্রশ্নের ইতিবাচক বা নেতিবাচক যেকোন স্পস্ট উত্তর প্রদানের প্রসঙ্গ শঙ্করাচার্য্য এড়িয়ে গেছেন । কারণ এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তরে তাঁর মতের সঙ্গে যেমন বৈদিক ভাবধারার বিরোধ উপস্থিত হত তেমনি নেতিবাচক উত্তরে তাঁকে তাঁর দর্শনে ভেদ স্বীকার করতে হত । কিন্তু তিনি নিজেই তাঁর ব্রহ্মতত্ত্বে যেকোন ভেদকেই মিথ্যা বলে উল্লেখ করেছিলেন । তাই জীব ও ব্রহ্ম একে অপরের সঙ্গে অভিন্ন এইরূপ স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ প্রসঙ্গে কোন বর্ণের যে অনধিকার আছে এমন মন্তব্য অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে সমর্থিত হওয়া সম্ভব ছিল না । কিন্তু আবার সরাসরি ইতিবাচক উত্তরেও যেহেতু বৈদিক ভাবধারার সঙ্গে বিরোধিতা হতে পারে তাই উক্ত প্রশ্নের উত্তরে শঙ্করাচার্য্য ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে অভেদতত্ত্বের বর্ণনা প্রদান করেছিলেন। তাই অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে অপশূদ্রাধিকরণের যুক্তিতে যখন বলা হয়, যারা শূদ্র, বেদান্ত পাঠের অধিকার থেকে যারা বঞ্চিত, তাঁরা মোক্ষ লাভের জন্য জীব ও ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান লাভ করতে পারবেন না, ফলে তারা মোক্ষ লাভও করতে পারবেন না । এই সমস্যার সমাধানে শঙ্করাচার্য্য বলেছেন, শূদ্রেরা উপনিষদ পাঠের মাধ্যমে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞানের অধিকারী না হলেও তারা

পুরাণ ও ইতিহাস ইত্যাদি শ্রবণের মাধ্যমে উক্ত জ্ঞান লাভ করতে পারেন । ফলতঃ তারা এই প্রেক্ষিত থেকেও আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের অধিকারী হয় । অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে মোক্ষের অধিকার প্রসঙ্গে শূদ্র বর্ণের জন্য এটি ছিল বিশেষ অধিকার অর্পণের একটি দৃষ্টান্ত । মনুসংহিতাতেও শূদ্রদের দানাধিকার সম্পর্কে যেসকল নির্দেশ পাওয়া যায় তাও ঐ একই মতের সমর্থন করে ।[৫৯] তাই এই প্রশ্ন থেকেই যায় যে, তবে কেন মনুসংহিতায় নির্দেশিত বর্ণব্যবস্থায় শূদ্রের জন্য বেদ পাঠের অধিকার সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়নি ? যা আজও অমীমাংসিত । শুধু তাই নয় সেক্ষেত্রে দেখা যায়, শূদ্র বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট ধর্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম প্রসঙ্গে মনুসংহিতার সকল নির্দেশ দানাধিকার প্রসঙ্গে তার নিজের নির্দেশেরই বিরোধী । কারণ বর্ণভেদে কর্ত্তব্য কর্ম নির্দেশ প্রসঙ্গে মনু যে অধিকার ভেদনীতির উপর গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন তা দানাধিকার প্রসঙ্গে তার পরবর্তী নির্দেশে গুরুত্ব হারিয়েছে । শুধু তাই নয় যেখানে দানাধিকার প্রসঙ্গে শূদ্র এবং চণ্ডালের জন্য বিদ্যাদান এমনকী আত্মদানের অধিকারও ক্ষেত্রবিশেষে মনুসংহিতায় স্বীকৃত হয়েছে সেখানে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার এবং বসবাস প্রসঙ্গে এদের সংসর্গ বিষয়ে বলা হয়েছে, পতিত, চন্ডাল, পুক্কস, মূর্খ, ধনাদিমদগর্বিত, রজকাদি নীচজাতীয় লোক এবং অন্ত্যাবসায়ীদের সঙ্গে এক গাছের ছায়ার তলায় এমনকী কাছে থাকাও নিষিদ্ধ । লৌকিক বিষয় সহ ধর্ম এমনকী প্রায়শ্চিত্তরূপ ব্রত বিষয়েও শূদ্রকে কোন রূপ উপদেশ প্রদান নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে, যে সকল ব্যক্তি তাদের এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন তারা নরকে নিমগ্ন হন ।[৬০] অর্থাৎ লক্ষ্য করা যায় যে, শূদ্র বর্ণ প্রসঙ্গে মনুসংহিতার উভয় নির্দেশই পরস্পর বিরোধী । এই প্রসঙ্গে আরও বলা যায়, অহিংসা এবং সত্যভাষণকে সমাজের স্থিতাবস্থার সহায়ক হিসেবে গণ্য করে মনু চৌর্য্যবৃত্তির নিন্দা করেছেন এমনকী মিথ্যাবাদীকে পর্য্যন্ত বচন চোর বলে তিরস্কার করে সর্বপহারক বলে উল্লেখ করেছেন ।[৬১] একইসঙ্গে দন্ড বিষয়ে মনু নির্দেশ করে বলেছেন, দন্ড সকলকে শাসন করে , দন্ডই রক্ষা করে । নিদ্রিত অবস্থাতেও এই দন্ড ধারণ করে থাকে তাই পন্ডিতদের মতে এই দণ্ড হল ধর্ম । বিবেচনা প্রসূত দন্ড যেমন প্রজার মনোরঞ্জনকারী হয় তেমনই অবিবেচনা প্রসূত ধর্ম বিনাশেরও কারণ হয় । চৌর্য্যবৃত্তির নিন্দা এবং দন্ড প্রসঙ্গে মনুসংহিতার উভয় নির্দেশ পরস্পর সাযুজ্য বা সঙ্গত হলেও উভয় মতের সঙ্গে মনুসংহিতায় নির্দেশিত নাম ও প্রায়শ্চিত্ত বিধির বিরোধ দেখা যায় । বিভিন্ন বর্ণের নাম প্রসঙ্গে উপদেশ দিয়ে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণের নাম হবে শুভসূচক, ক্ষত্রিয়ের বলবাচক, বৈশ্যের ধনবাচক এবং শূদ্রের নিন্দাবাচক । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এদের প্রত্যেকের উপনাম স্থিরীকৃত হবে যথাক্রমে শর্ম, বর্ম, ভূতি ও দাস বা দীনদাস এইরূপে ।[৬২] আবার প্রায়শ্চিত্ত বিধি বিষয়ে একই অপরাধের জন্য অপরাধী

---

৫৯. *'দ্বিজেতরজাতির সন্ন্যাস ও মোক্ষের অধিকার বিষয়ে শঙ্করমতের পর্যালোচনা '*, সুখরঞ্জন সাহা, *ধর্মনীতি ও শ্রুতি*
৬০. *মনু.* ৪ ।৭৯-৮১
৬১. ঐ,. ৪ ।২৫৫-২৫৬
৬২. ঐ, ২ ।৩১, ৩২

ব্রাহ্মণের জন্য বর্ণভেদে ভিন্ন নীতির উল্লেখ হয়েছে। যেমন, ‘বৃত্তস্থ’ অর্থাৎ সকল প্রকার ব্রত আচরণকারী কোন ক্ষত্রিয়ের বধ করলে ব্রাহ্মণকে তিন বৎসর, ঐরূপ বৈশ্যবধে দেড় বৎসর এবং শূদ্রবধে মাত্র নয় মাসের ব্রহ্মহত্যা ব্রত পালন করার বিধি নির্দেশিত হয়েছে । [৬৩] তাই প্রশ্ন হয়, যেখানে মনু অহিংসাকে সমাজের স্থিতাবস্থার অন্যতম সহায়ক বলে উল্লেখ করেছিলেন সেখানে মনু নিজেই কী নাম এবং প্রায়শ্চিত্ত বিধি বিষয়ে নির্দেশ প্রদান প্রসঙ্গে হিংসাকে প্রশ্রয় দেননি ? শেষতঃ বর্ণভেদের যে পরিকল্পনা মনুর সাহিত্যে স্বীকৃত হয়েছে সেখানে আশ্রম ধর্ম ব্যতিরেকে সন্ন্যাসী কারা ছিলেন কিংবা এই বর্ণব্যবস্থায় তাদের অবস্থান ঠিক কীরূপ কিংবা কোথায় ছিল তাও সুস্পষ্ট নয় । কারণ গৃহত্যাগী যেকোন বর্ণের ব্যক্তিই তো সন্ন্যাসী হতে পারতেন । সেক্ষেত্রে তাদের জন্য কী মনু অন্য কোন বর্ণ এবং তদুনাসারী কর্ত্তব্য কর্মের পরিকল্পনা করেছিলেন ? না কি তা সেই সমাজ ব্যবস্থায় অনুমোদিত ছিলো না ? এইসকল প্রশ্নে মনুসংহিতার অবস্থান অস্পষ্ট । তাই বলা যায়, বৈদিক ভাবধারা অনুসারী বর্ণ তাদের কর্ত্তব্য কর্ম এবং দানাধিকার ব্যবস্থা প্রসঙ্গে মনুর এইরূপ অস্পষ্ট অবস্থানকে কেন্দ্র করে যে বিরোধ ও বিতর্ক হয় তা অস্বীকার করা যায় না ।

---

৬৩. *মেধাতিথি,* ১১ ।১২৫

তথ্যসূত্র :

- তর্করত্ন পঞ্চানন (শ্রীযুক্ত), (ডঃ) মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত প্রাককথন, *মনুসংহিতা, ২০০০,* প্রকাশক - সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার , কলিকাতা ।

- ন্যায়তীর্থ বসু সুমিতা (ডঃ), *ধর্ম-অর্থ-নীতিশাস্ত্রসমীক্ষা,* ২০০৬, প্রকাশক - সদেশ, কলিকাতা।

- বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেশচন্দ্র (অনুবাদক), *মনুসংহিতা,* ১৯৯৯, প্রকাশক- আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

- সপ্ততীর্থ শ্রীভূতনাথ (অনুবাদক), *মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য,* (বঙ্গানুবাদ), প্রথম খণ্ড, ১৩৬১, কলিকাতা ।

- সপ্ততীর্থ শ্রীভূতনাথ (অনুবাদক), *মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য,* (বঙ্গানুবাদ), দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬১, কলিকাতা ।

- সপ্ততীর্থ শ্রীভূতনাথ (অনুবাদক), *মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য,* (বঙ্গানুবাদ), তৃতীয় খণ্ড, ১৩৬১, কলিকাতা ।

- সপ্ততীর্থ শ্রীভূতনাথ (অনুবাদক), *মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য,* (বঙ্গানুবাদ), চতুর্থ খণ্ড, ১৩৬১, কলিকাতা ।

- সান্যাল ইন্দ্রাণী, শর্মা রত্না দত্ত (সম্পাদনায়), *ধর্মনীতি ও শ্রুতি ,* ২০০৯,, প্রকাশক - যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা ।

যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য সংহিতায় দান

প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা অন্যতম । এর সমগ্র আলোচনা মূলতঃ তিনটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে যেমন - আচার অধ্যায়, ব্যবহার অধ্যায় এবং প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায় । উক্ত তিনটি অধ্যায়েই তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত আশ্রমধর্ম অনুসারে ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম সম্পর্কিত উপদেশ ও নানা বিধি নির্দেশিত হয়েছে । যেখানে 'দান' ক্রিয়ার ভূমিকা ছিল অন্যতম প্রধান । দেখা যায় যে, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রথম অধ্যায় বা আচার অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় হল ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমের বিধি বিষয় । সেই সময়ে সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের পরিসরে নির্দেশিত অপর সকল কর্ত্তব্য কর্মের মধ্যে 'দান' অন্যতম গুরুত্বপূর্ণরূপে নির্দেশিত হয়েছিল । এই অধ্যায়ে ব্রহ্মচারীর জীবনের আচরণ বিধির সঙ্গে গৃহী বা সংসারীদের জীবন যাপন সম্পর্কিত নানাবিধ কর্ম নিয়ম যেমন - বিদ্যাশিক্ষা, বিবাহ বিধি, গ্রহশান্তি ও শ্রাদ্ধাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে । ব্যবহার অধ্যায়ে পাওয়া যায় সেইসময় সমাজে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা । প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে 'নিয়োগ পদ্ধতি', যেমন - রাজ্যসভার বিভিন্ন সদস্যের নিয়োগ পদ্ধতি, শাস্তিদান সম্বন্ধীয় নানা বিধিসহ বিচারালয়ে বিচারক নিয়োগের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা এই অধ্যায়ে গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়েছে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বিবিধ প্রকরণ যেমন - সীমা বিবাদ প্রকরণ , দত্তা প্রদানিক প্রকরণ, ক্রীতানুশয় প্রকরণ ইত্যাদি সহ বিভিন্ন বিবরণ বিষয়েও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে । যার মধ্যে অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ হল ঋণদান ও পরিশোধ বিষয়ক বিবরণ যেখানে পৈতৃক সম্পত্তি বিষয়ক নানাবিধ আলোচনা যেমন - আধি, সাক্ষী, লেখ, দিশ, দায়বিভাগ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ব্যাখ্যাত হয়েছে । শেষতঃ প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায়ে মূলতঃ পারলৌকিক ক্রিয়া বিষয়ক বিবিধ বিধি যেমন - অশৌচ, প্রায়শ্চিত্ত কর্ম ও শ্রাদ্ধাদি বিষয়ে বিভিন্ন উপদেশসহ অপর দুটি আশ্রমব্যবস্থা অর্থাৎ বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস জীবনের বিভিন্ন কর্ত্তব্য কর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে । যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার উল্লিখিত এই তিনটি অধ্যায়ের প্রতিটিতেই দান বিষয়ক আলোচনা পাওয়া গেলেও এর মধ্যে মূলতঃ প্রথম এবং তৃতীয় অধ্যায়েই 'দান' সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার নির্দেশ হয়েছে ।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় ধর্ম ও দান এবং দানের প্রকার :

'ধর্ম' শব্দটির ব্যবহার বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রসিদ্ধ । যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় এই 'ধর্ম' বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ধৃ ধাতু থেকে উৎপন্ন এই 'ধর্ম' শব্দটির অভিধানগত অর্থ হল সৎ কর্মের সাধন করা, নিজে

সৎ থাকা, ধর্মীয় সদাচারে ব্রতী হওয়া, কর্ত্তব্য কর্ম বা সুনীতি সাধন করা ইত্যাদি । ঋগ্বেদে ‘ধর্ম’ শব্দটিকে বিশেষ ভাবে ধর্মীয় সদাচার অর্থে গ্রহণ করে এর তিনটি বিভাগের উল্লেখ করা হয়েছে । প্রথম বিভাগের অর্ন্তভূক্তরূপে যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এর উল্লেখ করা হয়েছে । দ্বিতীয় বিভাগে উল্লেখ হয়েছে তপস্যা সম্বন্ধে । আর তৃতীয় বিভাগে যাবজ্জীবন গুরুকূলে বাস করে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন পূর্ব্বক গুরুর সেবা করা এবং এইরূপ সেবা সাধনের মধ্যে দিয়েই নিজের জীবন অতিপাত করে পুণ্যার্জন করা এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ অমৃতত্ব লাভ করার বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে । এইরূপে ‘ধর্ম’ শব্দটির আভিধানিক ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় ‘দান’ - এর উল্লেখ পাওয়া যায় । যা বিভিন্ন বর্ণে ও আশ্রমব্যবস্থাতে কর্ত্তব্য কর্ম বা ‘ধর্ম’ অর্থেই নির্দেশিত হয়েছে । সংহিতানুসারে এই দান মূলতঃ দ্বিবিধ ‘যাচিত দান’ ও ‘অযাচিত দান’ । যে দানে দাতার উদ্দেশ্যে গ্রহীতা নিজের যাঞ্চা বা প্রার্থনা নিবেদন করেন তা ‘যাচিত দান’ বিপরীতে যে দান কর্মে গ্রহীতার কোন প্রার্থনা বা যাঞ্চা থাকেনা বরং যে দান দাতার স্বেচ্ছা প্রণোদিত তাই হল ‘অযাচিত দান’ ।

দাতা :

‘যাচিত দান’ এবং ‘অযাচিত দান’ দানের এই দুই প্রকারের উপর নির্ভর করেই যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় ‘দাতা’ বিষয়ক আলোচনায় আলোকপাত করা হয়েছে । সংহিতানুসারে এবিষয়ে উল্লিখিত হয়েছে যে, যেসকল ব্যক্তি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে দেবতাগণের পূজা ও উপাসনা করেন, নিজ পরিবার তথা পিতা - মাতা গুরুজনদের প্রতি আপন দায়িত্বের পালন করেন এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে অতিথির সেবা করেন তাঁদের কাছ থেকে ‘যাচিত দান’ এবং ‘অযাচিত দান’ উভয় প্রকার দানই গ্রহণ করা যেতে পারে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে , ‘অযাচিত দান’ এর ক্ষেত্রে সংহিতার স্পষ্ট নির্দেশ এইরূপ যে , প্রার্থনা ব্যতিরেকে যদি কোন দাতা দান করতে ইচ্ছুক হন তবে সেই দাতা দুষ্কার্য্যকারী হলেও গ্রহীতা তাঁর কাছ থেকে ‘দান’ গ্রহণ করতে পারেন । যদিও এবিষয়ে কিছু বিধি নিষেধও পরিলক্ষিত হয় , যেমন - যাঁরা নিজেদের জীবন যাপনের জন্য পতিতাদির জীবিকা গ্রহণ করেন কিংবা অপর এমন কোন জীবিকা যা অত্যন্ত কুৎসিত মানের তাঁদের কাছ থেকে গ্রহীতাগণের ‘যাচিত’ কিংবা ‘অযাচিত’ কোন প্রকার ‘দান’ গ্রহণই সমর্থনীয় নয় । এইরূপ শাস্ত্র নির্দেশ থেকে প্রশ্ন হতে পারে যে, ইতিপূর্বেই ‘অযাচিত দান’ বা ‘প্রার্থনা ব্যতিরেকে দান’ এর ক্ষেত্রে দুষ্কার্য্যেরত দাতার কাছ থেকেও সংহিতানুসারে দান গ্রহণ সমর্থনীয় বলে উল্লিখিত হয়েছে তবে পরে এমন নিষেধের অর্থ কী ? আবার সংহিতায় পতিতাদির জীবিকা ব্যতীত কুৎসিত মানের জীবিকা বলতে কিপ্রকার জীবিকার উল্লেখ করা হয়েছে ? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, যদিও শাস্ত্রোল্লিখিত ‘দুষ্কার্য্যকারী’ শব্দটির অর্থ এক্ষেত্রে খুব স্পষ্টার্থক নয় তথাপি একথা বলা

যেতে পারে যে, তদানীন্তন সমাজবাবস্থায় প্রচলিত বর্ণব্যবস্থানুসারে পৌরহিত্য, বাণিজ্য, দেশরক্ষা, কৃষি কিংবা সেবাধর্ম জীবিকার জন্য যেসকল বিধি নিষেধ শাস্ত্রনির্দিষ্ট ছিল হয়তো বা ক্ষেত্র বিশেষে সেই সকল বিধি নিষেধের ত্রুটিকারী প্রমুখের কথা এক্ষেত্রে বলা হয়েছে যা ক্ষেত্র বিশেষ সমর্থনীয় হলেও জীবন যাপন করার জন্য পতিতাদির জীবিকা কোনও মতেই যে সমর্থনীয় ছিল না তাই এক্ষেত্রে উল্লিখিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে অর্থাৎ কুৎসিত মানের জীবিকা বলতে স্পষ্ট করে সংহিতায় কিছু বলা না হলেও একথা বলা যেতে পারে যে, এমন কোন জীবিকা যা লোক সমক্ষে প্রসিদ্ধ নয়, যেমন হতে পারে চৌর্য্য কিংবা দস্যু বৃত্তি করেন, এমন (কিংবা মনুসংহিতায় যেমন উল্লিখিত হয়েছে, তৈল ব্যবসায়ী, খটিক বা কসাই প্রমুখের জীবিকা) জীবিকা যাপনকারীর কাছ থেকেও 'দান' গ্রহণ সমর্থনীয় নয় ।

দানের পাত্র বা গ্রহীতা :

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় 'দান' বিষয়ের সমগ্র আলোচনা পরিচালিত হয়েছে মূলতঃ দানের পাত্র ও অপাত্র বা গ্রহীতা নির্বাচনের ভিত্তিতে এবং দানের দ্রব্য এবং দানজন্য দাতার ফললাভ এই সকল বিষয়কে কেন্দ্র করে । এবিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে , 'আচার অধ্যায়' - এ উল্লিখিত 'দান' বিষয়ক উপদেশে বলা হয়েছে, প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁর বিশুদ্ধ ধ্যান ক্রিয়ায় এই বিশ্ব তথা জগৎ রক্ষা কল্পে যে ব্রাহ্মণ বর্ণের সৃষ্টি করেছেন তাঁরা অপরাপর বর্ণ অপেক্ষা গুণকর্ম ও জাতিতে উৎকৃষ্ট মানের । তাই তাঁরা সকল বর্ণমধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছেন । তবে এই শ্রেষ্ঠতার বিচার তথা স্বীকৃতি যে শুধু অপরাপর বর্ণের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের মধ্যেই নির্ধারিত হয়েছিল এমন নয়, বরং যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতানুসারে গুণাগুণের ভিত্তিতে যথাক্রমে - 'উৎকৃষ্ট', 'প্রধান' এবং 'শ্রেষ্ঠ' এইরূপ শ্রেষ্ঠতার ক্রম পর্যায় ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত এবং স্বীকৃত হয়েছিল । এই প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বর্ণিত হয়েছে, গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ বর্ণের যেকোন মানুষ অপরাপর বর্ণের ব্যক্তিদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হলেও এঁদের মধ্যে যাঁরা শ্রুতি অধ্যয়ন করে নিজেদের জীবন যাপন করতেন তাঁরাই ছিলেন প্রকৃতপক্ষে 'উৎকৃষ্ট' মানের ব্রাহ্মণ । আবার যাঁরা কেবল শ্রুতাধ্যয়নসহ বর্ণধর্ম অনুসারে নিজেদের কর্ত্তব্য কর্মের পালন করতেন তাঁরা ছিলেন উৎকৃষ্ট মানের ব্রাহ্মণদের তুলনায় 'প্রধান' এবং যেসকল ব্রাহ্মণ পূর্বোল্লিখিত গুণসহ আত্মতত্ত্ব জ্ঞান সম্পন্ন তাঁরা ছিলেন অন্য সকল ব্রাহ্মণদের তুলনায় 'শ্রেষ্ঠ' । দান প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় সর্বদাই ব্রাহ্মণদের দান উৎসাহিত হয়েছে ; যাঁর মধ্যে 'শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের' দান সর্বাধিক ফলজনক বলেও উল্লিখিত হয়েছে । তবে ব্রাহ্মণগণকে 'দান' শ্রেষ্ঠ বলে উল্লিখিত হলেও সকল ব্রাহ্মণকে দানই যে শ্রেষ্ঠ তেমন নয় । বরং এবিষয়ে পাত্রভেদেরও উল্লেখ হয়েছে । যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতানুসারে দানের পাত্র বিচারে ব্রাহ্মণগণকে মূলতঃ

দ্বিবিধ ভাগে ভাগ করা যায় , যেমন - 'অসম্পূর্ণ' এবং 'সম্পূর্ণ' । যেসকল ব্রাহ্মণ কেবল জাতি কিংবা কেবল কর্ম কিংবা কেবল তপস্যা কিংবা কেবল বিদ্যায় পারদর্শী তাঁরা গ্রহীতা হলেও দানের বিষয়ে তাঁরা গ্রহীতারূপে 'অসম্পূর্ণ পাত্র'। কিন্তু যেসকল ব্রাহ্মণ উক্ত সকল ক্ষেত্রেই পারদর্শী তাঁরাই গ্রহীতারূপে 'সম্পূর্ণ পাত্র' । এইরূপ 'সম্পূর্ণ পাত্রে' দানই উত্তম বা শ্রেষ্ঠ দান ।[১] যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার মতো উশন্ সংহিতাতেও সমাজে প্রচলিত অন্যান্য বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বর্ণকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করার নির্দেশ পরিলক্ষিত হয় । এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, অপরাপর তিন বর্ণের তুলনায় ব্রাহ্মণ বর্ণই সর্বাধিক সম্মানীয় । যেহেতু তাঁরা অপরাপর সকল বর্ণের যাবতীয় ধর্মীয় বোধের ও সদাচারের প্রয়োজন পূরণ করতে যজমানগণকে সাহায্য করেন তাই তাঁরা সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদা লাভের অধিকারী । কাজেই তাঁদের সর্বাধিক সম্মান 'দান' করতে হবে । 'দান' প্রসঙ্গে এইরূপ উল্লেখের মধ্যে দিয়ে বলা যায় যে, উশন্ সংহিতা অনুসারেও দান ক্ষেত্রে 'ব্রাহ্মণ'বর্ণই অন্যতম প্রধান বলে নির্দেশিত হয়েছে । দানজন্য ফল লাভ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গেও সংহিতায় উল্লিখিত হয়েছে যে , দাতার যদি উত্তম ফল লাভ করতে হয় তবে প্রথমে 'সম্পূর্ণ পাত্রে' দান করতে হবে ,এইরূপ পাত্রের অভাব হলে 'অসম্পূর্ণ পাত্রে' দান করা যেতে পারে । এইরূপে দেখা যায় যে, 'দান' বিষয়ের আলোচনায় গ্রহীতা বা দানের পাত্র ভেদ গুরুত্বপূর্ণরূপেই সংহিতানুসারে বিবেচিত হত । হারীত সংহিতাতেও বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণদের প্রতি গৃহস্থের নিত্য দান কর্ত্তব্য ।[২] তবে যে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞানহীন সেইরূপ ব্রাহ্মণকে দান করলে দাতা এবং তার পরিবারের ক্ষতি সাধিত হয় ।[৩] এই প্রসঙ্গে ব্যাস সংহিতায় বলা হয়েছে ব্যক্তির অর্জিত সম্পত্তি যে অংশটুকু শিক্ষিত বা উত্তম শ্রেণির ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে সেই ব্যক্তি ব্যবহার করেন বা দান করেন, সেই অংশটুকুই তার মোট অর্জিত সম্পত্তির প্রকৃত সম্পত্তি ।[৪] তাই ব্রাহ্মণদের দান করাই হল শ্রেষ্ঠ দান । তবে কোন গৃহস্থ ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে দান করার সময় অবশ্যই এই বিষয়ে নিশ্চিত হবেন যে, তাঁর বেদের জ্ঞান আছে কিনা । কারণ বেদ জ্ঞানহীন অশিক্ষিত ব্রাহ্মণদের ব্যাস সংহিতায় কাষ্ঠের হাতি বা চর্ম হরিণস্বরূপ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তারা শুধু নামেই ব্রাহ্মণ । এই বিষয়ে ব্যাস সংহিতায় বলা হয়েছে গৃহস্থের নিকটস্থ অশিক্ষিত ব্রাহ্মণদের তুলনায় দূরে বসবাসকারী শিক্ষিত ব্রাহ্মণদের দান করাই শ্রেয়, এবং তাতে গৃহস্থ দাতার কোন পাপ কর্মফল সঞ্চিত হয় না।[৫] দান ক্রিয়ার জন্য গ্রহীতাদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে কতকগুলি বিধির নির্দেশ করা হয়েছে । এই প্রসঙ্গে ভিক্ষা যাঞ্চা করা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কতকগুলি বিধির নির্দেশ হয়েছে ।

---

১ . *যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা,* ১। ১৯৯
২ . *হারীত সংহিতা,* ৪। ৭৪
৩ . ঐ, ১। ২৩-২৪
৪ . *ব্যাস সংহিতা,* ৪। ১৬
৫ . ঐ, ৪। ৩৩-৩৮

ভিক্ষা যাচ্ঞা ও গ্রহণ বিধি :

এক্ষেত্রে প্রধানতঃ দুই ক্ষেত্রে ভিক্ষা যাচ্ঞা বিধি প্রাধান্য পেয়েছে । প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্যকালীন পরিসরে ব্রহ্মচারীর ভিক্ষা যাচ্ঞা বিধি । এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই বিশেষ নির্দেশ করে বলা হয়েছে, এই সময়ে প্রতি ব্রহ্মচারীই তাঁর আচার্য্যের প্রতি অনুরক্ত থাকবেন । গুরু গৃহে থাকাকালীন পরিসরে ব্রহ্মচারীগণ আচার্য্যের জন্য ভিক্ষা গ্রহণ করবেন এবং সেই ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে প্রথমে গুরুকে নিবেদন করে তাঁর অনুমতি নিয়ে সেই ভিক্ষান্ন থেকে নিজের জন্য আহার গ্রহণ করবেন। দ্বিতীয়তঃ উপনয়ন কালে ভিক্ষা গ্রহণ, এই বিষয়েও সংহিতায় বহু নির্দেশ পাওয়া যায় । সেখানে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বর্ণের ব্রহ্মচারীদের জন্য উপনয়নের সময় শাস্ত্রে যে ভিক্ষা যাচ্ঞা করার নির্দেশ হয়েছে সেই প্রসঙ্গে বর্ণ ভেদে পৃথক যাচ্ঞা বিধির উল্লেখ হয়েছে । এই প্রসঙ্গে উশন্ সংহিতায় নির্দেশিত হয়েছে, যেসকল ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ বর্ণের তারা 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' এইরূপ মন্ত্রচ্চারণপূর্ব্বক ভিক্ষা যাচ্ঞা করবেন । ক্ষত্রিয় বর্ণের ব্রহ্মচারী বলবেন, 'ভিক্ষাং ভবতি দেহি', শেষতঃ বৈশ্য বর্ণের ব্রহ্মচারী অন্ন যাচ্ঞা করার সময় দাতার উদ্দেশ্যে বলবেন - 'ভিক্ষাং দেহি ভবতি' ।[৬] শুধু তাই নয়, ব্রহ্মচারীগণ কাদের কাছে এই ভিক্ষা যাচ্ঞা করে তা সংগ্রহ করবেন সেই বিষয়েও স্পষ্ট নির্দেশ করে বলা হয়েছে, একজন ব্রহ্মচারী প্রথমে তার মা তারপর তার দিদি অথবা বোন অথবা মাতৃস্থানীয় ব্যক্তি যেমন মাসীর কাছ থেকেই যথাক্রমে ভিক্ষার যাচ্ঞা করবেন । তারা কখনই গুরুর পরিবার কিংবা তাঁর নিকট স্থানীয় কোন আত্মীয় অথবা স্বজনের কাছে ভিক্ষান্ন যাচ্ঞা করবেন না । এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, সেই সকল ব্যক্তি বা পরিবারই এই ভিক্ষান্ন প্রদান করার জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন, যাঁরা বেদ চর্চা ও অধ্যয়ন করেন এবং শাস্ত্রানুসারে নিজ ধর্মের কর্ত্তব্য - কর্ম বা স্বধর্ম পালন করেন । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, হারীত সংহিতাতেও ব্রহ্মচারীদের উদ্দেশ্যে জীবন যাপন ও ভিক্ষা গ্রহণ বিষয়ে বিধি নির্দেশ করে বলা হয়েছে, একজন ব্রহ্মচারী যখন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম যথাবিধি পালন করে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করবেন তখন যেন তিনি উক্ত আশ্রমের সকল ধর্মই কর্ত্তব্য জ্ঞানেই সম্পন্ন করেন সেই বিষয়ে আচার্য্য তাঁকে নির্দেশ প্রদান করছেন । গুরু বা অচার্য্য তাঁর শিষ্যকে নির্দেশ করেছেন প্রতিদিন 'বেদ' পাঠে অভ্যস্ত থাকতে হবে, অন্যথায় শিষ্য তার আশ্রমধর্মের কাম্য ফলভোগ করতে পারবে না । যথাযথভাবে কর্ত্তব্য - কর্ম ফল ভোগ করার জন্য তাকে কায় - মন ও বাক্যে সংযমী হতে হবে, এমন নির্দেশ হয়েছে । সেই কারণে ব্রহ্মচারীগণের কটি দেশের পরণে থাকবে শুধু হরিণের চামড়ার বস্ত্র , মেখলা অর্থাৎ তিনটি অংশের বস্ত্র তারা শরীরের উর্দ্ধাংশের জন্য ব্যবহার করবে । আর দাঁত পরিস্কার করার

৬ . *উশন্ সংহিতা,* ১। ৫২

জন্য তারা কাঠের টুকরো ব্যবহার করবে । তবে তাও শাস্ত্র নির্দিষ্ট সময় - নিয়ম অনুসারেই । আবার আত্ম - অহং বা ব্যক্তিত্ব বোধের সংযমের উদ্দেশ্যে এখানে ব্রহ্মচারীগণের জন্য প্রতিদিনে সকাল ও সান্ধ্যে দু'বার করে ভিক্ষা যাঞ্চ্ঞা বিধি নির্দেশিত হয়েছে । এবং গৃহস্থগণের উদ্দেশ্যে নির্দেশ হয়েছে তাঁদেরকে অন্ন বা ভিক্ষা দানের। সংহিতানুসারে ব্রহ্মচারীদের এইরূপ ভিক্ষা যাঞ্চ্ঞা করা এবং তা সংগ্রহ করে আচার্য্যের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তার গ্রহণ করার ক্ষেত্রে শাস্ত্রের নির্দেশের লক্ষ্য হল, ব্রহ্মচারীর আত্ম - অহংবোধের নিবৃত্তিকরণ এবং আত্মসংযমের অভ্যাস করা।[৭]

গৃহস্থের নিত্য দান কর্ত্তব্য :

হারীত সংহিতায় নির্দেশিত হয়েছে , গৃহস্থের নিত্য নৈমিত্তিক জীবন যাপনে দান অবশ্যকর্ত্তব্য । কোন গৃহস্থের কাছে পূর্বে অপরিচিত কোন অতিথি এসে উপস্থিত হলেও গৃহস্থ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবেন , তাকে আসন ও জল দান করবেন । তার পা ধুইয়ে দেবেন এবং তাকে আহার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করবেন । এইভাবেই একজন গৃহস্থ প্রতিদিন অতিথি সেবা করবেন এবং তাছাড়াও ব্রহ্মচারী ও ভিক্ষুক গণের উদ্দেশ্যেও অন্ন দান করবেন । একইরকমভাবে কোন সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত হলে গৃহস্থ শ্রদ্ধার সঙ্গে আগে সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে 'অন্ন দান' করে তারপর পরিবারের অপরাপর সকলের জন্যে আহারের ব্যবস্থা করে সবশেষে নিজে খাদ্য গ্রহণ করবেন ।[৮] অত্রি সংহিতায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের জন্যেই 'দান' নিত্য ও ধর্মীয় কর্ত্তব্য বলে নির্দেশিত হয়েছে ।[৯] শূদ্র বর্ণের জন্যেও ত্যাগ অর্থে দানকর্ম 'ইষ্ট' রূপে পৃথকভাবে সমর্থিত হয়েছে ।[১০] এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে, যে গৃহস্থের নিত্য উপার্জন অতি সীমিত তিনিও তার উপার্জনের সামান্যতম অংশও নিত্য দান কার্য্যে অবশ্যই ব্যয় করবেন ।[১১] ব্যাস সংহিতাতেও গৃহস্থের উদ্দেশ্যে এইরূপ নিত্য অন্নদানের নির্দেশ হয়েছে ; বলা হয়েছে, মৃত্যু ধ্রুব সত্যি । তাই গৃহস্থের যেসকল সম্পত্তি তাঁর প্রয়োজন ও খ্যাতি অনুসারে অব্যবহৃতই থেকে গেছে এবং তাঁর মৃত্যুর পরও অব্যবহৃতই থেকে যাবে সেই সম্পদ অবশ্যই অপরের সাহায্যার্থে গৃহস্থের দান করে যাওয়া উচিৎ ।[১২]

---

৭ . *হারীত সংহিতা,* ৬। ১৪-১৭
৮ . ঐ, ৪। ৫৬-৬৫
৯ . *অত্রি সংহিতা* , ১। ১২-১৫
১০. ঐ, ১। ৪৬
১১. ঐ, ১। ৪০
১২ . *ব্যাস সংহিতা,* ৪। ১৯-২০

দানের গুরুত্ব ও ফল :

দানের গুরুত্ব ও ফল প্রসঙ্গের আলোচনায় পূর্বমতোই ব্রাহ্মণ বর্ণের স্থান সকলের উর্দ্ধে বলেই নির্দেশিত হয়েছে । এই বিষয়ে ব্যাস সংহিতানুসারে নির্দেশিত হয়েছে , যে ব্যক্তি সৎ পথে উপার্জিত অর্থের দ্বারা নিজ প্রয়োজন পূরণের পর বাকী অংশের সমস্তটাই কোন ব্রাহ্মণের সেবা করার উদ্দেশ্যে ব্যয় করেন , কিংবা যিনি তাঁর মৃত্যুর পর তার সহায় - সম্পদ এবং নগদ অর্থ সবই ব্রাহ্মণ এবং দরিদ্র অসহায় ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে দান করে যান তিনি মৃত্যুর পরেও সকলের মধ্যে তার কাজের মধ্যে দিয়ে জীবিত থাকেন। শুধু তাই নয় , তিনি তাঁর এইরূপ দানের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুর পরে পরলোকেও উপকৃত হন বলে সংহিতানুসারে নির্দেশ করা হয়েছে । যে ব্যক্তি গ্রহীতার কোন যাঞ্চা ছাড়াই নিজের ইচ্ছাতেই তার সাহায্যার্থে কোন বিষয়, কিংবা দ্রব্য কিংবা নগদ অর্থ দান করেন মৃত্যু তাকে কোন দিন স্পর্শ করতে পারে না । [১৩] ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশ্যে দান সর্বদাই প্রশংসিত হয়েছে । বলা হয়েছে গৃহী প্রতিদিনই ব্রাহ্মণগণকে দান করবেন। এতে গৃহীর পুণ্যফলের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অধিক হবে বলেই উল্লিখিত হয়েছে । তবে এই প্রসঙ্গে বেদ অধ্যপনা বা তার অধ্যয়নের গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য বলে নির্দেশিত হয়েছে । বলা হয়েছে, একজন ব্রাহ্মণ তিনি তখনই যথাযথভাবে গ্রহীতা বলে বিবেচিত হবেন , যদি তিনি নিত্য বেদ পাঠ, অধ্যাপনা এবং চর্চা করেন । আর সেই সকল ব্রাহ্মণগণকে 'দান' আরও বেশি রূপে ফলদায়ী হবে যেসকল ব্রাহ্মণ পূর্ণ রূপে শাস্ত্রানুসারে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যিনি কখোনই কোন শূদ্র বর্ণের ব্যক্তির জল গ্রহণ করেন নি। এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণগণের শ্রেণিবিভাগও উল্লিখিত হয়েছে ; যেমন - ভ্রূব ব্রাহ্মণ , সাম ব্রাহ্মণ এবং আচার্য্য । যে ব্রাহ্মণ যথাযথভাবে ব্রাহ্মণ পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু কোনদিনই বেদ বা এর কোন অংশের পাঠ করেন নি , কিংবা বৈদিক চর্চায় অনুসারী হননি বা কাউকে এই বিষয়ে কোন শিক্ষা প্রদান করেন নি তিনি হলেন, ভ্রূব ব্রাহ্মণ । আবার যিনি যথাযথরূপে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেননি এবং যার মন্ত্র শিক্ষাও হয়নি অথচ যিনি জীবন যাপন করার উদ্দেশ্যে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলেই পরিচয় দেন এবং তার সুবিধা উপভোগ করেন, তাকে বলা হয় সাম ব্রাহ্মণ । কিন্তু যিনি নিত্য বেদ পাঠ, অধ্যয়ন এবং চর্চা করেন এবং তাঁর শিষ্যদেরকে বেদ ও তার বিভিন্ন কল্প বিষয়ে শিক্ষা দান করেন এবং এর রহস্য শিষ্যের কাছে উদ্‌ঘাটন করেন এবং প্রতিদিন শাস্ত্র নির্দিষ্ট নিয়মেই হোম - যাগ ইত্যাদি সম্পন্ন করেন তিনি হলেন শাস্ত্র মতে আচার্য্য । ব্যাস সংহিতানুসারে 'সাম ব্রাহ্মণগণ'কে দান করার

---

১৩ . *ব্যাস সংহিতা,* ৪। ২৫-২৬

তুলনায় 'ভূব ব্রাহ্মণগণকে ' দান করলে দ্বিগুন ফলদায়ী হবে। আবার আচার্য্যের উদ্দেশ্যে দান করলে পূর্বের তুলনায় সহস্র গুণ বেশী ফলদায়ী হবে । [১৪] তবে শুধু ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশ্যেই নয় বরং পরিবারের গুরুজনদের প্রতি 'দান'ও প্রশংসিত হয়েছে । বলা হয়েছে , নিজের বাবা, মা , ভাই , বোন শ্বশুরমশাই বা শ্বাশুড়ি এবং স্ত্রী ও সন্তানাদিদের উদ্দেশ্যে দান স্বর্গ লাভের কারণ হয়।[১৫]

দানের গুরুত্ব ও ফল বিষয়ে আলোচনায় ব্যাস ও শঙ্খ উভয় সংহিতানুসারেই নির্দেশিত হয়েছে যে, 'দান' হল এক নৈতিক কর্ত্তব্য । যেকোন বর্ণের জন্যেই যেকোন আশ্রম ব্যবস্থাতেই এই 'দান' ক্রিয়া যথাবিধ ধর্মোপায়ে সম্পন্ন করাই হল পরম কর্ত্তব্য । পূর্ব আলোচনার মধ্যে দিয়ে দার্শনিক দৃষ্টিকোণের প্রেক্ষিতে একথা উপলব্ধি করা যায় যে, প্রতি বর্ণের মানুষের কাছেই এ হল এমন এক দায়-বোধ যার মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকেই যেন পরস্পর এক সামাজিক ও নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন । কিন্তু 'দান' বিষয়ক এইরকম ভাবনার বিরোধী ভাবনা পাওয়া যায় ব্যাস সংহিতায় উল্লিখিত 'শূদ্র বর্ণে'র হাতে ব্রাহ্মণের জল গ্রহণ না করার নির্দেশের মধ্যে দিয়ে । একইভাবে শঙ্খ সংহিতাতেও ব্রহ্মচারীদের জন্য কেবল ব্রাহ্মণ বর্ণের গৃহীর কাছ থেকে 'অন্ন যাচ্ঞা' করার যে নির্দেশ পরিলক্ষিত হয় তাও যেন একরকম বর্ণান্ধতারই সূচনা করে । মনু সংহিতাতেও একইভাবে শূদ্র বর্ণের জন্য সমাজে একইরকম অবস্থানই প্রসিদ্ধ ছিল। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রশ্ন হতে পারে , যেখানে সামর্থ্য ভেদে বর্ণ বিভাগ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল তাতে কেন 'দান' ক্ষেত্রে তাদের জন্য খুব স্পষ্টভাবেই দাতা কিংবা গ্রহীতা ক্ষেত্রের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয় না ? প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান প্রসঙ্গে একথা বলা যেতে পারে তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থায় সামর্থ্য ভেদে যে বর্ণ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল তা যেন ক্ষেত্র বিশেষে সামর্থ্যকে গুরুত্ব না দিয়ে জাতিভেদের পরিসরে উপনীত হয়েছিল । যেখানে মানুষের সামর্থ্য নয় বরং বর্ণ নামাঙ্কিত জাতিগত সীমাবদ্ধতাই সমাজের এক বদ্ধমূল সংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছিল ফলে প্রাসঙ্গিক প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনা ও উন্নতির পথ সম্বন্ধে সেই সমাজ অবগত থাকলেও তার সর্বৈব প্রয়োগ জনিত সাফল্য সম্পূর্ণরূপে লাভ করতে পারেনি। যদিও উক্ত ভাবনার একটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রের উল্লেখ অত্রি এবং বিষ্ণু সংহিতায় পরিলক্ষিত হয় । অত্রি সংহিতায় শূদ্র বর্ণের জন্যে প্রত্যক্ষভাবে দান অর্থে না হলেও 'ইষ্ট' বা ত্যাগ অর্থে দান কর্মে দাতার ভূমিকা স্বীকার করা হয়েছে । বিষ্ণু সংহিতাতেও শূদ্র বর্ণের জন্যে দাতার স্বীকৃতি প্রদান করে বলা হয়েছে, যদি কোন শূদ্র বর্ণের ব্যক্তি নিজেকে তার প্রভূর দাস বলে ঘোষণা করে, নিত্য তার সেবায় নিয়োজিত থাকে তবে সেই ব্যক্তি শূদ্র বর্ণের

---

১৪ . *ব্যাস সংহিতা,* ৪। ৪০
১৫ . ঐ, ৪। ২৯

হলেও তাঁর কাছ থেকে অন্ন গ্রহণ করা যাবে ।[১৬] বিষ্ণু সংহিতায় দানের ফল বিষয়ে নির্দেশ প্রসঙ্গে দাতা এবং গ্রহীতাদের প্রতি বিধি উপদেশ করে বলা হয়েছে, ধর্মীয় স্তরে যাদের কোন ভাবে অবনমন ঘটেছে, যে সকল ব্যক্তির জন্ম বর্ণনিয়ম ব্যবস্থায় শাস্ত্রানুসারে স্বীকৃত নয় তারা যোগ্য দাতা বলে বিবেচিত হবেন না । এদের কাছ থেকে যেকোন দান বিশেষভাবে 'অন্ন দান' গ্রহণে গ্রহীতাগণের ধর্মীয় মানের অবনমন প্রাপ্তি হবে । সংহিতায় নির্দেশিত হয়েছে, ব্রাহ্মণগণ তাঁদের ব্রহ্ম তেজ ও ধর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ বলে বিবেচিত হবেন, তারা দাতাদের কাছ থেকে 'দান' গ্রহণ করে দাতাগণের ধর্মীয় মানের উত্তরণ ঘটাবেন । শুধু তাই নয়, দাতাদের উদ্দেশ্যে নির্দেশিত হয়েছে, তাঁরা যেন 'দান' করার সময় গ্রহীতাদের উদ্দেশ্যে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা সহকারে সেই সকল বিষয়েরই 'দান' করেন যে বিষয়গুলি এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে গ্রহীতাগণ অবগত আছেন । অন্যথায় সেই 'দান' কর্ম দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই ধর্মীয় মানের অবনমন ঘটাবে । কিন্তু এর বিপরীত পরিস্থিতিতে অর্থাৎ যথাযথ জ্ঞান সহকারে যদি গ্রহীতাগণ তাদের উদ্দেশ্যে কৃত 'দান' এবং তার গুরুত্ব বিষয়ে অবগত থাকেন তবে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই ধর্মীয় স্তরের উত্তরণ ঘটবে । দানের দ্রব্য বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বিষ্ণু সংহিতায় নির্দেশিত হয়েছে, কোন ব্যক্তি বা গ্রহীতা জল, জ্বালানী, ফল, মূল, শয্যাদি, মধু, মাংস, সম্ভাবনাময় চারাগাছ ইত্যাদি পেলে তাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না । এমননকী অন্নের জন্যেও একই বিধি । কারণ এতে প্রজাপতি স্বয়ং সন্তুষ্ট থাকবেন ।[১৭]

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় দানজন্য ফল লাভ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে যে , দাতাকে প্রথমেই সচেতন হতে হবে যেন তাঁর সমগ্র 'দান ক্রিয়া' যথাযথ বিধি বা নিয়মসহ সঠিক সময়ে এবং সঠিক পাত্রে সম্পাদিত হয়। কিরূপ দ্রব্য দানে দাতা কিরূপ ফল লাভ করতে পারেন সেই বিষয়ে বিস্তৃতাকারে আলোচিত হয়েছে । যেমন এবিষয়ে প্রথমেই উল্লিখিত হয়েছে যে , 'অযাচিত দান' 'যাচিত দান' অপেক্ষা অধিক ফলবান । উক্ত দুই প্রকার 'দান' ভেদে বিভিন্ন 'দানীয় দ্রব্য' বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে 'কাংস্যপাত্র', 'যথাযথ দক্ষিণাসহ সুশীলা দুগ্ধবতী গাভী', 'স্বর্ণময় শৃঙ্গ', 'রৌপ্যময় খুর' 'পরিধানের বস্ত্র' ইত্যাদি সকল বিষয় সংহিতানুসারে অধিক ফললাভ জনক বলে উল্লিখিত হয়েছে । যেমন - সকল রকম নিয়মের যথাযথ পালন সহ যদি কোন দাতা 'সুশীলা দুগ্ধবতী গাভী' দান করেন, তবে দাতা যে গাভী দান করছেন, সেই গাভীর রোম সংখ্যক বৎসর তিনি স্বর্গে বসবাস করেন । আবার এইরূপ গাভী যদি কপিলা হয় (তামাটে বর্ণের) তবে সেই দাতা সহ তাঁর পিত্রাদি ছয় পুরুষ, মোট সাত পুরুষ পরম মোক্ষ লাভ করেন । [১৮] এইরূপে প্রসূতি গাভী সহ তার বৎস

১৬ . *বিষ্ণু সংহিতা,* ৭। ১৬
১৭ . ঐ, ৭। ৯ -১১
১৮ . *যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা,* ১। ২০৫

(উভয়োতমুখী গাভী) যিনি দান করেন সেই দাতা গাভী এবং সেই গাভী বৎসের রোম সংখ্যার যোগফল যা হয়, সেই মোট রোম সংখ্যক বৎসর স্বর্গবাস করেন । শুধু তাই নয়, গৃহ, অন্ন, বস্ত্র, সজ্জা দ্রব্য, রথাদি যান, শয্যা, ধর্ম্ম উপদেশ সহ বিবিধ বিষয় গ্রহীতার যা কিছু প্রয়োজনীয় কিংবা যেসকল বস্তু তাদের প্রিয় সেই সকল বিষয়েরই নিয়ম নিষ্ঠাপূর্ব্বক দান দাতাগণের অতিশয় সুখ ভোগের কারণ হয় ।

আবার ধর্ম্মাদি দান বিষয়ে উক্ত হয়েছে 'বেদ' যেহেতু সর্ব্ব ধর্ম্মময় তাই 'বেদ দান' হল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান । [১৯] এইভাবে দেখা যায় যে, ধর্ম্মীয় ক্ষেত্রে উক্ত সকল স্মৃতি ও শ্রুতি শাস্ত্রগুলি সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিকে উচিত ও অনুচিত কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের উপদেশ প্রদান করার সঙ্গে সঙ্গে ঐসকল ব্যক্তিবর্গকে তাঁদের জীবনের কামনা - বাসনা মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ মুক্তি বা মোক্ষ লাভের দিক নির্দেশ করেছে । এখন প্রশ্ন হতে পারে , এইরূপে ফলাকাঙ্খাসহ দান কিংবা দান জন্য সুখ লাভ কি সত্যি কোন দাতা বা গ্রহীতাকে সকল কামনা বাসনার উর্দ্ধে রেখে মুক্তি দিতে সমর্থ হয় ? 'দান' বলতে যেহেতু বোঝায় সম্পূর্ণরূপে স্বত্ব ত্যাগ সেক্ষেত্রে আরও প্রশ্ন হয় যে, এইরূপে ফলের আশা করে যে 'দান' ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তা কি সত্যি 'দান' রূপে স্বীকৃত হওয়ার যোগ্য? উক্ত প্রশ্নগুলির মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, সংহিতানুসারে 'যাচিত' ও 'অযাচিত' উভয় প্রকার 'দান'- এর উল্লেখ পরিলক্ষিত হলেও 'অযাচিত দান' কেই শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে । ফলতঃ একথা বলা যেতে পারে যে , এক্ষেত্রে গ্রহীতার নিজের কোন কামনা - বাসনা কিংবা কোন চাহিদা না থাকায় তার পক্ষ থেকে যেকোন প্রকার সুখ ভোগের প্রতি আসক্তি শাস্ত্র উপদিষ্ট নয় । আবার সেই একই যুক্তি অনুসারে একজন দাতা যখন অযাচিতভাবেই কোন ব্যক্তিকে কিছু 'দান' করতে চান সেক্ষেত্রে তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য হয়, কেবল আত্মতুষ্টি । তাই নিয়মনিষ্ঠা সহকারে কোন 'দান' যদি তাঁর জন্য বিশেষ কোন ফললাভের সূচনা করে তবে তা শাস্ত্রানুসারে ঐসকল দাতাগণের জন্য সকাম কর্ম জনিত কোন বন্ধনের সূচনা করে না । কিন্তু সেক্ষেত্রে পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে যে, 'অযাচিত দান' এর ক্ষেত্রে এইরূপে ব্যাখ্যা দেওয়া গেলেও 'যাচিত দান' ক্রিয়া জনিত কর্ম বন্ধনের মুক্তি কিরূপে সম্ভব ? এই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরে বলা যেতে পারে যে, 'যাচিত দান' - এর ক্ষেত্রে একজন গ্রহীতার (বা যাঞ্চাকারীর) জীবন যাপনের জন্য এই মুহূর্তে যা প্রয়োজন তা কেবল সে কোন ব্যক্তির কাছে যাঞ্চা করেই পেতে পারে, যা তার জীবিত থাকার অধিকার সুরক্ষিত করতে পারে । যা কামনারূপে একজন মুক্তিকামী ব্যক্তির জন্য খুব অন্যায়জনক নয় । আর এর জন্য তার যে জাগতিক মোহ বন্ধন তৈরী হচ্ছে তা সে ধীরে ধীরে জীবন বোধ ও আত্মতত্ত্বের জ্ঞান লাভের মধ্যে দিয়ে পূর্ণরূপে ছিন্ন করতে

---

১৯ . *যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা,* ১। ২১২

সমর্থ হতে পারে । আবার বিপরীত প্রেক্ষিত থেকে একজন গ্রহীতাকে তার কোন প্রয়োজনীয় বিষয় 'দান' জন্য দাতা নিজে কিরূপ ফল লাভ করতে পারেন সে বিষয়ে কোন দাতা 'দান ক্রিয়া'র পূর্ব থেকেই অবগত হতে পারেন । তবু বলা যেতে পারে যে ঐ ফলের আশায় নয় বরং গ্রহীতার প্রয়োজনের নিরসনেই একজন দাতার এক্ষেত্রে 'দান' করা উচিৎ । যা তার জাগতিক বন্ধনের সূচনা করবে না । এইরূপ উত্তরের সূত্র ধরেই পূর্বে উত্থাপিত দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে , 'দান ক্রিয়া' সর্বদাই নিষ্কামভাবে সম্পাদিত হওয়া উচিৎ , যা পরবর্তীতে ফলজনক হলেও তদ্‌জন্য দাতাগণের কোন জাগতিক বন্ধনের সূচনা হয় না । কিন্তু বিপরীত দিক থেকে যদি ফলের আশায় কোন দাতা দান করে থাকেন , তবে কোন বিষয় দান জন্য শাস্ত্র নির্ধারিত 'দান জন্য ফল' তাঁর জন্য পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট হলেও এক্ষেত্রে তাঁর নিজ ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ রূপে সিদ্ধ হয় কিনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ । আর যেসকল গ্রহীতা এইরূপে ফলের আশায় 'দান' গ্রহণ করেন তাঁদের নিরুৎসাহিত করার জন্য সংহিতায় 'দান জন্য প্রসিদ্ধ পাত্র' বা 'সম্পূর্ণ পাত্র'গণের নিজ ইচ্ছানুসারে প্রতিগ্রহ না করাকে অত্যন্ত প্রসংশনীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।

'শ্রাদ্ধ দান' :

উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় 'শ্রাদ্ধ দান' বিষয়েও প্রভূত আলোচনা ও বিধির উল্লেখ পাওয়া যায় । যেমন, এবিষয়ে প্রথমেই সংহিতায় নির্দেশ করা হয়েছে , কোন 'শ্রাদ্ধ দান' প্রক্রিয়া কাদের দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে । উত্তরাধিকার সূত্রানুসারে যারা উত্তরসূরী তাদের অতিরিক্ত যাঁরা শাস্ত্রানুমোদিত ব্যক্তি যেমন - মাতৃকূলের জন্য কোন ব্যক্তি তাঁর মায়ের বাবার জন্য এই ক্রিয়া করতে পারেন , জামাতা তার শ্বশুরমশাইয়ের জন্য সম্পন্ন করতে পারেন । এছাড়াও যাদের বেদ জ্ঞান আছে , ব্রহ্ম জ্ঞানে জ্ঞানী যাঁরা, যেসকল ব্যক্তি ভালো পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন । এঁরা প্রত্যেকেই শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন । আবার কোন কোন ব্যক্তি এই ক্রিয়ার জন্য শাস্ত্রানুসারে প্রসিদ্ধ নন সেই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে, যেসকল ব্যক্তির কোন শারীরিক অথবা ইন্দ্রিয় বৈকল্য আছে, কিংবা যাদের একটি অঙ্গ অতিরিক্ত, যাঁরা কোন দূরারোগ্য ছোঁয়াচে ব্যাধি যেমন - কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন তারা কেউই এই ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য যোগ্য ব্যক্তি নন। এবিষয়ে আরও নির্দেশ করা হয়েছে, যেসকল ব্যক্তি বিধবা মা , যিনি পুনরায় বিবাহ করেছেন সেই মায়ের সন্তান তিনিও যোগ্য নন । আরও বলা হয়েছে, যে সকল ব্যক্তির নখ এবং দাঁত অপরিস্কার, , আবার যে ব্যক্তি 'বিদ্যা দানে'র বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করেন, কিংবা যে ব্যক্তি তাঁর প্রিয়জন কিংবা বন্ধু স্থানীয় কাউকে আহত করেছেন

এরা কেউই শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য যোগ্য আধিকারিক নন ।[২০] শ্রাদ্ধ দান বিধি বিষয়ে বিশেষ ভাবে 'পিন্ডদানে'র কথা নির্দেশিত হয়েছে । দাতাগণ এবিষয়ে প্রথমেই ব্রাহ্মণ ব্যক্তি বর্গের বিধি নির্দেশ অনুসরণ করবেন । আর ব্রাহ্মণ ব্যক্তিবর্গ এবিষয়ে দাতাগণের দ্বারা শাস্ত্রনির্দেশানুসারে কর্ত্তব্য - কর্মের সম্পাদনা করাবেন। প্রেতলোকে গত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে 'শ্রাদ্ধ দান' প্রক্রিয়ায় দাতা অবশ্যই 'হবিষ্যান্ন দান' করবেন, শাস্ত্র নির্দিষ্ট মন্ত্রচারণার মধ্যে দিয়ে । তারপরে তাঁদের উদ্দেশ্যে 'জল দান' করবেন ।[২১] শেষতঃ সিদ্ধ অন্নের সঙ্গে তিল বীজের মিশ্রণে একটি প্রেতলোকে গত নিজ আত্মীয় বা ব্যক্তির উদ্দেশ্যে একটি করে খাবারের গোলা বা মন্ড দক্ষিণ দিকে দান করবেন । শাস্ত্রমতে এই প্রক্রিয়াটিই 'পিন্ড দান' নামে প্রসিদ্ধ । সবশেষে ব্রাহ্মণের অনুমতি নিয়ে প্রেতাত্মার মুখের শুদ্ধিকরণের জন্য 'জল দান' করবেন । হারীত সংহিতানুসারে 'শ্রাদ্ধ দান'বিধি আলোচনা প্রসঙ্গে বাণপ্রস্থ আশ্রমের পর কোন ব্যক্তি যখন পরবর্তী সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করছেন তার জন্য তাকে তার পূর্ব জীবনের যাবতীয় বন্ধন ছিন্ন করে নিজের জন্যে নিজেকেই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে । তবে তারও আগে তার সকল আত্মীয় - স্বজনগণের উদ্দেশ্যেও নির্দিষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক উক্ত কর্ত্তব্যের পালনের জন্য যথাবিধ বিষয়ের দান করতে হবে ।

'শ্রাদ্ধ দান' ও সমাজ চিত্র :

সংহিতানুসারে যেভাবে শ্রাদ্ধ দান বিধি বিষয় আলোচিত হয়েছে , তাতে সেই সময়ে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার যে চিত্র মেলে সেখানে ধর্মীয় সদাচারের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হলেও সামাজিক ভাবনার অগ্রগতি ছিলনা । যেমন দেখা যায় - নিয়ম নিষ্ঠা পূর্ব্বক 'শ্রাদ্ধ দান' সহ অন্যান্য দানাদি ক্রিয়ার নির্দেশ যেমন আছে, তেমনি আছে কিছু সীমিত মনোভাবনার অবস্থান যা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কুসংস্কার বলে উল্লিখিত হলেও বিজ্ঞানের অগ্রগতির অভাবে সেই সময়ে মানুষের মনে বদ্ধমূল রূপেই প্রোথিত ছিল । যেমন - যেসকল ব্যক্তির ইন্দ্রিয় কিংবা শারীরিক বৈকল্য তাঁরা যেমন 'শ্রাদ্ধ দানে'র জন্য যোগ্যাধিকারী ছিলেন না তেমনি যাঁরা কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁরাও সমাজে এই ক্রিয়ার অধিকারী ছিলেন না । বলা বাহুল্য যে, উল্লিখিত বৈকল্যের প্রতিবন্ধকতা তো যেকোন কারণেই যেমন, জন্ম সূত্রে অথবা কোন দুর্ঘটনার কারণেও তো হতে পারে ; উক্ত নির্দেশে কারণ জনিত কোন ব্যতিক্রমের কথাই স্বীকার করা হয়নি । সুতরাং একথা বলা যায় যে, উভয় ক্ষেত্রেই

---

২০ . *যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা,* ১। ২২২-২২৪
২১ . ঐ, ১। ২৪০

সমাজে এরা বিচ্ছিন্ন বলেই অভিহিত হতেন । শুধু তাই নয় বিধবা বিবাহ ব্যবস্থার বর্তমান আইনি স্বীকৃতি থাকলেও এই প্রথা সেই সমাজে নিন্দনীয়ই ছিল, তাই এই নারীর পুত্র সন্তান শাস্ত্রানুসারে 'শ্রাদ্ধ দানে'র যোগ্য অধিকারী ছিলেন না । আরও উল্লেখ্য যে, প্রিয় জনকে অথবা আত্মীয় - স্বজনকে আঘাত করেছেন এমন ব্যক্তি যদি 'শ্রাদ্ধ দান' ক্রিয়ার জন্য যোগ্য ব্যক্তি রূপে মনোনীত না হন তবে সংহিতানুসারে স্বধর্ম জনিত কর্ত্তব্য - কর্ম পালনের ব্যাখ্যা কীভাবে প্রদান করা হবে ? যেমন, এই প্রসঙ্গে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পান্ডব এবং কৌরব পক্ষের যুদ্ধের ব্যাখ্যা কীভাবে সংহিতায় প্রদত্ত হবে সেই প্রশ্ন থেকেই যায় । তবে এমন নয় যে, সংহিতায় নির্দেশিত উক্ত বিধিগুলি সবকটিতেই সমাজ ব্যবস্থায় কেবল নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে বরং ক্ষেত্র বিশেষে কিছু বিধির সদর্থক দিকেরও উল্লেখ পাওয়া যায়, যখন দেখা যায় এইরূপ 'দানাদি ক্রিয়া' সম্পন্ন করার জন্য ব্যক্তিকে তার প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধির অনুসরণসহ শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গ ইত্যাদির শুদ্ধিকরণের উপর গুরুত্ব প্রদান করার নির্দেশ করা হচ্ছে । আরও বলা যায় ধর্মীয় সদাচারের গুরুত্ব যে কেবল ধর্মীয় গোঁড়ামির ক্ষেত্রই প্রস্তুত করে এমন নয় , বরং ক্ষেত্র বিশেষে এর প্রভাব কিংবা ধর্মীয় সদাচার পালন না করার জন্য যে শাস্তি ব্যবস্থার নির্দেশ হয়েছে তাও মানুষকে কোন অন্যায় কর্ম করা থেকে বিরত রাখে ।

তথ্যসূত্র :

- Dutt Manmath Nath (Translated By), *ATRI SAMHITA*, *THE DHARAM SHASTRA HINDU RELIGIOUS CODES , Vol II*, 1979, Cosmo Publications , New Delhi , India.
- Dutt Manmath Nath (Translated By), *HARITA SAMHITA*, 1906, Published By- Keshub Academy, calcutta , India.
- Dutt Manmath Nath (Translated By), *US'ANA SAMHITA,* 1906, Published By- Keshub Academy, calcutta , India.
- Dutt Manmath Nath (Translated By), *VISHNU SAMHITA, THE DHARAM SHASTRA HINDU RELIGIOUS CODES , Vol IV*, 1979, Cosmo Publications , New Delhi , India.
- Dutt Manmath Nath (Translated By), *VYASA SAMHITA, THE DHARAM SHASTRA HINDU RELIGIOUS CODES , Vol III*, 1979, Cosmo Publications , New Delhi , India.
- Dutt Manmath Nath (Translated By), *YA'JNAWALKYA SAMHITA,* 1906, Published By - Keshub Academy, calcutta , India.
- Maganlal, A. Buch , *THE PRINCIPLES OF HINDU ETHICS ,* 1921, Published By- Kala Prakashan , Delhi, India .

উপনিষদে দান

প্রাচীন ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনা ও ধর্ম - নীতিবোধের যাত্রা শুরু হয়েছে বৈদিক সাহিত্যের ক্রমবিকাশের মধ্যে দিয়ে তার শেষ পর্ব উপনিষদ । এই উপনিষদ অংশেই বৈদিক সাহিত্য তথা চিন্তাভাবনার পূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হয় । বৈদিক সাহিত্যের অন্যতম বিভাগ উপনিষদের বিভিন্ন প্রকারের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাদের মূলতঃ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় , যেমন - প্রথমতঃ গদ্যাকারে রচিত উপনিষদ - যেমন - ঐতরেয় উপনিষদ, কৌষিতকী উপনিষদ, তৈত্তিরীয় উপনিষদ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ছান্দোগ্য উপনিষদ, কেনোপনিষদ। দ্বিতীয়তঃ পদ্যাকারে রচিত উপনিষদ - কঠোপনিষদ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ , ঈশোপনিষদ , মুণ্ডক উপনিষদ এবং মহানারায়ণ উপনিষদ । তৃতীয়তঃ গদ্য এবং পদ্যাকারে বৌদ্ধোত্তর কালে রচিত ত্রিবিধ উপনিষদ, যেমন- প্রশ্নোপনিষদ, মাণ্ডুক্য উপনিষদ, এবং মৈত্রায়ণীয় উপনিষদ । চতুর্থ শ্রেণীতে রয়েছে বুদ্ধ পরবর্তী কালে রচিত অসংখ্য উপনিষদ । এই সকল উপনিষদগুলি বেদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত নয় এবং যাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্মতত্ত্বও নয় বরং নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মতামতের প্রতিষ্ঠা । যেমন - শাক্ত , বৈষ্ণব প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক উপনিষদ । মূল উপনিষদের বিভাগ কতগুলি সেই বিষয়ে মত পার্থক্যও পাওয়া যায় । এই প্রসঙ্গে দেখা যায়, ‘অদ্বৈতবেদান্তী শঙ্করাচার্য বৈদিক উপনিষদের যে তালিকা করেছেন তাতে প্রশ্নোপনিষদ, মুণ্ডক উপনিষদ, মাণ্ডুক্য উপনিষদ, কেনোপনিষদ, ছান্দোগ্য উপনিষদ, ঈশোপনিষদ , বৃহদারণ্যক উপনিষদ, কঠোপনিষদ, তৈত্তিরীয় উপনিষদ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ , ঐতরেয় উপনিষদ এবং কৌষীতকি উপনিষদ, এই মোট বারোটি উপনিষদেরই উল্লেখ পাওয়া যায় ।’ [১] আবার কোথাও বা উল্লিখিত হয়েছে, ‘অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, শংকরাচার্য’ তাঁর বিভিন্ন ভাষ্যে যতগুলি উপনিষদের বচন উদ্ধৃত করেছেন তার সংখ্যা ছিল চৌদ্দ ।’ [২] তবে উপনিষদের সংখ্যা বিষয়ে মত পার্থক্য থাকলেও এর মূল আলোচ্য বিষয় যে ব্রহ্মতত্ত্ব সেই বিষয়ে অধিকাংশ মতেরই সমর্থন পাওয়া যায় । অধিকাংশ কারণ, শ্রেণীগতভাবে উপনিষদের উল্লিখিত প্রকারের মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীর কিছু উপনিষদে যে ব্রহ্মতত্ত্ব নয় বরং নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মতের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে একথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে । ব্রহ্মতত্ত্ববাদী উপনিষদের মূল আলোচ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব । কারণ এইসকল উপনিষদ অনুসারে আত্মাই ব্রহ্ম । তাই আত্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান হল ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা । অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় সমূহের অধিকাংশেরই মূল ভিত্তি হল এই আত্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান ; যাকে উপলব্ধি

---

১ . *প্রাক্ - কথন,* উপনিষদ সমগ্র , কালিকানন্দ অবধূত (সম্পাদিত) , পৃ : ২২

২ . *‘আলোচ্য উপনিষদের নির্বাচন’, উপনিষদের দর্শন* , হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উপনিষদ* (অখন্ড সংস্করণ) অতুল চন্দ্র সেন (অনুবাদ ও সম্পাদনা) পৃ : ২১

করাই হল মনুষ্য জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য । উপনিষদ অনুসারে এইরূপ পরম লক্ষ্য লাভের অন্যতম সহায়ক হল ‘দান ক্রিয়া ’। সেই উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন উপনিষদে দান বিষয়ে বহু উল্লেখ, বর্ণনা ও নির্দেশ হয়েছে । উক্ত সকল বর্ণনা ও আলোচনার মধ্যে তিনটি বিষয়ের দান আলোচনা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রূপে উল্লিখিতও হয়েছে, যেমন - বিদ্যাদান বা শিক্ষাদান এবং তার প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতা , আত্ম -তত্ত্ব জ্ঞান বা ব্রহ্ম জ্ঞান দান এবং অন্ন দান । তাই ‘দান’ বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনে উল্লিখিত তিনটি বিভাগ সম্বন্ধে আমি সকল উপনিষদের মধ্যে কতকগুলি উপনিষদে বর্ণিত এই সকল বিভাগ বিষয়ক বর্ণনা ও নির্দেশের অনুসরণপূর্ব্বক তার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি । এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই তৈত্তিরীয় উপনিষদে বর্ণিত শিক্ষাদান - এর উল্লেখ করা যায়।

শিক্ষাদান :

তৈত্তিরীয় উপনিষদের মূল লক্ষ্য হল আত্মজ্ঞানের স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হওয়া । এই উপনিষদ কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত । অপরাপর অংশগুলির তুলনায় উপনিষদের এই অংশে দান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পরিলক্ষিত হয় । তৈত্তিরীয় উপনিষদের মোট তিনটি বল্লী - শিক্ষাবল্লী, ব্রহ্মবল্লী এবং ভৃগুবল্লী । এর শিক্ষাবল্লী অংশের মোট বারটি অনুবাক আছে। এই বারটি অনুবাকের মধ্যে নবম থেকে একাদশ অনুবাকের মধ্যে ‘শিক্ষাদান’ বিষয়ে বহু আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। এই বিষয়ে একাদশ অনুবাক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ । উপনিষদের এই ভাগে ‘দান’ বিষয়ক যেসকল তথ্য পাওয়া যায় তার বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সেগুলি আলোচিত হয়েছে পুরাকালে প্রচলিত আশ্রমব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে । কিংবা আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে, তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় যে চতুরাশ্রম প্রথা প্রচলিত ছিল, তার মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ মূলতঃ ব্রহ্মচর্যাশ্রম ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে । এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্র বা শিষ্যের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হতো গুরুগৃহে। শিষ্য তার গুরুগৃহে বসবাস করে গুরুর কাছ থেকে নিজেদের উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতেন । এই শিক্ষাকালীন পরিসরে গুরু এবং তাঁর পত্নীকে পিতৃ - মাতৃ জ্ঞানে সেবা করতেন । তাঁদের পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপচার ও উপাদান সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন, যাতে পরিবারের বিভিন্ন প্রয়োজন সাধিত হতে পারে । শিক্ষাকালে গুরু তাঁর শিষ্যদের সেই সকল শিক্ষা প্রদান করতেন যাতে তাদের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সকল প্রয়োজন সাধিত হয় এবং তার মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিত্বের যথাযথ ও পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয় । তারা যেন এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠতে পারেন যাতে ভবিষ্যতে যেকোন রূপ পরিস্থিতিতে তাদের নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও দক্ষতায় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মতো সমর্থ হয়ে উঠতে পারেন । শিক্ষান্তে গুরু তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে

যেসকল উপদেশ দিতেন, সেই সকল উপদেশের মধ্যে দান বিষয়ক উপদেশ ছিল অন্যতম । সবশেষে উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করে গুরুর আশির্বাদ সহ তাঁর গৃহ থেকে বিদায় নিয়ে শিষ্যগণ তাদের জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে প্রবেশ করতেন । এই প্রসঙ্গে নবম অনুবাকে বলা হয়েছে যে, গুরু বা আচার্য্য তাঁর শিষ্যের উদ্দেশ্যে স্বাধ্যায় এবং প্রবচনের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন । ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে শিক্ষা লাভ শেষ করে যখন নিজের বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন সেই সময়ে অর্থাৎ শিক্ষার সমাবর্তনে আচার্য তাঁর শিষ্যের জন্য কতকগুলি উপদেশ প্রদান করছেন, যা একসঙ্গে 'শিক্ষা - দীক্ষা' [৩] নামেও অভিহিত হয়েছে । এই শেষ দিনে গুরু তাঁর শিষ্যের জন্য যেসকল উপদেশ দান করছেন তা শিষ্যের কাছে তার জীবনে সর্বদা আচরণীয় এমন পরম 'শিক্ষা দান' বলেই স্বীকৃত হবে । আচার্য্য তাঁর শিষ্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, শিক্ষার সমাপান্তে শিষ্যকে আচার্য্যের প্রিয় বা অভীপ্সিত দক্ষিণা প্রদান করতে হবে । গৃহে ফিরে গিয়ে তাঁকে সংসারী ধর্মের পালন করতে হবে । তাঁর সন্তান সন্ততি ধারার অবিচ্ছিন্নতা সে বজায় রাখবে এবং নিজের গার্হস্থ্য জীবনে অর্থোন্নতি এবং আত্মরক্ষার্থে আচরণীয় যেকোন কর্মেরই সে সাধন করবে । তবে এই সকল কর্ত্তব্য সাধনে কখনোই সে তাঁর সত্য ধর্ম থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে না । শেষতঃ সে কখনোই বেদের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করবে না , বরং সর্বদাই এর অনুসারী হবে । এই প্রসঙ্গে আচার্য্য তাঁর উপদেশে শিষ্যদের প্রতি সত্য , ধর্ম এবং স্বাধ্যায় বিষয়ে বিশেষ উপদেশ প্রদান করতেন । [৪] শিষ্যদের প্রতি আচার্য্য তাঁর এইরূপ উপদেশ বাক্যের মধ্যে দিয়ে তাদের পরবর্তী জীবনের ধর্ম ও কর্ত্তব্য - কর্ম বিষয়ে অবহিত করতেন । এই প্রসঙ্গে আচার্য্যের উপদেশ বাক্যের তাৎপর্য্য - বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উপদেশ বাক্যের প্রথম অংশ হল , ''সত্যং বদ' - অর্থাৎ সত্য কথা বল । শিষ্যগণ সদা সর্বদা সত্য কথা বলবে । কারণ প্রকৃত সত্যের স্বরূপ বা নিজ আত্মার সাক্ষাৎ করতে হলে সত্য মার্গ অনুসরণ করা ভিন্ন কোন পথ নেই । তাই সদা সর্বদা সত্য কথা বলাই শ্রেয় । কিন্তু যদি এমন হয় যে, পরিস্থিতি বিশেষে সত্য অপ্রিয় তবে সেই বিষয়ে কোন কথাই না বলে মৌনতা অবলম্বন করা যেতে পারে । কিন্তু মিথ্যাচার কখনই নয় । আচার্য নির্দেশিত দ্বিতীয় উপদেশ ছিল, ' 'ধর্মং চর ' অর্থাৎ শিষ্য সেই সকল কর্মই সম্পাদন করবে, যা তার করা উচিৎ বা যা শাস্ত্রানুসারে তার ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য - কর্ম ।' উচিৎ কর্মের কৌতুহল ব্যাখ্যায় গুরুর মতানুসারে বলা যায় যে, যেসকল কর্ম শিষ্যের ধর্ম বা স্বধর্ম হবে কেবল সেগুলিরই পালন করবে তারা । শিষ্যগণ নিজেদের ধর্ম ও কর্তব্য কর্ম সম্পর্কে শাস্ত্রীয় নির্দেশ থেকে অবগত হতে পারবে । আর যদি এবিষয়ে কোন শাস্ত্রীয় নির্দেশের উল্লেখ না থাকে তবে তারা তাদের অন্তর বা বিবেক নির্দেশিত কর্তব্য কর্মের সাধন করবে । যাতে তাদের সমাজব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধিত হয় । বলা বাহুল্য

---

৩. *তৈত্তিরীয় উপনিষদ,* শিক্ষাবল্লী
৪. ঐ, ১।১১।১ ।

এপ্রসঙ্গে আচার্য্যের নির্দেশ চতুর্বর্গ পুরুষার্থের মধ্যে প্রথম প্রকার অর্থাৎ ধর্মমার্গ দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল। শিষ্যগণের প্রতি গুরুর তৃতীয় নির্দেশ হল, ''স্বাধ্যায় মা প্রমদ ঃ ' - এর আক্ষরিক অর্থ হল শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা থেকে কখনও বিরত হয়ো না ।' পরবর্তী গার্হস্থ্য আশ্রমে জাগতিক বা ব্যবহারিক জীবন-যাপন প্রসঙ্গে গুরু তাঁর পরবর্তী নির্দেশে শিষ্যসকলকে একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে, তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি বংশের সন্তান, তাই তাঁদের বংশধারা যাতে অক্ষুণ্ন থাকে সেইরূপ গার্হস্থ্য আশ্রম বিধি এর পরবর্তী পর্যায়ে তারা প্রত্যেকেই যথাপূর্ব্বক পালন করবে । তাই শিষ্যদের প্রতি গুরুর নির্দেশ, 'প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ' - বংশধারা যাতে অক্ষুণ্ন থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখো ।'[৫] শিক্ষান্তে গুরুগৃহ থেকে তারা প্রত্যেকেই ফিরে যাবে আপন আপন গৃহে এবং ধর্মসম্মত মার্গে সংসার ধর্ম পালন করবে । তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই অনুবাকে দেখা যায় যে, আচার্য্য তাঁর শিষ্যের কাছে পরম গুরু। তিনি তাঁর শিষ্যদের এবিষয়ে সতর্ক করছেন যে, প্রতিটি আশ্রম ব্যবস্থাতেই শাস্ত্র নির্ধারিত কর্ম - ব্যবস্থাই সর্বদা শ্রেষ্ঠ । তাই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে অভ্যস্ত শিষ্য গৃহস্থাশ্রমে ফিরে গিয়ে সংসারী জীবনের প্রতি মনোনিবেশ করবে, কারণ তখন তাই হবে তার কর্ত্তব্য - কর্ম বা পরম - ধর্ম । আচার্য্য নির্দেশিত উপদেশ বাক্যগুলির ব্যাখ্যা করলে একথা উপলব্ধ হয় যে, তিনি প্রতিমুহূর্তেই তাঁর শিষ্যদের একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, তাঁরা যেন তাঁদের ব্যবহারিক কিংবা আধ্যাত্মিক জীবনের যেকোন কর্মই সাধন করার সময় ধর্মমার্গের যথাযথ অনুসরণ করে । তা সে সাংসারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থোপার্জন থেকে শুরু করে যেকোন কর্তব্য কর্মই সম্পাদন করুক না কেন , তা যেন অবশ্যই ধর্মমার্গে সাধিত হয় । জীবনের সকল স্তরে স্থিত হয়ে শিষ্যদের প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত পরিমাণ অন্ন বা খাদ্য, ধন বা অর্থ এবং যশ বা খ্যাতি অর্জন করতে হবে । তবে এই সকল কর্ত্তব্য সাধনে শিষ্যদের অবশ্যরূপে সর্বদাই কুশল বা যথোচিত অর্থাৎ ধর্মানুসারী কর্ত্তব্য কর্মের সম্পাদন করতে হবে । এইরূপ ধর্মানুসারী কুশল কর্ম যে তাদের জীবনে পরম শ্রেয় লাভের উপায় এবং তাদের ব্যক্তি জীবনের উন্নতির সহায়ক হবে তেমনই তা একইসঙ্গে তাদের সমাজব্যবস্থা, এবং সমাজে বসবাসকারী সকলের হিতসাধক ও কল্যাণকারী হবে । বৈদিক সাহিত্যের পরিসরে শিক্ষার সমাপান্তে শিষ্যদের উদ্দেশ্যে আচার্য্যের এইরূপ 'শিক্ষাদান' তাদের জীবনে পরম দানেরই সমতুল বলে পরিগণিত হয়েছে । যা শিক্ষার্থীকে সর্বদাই পরম শ্রেয়'র পথে দিক দর্শন করবে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শিষ্যদের প্রতি আচার্য্যের প্রতিটি উপদেশেই যেভাবে বারংবার 'ধর্ম' বিষয়ে উল্লেখ হয়েছে ও তার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে তার ভিত্তিতেই বলা যায় যে, ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত চতুর্বর্গ পুরুষার্থের মধ্যে প্রথম পুরুষার্থরূপে 'ধর্ম' তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবস্থানের দাবী রাখতো ।

---

৫. *তৈত্তিরীয় উপনিষদ,* ১।১১।১

দান বিষয়ক বিধি :

আচার্য্য তাঁর শিষ্যের প্রতি শুভাশুভ কর্ম এবং অতিথি সৎকার বিষয়ে যেসকল উপদেশ প্রদান করেছেন তার মধ্যে দিয়েও তৈত্তিরীয় উপনিষদে 'দান বিধি'র উল্লেখ পাওয়া যায় । যেমন - আচার্য্য তাঁর শিষ্যের উদ্দেশ্যে বলেছেন , শিষ্যকে সর্বদাই শুভ কর্মের আচরণ করতে হবে । কখনই যেন সে অনুচিত কর্মের অনুসরণ না করে । এই প্রসঙ্গে আচার্য্য একথাও নির্দেশ করেছেন যে শিষ্য যেন সর্বদাই আচার্য্যের নির্দেশের অনুসারী হন, কর্মের নয় । কারণ কাম ও ক্রোধের বশে কখনও কখনও আচার্য্যের দ্বারা অনুচিত কর্ম সম্পাদিত হতে পারে । তাই শিষ্য সর্বদাই আচার্য্যের উপদেশেরই অনুসারী হবে । উল্লেখ্য যে শিষ্যদের প্রতি আচার্য্যের পূর্বোক্ত উপদেশগুলিতে গৃহী জীবন যাপনের জন্য ধর্মমূলক নানারূপ কর্তব্য কর্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদানের পর 'দান' বিষয়ক আবশ্যিক বিধি সকলের উল্লেখ হয়েছে এর পরবর্তী নির্দেশে । যেখানে আচার্য্য তাঁর শিষ্যদের প্রতি 'দান বিধি' বিষয়ে উপদেশ প্রসঙ্গে বলেছেন, - '' আচার্যায় প্রিয়ং ধনম্ আহৃত্য ' - আচার্য্যকে তাঁর পছন্দ ও প্রয়োজন মতো জিনিস দক্ষিণা স্বরূপ দাও । আচার্য্য তোমাকে প্রভূত জ্ঞান দান করেছেন । এখন তাঁর প্রতি তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সময় । শিষ্যগণ তাঁদের সামর্থ্য অনুসারে আচার্য্যের প্রয়োজন মতো খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ ইত্যাদি প্রদান করবেন । তবে শিক্ষান্তে আচার্য্যের উদ্দেশ্যে কিছু দক্ষিণা দিয়ে তার সকল ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া কোন শিষ্যের পক্ষেই সম্ভব নয়, তাই সেই বিষয়ে কোন শিষ্যই মনে মনে অথবা বাহ্যিকভাবে কখনও অহংকার প্রকাশ করবে না । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, উপনিষদে বর্ণিত এই দান ব্যবস্থাটি হিন্দু ধর্মে উল্লিখিত 'ঋণ' এর ধারণার সঙ্গে ওতোপ্রোত সম্পর্কে আবদ্ধ । এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, বৈদিক সাহিত্য ও সভ্যতায় 'ঋণ' এই বিষয়টি ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালনের দায়বদ্ধতা এই অর্থেই গৃহীত হয়েছে । বৈদিক ও ঔপনিষদিক সাহিত্য অনুসারে তদানীন্তন সমাজব্যবস্থায় মানুষ তার দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় নির্দিষ্ট কতকগুলি কর্ত্তব্য তথা দায়িত্ব পালনে দায়বদ্ধ ছিল। মানুষের এই দায়বদ্ধতা ছিল যেমন ঈশ্বরের প্রতি, তাঁদের জন্মানুসারে সংশ্লিষ্ট ধর্মের প্রতি তেমনি ছিল সমাজের প্রতি, সমাজে বসবাসকারী অপরাপর মানুষ এবং অবশ্যই অন্যান্য জীবের প্রতি । মানুষের এই কর্ত্তব্যতা নির্ধারিত হত তাঁদের জন্ম সূত্রেই । আর সেকারণেই তদানীন্তন সমাজে প্রচলিত বর্ণব্যবস্থা ও আশ্রম ব্যবস্থাতেও ছিল এইরূপ রীতির প্রয়োগ ও ব্যবহার । মানুষের জীবন ছিল পূর্ণ - দায়িত্বময় । বর্ণানুসারে শাস্ত্রনির্ধারিত জীবনের সকল দায়িত্ব নিষ্ঠাভাবে পালন করাই ছিল উত্তম মানের ব্যক্তিদের পরিচয়। এইরূপ দায়বদ্ধতা বা কর্ত্তব্য অর্থে হিন্দুশাস্ত্রে 'ঋণ' - এর ধারণার উল্লেখ হয়েছে এবং এই 'ঋণ' - এর প্রকাররূপে 'দেব ঋণ', 'ঋষি ঋণ' এবং 'পিতৃ ঋণ' এই ত্রিবিধ ঋণ সহ 'ভূত ঋণ' এবং 'নৃ ঋণ'- এরও উল্লেখ হয়েছে । এই সকল ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য বলে শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে । উল্লিখিত এই সকল ঋণের প্রকারের মধ্যে শিষ্যগণ তাদের আচার্য্যের কাছে ঋষিঋণে ঋণী হন । আর

ঋষিঋণ থেকে মুক্তি লাভ করার একমাত্র উপায় হল শিক্ষান্তে আচার্য্যকে তাঁর প্রয়োজন মতো বিষয়ের দান করা। শিষ্যগণ গুরুগৃহে বসবাসকালীন পরিসরে গুরুর কাছ থেকে প্রভূত শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করেছেন তাতে তাঁরা গুরুর কাছে ঋণী হয়েছেন, তাই তার থেকে মুক্তি লাভের উপায় স্বরূপ সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্বক গুরুকে তাঁর প্রয়োজন মতো বিষয়ের দান ও দক্ষিণা প্রদান করে গুরুর মনোবাসনা ও প্রয়োজন পূরণ করবেন । এটিই হল গুরুর প্রতি শিষ্যের অন্যতম কর্তব্য । ব্যাখ্যা এইরূপ - ব্রহ্মচর্য্যকালীন পরিসরে শিক্ষালাভ করার সময় কোন শিষ্য তার আচার্য্যের জন্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিষয়ের সংস্থান ও সেবা অতিরিক্ত কিছুই প্রদান করতে পারেনা। অথচ শিক্ষার সমাপান্তে শিষ্যের কাছে তাঁর আচার্য্যের উদ্দেশ্যে শিষ্যের দক্ষিণা প্রদান হল তাকে প্রদত্ত শিক্ষার জন্যেই সাম্মানিক । তাই সকল শিষ্যের কাছেই তা অবশ্যই প্রদেয় । শুধু তাই নয়, এই নিয়মটি যাতে শিষ্যরা একইভাবে ভবিষ্যতেও অনুসরণ করে তারও একটি নির্দেশ করে বলা হয়েছে গৃহস্থাশ্রমে ফিরে গিয়ে যখনই শিষ্যরা এইভাবে কারুর দ্বারা উপকৃত হবেন তখন যেন তারা উপকারের ঋণ স্বীকার করে তার জন্য উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করে সেই ব্যক্তির কাছে নিজের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন । অন্যান্য সকল ঋণের মধ্যে দেব ঋণ থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য শিষ্যদের পূজার্চনা, হোম - যাগযজ্ঞ ও যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দানসহ নিজের বর্ণ অনুসারে শাস্ত্র নির্দিষ্ট ধর্ম ও কর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয় । আবার পরলোকগত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধে পিন্ডদান এবং তর্পনাদি পারলৌকিক ক্রিয়াসহ সুপুত্র উৎপাদন করে বংশ রক্ষা পূর্ব্বক 'পিতৃ ঋণ' থেকে এবং কাক ও অন্যান্য পক্ষীসহ মনুষ্যেতর জীব -জন্তুদের উদ্দেশ্যে আহার্য্য খাদ্য প্রদান করে 'ভূত ঋণ' থেকে মুক্তি লাভ করা যায় । শাস্ত্রানুসারে যথাপূর্ব্বক সম্মাননা ও মর্যাদা প্রদর্শনসহ অতিথি - সংস্কার 'নৃ ঋণ' এর দায়ভার থেকে মুক্তি লাভ করার উপায় । জীবনের পরম শ্রেয় বা মোক্ষলাভের সংকল্পে এই সকল ঋণ থেকে মুক্তি লাভ করা একান্ত কাম্য । উপনিষদানুসারে এইরূপ কাঙ্খিত মুক্তি লাভের পথে 'দান' ক্রিয়া হল অন্যতম সহায়ক হয় ।

দান ক্রিয়া শিষ্যরা কীভাবে সম্পন্ন করবেন সেই বিষয়ে আচার্য্যের উপদেশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অপরাপর ক্রিয়ার মতো শিষ্যের এই ক্রিয়াটিও চালিত হবে ধর্ম পথেই । শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হবে গুরুকে দানের জন্য সদিচ্ছা, শ্রদ্ধা, সম্মান, বিনয়ী মনোভাব । তাতেই শিষ্য প্রকৃত অর্থে কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠতে পারবে এবং এর ফলে যথাযথরূপে তাঁর আত্মতত্ত্বের বিকাশ হবে । তাই শিষ্যদের উদ্দেশ্যে আচার্য্য বলেছেন , 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্ । শ্রিয়া দেয়ম্ । হ্রিয়া দেয়ম্ । ভিয়া দেয়ম্ । সংবিদা দেয়ম্।'[৬] দান করার ক্ষেত্রে

---

৬. *তৈত্তিরীয় উপনিষদ,* ১।১১।৩

শিষ্যের প্রতি গুরুর প্রথম নির্দেশ - 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্' - শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করবে। দান করা বলতে যেহেতু বোঝায় কোন বিষয়ের প্রতি দাতার সকল স্বত্বাধিকারের ত্যাগ । তাই দান করার সময় দাতা অবশ্যই অহংবোধ বা অভিমান পরিত্যাগ করে গ্রহীতাকে তাঁর যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে অতি বিনয়ের সঙ্গে দান করবেন । কারণ শ্রদ্ধার সঙ্গে দান না করলে তদ্‌জন্য দাতার কোন পুণ্যফল সঞ্চিত হয় না । দান ক্রিয়ার সময় এমন কোন অহংবোধ দাতার মনে থাকা সমর্থনীয় নয় যে, তিনি কিছু দান করে গ্রহীতার কোন উপকার সাধন করছেন। কারণ তা যদি থাকে তাহলে আর একথা বলা যায় না যে, দাতা দানীয় দ্রব্যটি সম্পর্কে নিজের যাবতীয় স্বত্বাধিকার পরিত্যাগ করে দান করেছেন । ফলে দান ক্রিয়া যথাবিধি অনুসারে পূর্ণরূপে সাধিত হয় না । দান সম্পর্কে দ্বিতীয় নির্দেশে গুরু তাঁর শিষ্যদের প্রতি বলেছেন, 'শ্রিয়া দেয়ম্' । অর্থাৎ দাতা অবশ্যই গ্রহীতাকে তাঁর প্রয়োজন অনুসারে নিজের জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের মধ্যে যথাসম্ভব তাঁর প্রয়োজন অনুসারে দান করবেন । তবেই তা দাতার প্রকৃত দান হবে । বিষয়টি উপনিষদের এই অংশে একটু ভিন্ন রূপে এভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, শ্রিয়া শব্দের অর্থ হল সুন্দর । তাই দাতা যখন কোন কিছু কাউকে দেবেন তখন তাঁর হাতের ভঙ্গিমাকে হতে হবে এমন সুন্দর হবে যাতে গ্রহীতা তা গ্রহণ করতে আনন্দ পায় । অর্থাৎ দানের ভঙ্গিতে যেন বিনয় ও আন্তরিকতা প্রকাশ পায় । [৭] অর্থাৎ গ্রহীতাকে দান করার সময় দাতা তার মনোভাব সম্পর্কে সর্বদাই সতর্ক থাকবেন । তা যেন পূর্ণরূপে আন্তরিকতা ও বিনয়ী মনোভাবের মেলবন্ধনে এমন ভাবে পরিবেশিত হয় যা গ্রহীতার মনে আনন্দ উৎপাদনে সমর্থ হয় । এই বিষয়টির প্রতি দাতা অবশ্যই যত্নবান হবেন । এই বিষয়ে গুরু তাঁর শিষ্যদের আরও বলেছেন , 'হ্রিয়া দেয়ম্ '।' হ্রিয়া' শব্দটির অর্থ হল লজ্জা , তবে উক্ত উপদেশটির মধ্যে দিয়ে গুরু একথা বলতে চাননি যে, দাতা দান করার সময় মনে মনে লজ্জিত হবেন । বরং উপদেশ বাক্যটির তাৎপর্য্য এই যে, দান করার সময় দাতা মনে মনে এবিষয়ে সংশয়ী হবেন যে দানীয় বিষয়টি গ্রহীতার প্রয়োজন সাধনে সমর্থ হবে তো ? যদি তা না হয় তবে তা গ্রহীতার কোন প্রকার প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে না । মনে মনে এইরূপ সংশয়ী হয়ে দাতা প্রথম থেকেই লজ্জা ও বিনয় সহ সকল অহং অভিমান পরিত্যাগ পূর্বক দান করবেন । [৮] আচার্য্য দান সম্পর্কে তাঁর পরবর্তী নির্দেশে শিষ্যদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছেন যে, 'ভিয়া দেয়ম্' - সভয়ে দান কর । গুরুর এইরূপ আদেশ দেখলে প্রশ্ন হতে পারে তবে কি দাতা দান করার সময় ভয়ে ভয়ে দান করবেন ? তাঁরা কি একথা ভেবে ভয়ে ভয়ে দান করবেন যে, গ্রহীতাকে তাঁর প্রয়োজন মতো উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ কিংবা তাঁর প্রয়োজনীয় কোন বিষয় বা দ্রব্য দান না করলে তার পাপ ফল সঞ্চিত হবে, তাই দান অবশ্যই করা উচিত ? প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, এবিষয়ে গুরুর

৭. *তৈত্তিরীয় উপনিষদ,* ১।১১।৩ সংগৃহীত *উপনিষদ (প্রথম ভাগ),* স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, পৃ : ৪৮৮
৮. ঐ, ১।১১।৩ , ঐ, পৃ : ৪৮৯

উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে, দাতা দান করার সময় যদি নিজ মনের অজ্ঞাতেও কোনভাবে অহংবোধের প্রকাশ করে ফেলেন তবে তা অবশ্যই গ্রহীতার মনোকষ্টের কারণ হবে । তাই দাতা অবশ্যই এবিষয়ে সাবধানী ও সতর্কিত থাকবেন । এক্ষেত্রে 'সভয়' শব্দটির দ্বারা যা বোঝানো হয়েছে তা হল , দাতা তাঁর দান ক্রিয়ার সময় গ্রহীতার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শনের বিষয়ে অবশ্যই সন্ত্রস্ত মনে যত্নবান হবেন । [৯] শেষতঃ শিষ্যগণের প্রতি গুরুর নির্দেশ , 'সংবিদা দেয়ম' - অর্থাৎ দাতা দান করার সময় একথা কোন ভাবেই মনে মনে পোষণ করবেন না যে , গ্রহীতাকে কোন একবার তার প্রয়োজন মতো বিষয়ের দান করার পর তাঁর আর কোন অধিক কিছু করণীয় নেই । এবং একবার দান করার পর দাতা ও গ্রহীতার সকল সম্পর্কের ও গ্রহীতার প্রতি দাতার যাবতীয় কর্তব্যের সমাপ্তি । বিষয়টি একবারেই এইরূপ নয় , বরং যেহেতু দান মানেই সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দান, তাই সুনির্দিষ্ট 'দান ক্রিয়া'- এর মধ্যে দিয়ে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে একটি নতুন সম্পর্কের সূচনা হয় । তাই দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের মধ্যেই যাতে গড়ে ওঠে সৌহার্দ্য ও প্রীতিপূর্ণ মনোভাব সেই বিষয়ে দাতা অবশ্যই প্রযত্নবান হবেন । [১০] এইরূপে দেখা যায় যে, উপনিষদের এই অংশে 'দান' প্রসঙ্গে শিষ্যের প্রতি গুরুর উপদেশের মধ্যে দিয়ে বারংবার একথাই ধ্বনিত হয়েছে যে, গ্রহীতার প্রতি দাতা অবশ্যই শ্রদ্ধাশীল ও বিনয়ী হবেন ।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের আলোচ্য পরিসরে বর্ণিত 'দান' ব্যবস্থায় একথা বিশেষ ভাবেই উল্লিখিত হয়েছে যে, হিন্দু সমাজে দানের অন্যতম শর্ত হল নিঃশর্ত দান । এক্ষেত্রে দানক্রিয়া প্রসঙ্গে দাতার মনোভাবই প্রধান । দাতার দান বিষয়ে যেন গ্রহীতা অতিরিক্ত অন্য কোন ব্যক্তি জানতে না পারেন, এইরূপ শর্ত যতদূর সম্ভব মান্য করে চলা । কারণ দান বিষয়ে দাতার লক্ষ্যই হবে নিঃশর্তে গ্রহীতাকে তার প্রয়োজন মতো বিষয়ের দান করে তার সাহায্য করা । তাই দাতাকে দান করতে ভালবাসতে হবে । গ্রহীতাদের অধিক পরিমাণে আরও উৎকৃষ্ট মানের দ্রব্য দিয়ে সাহায্য করতে না পারার জন্য সলজ্জ মনোভাবে তার জন্য সদা উদ্‌গ্রীব থাকবেন এবং এইকাজ তিনি অবশ্যই সকলের আগোচরেই সম্পন্ন করতে চেষ্টা করবেন এমনটিই নির্দেশিত হয়েছে । 'শিক্ষা বা বিদ্যা দান' বিষয়ে মুন্ডক উপনিষদানুসারেও দেখা যায়, আচার্য্য তাঁর শিষ্যের প্রতি 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের অর্থ অনুধাবনের উদ্দেশ করেছেন । মুন্ডক উপনিষদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল আমাদের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতাকে অক্ষুণ্ন রেখে জাগতিক বন্ধন জাত সকল অবিদ্যাকে দূর করে পরম সত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করা, অর্থাৎ অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের মহাবাক্য 'তত্ত্বমসি' - এর স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া । মুন্ডক উপনিষদে সরাসরি

---

৯. *তৈত্তিরীয় উপনিষদ্*, ১।১১।৩, ঐ, পৃ : ৪৮৯
১০. ঐ, ১।১১।৩ ,

কোন বিষয় বা দ্রব্য দান - এর আলোচনা পাওয়া না গেলেও, পুরাকালের ঋষি অঙ্গিরা ও তাঁর শিষ্য শৌনকের মধ্যে ব্রহ্ম জ্ঞান অর্জনের জন্য যেসকল কথোপকথন পাওয়া যায়, সেখানে 'শিক্ষাদান' কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋষি অঙ্গিরা তাঁর শিষ্যকে পার্থিব জ্ঞানের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সংযুক্তির শিক্ষা দিয়েছিলেন, যার মধ্যে দিয়ে পরম জ্ঞান লাভ করা যায় । পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যার মধ্যে বিভেদ নির্ণয় করা যায় ।[১১] তবে এইরূপ 'শিক্ষাদান' কেবলই ঋষি অঙ্গিরা কর্তৃক তাঁর শিষ্য শৌনকের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞান দান অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে,তদ্‌তিরিক্ত কোন অর্থে নয় ।

বিদ্যাদানের সার্থকতা :

আচার্য্য শিষ্যের শিক্ষার সমাপ্তিতে পরমাত্মা ব্রহ্মের কাছে যে প্রার্থনা মন্ত্রের উচ্চারণ করেছেন, তার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার যাতে সম্পূর্ণ সার্থকতা প্রকাশ পায় তার উল্লেখ পাওয়া যায় । পরমাত্মা ব্রহ্মের কাছে আচার্য্য তাঁর শিষ্য এবং নিজের, উভয়ের জন্যেই প্রার্থনা করেছেন যাতে তাঁরা দুজনেই সমানভাবে বিদ্যার ফল লাভে সমর্থ হন । তাঁরা উভয়েই যে বিদ্যার অধিকারী হয়েছেন ইতিমধ্যেই তা যেন তাঁদের দুজনকেই সমান শক্তিশালী ও তেজস্বী করে তুলতে পারে । তাঁরা যেন কখনোই পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন না হন । সবশেষে সকল বিষয়ে শান্তি কামনা করেছেন ।[১২] বলা বাহুল্য যে, পরম ব্রহ্মের কাছে আচার্য্যের এইরূপ প্রার্থনা যেন শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের এক প্রকার আদেশ এবং অনুশাসন । শিষ্য নিজেও যাতে পরবর্তী গৃহস্থাশ্রমে এইরূপ ধর্মীয় অনুশাসনেরই অনুসারী হয় তার নির্দেশ । গুরুজনদের প্রতি সে যাতে সর্বদাই বিনয়ী হয় এবং যাঁরা স্নেহভাজন তারাও যে তার সম শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী হতে পারে তার জন্য মানসিক অভ্যাসে স্থিত হওয়ার এক নির্দেশ । এবিষয়ে যেন তারা কখোনই পরস্পরের বিরোধী এবং বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন না হয় । সে বিষয়েও শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে যে প্রস্তুতি নিতে হবে এ যেন তারই অভ্যাস বা অনুশীলন করা । পরমাত্মার কাছে আচার্য্যের এইরূপ প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে শিষ্য তার ভবিষ্যতে চলার পথে এইরূপ ব্যবহারই যাতে সর্বদা অনুসরণ করে এ যেন তারই এক পদক্ষেপ । তৈত্তিরীয় উপনিষদেরই ব্রহ্মানন্দবল্লীতে 'বিদ্যা দানে'র সার্থকতা বিষয়ে সাধকের স্তর বিভাগের উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্যাদানের উপায় বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে 'কৌশল' এর উল্লেখ করা হয়েছে । আবার কোন কৌশল কীভাবে প্রয়োগ করা যাবে , সেই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে উপনিষদে ত্রিবিধ উপায়ের উল্লেখ করা হয়েছে , যেমন - ১) আণব , ২) শাক্ত এবং ৩) শাম্ভব । উপনিষদে এই উপায়গুলিকে

---

১১. *মুণ্ডক উপনিষদ* ১।১।৪
১২ . *তৈত্তিরীয় উপনিষদ,* ২।১।২

বেদান্তে উল্লিখিত ত্রিবিধ উপায় অর্থাৎ শ্রবণ, মনন এবং নির্দিধ্যসন এর সঙ্গে অভিন্ন মানের বলা হয়েছে। এইরূপ উপায় বিভাগের মধ্যে দিয়ে উপনিষদে 'সাধক' বা 'অন্তেবাসী' বা 'ব্রহ্মচারী'র উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠরূপ স্তর উল্লিখিত হয়েছে। উপনিষদ্ অনুসারে, যে সাধক বা ব্রহ্মচারীর সাধনা বা উপাসনার জন্য সব উপায়গুলিকেই প্রয়োগ করতে হয় তিনি হলেন কনিষ্ঠ সাধক। যিনি কেবল দুটির মধ্যে দিয়েই তাঁর সাধনা সম্পন্ন করতে সমর্থ হন তাকে বলা হয় মধ্যম মানের সাধক। আর যাঁর কেবল শ্রবণ মাত্রেই সিদ্ধি লাভ হয় তিনি হলেন উত্তম। যেমন 'নচিকেতা' হলেন উত্তম মানের সাধক।[১৩] আত্ম -তত্ত্ব জ্ঞান বা ব্রহ্ম জ্ঞান লাভে যিনি পথপদর্শক হতে পারেন। কঠোপনিষদে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরিলক্ষিত হয়।

আত্ম -তত্ত্ব জ্ঞান বা ব্রহ্ম জ্ঞান দান :

কঠোপনিষদ কৃষ্ণ যর্জুবেদের তৈত্তিরীয় অংশের অন্তর্গত। উপনিষদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এই অংশের আলোচ্য পরিসরে পরিলক্ষিত হয় আত্ম -তত্ত্ব জ্ঞান বা ব্রহ্ম জ্ঞান দান বিষয়ের আলোচনা। পুরাকালের রাজা বাজশ্রবসের পুত্র নচিকেতা ও মৃত্যুর অধিপতি যমরাজের কথোপকথন। উপনিষদের এই বিভাগে বর্ণিত হয়েছে পুরাকালের রাজা বাজশ্রবশের দান কাহিনী। সেখানে দেখা যায়, রাজা বাজশ্রবস দানশ্রেষ্ঠ ও দানবীর - এর যশ ও খ্যাতি অর্জন পূর্ব্বক মৃত্যুর পর স্বর্গীয় সুখ - সম্ভোগের আশায় 'বিশ্বজিৎ' নামে এক বিশাল যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। যজ্ঞের নিয়মানুসারে যজমান বা যজ্ঞের হোতা নিজ লক্ষ্য লাভের উদ্দেশ্যে যজ্ঞান্তে তাঁর সর্বস্ব দান করবেন। নিজ লক্ষ্য চরিতার্থ করার আশায় তাই রাজা বাজশ্রবশ তাঁর মনের একান্ত লক্ষ্যে কেবলই যন্ত্রবৎ দান করছিলেন, যা ছিল মূলতঃ 'দান ক্রিয়ার' নীতি বিরুদ্ধ। পিতার এইরূপ দান ক্রিয়ায় শাস্ত্র জ্ঞানী পুত্র নচিকেতা মনে মনে দুঃখী হয়ে একথা উপলব্ধি করলেন যে তাঁর পিতা এই দান ক্রিয়ার দ্বারা কখোনই নিজ লক্ষ্য লাভ করতে সমর্থ হবেন না। বরং যজ্ঞের নিয়মানুসারে সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান যথাপূর্ব্বক সম্পন্ন না করার জন্য তিনি মন্দ কর্ম ফলের অধিকারী হবেন। এইরূপ আশঙ্ক চিত্তে পুত্র নচিকেতা পিতাকে তাঁর অপকৃষ্টমূলক কর্মের দায়ভার থেকে মুক্ত করার জন্য উদ্দ্যত হন এবং সেই লক্ষ্যে তিনি নিজেকে বারংবার দানীয় দ্রব্য পিতার কাছে উল্লেখপূর্ব্বক তার গ্রহীতার কথা জানতে চান। বারংবার পুত্রের এইরুপ বিরক্তিকর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে পিতা বাজশ্রবস পুত্রের গ্রহীতা রূপে মৃত্যুর অধিপতি যমরাজের নাম উল্লেখ করেন। ফলতঃ পিতার বাক্যের সত্যতা রক্ষার দায় গ্রহণ করে পুত্র নচিকেতা যমরাজের গৃহে গিয়ে উপনীত হন। উভয়ের সাক্ষাতের পর

---

১৩. *তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ব্রহ্মানন্দবল্লী,* সংগৃহীত *উপনিষদ (প্রথম ভাগ),*স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, পৃ : ৬৫

তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে কথোপকথন শুরু হয়, যে আলোচনার মধ্যে দিয়ে 'আত্মতত্ত্ব'সহ জগতের অন্যান্য তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় ।[১৪]

কঠোপনিষদের আলোচ্য পরিসর উপস্থাপিত হয়েছে মূলতঃ দুটি ভাগে । প্রথম ভাগটিতে বর্ণিত হয়েছে, রাজা বাজশ্রবসের দানক্রিয়ানুষ্ঠান এবং সে প্রসঙ্গে পুত্র নচিকেতার পিতার জন্য আশংকা ও মনোকষ্ট । দ্বিতীয় ভাগে আলোচিত হয়েছে শাস্ত্র জ্ঞানী নচিকেতা ও মৃত্যুর অধিপতি যমরাজের নানা বিষয় সম্বন্ধে কথোপকথন যার মূল লক্ষ্য ছিল 'আত্মতত্ত্ব' জ্ঞানলাভ । প্রশ্ন হয় এর প্রথম ভাগে বর্ণিত বিষয়কে কেন্দ্র করে যে, কেন এইরূপে নচিকেতা তার পিতার দানক্রিয়া ও তদ্‌জনিত ফলাফল সম্বন্ধে সংশয়ী মনোভাব পোষণ করেছিলেন ? এবং কি প্রয়োজনেই বা পিতার কাছে তিনি নিজেকে বারংবার একটি দানীয় বিষয় রূপে উল্লেখ করেছিলেন ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে প্রথমেই তৈত্তিরীয় উপনিষদ অনুসারে 'দান' ক্রিয়ার স্বরূপ বা এর মূলভাবের উল্লেখ করে বলা যায় যে, 'দান বলতে বোঝায় যোগ্য ব্যক্তিকে উত্তম ও প্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়া । দাতা ত্যাগের মনোভাব নিয়ে দান করবেন । অপরের প্রয়োজনে নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু দান করার ক্ষেত্রে দাতা নিজে ত্যাগ স্বীকার করবেন । দানের সময়ে দাতা কিভাবে দিচ্ছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । দাতা বিনয় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে কেবলমাত্র তাঁর শ্রেষ্ঠ ধন দান করবেন ।'[১৫] অর্থাৎ প্রকৃত দাতা হবেন তিনিই যিনি অতি শ্রদ্ধা ও বিনয়পূর্ব্বক দানের মনোভাব সহ যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের সঙ্গে গ্রহীতার প্রয়োজন অনুসারে তাঁর নিজ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুটির যাবতীয় স্বত্বাধিকার চিরতরে ত্যাগ করে দান করবেন । কিন্তু কঠোপনিষদের প্রথম ভাগে বর্ণিত হয়েছে, দাতা রূপে বাজশ্রবস কেবলমাত্র সেইসকল বস্তুগুলিরই দান করছিলেন যেগুলি ছিল দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের কাছেই অপ্রয়োজনীয় । শুধু তাই নয়, দাতা রূপে বাজশ্রবসের মনে দান ক্রিয়া সম্বন্ধে গ্রহীতার প্রতি কোন রূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানের মনোভাবেরও স্থান ছিল না । বরং স্বর্গীয় সুখ লাভের আশায় তিনি এপ্রসঙ্গে কেবলই যন্ত্রবৎ চালিত হয়েছিলেন । তাই পূর্বোক্ত দুটি প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে বলা যায় যে, দাতা রূপে রাজা বাজশ্রবস 'দান ক্রিয়া' সংক্রান্ত নিয়মগুলির অবমাননা করেছেন । এইরূপ উপলব্ধির পরই শাস্ত্রজ্ঞানী নচিকেতা পিতাকে তাঁর কর্মজনিত প্রত্যবায় থেকে মুক্ত করার জন্যই নিজেকে বারংবার দানীয় বস্তু রূপে পিতার কাছে উল্লেখ করেছিলেন। যাতে করে তাকে দান করে পিতা দানক্রিয়ায় জীবনের সর্বস্ব ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ দান না করার প্রত্যবায় বা পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হন ।

---

১৪. কঠোপনিষদ, ১।১
১৫. ঐ, ১।১

বলা বাহুল্য যে, কঠোপনিষদ অনুসারে দান ক্রিয়া দাতার কর্তব্য কর্ম বলে বিবেচিত হলেও তা মূলতঃ চালিত হয়েছে পুণ্যার্জন ক্রিয়ার ভিত্তিতেই । দাতা নিয়ম অনুসারে যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান পূর্ব্বক দান ক্রিয়া সম্পাদন করবেন এবং তাতে তাঁর নিজ জীবনের পুণ্যফল সঞ্চিত হবে । এইরূপ পুণ্যফলের ভিত্তিতেই তাঁর সকাম কর্মফল বিনষ্ট হয় এবং তিনি বর্তমান জীবনের পরিসমাপ্তিতে পরলোকে বা স্বর্গলোকে অনাবিল স্বর্গীয় সুখ ও প্রভূত আনন্দের অধিকারী হন । সেক্ষেত্রে দান বিষয়ে কঠোপনিষদের প্রথম ভাগে প্রদত্ত বর্ণনার ভিত্তিতে আরও একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, যেখানে দাতা ভবিষ্যতে নিজের জন্য সুখলাভের কামনা করছেন সেখানে এই সংকল্পে কৃত কোন যজ্ঞে যজ্ঞকারী যজমানের জীবনের যথাসর্বস্ব দান করার বিশিষ্ট রীতি প্রচলনের কারণ কী ছিল ? সকাম এবং নিষ্কাম উভয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিত থেকে এই প্রশ্নের দুটি উত্তর পাওয়া যায় । সকাম দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে বলা যায় যে, এই ধরণের বিশিষ্ট রীতি ছিল মূলতঃ নিয়মভিত্তিক । অর্থাৎ যে যজ্ঞের জন্য যেসকল নিয়ম নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট হয় সেই যজ্ঞের সম্পাদনকারী যজমান অবশ্যই সেইসকল নিয়মেরই যথাযথ অনুসরণ করবেন, নিজ লক্ষ্য লাভের উদ্দেশ্যে । আবার নিষ্কামভাবে ঔপনিষদিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে উক্ত প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, এইরূপ যজ্ঞে যজমানকারীর যথাসর্বস্ব দানের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির জীবন্মুক্তি এবং বিদেহমুক্তি উভয় তত্ত্বই বর্ণিত হয়েছে । ব্যক্তি জাগতিক বন্ধনের জালে আবদ্ধ হয়ে বদ্ধাদশা প্রাপ্ত হলে অনিত্য সুখকেই নিজের জীবনের অনাবিল সুখরূপে উপলব্ধি করে, তাকে কামনা করে । সে জীবনের পরম সত্য লাভের পথ থেকে বিচ্যুত হয় । কারণ জীবের জীবনের চরম লক্ষ্য হল জীবনের মূল সত্যের উপলব্ধি বা আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার । যা কেবলমাত্র সম্ভব হতে পারে জাগতিক বন্ধনের উর্দ্ধে অবস্থানপূর্ব্বক জীবন্মুক্তি বা বিদেহ মুক্তি ঘটলে । যদি বলা হয় যে, একজন জীবন্মুক্ত পুরুষই এই সত্যের উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন, সেক্ষেত্রে ঐ নির্দিষ্ট যজ্ঞে প্রচলিত নিয়মের কারণের ব্যাখ্যায় বলতে হবে যে, দাতা তাঁর জাগতিক জীবনের সকল সম্পদ যেমন, তাঁর ধন সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, সাম্রাজ্য, যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি শ্রদ্ধা, সম্মান ও বিনয়ের সঙ্গে গ্রহীতার প্রয়োজন অনুসারে তাকে দান করে, নিজেকে বিষয়ের মোহ বন্ধন থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবেন । তিনি এই জীবনেই যাবতীয় জাগতিক বন্ধনের উর্দ্ধে অবস্থান করে নিজ আত্মার স্বরূপ উপলব্ধিতে সমর্থ হবেন , তাঁর জীবন্মুক্তি ঘটবে । যার ফলে যজ্ঞের ও যজ্ঞকারীর একটি লক্ষ্যের পূরণ হবে । কারণ জীবন্মুক্তি পরম সত্য লাভের পথ । আবার যদি একথা বলা হয় যে, দাতা এই পার্থিব জগতে তার অর্জিত সকল সম্পদের দান করে জাগতিক সকল বন্ধনের বিনাশ সাধন করে তার ইহজাগতিক সকল সকাম কর্মজনিত ফলের বন্ধনের নাশ করেন, তবে তাঁর বর্তমান জীবনের দেহান্তে আত্যন্তিক দুঃখমুক্তি ঘটে । তিনি মোক্ষ লাভ করতে সমর্থ হন । তাঁকে আর পুনরায় জন্ম জন্মান্তরের সংসার বন্ধনের জালে আবর্তিত হতে হয়

না। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়, তাঁর বিদেহমুক্তি ঘটে । যার মধ্যে দিয়ে ঐ নির্দিষ্ট যজ্ঞের চরম বা চূড়ান্ত লক্ষ্য সাধিত হয় ।

এইরূপ আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে যথাক্রমে জীবের অন্তঃকরণ বা চিত্তশুদ্ধি তথা চিত্তের স্থিরতা এবং ব্যক্তির স্বভাব বা প্রকৃতির উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। দেখা যায় যে, ছান্দোগ্য উপনিষদে মানুষের নিত্যদিনের নানারূপ কর্মের যোগ্যতার বিচার - বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে মনুষ্য জীবনের পরমার্থ পরম ব্রহ্মের তত্ত্বালোচনা স্থান লাভ করেছে । নির্দেশিত হয়েছে এমন দুটি মার্গের কথা যাদের মাধ্যমে বদ্ধ জীব যথাক্রমে ইহজীবনের জন্য নানা প্রয়োজনীয় বিষয় এবং অন্তিমে জীবনের পরম লক্ষ্য রূপে পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয় । নিজ আত্মার তত্ত্বসাক্ষাৎকার করতে পারে । উক্ত দুটি মার্গ বা উপায়ের মধ্যে প্রথমটি হল, শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পূজার্চনা, আরাধনা , উপাসনা ইত্যাদি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান মূলক সকাম কর্মের উপাসনা । আর দ্বিতীয়টি হল, শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে পরব্রহ্মের ধ্যান । প্রথম মার্গ পথে সধারণ মানুষ তাঁর ইহজাগতিক নানারূপ লক্ষ্য সাধনে সমর্থ হয়, সে লাভ করতে পারে প্রভূত পরিমাণ ধন, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, উন্নত স্বাস্থ্য ইত্যাদি ; যদিও সেগুলি লাভ করে সে পূর্ণরূপে তৃপ্ত হতে পারে না । কারণ এই সকল বিষয়গুলি তাঁর জাগতিক বন্ধনকে আরো দৃঢ় করে, তাঁকে পুনরায় জন্ম- মৃত্যুর আবর্তন চক্রে আবদ্ধ করে । তাই এর থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে সে দ্বিতীয় মার্গ বা পথের উপায় অবলম্বন করে । অর্থাৎ সে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পরব্রহ্মের ধ্যানে ব্রতী হয়, যার মাধ্যমে তার আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয় । প্রশ্ন হয় উপনিষদে বর্ণিত প্রথম মার্গ যদি জীবের লক্ষ্য লাভের অন্তরায় হয় তবে তা গুরুত্ব সহকারে মার্গরূপে বিবেচিত হওয়ার কারণ কী ? উত্তরে বলা যায়, নির্দেশিত প্রথম মার্গে জীব পার্থিব জীবনের লক্ষ্য লাভে সচেষ্ট হতে পারে তবে আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে এইরূপ পরমাত্মার জ্ঞান লাভে প্রয়োজন হয় দ্বিতীয় মার্গের । তবে এইরূপ পরমাত্মার জ্ঞান লাভে চিত্তের শুদ্ধিকরণ এবং ধৈর্য্য বা স্থিরতা অন্যতমরূপে তাৎপর্য্যপূর্ণ । এই প্রসঙ্গে যাবতীয় তত্ত্বালোচনা ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের ‘প্রজাপতি ও ইন্দ্র বিরোচন সংবাদ’ এবং ‘আসুরী উপনিষদ’ - এ প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুর প্রধান বিরোচনের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্র এবং অসুরদের প্রধান বিরোচনের অনুরোধ অনুসারে প্রজাপতি ব্রহ্মা যেরূপে তাঁদেরকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন সেই তত্ত্বালোচনার মধ্যে দিয়েই উপনিষদের এই অংশে ‘দান’ বিষয়ক আলোচনাও পরিলক্ষিত হয় ।

এই প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে, দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুরদের প্রধান বিরোচন উভয়েই রাজা হওয়া সত্ত্বেও তাদের স্বভাব ও প্রকৃতি ছিল ভিন্ন প্রকৃতির । তাঁদের পিতামহ ছিলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা । তাঁরা উভয়েই পিতামহ ব্রহ্মার কাছে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হন এবং জ্ঞান লাভ করেন যে, আত্মা সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান লাভ করলে সমস্ত লোক ও সকল কাম্য বস্তু লাভ করা যায় । এইরূপ জেনে তারা স্থির করলেন যে তারা আত্মজ্ঞান লাভ করবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা উভয়েই যজ্ঞের জন্য কাঠ বা 'সমিৎপাণী ' সংগ্রহ করে প্রজাপতির গৃহে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করেন তাদেরকে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান দানের জন্য । প্রজাপতি সম্মত হন এবং সেইমত আদেশ করেন । প্রজাপতির আদেশ অনুসারে তাঁরা এর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চিত্তশুদ্ধির অভ্যাসে রত হলেন । এরপর দীর্ঘ বত্রিশ বছর ধরে আচার্য্য প্রজাপতির গৃহে বসবাসপূর্ব্বক নিজেদের চিত্তের শুদ্ধিকরণ ও আত্মসংযমের অভ্যাস করে দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুর প্রধান বিরোচন ঋষি প্রজাপতির কাছে গিয়ে আত্মতত্ত্বের প্রার্থনা জানালে গুরু জানালেন, 'চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন তিনিই আত্মা পরম ব্রহ্ম । তিনি অমৃত, অভয় । তিনিই জলে দৃষ্ট হন এবং দর্পণেও । তিনি সমস্ত কিছুতেই দৃষ্ট হন । '[১৬] এইবার আচার্য্য প্রজাপতি তাঁদের একটি জলপূর্ণ পাত্রে নিজেদের প্রতিবিম্ব দর্শন করতে নির্দেশ দেন । প্রজাপতি জিজ্ঞেস করেন তারা কি দেখছেন ? তাঁরা উভয়েই জানান যে, রোম থেকে নখ পর্যন্ত তাঁরা নিজেদের প্রতিমূর্তি বা প্রতিবিম্বই দেখছেন । গুরু জানান ইনিই আত্মা, পরম ব্রহ্ম । প্রাথমিক ভাবে সন্তুষ্টি হলেও পরে এবিষয়ে মানসিক জটিলতা ও দ্বিধা উপস্থিত হওয়ায় তাঁরা উভয়েই আবার একইভাবে গুরুর কাছে গিয়ে আত্মতত্ত্বের উপদেশ ভিক্ষা করেন, গুরু এবারও তাঁদের একইভাবে নিজেদের প্রতিবিম্ব পরিলক্ষিত করার উপদেশই প্রদান করলেন । তবে ব্যতিক্রম ছিল এই যে, এই দ্বিতীয়বার তাঁরা গুরুর আদেশ অনুসারে সুন্দর অলংকার ও পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে নিজেদের প্রতিবিম্ব জলপূর্ণ পাত্রে পরিলক্ষিত করলেন । পুনরায় প্রজাপতি জিজ্ঞেস করেন এইবার তারা কি দেখছেন ? এইবার তারা জানালেন, 'ভগবান আমরা যেমন সুন্দর অলংকার বস্ত্র সজ্জায় সুসজ্জিত তেমনি জলের মধ্যে পরিদৃশ্যমান এই দুইজনের প্রতিবিম্বও সুন্দর অলংকার ও বসনে ভূষিত, পরিবৃত এবং সুসজ্জিত । তাঁদের এই উত্তরে প্রজাপতি জানালেন , 'ইনিই অমৃত ও অভয়রূপী আত্মা বা পরম ব্রহ্ম ' । এই দ্বিতীয় বারের ব্যাখ্যায় তাঁদের সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি হয়, তারা নিজ গৃহে ফিরে যান এবং নিজ বোধ ও সামর্থ্য অনুসারে আত্মতত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করেন । তাঁদের এইরূপ প্রস্থানে গুরু মনে মনে ভাবেন যে, তাদের চিত্তের পূর্ণরূপ শুদ্ধিকরণ না হওয়ায় তারা প্রকৃত আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি না করেই চলে গেল । কারণ আচার্য্য তাদের আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে, আমাদের চক্ষুর মধ্যে যিনি দ্রষ্টারূপে সর্বদা উপস্থিত থেকে দর্শন করেন ,

---

১৬. *ছান্দোগ্য উপনিষদ,* ৮।৭।৪

তিনিই প্রকৃত আত্মা' । তাই সিদ্ধযোগীগণ চক্ষু মুদ্রিত অবস্থাতেও দ্রষ্টারূপী আত্মার প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হন । কিন্তু ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই তাঁদের চিত্তের চাঞ্চল্যবশতঃ উপলব্ধি করেন যে, চক্ষুর মধ্যে যে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় , তিনিই আত্মা। আচার্য্য মনে মনে বলেন, এইরূপ জ্ঞানকেই যে ঔপনিষদিক জ্ঞান বলে প্রচার করবে তারই ভুল হবে সে দেবতাই হোক বা অসুর । অসুররাজ বিরোচন গৃহে ফিরে গিয়ে প্রচার করেন , এই জগতে দেহই সব । তার পূজা ও পরিচর্যা করাই ইহলোকের একমাত্র কর্ত্তব্য । এইরূপে দেহের পূজা ও পরিচর্যা করলে মহীয়ান হওয়া যায় এবং তারপরেও দেহের আরও পরিচর্যা করলে ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই লাভ করা যায় ।' [১৭] তার জন্য কোনরূপ চিত্তের শুদ্ধিকরণ এবং তার উপায়রূপে দান, শ্রদ্ধা, ভক্তি কিংবা যজ্ঞের প্রয়োজন নেই । সেই কারণে আজও দানহীন, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও যজ্ঞহীন ব্যক্তিদের অসুর বলা হয় । উপনিষদানুসারে যাঁরা কেবল আত্মসুখভোগে বা ইন্দ্রিয়সুখভোগে মত্ত হন তাঁরা কখনই নিজেদের তুলনায় মহত্তর সত্তার আদর্শ স্বীকার করেন না । তাঁরা কেবলই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির সুখে মগ্ন থাকতে অভ্যস্ত হন। আর একারণেই তাঁরা নিজেদের সুখের জন্য ইহজাগতিক যেসকল বিশ্বাস পোষণ করেন সেই একই বিশ্বাস তাঁরা মৃত্যুর পরেও ধারণ করে রাখতে চান । ইন্দ্র ও বিরোচনকে প্রজাপতি বিভ্রান্ত করতে চাননি । তাঁদের পরীক্ষা করছিলেন মাত্র । তিনি বুঝেছিলেন, এঁরা কেউই এখনও আত্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রস্তুত নন '। যাঁরা আত্মজ্ঞানে জ্ঞানী হন তাঁরা একথা উপলব্ধি করেন যে, আমাদের নিজেদের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে আত্মশক্তি । তবে তার অর্থ এই নয় যে, এক্ষেত্রে বাহ্য জগতের কোন ভূমিকা নেই । কারণ মানুষ যখন আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি করে তখন সে একথাও উপলব্ধি করে যে সে আর পরমব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন। কোন ভেদাভেদ তাঁদের মধ্যে নেই । কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না এই অভিন্নতার উপলব্ধি হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বদ্ধজীব ভেদের জ্ঞান করে । এই ভেদের জ্ঞান যে কেবল ব্রহ্ম ও তাঁর মধ্যেই হয় এমন নয় বরং সবক্ষেত্রেই এইভেদের জ্ঞান তাঁরা একইভাবে উপলব্ধি করে । যেমন, তাঁরা যখন অন্য কোন ব্যক্তিকে সাহায্য করে তখন তাঁরা নিজেদের সেই ব্যক্তির তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে । আবার এবিষয়ে গর্বিত হয়ে তাঁরা কখনও না কখনও অহংকারের প্রকাশ করে । এবিষয়ে বদ্ধজীবকে সতর্ক হতে তাই তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে, 'শ্রদ্ধার সঙ্গে দান কর । তুমি ভিখারীকে কিছু দিচ্ছ । সে হয়ত ছেঁড়া কাপড় জামা পড়ে আছে, কিন্তু সেও তো ভগবান । সে যে তোমার দান গ্রহণ করছে তার জন্য তুমি কৃতজ্ঞ থেকো । তৈত্তিরীয় উপনিষদে একথাও আছে শ্রদ্ধার সঙ্গে দিতে না পারলে বরং কিছু না দেওয়াই ভাল । নইলে অপরের আত্ম মর্যাদাবোধকে আঘাত করা হয় । দান করবে ভালবাসার সঙ্গে, বিনয়ের সঙ্গে। আসলে তুমি নিজেকেই দিচ্ছ । কারণ ছোট বা বড় , মানুষ বা কীট পতঙ্গ সর্বভূতে এবং সর্বত্র

---

১৭. *ছান্দোগ্য উপনিষদ,* ৮।৮।৩-৫

যে কেবল তুমিই রয়েছ।' [১৮] কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, উপনিষদ অনুসারে দেহের কোন গুরুত্বই নেই । কারণ দেহ না থাকলে আত্মজ্ঞান লাভ করব কি করে ? জাগতিক বা আধ্যাত্মিক, যে কোন উন্নতির জন্য দেহটা হল প্রধান যন্ত্র । এই প্রসঙ্গে মুন্ডক উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে , 'ন্যায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো' [১৯] যার দেহে বল নেই সে আত্মাকে লাভ করতে পারে না । দুর্বল, জরাজীর্ণ দৈহিক ও মানসিক অবস্থা নিয়ে আত্মতত্ত্ব বা পরম ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করা যায় না । তার জন্য প্রয়োজন শারীরিক ও মানসিক শক্তি, দৃঢ়তা, অত্মসংযম, নিষ্ঠা, ধৈর্য্য ও স্থিরতা । জাগতিক বা আধ্যাত্মিক, যে কোন উন্নতির জন্যই একথা সত্য। একাগ্র চিত্তে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে আত্মতত্ত্বের সাধনা করলে পরম ব্রহ্মের জ্ঞান উপলব্ধি সম্ভব হয়। উপনিষদ অনুসারে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে কেবল কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার মার্গ নয় বরং ভোগ ও ত্যাগের সামঞ্জস্যের বিধি নির্দেশিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়ের বিষয়াসক্তি স্বাভাবিক তাই তাকে স্বীকৃতি দিতে হবে । তবে তার জন্য চিত্তের চাঞ্চল্য ঘটলেই জীব আপন লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবে । তাই পরম নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত না করে একাগ্র হয়ে জগতে প্রেয় নয় বরং শ্রেয়কে নির্বাচন করতে হবে । তার মধ্যে দিয়েই গঠিত হবে জীবের আত্মজ্ঞান লাভের উপযোগী চিত্ত এবং ব্যক্তিত্ব বা স্বরূপ । ঘটবে জগতের সামগ্রিক কল্যাণ । এইরূপে দেখা যায় যে, জীবের আত্মজ্ঞান লাভের জন প্রয়োজন উপযোগী ব্যক্তিত্ব বা স্বভাব । আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য যোগ্য অধিকারী হতে হবে। আর তার জন্য চাই প্রস্তুতি । যার যেমন স্বভাব, সেই অনুযায়ী তার প্রস্তুতিও তেমন হবে । এইরূপ প্রস্তুতিতে 'দান ক্রিয়া' জীবের অন্যতম সহায়করূপে নির্দেশিত হয়েছে । কারণ দাতা কীরূপ মনোভাবে দান করছেন, তা দানক্ষেত্রের যেমন অন্যতম শর্ত তেমনি তা একজন দাতার স্বভাবেরও পরিচায়ক । উপনিষদে 'আত্মজ্ঞান' লাভের জন্য ব্যক্তির স্বভাবের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে তা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদে নির্দেশিত হয়েছে, 'দ দ দ দাম্যত দত্ত দয়ধ্বম্ ইতি '।[২০] প্রজাপতি ব্রহ্মার তিন পুত্র ; দেবতা , মানুষ ও অসুর । স্বভাব বা প্রকৃতিতে তিনজনেই ছিলেন একে অপরের থেকে ভিন্ন । আত্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে এঁরা প্রত্যেকেই প্রজাপতির গৃহে কিছুদিন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে বসবাস করার পর প্রত্যেকেই পৃথকভাবে আচার্য্যের কাছে পরম জ্ঞান লাভের উপদেশ প্রার্থনা করেন । এইরূপ প্রার্থনায় আচার্য্য পৃথকভাবে সকলকে উপদেশ প্রদান করেন । প্রথমে দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'দ' । দেবতারা এই অক্ষর শুনে তার অর্থ করেন 'দাম্যত' অর্থাৎ দান্ত হওয়ার বা দমন করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে । এইবার প্রজাপতি মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন, 'দ' । মানুষ এই 'দ' অক্ষরের অর্থরূপে 'দান' করার উপদেশ গ্রহণ করে । সবশেষে প্রজাপতি

---

১৮ . *বৃহদারণ্যক উপনিষদ, উপনিষদ,* স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, পৃষ্ঠা - ৪০৯
১৯ . *মুন্ডক উপনিষদ* ৩।২।৪
২০ . *বৃহদারণ্যক উপনিষদ,* ৫।২।৩

অসুরদের উদ্দেশ্যে বলেন ‘দ’। তারা এর অর্থ করেন ‘দয়া কর ’। প্রজাপতি সকলের উদ্দেশ্যেই বলেন, তারা সকলেই ঠিক অর্থ গ্রহণ করেছে। এইরূপে দেখা যায় যে, প্রত্যেকেই তাদের স্বভাব অনুযায়ী প্রজাপতির উপদেশের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করলেন । এদের মধ্যে দেবতারা সবচেয়ে শুদ্ধ । ব্রহ্মের সবচেয়ে কাছাকাছি তাঁরা, কিন্তু এখনও ব্রহ্মের সঙ্গে একত্ব বোধ হয়নি । এখনও একটু অজ্ঞানতার আড়াল রয়েছে । সেই অজ্ঞানতা মুছে তাঁদের আরো পবিত্র হতে হবে । তাই তার জন্য প্রয়োজন সংযমের অভ্যাস । তাই তাঁরা ‘দ’ - এর অর্থ করলেন দমন কর বা সংযম অভ্যাস কর । কামনা, বাসনা ইন্দ্রিয়ের বিষয়াসক্তি ইত্যাদি সবকিছুরই সংযম ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। দেবতাদের পরে মানুষের স্থান । তারাও ভাল, কিন্তু তাদের স্বভাব বা প্রকৃতি অনুসারে তাদের আরও ভাল হতে হবে । কিভাবে ? তাদের নিঃস্বার্থ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে । নিজেদের কাছে যা আছে তা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে । যতদূর সম্ভব অপরকে দান করতে হবে । স্বার্থকেন্দ্রিকতায় নয় বরং সাম্য মনোভাবে বিশ্বাসী হতে হবে । সেই লক্ষ্যে সামর্থ্য অনুযায়ী যতদূর সম্ভব অপরকে দান করতে হবে, তাদের সাহায্য করতে হবে । শেষতঃ অসুরেরা তাদের স্বভাব অনুসারে অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির । কিন্তু আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করার জন্য তারা আত্মসংযম বা আত্মনিয়ন্ত্রণ কিংবা দানের জন্য এখনও প্রস্তুত নয় । তাই স্বভাব অনুসারে প্রজাপতির উপদেশের তারা অর্থ করল নিষ্ঠুরতা ত্যাগ করে দয়া করার । [২১] মানুষের মধ্যেও এই তিন রকমের চরিত্র দেখা যায় । আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কারোর প্রয়োজন সংযম অভ্যাস করা, কারোর দান করা আবার কারোর বা প্রয়োজন দয়া করা। যার যেমন স্বভাব, সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করে সে তার ব্যক্তিত্বের গঠন করে নিজেকে যোগ্য অধিকারী করে গড়ে তুলতে পারবে । যা জীবের অনবদ্য কর্মরূপে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে হিতকারী হবে । [২২]

অন্ন দান :

তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দবল্লী এবং ভৃগুবল্লীতে আত্মজ্ঞান লাভের সোপানরূপে অন্ন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায় । সেখানে বর্ণিত হয়েছে, আত্মা হল অন্নময় কোশ, প্রাণময় কোশ, মনোময় কোশ, বিজ্ঞানময় কোশ এবং আনন্দময় কোশ - এই পঞ্চকোশের সমাহার । এই পঞ্চকোশগুলি হল মূলতঃ আত্মার বহিরাবরণের ন্যায় । আত্মাকে জানতে হলে বা আত্মজ্ঞান লাভের সাধনা

---

২১ . *বৃহদারণ্যক উপনিষদ, উপনিষদ,* স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, পৃষ্ঠা - ১ - ৩
২২ . *তৈত্তিরীয় উপনিষদ,* ১।১১।২

করতে হলে এই পাঁচটি বহিরাবরণের স্তর ভেদ করে তার স্বরূপকে জানতে হয় বা আত্মজ্ঞান লাভের উপাসনা করতে হয় । এই প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য্য বলেছেন, আত্মা হল অন্তরতম সত্তা । যেন রাজগৃহের রাজার মত । রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজার দর্শন করতে হলে যেমন একটার পর একটা ঘর পেরিয়ে যেতে হয় কিংবা তরবারির ঔজ্জ্বল্য এবং ধার দেখার জন্য যেমন তাকে খাপ থেকে বের করে দেখতে হয় আত্মদর্শনও সেইরূপেই হয় । কারণ আত্মাকে দর্শন করতে হলেও এইসকল কোশসমূহের স্তর পেরিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হয় । [২৩] প্রতিটি কোশই আত্মজ্ঞান লাভের সোপান । উল্লিখিত পঞ্চকোশের মধ্যে প্রথম অন্নময় কোশ হল আত্মার প্রথম আবরণ । অন্ন বা খাদ্য থেকে গঠিত মানব দেহের কোষের নাম হল অন্নময় কোষ । অন্ন থেকে জাত বা উৎপন্ন হয় বলে এই কোশের নাম অন্নময় । পৃথিবীকে আশ্রয় করে যত জীব আছে তারা সকলেই অন্ন থেকে জন্ম গ্রহণ করে, অন্ন দ্বারাই জীবনধারণ করে এবং পরিশেষে এই অন্নতেই লীন হয় । এই অন্নই প্রাণিসমূহের খাদ্য এবং এই অন্নই আবার প্রাণিসমূহকে ভক্ষণ করে তাই তার নাম হল অন্ন । জীবের আগে অন্ন এসেছিল । এই জন্য অন্নকে জীবের ঔষধ বলা হয় । অন্নময় কোশ থেকে ভিন্ন তার থেকে সূক্ষ্ম এবং তার মধ্যেই আর একটি দেহ বা কোষ আছে তার নাম হল প্রাণময় কোশ । দ্বিতীয় প্রাণময় কোশের উপস্থাপনা প্রসঙ্গে মনুষ্যদেহকে পাখীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । প্রাণময় কোশ প্রাণ এর সঙ্গে সম্পর্কিত । এই প্রাণময় কোষটিও অন্নময় কোশের মত পুরুষাকার । প্রাণ অর্থে এখানে প্রাণবায়ুর কথা বলা হয়েছে । এই প্রাণবায়ু মনুষ্যদেহে পাঁচভাবে নিজের কাজ করে, যেমন - প্রাণ , অপান, ব্যান, সমান ও উদান । প্রতিটি প্রকারই পাখীর দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে তুলনীয়ও হয়েছে । যেমন, মনুষ্যদেহে প্রাণ বায়ুর অবস্থান হৃদয় থেকে উর্দ্ধে তাই তা যেন পাখীর মস্তকস্বরূপ । অপান হল নিঃশ্বাস, যা মনুষ্যদেহ থেকে বর্হিমুখী তাই তাকে পাখীর বাম দিকের ডানা এবং ব্যান বায়ু সমগ্র মনুষ্য দেহ জুড়ে থাকে তাই তাকে পাখীর ডান দিকের ডানার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । উদান বায়ু পাখীর পুচ্ছের মতো করে সমগ্র মনুষ্য দেহের ভারসাম্য বজায় রাখে । এইভাবে প্রাণময় কোশ ক্রিয়াশীল হলেই মানুষ আয়ু প্রাপ্ত হন । তাই যাঁরা প্রাণরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁরা পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হন । প্রাণময় কোশের গভীরে থাকে আত্মার তৃতীয় আবরণ মনোময় কোশ । এই মনোময় কোশ হল প্রাণময়ের অন্তঃস্থ আত্মা । মন অর্থাৎ সংকল্প - বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ । এই মনোময় কোশের দ্বারা প্রাণময়ের অন্তঃস্থ আত্মা পরিপূর্ণ হন । এই মনোময় কোষও প্রাণময় কোশের মত পুরুষাকার । মনোময় কোশ থেকে ভিন্ন অথচ তার অভ্যন্তরস্থ আর একটি কোশ বা আত্মা হল বিজ্ঞানময় কোষ । এই বিজ্ঞানময় কোশ দ্বারা মনোময় কোষ পরিপূর্ণ হন । এই বিজ্ঞানময় কোষও পুরুষাকৃতি বিশিষ্ট । বিজ্ঞানময় কোশকে বুদ্ধির দ্বার হিসেবে চিন্তা করা

---

২৩ . *উপনিষদ সমগ্র,* কালিকানন্দ অবধূত, পৃষ্ঠা - ১৯২

হয় । কারণ ‘বিজ্ঞান’ শব্দের অর্থ হল বুদ্ধি , যে বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা তার দ্বারা সত্যের অনুভূতি হয় । এই বুদ্ধি বা বিজ্ঞান যেহেতু মানুষের সকল শুভাশুভ কর্মের কারণ হয় তাই এই বুদ্ধিই মানুষের ধর্মীয় উপাসনার অঙ্গরূপে যেমন যজ্ঞাদি কর্মের বিস্তার করে তেমনি তাদের দৈনন্দিনের জীবন যাপনে সকল কর্মেরও বিস্তার সাধন করে । যিনি বিজ্ঞানরূপে ব্রহ্মের সাধনা করেন তিনি সকল কামনা - বাসনা জনিত আসক্তি মুক্ত হয়ে বিজ্ঞানাত্মারূপে কাম্য বিষয়ের উপভোগ করেন । বিজ্ঞানময় থেকে ভিন্ন অথচ তার অভ্যন্তরস্থ যে আত্মা, তিনি হলেন আনন্দময় কোশ । এই আনন্দময় কোশ বিজ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ । আনন্দময়ও বিজ্ঞানময়ের মত পুরুষাকৃতি বিশিষ্ট এবং পক্ষীরূপে কল্পিত । কোন অভীষ্ট প্রিয় বস্তু দেখলে মনে যে আনন্দ বা হর্ষ হয় তাকে উপনিষদে ‘মোদ’ বলা হয়েছে । এই ‘মোদে’র প্রাচুর্য্যই হল প্রমোদ । এই প্রমোদের দ্বারাই হর্ষের বিস্তার হয় । এইরকম হর্ষের মধ্যে যে সাধারণ সুখানুভূতি থাকে তাকেই আনন্দ বলা হয়। এই আনন্দই সমস্ত সুখের আত্মাস্বরূপ যিনি এই সৃষ্টিতে নানাপ্রকার সুখানুভূতির মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন । শ্রোত্রিয়ত্ব, নিষ্পাপত্ব এবং কামনাহীনতা এই ত্রিবিধ হল আনন্দ লাভের উপায় । যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তিনি অসীম আনন্দের অধিকারী হন।[২৪]

তৈত্তিরীয় উপনিষদানুসারে উল্লিখিত পঞ্চকোশের মধ্যে আত্মার প্রথম আবরণ অন্নময় কোশ হল আত্মসাধনার পথে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায় বা মার্গ । অন্নদানের মধ্যে দিয়ে প্রাণদানের তত্ত্ব উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে উপনিষদে অধ্যাত্মতত্ত্বের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে । ‘অন্ন’ই সব কিছুর মূল । প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন ও বাক্যের ন্যায় অন্নও ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার । [২৫] সাধনার অন্যতম শর্ত সাধকের উৎপত্তি হয় এই অন্ন থেকে। তবে এইরূপে কেবল ব্রহ্মোপলব্ধি বা আত্মজ্ঞানের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই নয় বরং তৈত্তিরীয় উপনিষদে অন্নদানের মধ্যে দিয়েই প্রাণদানের তত্ত্বও বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে । এইপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এই পৃথিবী অন্নরসময় । এই পৃথিবীতে প্রাণের আধাররূপে আছে যত জীব তাদের সকলেরই উৎপত্তি হয় এই অন্ন থেকে । মনুষ্যদেহ অন্নের বিকার । জীবদেহ খাদ্য গ্রহণ করলে তা থেকে যে খাদ্য বা অন্নরসের সঞ্চার হয় তা শুক্রবীজাকারে পিতার দেহ থেকে সন্তানে সঞ্চারিত হয়ে ভাবী দেহের কারণ হয় । অন্ন ছাড়া জীবের জীবন সম্ভব নয়, তাই অন্ন সব কিছুর আগে আসে । জীবসৃষ্টির আগেই যেহেতু তাদের জীবন রক্ষার জন্য অন্নের সৃষ্টি হয়েছিল তাই অন্ন হল সকল জীবের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বা অগ্রজ । এই অন্ন গ্রহণ করে জীবদেহের ক্ষুধা - তৃষ্ণাসহ যেকোন প্রকার ক্ষয় দূর করে , শরীরকে পুষ্ট করে, দেহে শক্তির সঞ্চার করে তাই অন্ন হল সর্বৌষধ । জীব অন্ন থেকে জাত হয়ে তা গ্রহণ করে পুষ্ট হয়, বর্ধিত হয় বা বেড়ে ওঠে এবং মৃত্যুর পর এই অন্নেই লীন হয় তখন

---

২৪ . *উপনিষদ সমগ্র,* পৃষ্ঠা - ১৯৮ ।
২৫ . *তৈত্তিরীয় উপনিষদ,* ৩।১।

এই অন্নই জীবদেহকে ভক্ষণ করে । এইকারণে সকল প্রাণীদের অন্নপ্রভব, অন্নজীবন এবং অন্নপ্রলয় বলা হয় । এই প্রসঙ্গে উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে, জীবের মৃত্যুর পর তার দেহের ধ্বংস বা বিনাশ হলে জীবদেহ পঞ্চভূত ক্ষিতি ইত্যাদি পদার্থে লীন হয় । ঐ পঞ্চভূত পদার্থ থেকে আবার ব্রীহি বা ধান্যাদি অন্নের সৃষ্টি হয় , এইভাবে ভূতদেহের উপাদানসমূহ অন্নের অন্তর্ভূক্ত হয় বলে বলা হয়েছে অন্ন জীবদেহকে ভক্ষণ করে।[২৬] ব্রহ্মজ্ঞানলাভে বিদ্বান সাধক এই অন্নকে ব্রহ্মপোলব্ধির দ্বার বলে জানেন এবং এইরূপ উপলব্ধিকেই পরমনিষ্ঠার সঙ্গে ব্রত বা অবশ্য পালনীয় নিয়মরূপে উপাসনাও করেন । উপনিষদানুসারে এই অন্নের 'অন্নে'র পরিহাস বা উপেক্ষা কিংবা নিন্দা কোনটিই সমর্থনীয় নয় । এই অন্নে থাকে প্রাণশক্তি যা জীবদেহের প্রাণরক্ষার কারণ হয় তাই অন্নকে প্রাণ বলা হয়েছে । আবার যে যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয় সে তার অন্ন হয় এইরূপ বিবেচনায় প্রাণকে অন্ন আর শরীরকে অন্নাদ বা অন্নভোক্তা বলা হয়েছে । কারণ প্রাণ শরীরেরই অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকে । আবার একইসঙ্গে শরীরকে আশ্রয় করে প্রাণ অধিষ্ঠিত থাকে বলে শরীর হয় অন্ন এবং প্রাণ হয় অন্নাদ । এইরূপে অন্নেই অন্ন প্রতিষ্ঠিত হয় । তৈত্তিরীয় উপনিষদানুসারে যে সাধক এইরূপে অন্নেই অন্ন তত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি করেন তিনি একইসঙ্গে অন্ন এবং অন্নাদরূপে স্থিতিলাভ করেন । তিনি প্রভূত অন্নশালী এবং অন্নভোজী হন তিনি সন্তান, পশু ও ব্রহ্মতেজে মহান হয়ে কীর্তিতে ভাস্বর হন এবং ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন । এইরূপে সাধকের ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনাতেও কোন প্রতিবন্ধকতা হয় না । এই অন্ন পরম চৈতণ্যময় । যেহেতু অন্নের মধ্যেই চৈতণ্য আছে কারণ এই অন্ন গ্রহণের মাধ্যমেই যেমন জীবের জীবন ধারণ হয় এবংও দেহের গঠন ও সংরক্ষণ হয় তেমনি এর মধ্যে দিয়েই চৈতণ্যেরও প্রকাশ হয় । উপনিষদানুসারে বিদ্বান সাধক এই অন্নের উপাসনার মধ্যে দিয়েই পরম চৈতণ্যস্বরূপ অনন্ত আনন্দময় পরম ব্রহ্মের উপলব্ধি করেন ।[২৭] প্রশ্নপোনিষদেও জগতের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শিষ্যদের প্রতি গুরু পিপ্পলাদের নির্দেশেও এই 'অন্ন' ও 'প্রাণ' বিষয়ে আলোচনা পরিলক্ষিত হয় । প্রশ্নপোনিষদে যেমন পরম ব্রহ্মের অংশরূপে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তেমনি আলোচিত হয়েছে সেই আত্মার জাগতিক বন্ধনের কারণ এবং মুক্তির উপায় সম্বন্ধেও । বর্ণিত হয়েছে গুরু পিপ্পলাদের কাছে তাঁর শিষ্যরা কীভাবে অতি আগ্রহ ও নিষ্ঠাসহ আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে উপলব্ধি করেছিলেন, আত্মা পরম ব্রহ্মের অংশ সেই তত্ত্বও । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, যদিও বিষয়বস্তুর দান অর্থে দান বিষয়ের কোন প্রত্যক্ষ আলোচনা এখানে পরিলক্ষিত হয় না । তথাপি জগতের সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা ও ব্যাখ্যায় প্রশ্নপোনিষদে যেরূপে 'প্রাণ' ও 'অন্ন' - এর গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে তা দান সম্পর্কিত আলোচনায় অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। যেমন - কেন জীবনে 'অন্ন' ও 'প্রাণ' দানই শ্রেষ্ঠ দান ? উত্তরে প্রশ্নপোনিষদ অনুসারে জগতের

---

২৬ . *তৈত্তিরীয় উপনিষদ*, ২।২।১
২৭ . ঐ, ৩।৭-১০।১

সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে, গুরু পিপ্পলাদ তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, ' প্রজাপতি শব্দটির অর্থ জগতে সব কিছুর প্রভূ বা পিতা । 'পতি' শব্দের অর্থ 'প্রভূ' বা 'পিতা' এবং প্রজা শব্দের অর্থ 'যা সৃষ্টি হয়েছে' অথবা 'যা জন্মেছে' অথবা 'যার অস্তিত্ব আছে' । প্রজাপতি হলেন পরম সত্য । প্রজাপতি কর্তৃক এই জগৎ প্রকাশিত হয় এবং তাতেই বিলীন হয় । তাঁর সৃষ্টির দৃঢ় সঙ্কল্পের মধ্যে দিয়েই এই জগতের যেমন প্রকাশ হয় তেমনি তাঁর দানে এই পৃথিবীর চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়েই দাতা । চন্দ্র আর্দ্রতা দানকারী এবং সূর্য্য আলো দানকারী। এই আর্দ্রতা ও সৌরালোকের উপস্থিতিতেই উদ্ভিদকূল নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করে তাদের প্রাণ রক্ষা করে । এইরূপে প্রজাপতি ব্রহ্মার দানে চন্দ্র, সূর্য্যের অস্তিত্ব এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের দানে অন্যান্য প্রাণীর প্রাণ রক্ষিত হয়।'[২৮] এই যে অন্ন ও প্রাণের এক হয়ে যাওয়া , উপনিষদের এই ব্যাখ্যানুসারেই বলা যায় যে জীবনের যেকোন দানের তুলনায় অন্ন ও প্রাণ দান শ্রেষ্ঠ , কারণ প্রাণের রক্ষা করা কিংবা অন্নদান পূর্ব্বক প্রাণ দান করা দাতা রূপে গ্রহীতার জন্য পরম কর্তব্য। যা জগতের অন্যান্য যেকোন বিষয়ের দানকে অর্থপূর্ণ করে অন্যথায় খাদ্যের অভাবে কিংবা অন্য যেকোন কারণে গ্রহীতার প্রাণই যদি না থাকে তবে 'দাতা' ও 'গ্রহীতা' এই শব্দগুলি অর্থহীন হয়ে পড়ে । তাই এই অন্নকে কোনভাবেই উপেক্ষা বা পরিহার করা যাবে না । রাগ, বিদ্বেষ বা মোহবশেও 'অন্নে'র নিন্দা সমর্থনীয় নয় । উপনিষদে যেকোন বিদ্বেষ কিংবা তপস্যার কারণে 'অন্নে'র অগ্রহণকেও নিন্দা করা হয়েছে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, 'প্রাণ' রক্ষার তাগিদে এই 'অন্নে'র গ্রহণ বিষয়েও গ্রহীতাগণকে সতর্ক হতে বলা হয়েছে। কারণ রূপে ধর্মাচারে 'অতিগ্রহণ' ও 'অল্পগ্রহণ' উভয়ই শাস্ত্রে নিন্দিত হয়েছে ।এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যজ্ঞ, অন্ন ও দানের পারস্পরিক সম্পর্কও বর্ণিত হয়েছে । বলা হয়েছে, জীবের জীবন ধারণে অতি প্রয়োজনীয় এই অন্নের উৎপত্তিতে যজ্ঞ ও দানের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ । কারণ অন্নের উৎপত্তিতে প্রয়োজনীয় জলের সহায়ক হল বৃষ্টি । এই বৃষ্টি উৎপন্ন হয় যজ্ঞ থেকে । যজ্ঞাগ্নিতে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দান করলে সেই আহুতি উপস্থিত হয় আদিত্যে, সেই আদিত্য থেকে উৎপন্ন হয় বৃষ্টি বা পর্জ্জন্য , যে বৃষ্টি সহায়ক হয় কৃষি কর্মে , যার মধ্যে দিয়ে অন্নের উৎপত্তি হয় । যে অন্ন সকল প্রজাদের জীবন ধারণে সহায়ক হয় । তাই যেসকল ব্যক্তি অন্যদের বঞ্চিত করে কেবলই নিজেদের খাদ্যচিন্তায় নিমগ্ন হন, তার চিত্তের সংকীর্ণতায় তার যেমন যোগ সাধনা হয়না, আবার ঠিক তেমনি যিনি কোন খাবার গ্রহণ না করে দেহ বা শরীরকে কষ্ট দেন তার শারীরিক কষ্টের কারণেও সুষ্ঠু রূপে যোগ সাধনা সম্ভব হয় না । তাই শাস্ত্রানুসারে 'অন্নে'র 'অতিগ্রহণ' কিংবা 'অল্পগ্রহণ' উভয়ই নিন্দিত হয়েছে । [২৯] যেভাবেই অন্ন প্রদত্ত হোক

---

২৮. *প্রশ্নোপনিষদ, উপনিষদ,* স্বামী লোকেশ্বরানন্দ , পৃ : ১৫৬ - ১৫৭
২৯. *শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা* , ৩ । ১০ -১৪

বা অন্নের যোগান হোক না কেন তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে । যখন যেরূপ ‘অন্নে’র যোগান হবে, জীবন ধারণের জন্য তাই পরম আনন্দ , সন্তুষ্টি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে । আত্মজ্ঞানীর কাছে এই হল নিয়ম বা ব্রত যা অবশ্য পালনীয় । এই অন্নকে বর্ধিত করতে হবে , তার প্রাচুর্য্যের সাধন করতে এবং তার জন্য প্রয়োজন অধিক উৎপাদন, অধিক কৃষি- কর্ম । এই পৃথিবী অন্ন প্রসবা, শষ্যশালিনী । এইরূপে অন্নের উপাসনা করতে হবে । উপনিষদানুসারে, যে ব্যক্তি এইরূপে অন্নের উপাসনা করেন তিনি কখনোই তার গৃহে আগত অতিথির প্রত্যাখান করবেন না । বরং তাকে বাসের জন্য আশ্রয় দেবেন , যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে তার সম্মাননা করবেন । তার ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য বা অন্ন রন্ধন করে প্রদান করবেন । এই প্রসঙ্গে উপনিষদে দাতার জন্য কতকগুলি বিধি নির্দেশ করে বলা হয়েছে , আশ্রয় দাতা তাঁর অতিথিকে অবশ্যই উপযুক্ত আহার দান করবেন, অন্যথায় তার পাপ হবে । তাই এটিই তার ব্রত নিয়ম যা অবশ্য পালনীয় । অতএব আশ্রয়দাতাকে তার অতিথিকে আহার দান করার জন্য যেকোন উপায়েই প্রচুর অন্ন সংগ্রহ করতে হবে। তবে যেকোন উপায় অর্থে উপনিষদে কোন দুষ্কার্য্য বা মন্দ মানের কার্য সমর্থিত হয়নি বরং এই প্রসঙ্গে বর্ণ বিশেষে স্বধর্ম বৃত্তির উল্লেখ হয়েছে । ব্রাহ্মণাদি চতুঃবর্ণের জন্য শাস্ত্রনির্দিষ্ট বৃত্তিই হবে উত্তম বৃত্তি, তবে তাতেও যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ অন্নের সংগ্রহ না হয় সেইক্ষেত্রে অন্ন সংগ্রহের নিমিত্ত অন্য বর্ণের বৃত্তিও অনুমোদিত হয়েছে। এইরূপে অন্ন সংগ্রহ করে গৃহে আগত অতিথিকে অন্নদান করা সকল গৃহস্থের জন্যই অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য । এই অন্ন দান প্রসঙ্গে দাতাকে স্পষ্ট নির্দেশ করা হয়েছে যে , গৃহে আগত অতিথিকে এইরূপ সম্মাননা এবং মর্যাদার সঙ্গে অন্ন দান করতে হবে, তাঁর উদ্দেশ্যে অন্ন দেওয়ার সময় একথা দাতাকে বলতে হবে যে, ঐ গৃহে সকল অন্নই তাঁর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে । এতে গ্রহীতা সন্তুষ্ট হবেন , তৃপ্ত হবেন । এইরূপে অতিথিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে অন্ন প্রদান করার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা দাতা বা গৃহকর্তা এবং তার পরিবার গ্রহণ করবেন । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে উপনিষদে ‘অতিথি’ শব্দটির দ্বারা অতিথি সহ, গৃহে আগত অসহায় দীন - দরিদ্র ব্যক্তি , আর্ত ব্যক্তি এবং আশ্রয় শরণার্থী সকলকেই নির্দেশ করা হয়েছে । এদের সকলের উদ্দেশ্যেই যে গৃহস্থ বা অন্নদাতা সম্মানের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণ অন্ন দান করেন তিনি সমুদয় অন্নের অধিকারী হবেন । তাঁর গৃহে কোনদিন অন্নের অভাব হবেনা । সেই অন্নের গ্রহণ করে তিনি জীবিত থাকবেন এবং শারীরিক শক্তিবলে তাঁর প্রাণ রক্ষা করতেও সমর্থ হবেন । উদ্ভিদসহ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট - পতঙ্গ থেকে শুরু করে মানুষ এবং তারও তুলনায় বৃহদাকার যেকোন প্রানীর দেহেই আছে ‘প্রাণে’র ব্যাপ্তি। এই জগতের সর্বত্রই প্রাণের ব্যাপ্তি বিধৃত হয়ে আছে । এরা প্রত্যেকেই ‘অন্নরসময়’। এরা প্রত্যেকেই জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় অন্ন বা খাদ্য গ্রহণ করে নিজেদের জীবনের রক্ষা করেন । তাই এইরূপ ‘অন্ন’ বা ‘প্রাণ’ দানের মধ্যে দিয়ে জীবের জীবন রক্ষা করাই ‘শ্রেষ্ঠ দান’ বলে উপনিষদে বিবেচিত হয়েছে । উপনিষদানুসারে অন্নদানের মধ্যে দিয়ে প্রাণদানের তত্ত্ব বর্ণনায়

দান ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে । এইরূপ বর্ণনার মধ্যে দিয়েই দেখা যায় যে, জীবের জীবন ধারণ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তের মধ্যে অন্ন এবং বিদ্যা অন্যতম প্রয়োজনীয় দুটি শর্তের যথাযথ দানে যেমন জীবের জীবন তথা প্রাণ সুরক্ষিত হয় তেমনি তার জীবন যাপনের জন্য উপযোগী বিদ্যাও সে আয়ত্ত করতে পারে, তার মধ্যে দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয় । অন্ন ও প্রাণের এইরূপ পরম সম্পর্কের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই সাধক তার জীবনের অন্যতম মূল লক্ষ্যরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করার বিষয়ে অবগত হয়ে তাকে লাভ করতে সমর্থ হয় ।

তথ্যসূত্র :

- অবধূত কালিকানন্দ (সম্পাদিত) , *উপনিষদ সমগ্র,* মার্চ - ২০২১ , প্রকাশক - গিরিজা লাইব্রেরী , কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

- অবধূত কালিকানন্দ (সম্পাদিত) , *প্রশ্ন উপনিষদ ; উপনিষদ সমগ্র,* মার্চ - ২০২১ , প্রকাশক - গিরিজা লাইব্রেরী , কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

- অবধূত কালিকানন্দ (সম্পাদিত) , *কঠ উপনিষদ; উপনিষদ সমগ্র,* মার্চ - ২০২১ , প্রকাশক - গিরিজা লাইব্রেরী , কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

- অবধূত কালিকানন্দ (সম্পাদিত) , *মুণ্ডক উপনিষদ, উপনিষদ সমগ্র,* মার্চ - ২০২১ , প্রকাশক - গিরিজা লাইব্রেরী , কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

- অবধূত কালিকানন্দ (সম্পাদিত) , *মাণ্ডুক্য উপনিষদ ; উপনিষদ সমগ্র,* মার্চ - ২০২১ , প্রকাশক - গিরিজা লাইব্রেরী , কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

- অবধূত কালিকানন্দ (সম্পাদিত) , *তৈত্তিরীয় উপনিষদ; উপনিষদ সমগ্র,* মার্চ - ২০২১ , প্রকাশক - গিরিজা লাইব্রেরী , কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

- অবধূত কালিকানন্দ (সম্পাদিত) , *ঐতরেয় উপনিষদ, উপনিষদ সমগ্র,* মার্চ - ২০২১ , প্রকাশক - গিরিজা লাইব্রেরী , কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

- অবধূত কালিকানন্দ (সম্পাদিত) , *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ; উপনিষদ সমগ্র,* মার্চ - ২০২১ ,প্রকাশক- গিরিজা লাইব্রেরী , কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

- অবধূত কালিকানন্দ (সম্পাদিত) , *ছান্দোগ্য উপনিষদ ; উপনিষদ সমগ্র,* মার্চ - ২০২১ , প্রকাশক- গিরিজা লাইব্রেরী , কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

- লোকেশ্বরানন্দ (স্বামী), *উপনিষদ,* প্রথম খণ্ড, ২০০২ , প্রকাশক - আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

- লোকেশ্বরানন্দ (স্বামী), *উপনিষদ,* দ্বিতীয় খণ্ড, ২০০২ , প্রকাশক - আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

- সেন অতুলচন্দ্র , তত্ত্বভূষণ সীতানাথ, ও ঘোষ মহেশচন্দ্র (অনূদিত ও সম্পাদিত), *উপনিষদ অখন্ড সংস্করণ,* ২০২১ , প্রকাশক - হরফ প্রকাশনী , কলকাতা - ৭০০০০৭ ।

- সেন অতুলচন্দ্র , তত্ত্বভূষণ সীতানাথ, ও ঘোষ মহেশচন্দ্র (অনূদিত ও সম্পাদিত), *বৃহদারণ্যক উপনিষদ, উপনিষদ অখন্ড সংস্করণ,* ২০২১ , প্রকাশক - হরফ প্রকাশনী , কলকাতা - ৭০০০০৭ ।

- সেন অতুলচন্দ্র , তত্ত্বভূষণ সীতানাথ, ও ঘোষ মহেশচন্দ্র (অনূদিত ও সম্পাদিত), *কৌষীতকি উপনিষদ, উপনিষদ অখন্ড সংস্করণ,* ২০২১ , প্রকাশক - হরফ প্রকাশনী , কলকাতা - ৭০০০০৭ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রে দান
মহাকাব্যে দান

দান শব্দটির দ্বারা সাধারণভাবে কোন একজনের উদ্দেশ্যে অপর জনের কিছু দেওয়া কিংবা আরও সুস্পষ্টভাবে বলা যায় নির্দিষ্ট কোন বিষয় বা বস্তুর প্রতি স্বত্বনিবৃত্তিপূর্ব্বক একজন ব্যক্তির অপরজনকে দেওয়া বোঝায় । তবে প্রতি ক্ষেত্রেই যে দান ক্রিয়া এইরূপে কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুর প্রতি স্বত্বাধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তিকে কেন্দ্র করেই সম্পন্ন হয় এমন নয়, বরং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বহু দান ক্ষেত্রই আছে যা অধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তিভিন্ন ভাবেও সংঘটিত হয় । এর উল্লেখ পুরাণ, মহাকাব্যসহ বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনেও পাওয়া যায়, যেমন - ধর্ম দান, উপদেশ দান, বাক্য দান ইত্যাদি । এই প্রসঙ্গে মহাকাব্যিক পরিসর বিশেষভাবে রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত বহু দানক্ষেত্রই অন্যতম দৃষ্টান্ত । যা অবশ্যই দান শব্দটির প্রচলিত ব্যবহারিক পরিসরে নতুন সংযোজন । এই বিষয়ে আলোচনায় অনুসারী হলে দেখা যায়, রামায়ণ ও মহাভারত উভয় মহাকাব্যেই দান শব্দটি প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে যেমন বিষয়বস্তু দান, দক্ষিণা দান ইত্যাদি অর্থে উল্লিখিত হয়েছে এবং সেই সকল ক্ষেত্রেই অধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তির প্রসঙ্গ স্বীকৃত হয়েছে ; তেমনি পাশাপাশি আশ্বাস দান, সম্মতি দান, পরিচয় দান, পরামর্শ দান এইরূপ বহু দান ক্ষেত্রেরই উল্লেখ হয়েছে যে স্থলগুলিতে কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুর প্রতি অধিকারীর স্বত্বনিবৃত্তির কোন প্রসঙ্গ না থাকলেও এই স্থলগুলি দান বলে উল্লিখিত হয়েছে । তাই বর্তমান অধ্যায়ের মহাকাব্যে দান এই পর্বে রামারণ ও মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত এইরূপ কিছু দানক্ষেত্রের উল্লেখ পূর্ব্বক স্থলগুলির দার্শনিক বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করবো এইসকল ক্ষেত্রগুলি মহাকাব্যিক পরিসরে কীরূপে দান বলে বিবেচিত হয়েছে ।

রামায়ণ ও দান :

রামায়ণ তার কথনে ও বর্ণনায় সুবিস্তৃত । সেই সুবিশাল পরিধির মহাকাব্যের আলোচনা বেশ কতগুলি কান্ডে বিভক্ত হয়েছে, যেমন - আদিকান্ড, অযোধ্যাকান্ড, অরণ্যকান্ড, কিষ্কিন্ধ্যা কান্ড, সুন্দরকান্ড, যুদ্ধকান্ড ও উত্তরকান্ড । এই সকল কান্ডের প্রতিটিতেই বর্ণিত 'দান' সম্বন্ধীয় আলোচনায় অনুসারী হলে দেখা যায় যে, এখানে 'দান' শব্দটির উল্লেখ যেমন কোন বিষয় বা বস্তু দান এইরূপ সরাসরি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি প্রচলিত ঐরূপ সরাসরি অর্থ ছাড়াও ভিন্ন অর্থে যেমন, পরিচয় অর্থে দান, পুত্র ও কন্যা দান, বরদান, আশির্বাদ দান, সান্ত্বনা দান, উপদেশ দান, কন্যা সম্প্রদান, অভিশাপ দান, সম্মতি দান, উৎসাহ দান, আশ্বাস দান, জীবন

দান, শাস্তি দান, সংবাদ দান, অনুজ্ঞা দান, ধিক্কার দান, টঙ্কার দান ইতাদি অর্থে গৃহীত হয়েছে। শুধু তাই নয়, কোন কোন কান্ডে দান শব্দটির ঐরূপ প্রয়োগই সংশ্লিষ্ট কান্ডের যাবতীয় আলোচনা ও তাৎপর্য্যের সূচনাকারী রূপেও রামায়ণে পরিবেশিত হয়েছে । আমাদের আলোচনার লক্ষ্য হবে রামায়ণে বর্ণির্ত 'দান' শব্দটির উক্ত সকল নতুন অর্থের ব্যবহার ও উল্লেখ পূর্ব্বক এর সঙ্গে প্রচলিত অর্থের সঙ্গতি বিচার - বিশ্লেষণ করে দেখা যে, উক্ত অর্থগুলির প্রায়োগিক তাৎপর্য্য আদৌ কতদূর গ্রহণযোগ্য । রামায়ণ মহাকাব্যের অন্যতম আদিকান্ডে পরিচয় অর্থে 'দান' শব্দটির প্রয়োগ ও ব্যবহার দিয়েই 'দান' সম্পর্কিত আলোচনার উল্লেখ পাওয়া যায় । যার মধ্যে দিয়ে পাঠক রামায়ণে বর্ণিত চরিত্রগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে । তাই মহাকাব্যে বর্ণিত ঐরূপ পরিচয় অর্থে দান এর উল্লেখ ও প্রয়োগ দিয়েই আমার বর্তমান আলোচনা শুরু করবো ।

পরিচয় অর্থে দান শব্দটির ব্যবহার ও উল্লেখ :

মহাকাব্যিক পরিসরের বিভিন্ন খন্ডে 'পরিচয়' অর্থে দান শব্দটির বহু উল্লেখ ও ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই অদিকান্ডে বর্ণিত অযোধ্যার রাজা দশরথের নির্দেশে জনক রাজার দরবারে ঋষি বশিষ্ঠ কর্তৃক রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের পরিচয় প্রদানের ক্ষেত্রটির উল্লেখ করে বলা যায়, রামচন্দ্র জনক রাজ্যে পরম কল্যাণকর ধনুতে গুণ সংযোজনা করার পর জনক রাজ্যে এক মনোরম ও স্বগীয় ক্ষণের সূচনা হয় । এইরকম পরিস্থিতিকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রাজা দশরথ জনক রাজ্যে উপস্থিত হয়ে রামচন্দ্র ও লক্ষণের জন্য জনক রাজার দুই কন্যা সীতা ও উর্মিলার প্রার্থনা করেন । তিনি জনক রাজাকে অনুরোধ করেন যোগ্য পাত্রের সঙ্গে যোগ্য কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য । এই অবসরে রাজা দশরথের বংশ 'পরিচয় প্রদান' করেন তাঁরই ইচ্ছানুসারে ঋষি বশিষ্ঠ ।[১] এইরূপ পরিচয় প্রদানের মধ্যে দিয়ে জনক রাজা, রামচন্দ্র ও লক্ষণের বংশকূল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত এবং নিজ কন্যাদ্বয়ের সঙ্গে তাঁদের বিবাহ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেন । পরবর্তী সর্গেই আবার দেখা যায় যে, এবার জনকরাজ রাজা দশরথের কাছে অনুমতি চেয়ে নিচ্ছেন তাঁর নিজের বংশ পরিচয় প্রদান করার জন্য । রাজা দশরথের কাছে তিনি অনুরোধ পূর্ব্বক বলছেন কন্যা সম্প্রদানের জন্য

---

১. বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠো বৈদেহমিদমব্রবীৎ । বিদিতং তে মহারাজ ইক্ষ্বাকুকুল দৈবতম্ ।। ১৬
বক্তা সর্বেষু কৃত্যেষু বশিষ্ঠো ভগবান্ ঋষিঃ । বিশ্বামিত্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ সহ সর্বৈর্মহর্ষিভিঃ ।।১৭
এষ বক্ষ্যতি ধর্মাত্মা বসিষ্ঠো মে যথাক্রমম্ । তূষ্ণীম্ভূতে দশরথে বসিষ্ঠো ভগবান্ ঋষিঃ ।।১৮
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞো বৈদেহং সপুরোধসম্ । অব্যক্তপ্রভবো ব্রহ্মা শাশ্বতো নিত্য অব্যয়ঃ ।।১৯
তস্মান্নরীচিঃ সংজজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ । বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মনুর্বৈবস্বতঃ স্মৃতঃ ।। ২০
মনুঃ প্রজাপতিঃ পূর্বমিক্ষ্বাকুশ্চ মনোঃ সুতঃ । তমিক্ষ্বাকুমোযোধ্যায়াং রাজানাং বিদ্ধি পূর্বকম্ ।।২১ (*রামায়ণ, আদিকান্ড,* সর্গ - ৭০, খন্ড- প্রথম, পৃ: ১৪৮)

এইরূপ বংশ পরিচয় প্রদান আবশ্যিক তাই তাকে তাঁর পরিচয় প্রদানের সুযোগ করে দেওয়া হোক । রাজ্ঞা জনকেন স্ববংশস্য কীর্তনম্, শ্রীরাম - লক্ষ্মণয়োর্হস্তে সীতায়া ঊর্মিলায়াশ্চ সম্প্রদানবিষয়ে প্রতিজ্ঞা ।[২] এরপরে দেখা যায়, রাজা দশরথের অনুরোধে বশিষ্ঠের দ্বারা রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সঙ্গে জনক রাজার দুই কন্যা সীতা ও ঊর্মিলার বিবাহ বিষয়ে সম্মতি দান ।[৩]

অযোধ্যাকাণ্ডেও এইরূপ পরিচয় প্রদানের বর্ণনা পাওয়া যায় । সেখানে দেখা যায় যে, দশরথ পুত্র ভরত ভরদ্বাজমুনির কাছে তাঁর সকল মায়ের পরিচয় প্রদান করে বনবাসরত রামের সঙ্গে তাঁর আশ্রমে দেখা করতে যাওয়ার জন্য পথনির্দেশের অনুরোধ করছেন এবং তারপর তিনি মুনি ভরদ্বাজের নির্দেশ মতো তার সুবিশাল সেনাবাহিনী সহ চিত্রকূট অভিমুখে যাত্রা করছেন ।[৪] অরণ্যকাণ্ডেও এইরূপ পরিচয় দানের উল্লেখ পাওয়া যায় । চৌদ্দ বছরের বনবাসের জন্য পঞ্চবটী বনে যাওয়ার সময় পথে রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয় জটায়ুর । তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করায় জটায়ু নিজেকে তাঁদের পিতা দশরথের বন্ধু স্থানীয় বলে উল্লেখ করে রামচন্দ্রের কাছে নিজের কূলের পরিচয় প্রদান করেন এবং তাঁদের বনবাস কালে সীতাকে যেকোন বিপদে রক্ষা করবেন এই মর্মে রামচন্দ্রকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করেন । অরণ্যকাণ্ডে বর্ণিত হয়েছে যে, মহাবলশালী জটায়ুর এই প্রতিশ্রুতিতে রামচন্দ্র অতি সন্তুষ্ট ও প্রীত হন ।[৫]

অরণ্য কাণ্ডেই আবার পরিচয় প্রদানের দ্বিতীয় বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া যায় । সেখানে দেখা যায় পরিচয় দাতা দশানন রাবণ নিজের সত্য পরিচয় গোপন করে সাধুর ছদ্মবেশ ধারণ করে সীতার কাছে নিজেকে ব্রাহ্মণ অতিথি বলে পরিচয় প্রদান করছেন । এক্ষেত্রে পরিচয় দাতা নিজের পরিচয় প্রদানে ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন।[৬] দশানন এক্ষেত্রে নিজের পরিচয় গোপন করে সীতার সঙ্গে ছলনা করলেও পরিবর্তে সীতা তা অনুমান করতে না পেরেও

---

২. *রামায়ণ, আদিকাণ্ড,* সর্গ - ৭১, (খন্ড- প্রথম, পৃ : ১৫১)

৩. জনকস্যেচ্ছয়া সাঙ্কাশ্যানগরীতঃ স্বীয়ভ্রাতুঃ কুশধ্বজস্যানয়নম্, রাজ্ঞোদশরথস্যানুরোধেন বসিষ্ঠেন সূর্যবংশস্য পরিচয়দানম্, শ্রীরাম- লক্ষ্মণয়োর্হস্তে জনককন্যায়াঃ সীতায়াঃ ঊর্মিলায়াশ্চ সম্প্রদানবিষয়ে বসিষ্টস্যানুমোদনম্ । (ঐ, *আদিকাণ্ড,* সর্গ - ৭০)

৪. মুনের্ভরদ্বাজস্য সমীপে প্রত্যাবর্তন - প্রার্থনম্, শ্রীরামস্যাশ্রমং গন্তুং পথনির্দেশ প্রাপ্তিশ্চ, মুনিনা জিজ্ঞাসিতস্য ভরতস্য স্বীয়মাতৃণাং পরিচয়দানম্ । তদনন্তরং সুবিশালসেনাবাহিন্যা সহ চিত্রকূটমভি ভরতস্য যাত্রা চ । (ঐ, *অযোধ্যাকাণ্ড,* সর্গ - ৯২, খন্ড- প্রথম, পৃ : ৪১৪)

৫. 'পঞ্চবটীমভিগমনসময়ে পথি জটায়ুনা সহ শ্রীরামাদীনাং সাক্ষাৎকারঃ, রামসমীপে তস্য বিস্তৃতবিচিত্রপরিচয়দানঞ্চ। (ঐ, *অরণ্যকাণ্ড,* সর্গ - ১৪, খন্ড- প্রথম, পৃ : ৫৮৫)

৬.. 'সন্নাসিরূপং পরিগৃহ্য সীতাসমীপে রাবণস্য গমনম্, অতিথিরূপেণ পরিচয়দানম্, সীতয়া তস্যাভ্যর্থনা চ ।। (ঐ, ঐ, সর্গ - ৪৬, পৃ : ৫১৩)

ছদ্মবেশী রাবণের কাছে নিজের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করলেন ।[৭] কিষ্কিন্ধা কান্ডে মহাবলশালী হনুমানের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে মেরুসাবর্ণির কন্যা স্বয়ম্প্রভার দ্বারা তাঁর নিজের এবং ''ঋক্ষ বিল'' এবং তার অন্দরে সাজানো সব সোনা রুপার মহল এবং ধনরাশি, গাছ - গাছালি ফল- মূল এর নির্মাণকর্তা 'ময়' দানবের পরিচয় প্রদানের উল্লেখ পাওয়া যায় । সুন্দরকান্ডে বর্ণিত হয়েছে যে, সীতার খোঁজে এসে অশোক কাননের ধ্বংস করে ও কিছু বানর সেনার বিনাশ করে রাজা দশাননের কাছে নিজের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে মহাবলশালী হনুমান নিজেকে রামচন্দ্রের দূত বলে উল্লেখ করেন এবং প্রতিযুদ্ধের ভয় দেখান । বিভীষণের দ্বারা রামের কাছে মহাবলশালী কুম্ভকর্ণের পরিচয় দানের উল্লেখও এই সুন্দরকান্ডেই পাওয়া যায়।

সম্প্রদান অর্থে কন্যা ও পুত্র দান :

রামায়ণ মহাকাব্যে 'দান' শব্দটি সম্প্রদান অর্থে কন্যা ও পুত্র প্রসঙ্গেও ব্যবহৃত হয়েছে । কন্যাদান বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই অযোধ্যাকান্ডে বর্ণিত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কাছে রাজা জনকের আবেদনের উল্লেখ করা যায় । সেখানে দেখা যায়, রাজা দশরথ পুত্র রামচন্দ্র মহেশ্বর প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ ধনুতে গুণ সংযোজনা করার পর তাঁর শক্তি ও গুণে আপ্লুত হয়ে জনকরাজ বিশ্বামিত্রের কাছে নিবেদন করলেন যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যাতে সীতা বীর্যশুল্কা হয় । তাই সেই উদ্দেশ্যে তিনি বীরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের হাতে সীতাকে তুলে দেবেন । এতে তিনি অত্যন্ত প্রীত এবং আপ্লুত। তাই তিনি বলেছেন, - 'মম সত্যা প্রতিজ্ঞা সা বীর্যশুল্কেতি কৌশিক । সীতা প্রাণৈর্বহুমতা দেয়া রামায় মে সুতা ।। ২৩'[৮] এইরূপ কন্যাদান তো প্রকৃত অর্থে দান । যেখানে দাতা স্বেচ্ছায় গ্রহীতাকে তার প্রিয় পাত্র বা বিষয়ের প্রতি নিজ সত্ত্বের অধিকার সম্পুর্ণ ত্যাগ করে দান করেন বিনিময়ে কোন প্রত্যাশা না রেখেই। তবে দান কালে দাতা তার মনোমতো গ্রহীতার নির্বাচন করতে পারেন তার গুণের বিচারের প্রেক্ষিতে। দান বিষয়ে এর পূর্ব আলোচনায় আমরা গ্রহীতার এইরূপ গুণবিচারের উল্লেখ পেয়েছি । বলা বাহুল্য জনকরাজ তাঁর কন্যা মৈথিলী সীতাকে রামচন্দ্রের হাতে সম্প্রদান করার আগে মহেশ্বর প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ ধনুতে গুণ সংযোজনা করিয়ে তাঁর শক্তি বা গুণেরই বিচার করেছিলেন । সুতরাং এই ক্ষেত্রে রামায়ণ মহাকাব্যে দান এর উল্লেখ প্রচলিত অর্থেই উল্লিখিত হয়েছে । আবার আদিকান্ডে এই বিষয়ে প্রাচীনকালে প্রজ্ঞাবান কুশনাভ রাজার বংশ পরম্পরাগতভাবে ক্ষমাগুণের কীর্তির কথাও বিশেষ ভাবে বর্ণিত হয়েছে । বর্ণনায় বলা হয়েছে, প্রজ্ঞাবান

---

৭. 'সীতয়া রাবণসমীপে স্বস্যাঃ পতেশ্চ পরিচয়দানম্ , বনাগমনস্য কারণবর্ণনম্ , সীতাং প্রধানমহিষীং কর্তুকামস্য রাবণস্য প্রলোভনম্, ভয়প্রদর্শনঞ্চ । (*রামায়ণ, অরণ্যকান্ড,* সর্গ - ৪৭, পৃ : ৫৮৮)

৮. *রামায়ণ, অযোধ্যাকান্ড,* সর্গ - ৬৭, প্রথম খন্ড, পৃ : ১৪৫

কুশনাভ রাজা ক্ষমাগুণের নৈপুণ্যে, মর্যাদায় ও কীর্তিতে ছিলেন বিশেষ ভাবে খ্যাত এবং এই বিষয়ে উত্তরাধিকারীরূপে কুশনাভের একশত কন্যাও পরম্পরাগতভাবে তাঁদের বংশ মর্যাদার একান্ত অনুসারী ছিলেন। রাজা কুশনাভের একশত কন্যা অসাধারণ রূপেরও অধিকারী ছিলেন। তাঁরা বর্ষার একদিনে সকলে মিলে এক উদ্যানে বেড়াতে বেড়িয়ে অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করছিলেন। এইসময়ে সর্বত্র বিচরণশীল বায়ু তাঁদের দেখেন এবং তাঁদের রূপে মুগ্ধ হয়ে সকলকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। কুশনাভের কন্যারা এই মতে অসম্মত হলে বায়ু অত্যন্ত ক্রূদ্ধ হয়ে তাঁদের শরীরে প্রবেশ করে তাঁদের রূপ ও দৈহিক গঠনকে খর্ব করেন। তবুও সেই তারা তাঁদের মতে স্থিত থেকে নিজেদের ক্ষমানৈপুণ্যে বায়ুকে ক্ষমা দান করেন। ক্ষমানৈপুণ্যের এইরূপ বংশ পরম্পরাগত মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকায় গর্বিত পিতা রাজা কুশনাভ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সকল কন্যার ক্ষমাগুণের প্রশংসা করে আশীর্বাদ করেন এবং তাঁদের সকলকেই ধার্মিক ব্রহ্মদত্তের হাতে সম্প্রদান করেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁদের গ্রহণ করা মাত্রই বায়ুর আঘাতের ফলে সকলেরই যেরূপ শারীরিক বিকৃতি এবং অসুস্থতা ইত্যাদি যাবতীয় হয়েছিল তা থেকে তারা মুক্ত হন। বলা বাহুল্য যে, আদিকান্ডের এইরূপ বর্ণনায় দান শব্দটি ক্ষমা দান এবং সম্প্রদান উভয় অর্থেই ব্যবহার দান সম্পর্কিত প্রচলিত ধারারই অনুসারী হয়েছে। দেখা যায় যে, প্রথমত যেখানে দান শব্দটি ক্ষমা দান এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেক্ষেত্রে তা চিরাচরিতভাবেই দাতার কর্ত্তব্য নৈপুণ্যেরই প্রকাশ করেছে। কারণ যেকোন দানক্রিয়ার ক্ষেত্রেই অন্যতম স্তম্ভরূপে গ্রহীতার উপকার সাধনই দাতার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য এবং এক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাই তা প্রচলিত অর্থেই দান। আবার দ্বিতীয়তঃ রাজা কুশনাভ যখন তাঁর সকল কন্যাকে ধার্মিক ব্রহ্মদত্তের হাতে সম্প্রদান করছেন তখন সেই দান ক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে বৈবাহিক সম্বন্ধ কারণে। কন্যা সম্প্রদান বা বিবাহ দান বিষয়ে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'রাজ্ঞা কুশনাভেন স্ব - তনয়ানাং ক্ষমায়াঃ প্রশংসনম্, মহামতি -ব্রহ্মদত্তেন সহ তাসাং বিবাহদানঞ্চ'।[৯] রাজা কুশনাভ তাঁর একশত কন্যার সঙ্গে ব্রহ্মদত্তের বিবাহ দিতে চাইছেন, তাঁর হাতে তাঁর একশত কন্যাকে সম্প্রদান করতে চাইছেন এমনটিই উল্লিখিত হয়েছে। এইরকম দান ক্রিয়াও প্রথাগত এবং প্রচলিত। শুধু তাই নয় এই প্রসঙ্গেই আদিকান্ডেই ব্রহ্মদত্তের জন্মবৃত্তান্তকে কেন্দ্র করে রামায়ণে 'পুত্র দান' বিষয়টিও বর্ণিত হয়েছে। একসময়ে চুলী নামে এক সদাচারী ব্রহ্মচারী নিজের তপস্যাগুণে ব্রহ্ম সাধনায় রত ছিলেন। তপস্যার সময়ে এক গন্ধর্বী কন্যা সোমদা তাঁর বহু সেবা শুশ্রুষা করেন। সাধনার পরে গুরু চুলী তাকে বরদানে ইচ্ছা প্রকাশ করলে সোমদা একটি ধর্মপুত্রের কামনা করেন। গুরু চুলী সোমদার ইচ্ছানুসারে তাঁকে একটি 'ধর্মপুত্র দান' করেন। উল্লিখিত এইরূপ 'পুত্র দান' বিষয়ে বলা যায় যে, গ্রহীতা তাঁর মনোমতো বিষয় যাঞ্চা করছেন দাতার

---

৯. *রামায়ণ, আদিকাণ্ড,* খন্ড- প্রথম

কাছ থেকে এবং দাতা তা প্রদান করে নিজ ঋণভার থেকে মুক্ত হচ্ছেন । ব্রহ্মবিষয়ক তপস্যা কালে সোমদার সেবা শুশ্রুষা গ্রহণ করে সদাচারী চুলী যেন নিজেকে সোমদার কাছে ঋণী বলেই বোধ করছিলেন । তাই সেই ঋণভার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে এবং অবশ্যই সোমদার সেবাতে সন্তুষ্ট হয়ে উভয় কারণেই সোমদাকে কিছু প্রদান করতে চাইছিলেন, এমতাবস্থায় সোমদার ধর্ম পুত্রের প্রার্থনা করা এবং তাঁর ইচ্ছানুসারেই তাঁকে ‘পুত্র দান’ যেন মনুসংহিতায় উল্লিখিত গুরুর অভীষ্ট বিষয় তাঁকে ‘দান’ করার মতো । যাতে তার প্রয়োজন সাধিত হয়, মনোবাসনার পূরণ হয় । কাজেই ‘দান’ ক্রিয়ায় গ্রহীতার প্রয়োজন পূরণ হবে তাঁর ইচ্ছাকে তৃপ্ত করবে এমন নিয়ম সর্বদাই উল্লিখিত হয়েছে । তাই পুত্র দান অর্থে দান শব্দটির এইরূপ ব্যবহারও প্রথাগত। উল্লেখ্য যে দান শব্দটির এইরূপ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে মহাকাব্যিক পরিসরে একটি নতুন ধারার সূচনা হচ্ছে। যেখানে প্রথাগতভাবে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ না হয়েও কুমারী কন্যার মাতৃত্ব লাভ বা সন্তান প্রাপ্তির একটি নতুন মার্গ বা উপায়ের সূচনা হচ্ছে । যার উল্লেখ পরবর্তীতে মহাভারত মহাকাব্যে কুন্তীর বিবাহ পূর্বে সূর্য্য কর্তৃক পুত্ররূপে কর্ণের প্রাপ্তি প্রসঙ্গেও পাওয়া যায় । উল্লেখ্য যে, প্রাচীন কালে ঐ ধারার প্রবহমানতা বর্তমানেও সুবিস্তৃত হয়েছে। যা ‘একক মাতৃত্ব’ নামক আইনানুগ স্বীকৃতিও লাভ করেছে ।

উপদেশ দান :

রামায়ণ মহাকাব্যের সুন্দরকান্ডে সীতা কর্তৃক দশানন রাবণকে উপদেশ প্রদানের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা এই মহাকাব্যের পরিসরে উপদেশ প্রদানের এক অন্যতম প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । যেখানে দাতা নিজে কষ্টে থেকেও গ্রহীতার মঙ্গলের জন্য উপদেশ বা পরামর্শ দান করছেন । এবিষয়ে সুন্দরকান্ডে বর্ণিত হয়েছে, মারীচের ছলনায় শ্রীরামচন্দ্র ও কনিষ্ঠ লক্ষ্মণকে কুটির থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের অনুপস্থিতিতে দশানন রাবন সাধুর ছদ্মবেশ ধারণ করে ছলনা করে পঞ্চবটী বনে তাদের কুটির থেকে সীতাকে হরণ করে নিয়ে এসে অশোকবনে বন্দী করে রাখেন । এই সময়েই তিনি অসামান্যা সুন্দরী মৈথিলী সীতাকে তাঁর পত্নী হওয়ার জন্য বারংবার কামনা প্রকাশ করতে থাকেন । সীতা রাবণের এই ঔদ্ধত্যে তাঁকে রামের সকল গুণকীর্ত্তণ করে এইধরণের অপরাধ করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ প্রদান করেন । দশানন রাবণ তাঁর প্রতি এইরূপ অন্যায় করা সত্ত্বেও মৈথিলী সীতা তার মঙ্গল কামনায় রামের সঙ্গে শত্রু আচরণ করা থেকে বিরত থেকে মিত্রতা স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছেন । যে দানে দাতা প্রচলিত রীতি মতোই গ্রহীতার হিত সাধন করার কর্ত্তব্য পালন করেছেন, তেমনি গ্রহীতার ক্ষেত্রেও সেই উপদেশ বাক্য অশ্রবণে মন্দ ফলেরও সূচনা হয়েছে । এযেন নিয়ম লঙ্ঘনেরই অনিবার্য্য

ফল ।[১০] কারণ সদুপদেশ সর্বদাই অনুসরণীয় । ধর্মীয় অনুশাসনের নিয়ম নীতি ও শাস্ত্রীয় বিধি বাক্য অন্ততঃ সেকথাই বলে ।

সান্ত্বনা দান :

রামায়ণ মহাকাব্যের পরিসরে সান্ত্বনা দান অর্থে 'দান' শব্দটির বহু ব্যবহার পাওয়া যায় । এই সম্বন্ধে মহাকাব্যের বিভিন্ন কাণ্ডে বর্ণিত বহু তাৎপর্য্যপূর্ণ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায় । যেমন - অযোধ্যাকাণ্ডে বর্ণিত হয়েছে, কৈকেয়ীকে দেওয়া রাজা দশরথের সত্যবচন রক্ষার জন্য রাম চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাস করবেন এমন সংকল্প করেন । এই বিষয়ে তাঁকে পিতা রাজা দশরথ এবং মা কৌশল্যা ও সুমিত্রা নিবৃত্ত করতে চাইলেও রামচন্দ্র তাঁর সংকল্পে দৃঢ় প্রতিজ্ঞই থাকেন । বরং বনবাসে তাঁর সঙ্গে অনুসারী হন স্ত্রী সীতা এবং ভাই লক্ষণ । বনবাসে যাওয়ার সময় পিতা রাজা দশরথের কাছ থেকে তিনি অনুমতি প্রার্থনা করেন । [১১] এইসময়ে তিনি দেখেন তার এইরূপ দৃঢ সিদ্ধান্তে রাজা দশরথ মনে মনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন, তিনি তাঁর পুত্রের জন্যে দুঃখে কাতর হয়ে পড়েছেন । এই সময়েই রামচন্দ্র তাঁর পিতাকে প্রবোধ বা সান্ত্বনা দান করে তাঁকে আশ্বস্ত করেন । [১২] সান্ত্বনা

---

১০. দুঃখার্তা রুদতী সীতা বেপমানা তপস্বিনী । চিন্তয়তী বরারোহা পতিমেব পতিব্রতা ।।২
তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা প্রত্যুবাচ শুচিস্মিতা । নিবর্তয় মনো মত্তঃ স্বজনে প্রীয়তাং মনঃ ।। ৩
ন মাং প্রার্থয়িতুং যুক্তস্তবং সিদ্ধিমিব পাপকৃৎ । অকার্যং ন ময়া কার্যমেকপত্ন্যা বিগর্হিতম্ ।।৪
রাবণং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা ভূয়ো বচনমব্রবীৎ । নাহমৌপয়িকী ভার্যা পরভার্যা সতী তব ।।৬
সাধু ধর্মমবেক্ষস্ব সাধু সাধুব্রতং চর । যথা তব তথান্যেষ্যাং রক্ষা দ্বারা নিশাচর ।।৭
আত্মানমুপাং কৃত্বা স্বেদু দারেষু রম্যতাম্ । অতুষ্টং স্বেদু দারেষু চপলং চপলেন্দ্রিয়ম্।
নয়ন্তি নিকৃতিপ্রজ্ঞং পরদারাঃ পরাভবম্ ।।৮
ইহ সন্তো ন বা সন্তি সতো বা না নু বর্তসে । যথা হি বিপরীতা তে বুদ্ধিরাচারবর্জিতা ।।৯
বচো মিথ্যাপ্রণীতাত্মা পথ্যমুক্তং বিচক্ষণৈঃ । রাক্ষসানামভাবায় ত্বং বা ন প্রতিপদ্যসে ।। ১০
অকৃতাত্মানমাসাদ্য রাজানমনয়ে রতম্ । সমৃদ্ধানি বিনশ্যন্তি রাষ্ট্রাণি নগরাণি চ ।। ১১ (*রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড,* সর্গ - ২১, খন্ড- দ্বিতীয়, পৃ: ৭৫)

১১. আপৃচ্ছে ত্বাং মহারাজ সর্বেষামীশ্বরো হসি নঃ । পরস্তিতং দন্ডকারণ্যং পশ্য ত্বং কুশলেন মাম্ ।।২২
লক্ষ্মণং চানুজানীহি সীতা চান্বেতু মাং বনম্ । কারণৈর্বহুভিস্তথ্যৈর্বার্যমাণৌ ন চেচ্ছতঃ ।। ২৩
অনুজানীহি সর্বান্নঃ শোকমুৎসৃজ্য মানদ । লক্ষ্মণং মাঞ্চ সীতাঞ্চ প্রজাপতিরিবাত্মজান্ ।।২৪ (*রামায়ণ, অযোধ্যাকান্ড,* চতুস্ত্রিংশ সর্গ, খণ্ড- প্রথম, পৃ : ২৭২)

১২. ইয়ং সরাষ্ট্রা সজনা ধন - ধানশ্যশ্যামাকুলা । ময়া বিসৃষ্টা বসুধা ভরতায় প্রদীয়তাম্ ।। ৪১
বনবাসকৃতা বুদ্ধির্ন চ মে হদ্য চলিষ্যাতি । যস্তু যুদ্ধে বরো দত্তঃ কৈকেয্য বরদ ত্বয়া ।। ৪২
দীয়তাং নিখিলনৈব সত্যস্তং ভব পার্থিব । অহং নিদেশং ভবতো যথোক্তমনুপালয়ন্ ।।৪৩
চতুর্দশ সমা বৎস্যে বনে বনচরৈঃ সহ । মা বিমর্শো বসুমতী ভরতায় প্রদীয়তাম্ ।।৪৪
নহি মে কাঙ্খিতং রাজ্যং সুখমাত্মনি বা প্রিয়ম্ । যথা নিদেশং কর্তুং বৈ তবৈব রঘুনন্দন ।।৪৫
অপগচ্ছতু তে দুঃখং মা ভূর্বাষ্পপরিপ্লুতঃ । ন হি ক্ষুভ্যতি দুর্ধর্ষঃ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ।।৪৬
নৈবাহং রাজ্যমিচ্ছামি ন সুখং ন চ মেদিনীম্ । নৈব সর্বানিমান্ কামান্ন স্বর্গং ন চজীবিতুম্ ।।৪৭
ত্বামহং সত্যমিচ্ছামি ন সুখং নানৃতং পুরুষর্ষভ । প্রত্যক্ষং তব সত্যেন সুকৃতেন চ তে শপে ।।৪৮
ন চ শক্যং ময়া তাত স্তাতুং ক্ষণমপি প্রভো । স শোকং ধারয়স্বেমং নহি মেহ স্তি বিপর্যয়ঃ ।।৪৯
অর্থিতো হ্যস্মি কৈকেয্যা বনং গচ্ছেতি রাঘব । ময়া চোক্তং ব্রজমীতি তৎ সত্যমনুপালয়ে ।।৫০ (ঐ, *অযোধ্যাকান্ড,* চতুস্ত্রিংশ সর্গ, খণ্ড- প্রথম, পৃ : ২৭৩ - ২৭৪)

দান প্রসঙ্গে সুন্দরকান্ডে বর্ণিত হয়েছে, অশোকবনে বন্দী থাকাকালে বীর হনুমানের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর বৈদেহী সীতা শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ কেন শত্রুদের বধ করে তাঁকে উদ্ধার করছেন না এই ভেবে যখন বিচলিত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করছিলেন তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বীর হনুমান আশ্বাস প্রদান করেছিলেন ।[১৩] হনুমানের এইরূপ সান্ত্বনা বাক্যে দুঃখাতুর সীতা আশ্বস্ত হন । তিনি বিলাপ বন্ধ করেন । যুদ্ধকান্ডেও এইরূপে সীতাকে সান্ত্বনা দানের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেখানে অশোকবনে সীতার প্রহরী রাক্ষসী সরমার দ্বারা সীতাকে সান্ত্বনা দানের উল্লেখ পাওয়া যায় । যুদ্ধকান্ডে এই বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, মৈথিলী সীতাকে বিচলিত করে, দুঃখে কাতর করে নিজের সঙ্গে বিবাহে সম্মত করাতে পারবেন এইভেবে যখন লঙ্কার রাজা দশানন রাবণ ছলনা করে রামের কাটা মুন্ড নিয়ে এসে সীতাকে দেখিয়ে রামের মৃত্যু সংবাদ দেন এবং তা দেখে সীতা বিচলিত হয়ে পড়েন । তিনি শোকে দুঃখে কাতর হয়ে বিলাপ শুরু করেন । এই সময়ে সরমা তাঁকে রামের স্বরূপ, পরিচয় ও তাঁর শক্তি সম্বন্ধে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করেন । রামায়ণ মহাকাব্যে সান্ত্বনা দানের আরও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেমন- যুদ্ধকান্ডেই বর্ণিত হয়েছে দশানন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ কালে মেঘনাদের দ্বারা নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে অচৈতন্য ও রক্তাক্ত লক্ষ্মণকে মাটিতে নিথর ভাবে পড়ে থাকতে দেখে রাম বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন । এইসময়ে বিভীষণকে আসতে দেখে রাঘব পক্ষের বানর সৈন্যরা সবাই তাঁকে রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিৎ ভেবে পালাতে শুরু করলে ভল্লুকরাজা মহাত্মা জাম্ববান তাঁদের আশ্বাস দান করেন । তাতে রাঘব পক্ষের বানর সেনারা আশ্বস্ত হন ।

আবার অরণ্যকান্ডে দেখা যায়, সীতা হরণের পর শোকে ও দুঃখে কাতর রামচন্দ্রকে অতি ক্রুদ্ধ হতে দেখে লক্ষ্মণ সভয়ে জগতের হিতার্থে রামচন্দ্রকে সান্ত্বনা দান করছেন । এইরূপ প্রবোধ বাক্যের মধ্যে দিয়ে কনিষ্ঠ ভাই লক্ষ্মণ তাঁর জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রকে তাঁর স্বরূপ সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, মনে করিয়ে দিচ্ছেন রাজার কর্ত্তব্য কর্ম বিষয়ে যাবতীয় ভূমিকা বিষয়ে । যাতে সীতা বিরহে সদাচারী রামচন্দ্রের দ্বারাও কোন অন্যায় কর্ম সাধিত না হয়ে পড়ে সেই বিষয়ে কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ সদা তৎপর থেকেছেন । নিজে সঙ্গে থেকে রামচন্দ্রের যাবতীয় কর্মে সাহায্য করতে চেয়েছেন । লক্ষ্য রেখেছেন রামচন্দ্রের রোষে পড়ে সমগ্র জগৎবাসীর কোন ক্ষতি না হয়ে যায় । রাজা তাঁর কোমল ও রাজোচিত স্বভাবে ও বীর্যে কেবল অন্যায় কর্ম সাধনকারীর বিনাশ করবেন,তাঁকে

১৩. পুনরপ্যহমার্যান্তামিদং বচনমব্রুবম্ । ত্বচ্ছোকবিমুখো রামো দেবি সত্যেন তে শপে ।। ২৫
রামে দুঃখাভিভূতে চ লক্ষ্মণঃ পরিতপ্যতে । কথঞ্চিদ্ভবতী দৃষ্টা ন কালঃ পরিশোচিতুম্ ।।২৬
ইদং মুহুর্তং দুঃখানামন্তং দ্রক্ষ্যসি ভামিনি । তাবুভৌ নরশার্দূলৌ রাজপুত্রৌ পরন্তপৌ ।।২৭ (ঐ, *সুন্দরকান্ড,* সপ্তষষ্টি সর্গ, খন্ড - দ্বিতীয়, পৃ : ২১৪)

দণ্ড দেবেন এই নিয়মেই রাজ্যে সুশাসন ব্যবস্থা অটুট থাকবে । রাজবাস ত্যাগ করে চোদ্দ বছরের জন্য পালন করতে এসেও যাতে ব্রহ্মচারী রাম কখনও নিজের ক্ষতি করে না বসেন সেই বিষয়েও লক্ষ্মণ তৎপর থেকেছেন।[১৪] সীতা বিরহে কাতর রামচন্দ্রকে সান্ত্বনা দান করেছেন, বানর কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৫]

মহাকাব্যিক পরিসরে বর্ণিত সান্ত্বনা দানের উক্ত ক্ষেত্রগুলির আলোচনা বা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই সকল ক্ষেত্রে 'দান' বিষয়টির সঙ্গে যেরূপ কোন বিষয় বা বস্তু দানের সম্পর্ক তেমন কোন সম্পর্ক এইরূপ সান্ত্বনা বা প্রবোধ দানের পরিসরে স্বীকৃত না হলেও এই দান ক্ষেত্রেও দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ক অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ । কারণ প্রচলিত অর্থে যেখানে দাতা কোন গ্রহীতাকে কোন বস্তু বা বিষয়ের দান করে তাঁর অভাব বা চাহিদার পূরণ করে তার অসহায় অবস্থায় সহায় হন, তার কষ্টের দূর করে তাঁকে সম্মানিত করেন । ঠিক তেমন ভাবে কোন বিষয় বা বস্তুর দান এইরূপ সান্ত্বনা দানের ক্ষেত্রে না থাকলেও দানের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ গ্রহীতার প্রয়োজন সাধন তা কিন্তু বজায় থেকেছে । কারণ মহাকাব্যে বর্ণিত সান্ত্বনা দানের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, দাতা অর্থাৎ সান্ত্বনা দাতা তিনি তাঁর সুপরামর্শ বা প্রবোধ বাক্যের মধ্যে দিয়ে দুঃখে আর্তকে তার অসহায় অবস্থা থেকে, তার দুঃখ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করছেন । দাতার এইরূপ বরাভয় বাক্যে গ্রহীতাও

---

১৪. পুরা ভূত্বা মৃদুর্দান্তঃ সর্বভূতহিতে রতঃ । ন ক্রোধবশমাপন্নঃ প্রকৃতিং হাতুমর্হসি ।। ৪
চন্দ্রে লক্ষ্মীঃ প্রভা সূর্যে গতির্বায়ৌ ভুবি ক্ষমা । এতচ্চ নিয়তং নিত্যং ত্বয়ি চানুমত্তং যশঃ ।।৫
একস্য নাপরাধেন লোকানং হন্তুং ত্বমর্হসি । ননু জানামি কস্যায়াং ভগ্নঃ সাংগ্রামিকো রথঃ।। ৬
কেন বা কস্য বা হেতোঃ সযুগঃ সপরিচ্ছদঃ । খুরনেমিক্ষতশ্চায়ং সিক্তো রুধিরবিন্দুভিঃ ।।৭
দেশো নিবৃত্তসংগ্রামঃ সুঘোরঃ পার্থিবাত্মজঃ । একস্য তু বিমর্দো হয়ং ন দ্বয়োর্বদতাং বর ।।৮
ন হি বৃত্তং হি পশ্যামি বলস্য মহতঃ পদম্ । নৈকস্য তু কৃতে লোকান্ বিনাশায়িতুমর্হসি ।।৯
যুক্তদন্ডা হি মৃদবঃ প্রশান্তা বসুধাধিপাঃ । সদা তং সর্বভূতানাং শরণ্যঃ পরমা গতিঃ ।।১০
কো নু দারপ্রাণাশং তে সাধু মন্যতে রাঘব । সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস দেব- গন্ধর্ব- দানবাঃ ।।১১
নালং তে বিপ্রিয়ং কর্তুং দীক্ষিতস্যেব সাধবঃ । যেন রাজন্ হৃতা সীতা তমন্বেষিতুমর্হসি ।।১২ (*রামায়ণ, অরণ্যকান্ড,* সর্গ- ৬৫, খণ্ড - প্রথম, পৃ ৬৩৫)

১৫. ন জানে নিলয়ং তস্য সর্বথা পাপরাক্ষসঃ । সামর্থ্যং বিক্রমং বাপি দৌষ্কুলেয়স্য বা কুলম্ ।। ২
সত্যং তু প্রতিজানামি ত্যজ শোকমরিন্দম্ । করিষ্যামি তথা জত্নং যতা প্রাপ্স্যসি মৈথিলীম্ ।। ৩
রাবণং সগণং হত্বা পরিতোষ্যাত্মপৌরুষম্ । তথা হস্মি কর্তা নচিরাদ্ যথা প্রীত ভবিষ্যসি ।।৪
অলং বৈক্লব্যমালম্ব্য ধৈর্যমাত্মগতং স্মর । তদ্বিধানাং ন সদৃশমীদৃশং বুদ্ধিলাঘবম্ ।।৫
ময়াপি ব্যসনং প্রাপ্তং ভার্যাবিরহজং মহৎ । নাহমেবং হি শোচামি ধৈর্যং ন চ পরিত্যজে ।।৬
নাহং ত্বামনুশোচামি প্রাকৃতো বানরে হপি সন্ । মহাত্মা চ বিনীতশ্চ কিং পুনর্ধতিমান্ মহান্ ।।৭
বাষ্পমাপতিতং ধৈর্যান্নিগৃহীতুং ত্বমর্হসি । মর্যাদাং সত্ত্বযুক্তানাং দৃতিং নোৎস্রোষ্টুমর্হসি ।।৮
ব্যসনে বার্থকৃচ্ছে্ বা ভয়ে জীবিতান্তগে । বিমৃশংশ্চ স্বয়া বুদ্ধ্যা ধৃতিমান্নাবসীদতি ।।৯
বালিশস্তু নরো নিত্যং বৈক্লব্যং যো হনুবর্ততে । স মজ্জত্যবশঃ শোকে ভারাক্রান্তেব নৌর্জলে ।।১০
এষো হঞ্জলির্ময়া বদ্ধঃ প্রণয়াৎ ত্বাং প্রসাদয়ে । পৌরুষং শ্রয় শোকস্য নান্তরং দাতুমর্হসি ।। ১১ (*রামায়ণ, কিষ্কিন্ধাকান্ড,* সপ্তম সর্গ, খণ্ড -প্রথম, পৃ : ৬৮৪)

পরম স্বস্তি ও শান্তিলাভ করছেন, তিনি আশ্বস্ত হচ্ছেন । দাতা তাঁর দৃঢ়চেতা মনোভাবে গ্রহীতাকে সাহস দিচ্ছেন, তিনি যাতে দুঃখে ভেঙে না পড়েন সেই মর্মে তাঁকে পরামর্শ দান করছেন । কাজেই এইরূপ সান্ত্বনা দান সেই অর্থে প্রচলিত বা প্রথাগত ভাবে কায়িক বা শারীরিক ভাবে সম্পন্ন দান না হলেও গ্রহীতার উপকার সাধনের লক্ষ্যে বৃহত্তর অর্থে এও একরকম মানসিক দান । তাৎপর্য্য বা গুরুত্বের বিচারে যার মূল্য নেহাৎ কম নয় ।

সম্মতি দান :

সম্মতি দান অর্থে রামায়ণে দান শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে । অযোধ্যাকান্ডে বর্ণিত হয়েছে যে, রামের রাজ্যাভিষেকের জন্য রাজা দশরথ গুরু বশিষ্ঠের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন । তাঁর অনুমতি পেয়ে তিনি নিজে রাজকর্মচারীদের প্রতি এই রাজ্যাভিষেকের জন্য প্রয়োজনীয় উপচার সংগ্রহ করার অনুমতি দান করেন। এই প্রকার 'দানোল্লেখে' আরও এক 'দান' ক্রিয়ার আভাষ আছে । যা বস্তু দানেরই এক প্রকার । গুরু বশিষ্ঠ রামের রাজ্যাভিষেকের জন্য পূজোর নানারূপ উপচার সহ স্বর্ণাদি রত্নরাজি, মধু, ঘি, খৈ, মালা, নতুন নতুন বাসন, বস্ত্র, রথ, মঙ্গল লক্ষণের হাতি, যুদ্ধের জন্য সবরকমের অস্ত্র ইত্যাদি সবেরই আয়োজন করতে বলেন । শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর পরিমাণ ঘি, দধি, খৈ এবং দক্ষিণা দান করার নির্দেশ দেন । বলা বাহুল্য এই প্রকার দান ব্যবস্থা মহাকাব্যিক পরিসরে দক্ষিণা দান অর্থেই উল্লিখিত হয়েছে । এই সম্বন্ধে বশিষ্ট আরও নির্দেশে জানা যায়, এইরকম মহৎ অনুষ্ঠানের দিনে রাজ্যের সকল দেব - দেবীর মন্দির সাজিয়ে তোলার বিষয়ে এবং রাস্তার চৌমাথাগুলিতে তালবাদ্যজীবি, মহিলাশিল্পী, সঙ্গীতের দ্বারা যাঁরা জনগণের মনোরঞ্জন করবেন সেই সকল গণিকা গণের জন্যেও নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসহ যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষিণার আয়োজন করে রাখার সুষ্ঠু আয়োজন করা হয়েছিল । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, 'দান' বিষয়ক এই গবেষণায় নানা অনুসন্ধানের মধ্যে এও এক প্রকার নতুন তথ্য যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় গনিকাগণ বর্তমান সমাজের মতো নিন্দিতা এবং ঘৃণিতা ছিলেন না। তাই রাজ্যাভিষেকের মতো শুভকার্যেও তাঁরা যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গেই নিমন্ত্রিত অতিথি হতেন, তাঁদের যত্ন আত্তি করার জন্যে যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হতো । তাঁরা গুনীজনের মধ্যেই উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গেই সমাদৃত হতেন । এই বিষয়ে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার যে পূর্ণসম্মতি ছিলো তারই উল্লেখ পাওয়া যায়, অযোধ্যাকান্ডের এই তৃতীয় সর্গের আলোচনায়। অযোধ্যাকান্ডেই অন্যত্র ত্রিশতম সর্গে এইরূপ সম্মতি দানের আরও এক উল্লেখ পাওয়া যায় । এই ক্ষেত্রে দাতারূপে শ্রীরামচন্দ্র এবং গ্রহীতারূপে তাঁর পত্নী স্বয়ং সীতার উল্লেখ পাওয়া যায় । পিতার সত্যরক্ষার জন্য বনবাসে যাওয়ার জন্য রামচন্দ্র যখন প্রস্তুতি নিচ্ছেন সেই সময়ে

সীতার আকুতি যে তিনিও যাতে রামচন্দ্রের সঙ্গে বনবাসে যাওয়ার অনুমতি পান । প্রথমে রামচন্দ্র এবিষয়ে অসম্মত হলেও বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে সীতা রামচন্দ্রের সম্মতি আদায় করেন । এইরূপ আশ্বাস বা সম্মতি দানেও কিন্তু দাতার দানে গ্রহীতা অত্যন্ত প্রীত, আনন্দিত । সম্মতি দান অর্থে অনুমতি দানেরও উল্লেখ পাওয়া যায় কিষ্কিন্ধাকান্ডে, যেখানে শ্রীরামচন্দ্র বানর রাজ বালির মৃত্যুর পর তাঁর পারলৌকিক আচার সম্পন্ন করার জন্য সুগ্রীব, অঙ্গদকে অনুমতি দান করছেন ।

অভিশাপ দান :

রামায়ণ মহাকাব্যের কিষ্কিন্ধাকান্ডে 'অভিশাপ দান 'এর ক্ষেত্রটিরও উল্লেখ পাওয়া যায় । এই বর্ণনায় দেখা যায় নিজের শক্তিবলে উন্মত্ত ও আত্মহারা হয়ে গর্বিত ইন্দ্রপুত্র বালি অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে, অসুরদের পরাজিত করে দুন্দুভিকে মাটীতে আছড়ে ফেলে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত করেন । তারপরে তাকে তুলে ধরে একযোজন দূরে ফেলে দিলে দুন্দুভির নিষ্প্রাণ দেহ মাতঙ্গ মুনির আশ্রমে গিয়ে পড়ে এবং তার থেকে রক্ত নির্গত হতে থাকে । এই অবস্থা দেখে মাতঙ্গ মুনি তপোবলে বানর বালির এইরূপ দুষ্কর্ম জানতে পেরে তাকে অভিশাপ প্রদান করেন । কিস্কিন্ধাকান্ডে এইরূপ অভিশাপ প্রদানের বিষয়টি অভিশাপ দান অর্থেই উল্লিখিত হয়েছে। মহাকাব্যিক পরিসরের 'দান' - এর এইরূপ ভিন্নার্থে প্রয়োগ দেখে এই প্রশ্ন মনে হতেই পারে যে, বস্তু বা বিষয় দানের মতো কোন কিছু প্রদান তো এক্ষেত্রে হয় না । তবে এ কীরূপ দান এবং 'দান' শব্দটির এইরূপ প্রয়োগিক ব্যবহার আদৌ কতদূর যুক্তিযুক্ত ? এই প্রসঙ্গে বলা যায়, এক্ষেত্রে 'দান' শব্দটিকে অভিশাপ দেওয়া অর্থে যেন এক প্রকার দান, এই প্রকারে ব্যবহার করা হয়েছে । যেখানে গ্রহীতার কোন প্রয়োজন পূরণ না হলেও দাতার মনোবাসনা চরিতার্থতা পায় । বলা বাহূল্য যে, 'দান' শব্দটির কেবল এইরূপ ব্যবহারিক প্রয়োগ কিন্তু এক্ষেত্রে মূল 'দান' বিষয়টি থেকে তাকে ভিন্নভাবেই পরিবেশিত করেছে। কিংবা বলা যায় এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই 'অভিশাপ দান' এর ক্ষেত্রটি 'দান' ক্রিয়ার অন্যতম লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে । কারণ গ্রহীতার মঙ্গল সাধনই যেখানে সকল দানের মূল লক্ষ্য সেখানে 'অভিশাপ দান' এর ক্ষেত্রটি কেবলই 'দান' শব্দটির ব্যবহারিক প্রয়োগ মাত্র তার অতিরিক্ত কিছু নয় । কারণ এই দানে গ্রহীতার মঙ্গল নয় বরং অমঙ্গলেরই সূচনা হয় । তাই 'অভিশাপ দান' এর ক্ষেত্রটি প্রকৃত 'দান ক্রিয়া'র পরিসরে কেবলই শব্দ পদবাচ্য মাত্র, এর অতিরিক্ত কোন তাৎপর্য্য নেই ।

জীবন দান :

রামায়ণে সীতার দ্বারা জীবন দানেরও উল্লেখ পাওয়া যায় । বনবাসকালে দন্ডকারণ্যে বসবাস করার সময় রামচন্দ্র একবার লক্ষ্মণকে নিয়ে সেই বনে বসবাসকারী রাক্ষস ও রাক্ষসীগণকে হত্যা করতে উদ্যত হলে তাঁর স্ত্রী সীতা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন একজন ক্ষত্রিয় রাজার পরম ধর্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম বিষয়ে । তিনি রামকে পরামর্শ দিয়েছেন যে, বীনা অপরাধে কাউকেই হত্যা করা যুক্তিযুক্ত নয় ।[১৬] এইরকম জীবন দানের উল্লেখ পাওয়া যায় কিষ্কিন্ধাকান্ডেও । যেখানে কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ সমগ্র জগৎবাসীর কল্যাণে সীতাহরণে ক্রুদ্ধ রামচন্দ্রের রোষের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর জেষ্ঠ্যকে শান্ত হতে পরামর্শ দিচ্ছেন, তাঁকে তাঁর ক্ষত্রিয়োচিত ধর্মের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন । যাতে করে সীতা হরণে অপরাধী ব্যতীত অন্য কেউই কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হন সেই বিষয়ে লক্ষ্মণ উদ্বিগ্ন ও আশঙ্কিত হয়েছিলেন । তিনি ঐরূপে তাঁর জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রকে সান্ত্বনা দান করে বহু নিরপরাধের জীবন দান করেছিলেন । এইরূপে রামায়ণে সান্ত্বনা দানের মধ্যে দিয়ে জীবন দানের অভিনব উল্লেখ তাৎপর্যপূর্ণ্য ।

একইরকম ভাবে রামায়ণ মহাকাব্যের বিভিন্ন কান্ডে সংবাদ দান, উৎসাহ দান , বরদান, অনুজ্ঞা দান, টঙ্কার দান, ধিক্কার দান ইত্যাদিরও উল্লেখ পাওয়া যায় । যেমন - যুদ্ধ কান্ডে সংবাদ দানের প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, বিভীষণের অভিষেক করে, তাঁর অনুমতি নিয়ে হনুমানকে লঙ্কা নগরীর অশোক বনে প্রবেশ করে মৈথিলী সীতাকে তাঁর কুশল সংবাদ দান করার নির্দেশ দেন শ্রীরামচন্দ্র । যাতে তিনি আশ্বস্ত হন ।[১৭] আবার উৎসাহ দান প্রসঙ্গে কিষ্কিন্ধা কান্ডের পঁয়ষট্টি সর্গে বর্ণিত বানর সেনাপতি অঙ্গদের দ্বারা সমগ্র বানর সেনাদের উৎসাহ দান - এর উল্লেখ করা যায় । সীতার উদ্ধারে এসে বানর সেনাগণ যখন সাগরতীরে পৌছেঁ কীভাবে ঐ বিশাল সাগর পার করবেন এইভেবে ভীত সন্তপ্তঃ হচ্ছেন সেই সময়ে তাঁদের মনে আস্থা স্থাপন করে তাঁদের বিশ্বাস ও উৎসাহ

---

১৬. স্নেহাচ্চ বহমানাচ্চ স্মারয়ে ত্বাং তু শিক্ষয়ে । ন কথঞ্চন সা কার্য্যা গৃহীত ধনুষা ত্বয়া ।।২৪
বুদ্দির্বৈরং বিনা হন্তুং রাক্ষসান্ দন্ডকাশ্রিতান্ । অপরাধং বিনা হন্তুং লোকো বীর ন মংস্যতে ।। ২৫
ক্ষত্রিয়াণাং তু বীরাণাং বনেষু নিয়ত্মানাম্ । ধনুসা কার্যমেতাবদার্তানামভিরক্ষণম্ ।।২৬
ক্ব চু শস্ত্রং ক্ব চ বনং ক্ব চ ক্ষাত্রং তপঃ ক্ব চ । ব্যাবিদ্ধমিদমস্মাভির্দেশধর্মাস্তু পূজ্যতাম্ ।। ২৭
কদর্যকলুষা বুদ্ধির্জায়তে শস্ত্রসেবনাৎ । পুনর্গত্বা ত্বযোধ্যায়াং ক্ষত্রধর্মং চরিষ্যাসি ।।২৮ (*রামায়ণ, যুদ্ধকান্ড,* দ্বিতীয় খন্ড, সর্গ - ১১২, পৃ: ৫৮২)

১৭. কৃতকার্যং সমৃদ্ধার্থং দৃষ্টা রামো বিভীষণম্ । প্রতিজগ্রাহ তৎসর্বং তস্যৈব প্রীতিকাম্যয়া ।।২২
ততঃ শৈলোপমং বীরং প্রাঞ্জলিং প্রণতং স্থিতম্ । উবাদেচং বচো রামো হনূমন্তং প্লবঙ্গমম্ ।।২৩
অনুজ্ঞাপ্য মহারাজমিমং সৌম্য বিভীষণম্ । প্রবিশ্য নগরীং লঙ্কাং কৌশলং ব্রূহি মৈথিলীম্ ।।২৪
বৈদেহ্যৈ মাঞ্চ কুশলং সুগ্রীবঞ্চ সলক্ষ্মণম্ । আচক্ষ বদতাগ শ্রেষ্ঠ রাবণঞ্চ হতং রণে ।।২৫
প্রিয়মেতদিহাখ্যাতি বৈদেহ্যাস্তবং হরীশ্বর । প্রতিগৃহ্য তু সনদেশমুপাবর্তিতুমর্হসি ।।২৬ (*রামায়ণ, যুদ্ধকান্ড,* দ্বিতীয় খন্ড, সর্গ - ১১২, পৃ : ৫৮২)

দান করেন বানর সেনাপতি অঙ্গদ্ । একই বিষয়ে পরবর্তী ছেষট্টিতম সর্গেও জাম্ববানের দ্বারা বীর হনুমানকে সমুদ্র লঙ্ঘনের উৎসাহ দানের উল্লেখ পাওয়া যায় । এই বিষয়ে এই সর্গে হনুমানের জন্ম বৃত্তান্তও বর্ণিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই উল্লিখিত হয়েছে, দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক হনুমানকে বরদানের প্রসঙ্গটিও । বজ্রের আঘাতেও বীর বলশালী হনুমানের কোন ক্ষতি হতে না দেখে মনে মনে তাঁর শক্তির প্রশংসা করে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে ইচ্ছামৃত্যুর বর প্রদান করেন । বর দানের উল্লেখ পাওয়া যায় আদিকান্ডের ষোড়শ সর্গেও । দেখা যায়, ব্রহ্মা রাবণের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দান করেন । সেই বরে রাবণ আশির্বাদ পেলেন মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রানীই তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না । [১৮] এইরকম বরদান ভৃগুমুনি রাজা সগরের উদ্দেশ্যেও করেন । আদিকান্ডের আটত্রিশতম সর্গে উল্লিখিত হয়েছে ভৃগুমুনি সগররাজা ও তাঁর দুই পত্নী সহ হিমালয়ে গিয়ে একশত বছর তপস্যা করেছিলেন । তপস্যার শেষে ভৃগুমুনি সত্যবাদী ধর্মপ্রাণ সগর রাজাকে তাঁর পুত্র প্রাপ্তির বর দান করেন । যা তাঁর বহু দিনের আকাঙ্খা তথা কামনা পূরণের সহায়ক হয় । আবার রাজা দিলীপের পুত্র ভগীরথের প্রতিও গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনার জন্য ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর উভয়েই যে বর দান করেন, তার উল্লেখ পাওয়া যায় আদিকান্ডের বিয়াল্লিশ এবং তেতাল্লিশতম সর্গে ।

উত্তর কান্ডে অনুজ্ঞা দানের উল্লেখ হয়েছে । পুত্রদ্বয় লব কুশকে তাঁদের স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত করে যখন শ্রীরামচন্দ্র নিজে স্বর্গে যাওয়ার উদ্যোগ করছেন, সেই সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত বিভীষণের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র বলেন, যতদিন পৃথিবীতে জীব জীবন ধারণ করবে ততদিন পৃথিবীতে বিভীষণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে । তাঁর এইরূপ অনুজ্ঞায় বিভীষণ প্রীত ও আনন্দিত হন ।[১৯] রামায়ণ মহাকাব্যে টঙ্কার দান অর্থে ধনুতে 'জ্যা' ধ্বনির কথা বলা হয়েছে । কিষ্কিন্ধানগরীতে প্রবেশ করে লক্ষ্মণ নিজের এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের আগমনের সূচনা দিয়েছিলেন ধনুর টঙ্কার দান করে । এক্ষেত্রে 'দান' শব্দটি বিশেষ রকমের শব্দের ইঙ্গিতার্থেই উল্লিখিত হয়েছে ।

---

১৮. স হি তেপে তপস্তীব্রং দীর্ঘকালমরিন্দমঃ । যেন তুষ্টো হ ভবদ্ ব্রহ্মা লোককৃল্লোকপূর্বজঃ ।।৪
সন্তুষ্টঃ প্রদদৌ তস্মৈ রাক্ষসায় বরং প্রভুঃঃ । নানাবিধেভ্যো ভূতেভ্যো ভয়ং নান্যত্র মানুষাৎ ।।৫ (ঐ, *আদিকান্ড,* সর্গ- ১৬, খন্ড-প্রথম, পৃ : ৪১)

১৯. যাবৎ প্রজা ধরিষ্যন্তি তাবৎ ত্বং বৈ বিভিষণ । রাক্ষসেন্দ্র মহাবীর্য লঙ্কাস্থঃ স্বং ধরিষ্যসি ।।২৭
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্যশ্চ যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী । যাবচ্চ মৎকথা লোকে তাবৎ রাজ্যং তবাস্তিহ ।। ২৮
শাসিতশ্চ সখিত্বেন কার্যং তে মম শাসনম্ । প্রজাঃ সংরক্ষ ধর্মেণ নোত্তরং বক্তুমর্হসি ।।২৯ (*রামায়ণ, উত্তরকান্ড,* দ্বিতীয় খন্ড, সর্গ - ১১২, পৃ : ৯১৭)

কিষ্কিন্ধাকান্ডে চৌত্রিশ সর্গে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা না করায় ধিক্কার দানের প্রসঙ্গও উল্লিখিত হয়েছে ।[২০] এ যেন এক প্রকার শাস্তি দান অর্থেই বর্ণিত হয়েছে । পরবর্তী পঁয়ত্রিশতম সর্গে সুগ্রীব পত্নী তারা দ্বারা লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে শান্তি দানের উল্লেখ পাওয়া যায় । যেখানে রাম ও লক্ষ্মণের উপস্থিতি সত্ত্বেও সুগ্রীব নিজে আনন্দ ও উল্লাসে মত্ত থাকায় লক্ষ্মণের রোষের কারণ হন । তখন সুগ্রীব পত্নী তারা সুগ্রীবের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন । তার মধ্যে দিয়ে লক্ষ্মণের রোষানল শান্ত হয় ।[২১]

সর্বোপরি আরও একপ্রকার 'দান' এর আভাষ বা ইঙ্গিত পাওয়া যায় রামায়ণ মহাকাব্যের আলোচনার পরিসরে । যার উল্লেখ খুব স্পষ্টভাবে রামায়ণ মহাকাব্যের কোন কান্ডেই বর্ণিত না হলেও এই প্রসঙ্গে বলা যায়, দাতা তাঁর সমস্ত রকম স্বত্ত্ব পরিত্যাগ করে তাঁর বিষয়টি উপযুক্ত গ্রহীতার হাতে সমর্পণ করবেন এবং তার পরবর্তীতে গ্রহীতাই সেই বিষয়ের মালিকানা পাবেন এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে তা রক্ষা করবেন । এই সমগ্র ব্যবস্থাটীই 'দান ক্রিয়া' নামে প্রসিদ্ধ এবং এইরূপ কেবল দয়া বা কারুণ্য দান ব্যতীত প্রায় সকল দানের ক্ষেত্রেই বিচার্য । প্রশ্ন হল, স্বত্বাধিকারের ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল কোন বিষয় - বস্তু কিংবা ব্যক্তি, অলঙ্কাররাজি, সহায় - সম্পত্তি, জমি- জিরেত কিংবা কোন পশু ইত্যাদির দানই দান ? সমর্পণ কি দান নয়? তাই যখন পিতা রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে উপযুক্ত মনে করে তাঁর গুনের বিচার করে তাঁর হাতে অযোধ্যার পরবর্তী শাসনভার সমর্পণ করবেন বলে মনোস্থির করে সভাসদ্‌গণকে তাঁর নিজের ইচ্ছা জানাচ্ছেন[২২] সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হয়, এহেন স্বত্বাধিকারের ত্যাগ

---

২০. সত্ত্বাভিজনসম্পন্নঃ সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয় ঃ । কৃতজ্ঞ সত্যবাদী চ রাজা লোকে মহীয়তে ।। ৭
যস্তু রাজা স্থিতোহধর্মে মিত্রাণামুপকারিণাম্ । মিথ্যা প্রতিওজ্ঞাং কুরুতে কো নৃশংসতরস্ততঃ ।।৮
শতমশ্বানৃতে হন্তি সহস্রং তু গবানৃতে । আত্মানং স্বজনং হন্তি পুরুষঃ পুরুষানৃতে ।।৯
পূর্বং কৃতার্থো মিত্রাণাং ন তৎপ্রতি করোতি যঃ । কৃতঘ্নঃ সর্বভূতানাং স বধ্যঃ প্লবগেশ্বরঃ ।। ১০ (ঐ, *উত্তরকান্ড*, প্রথম খন্ড, সর্গ - ৩৪, পৃ : ৭৭১-৭৭২)

২১. তথা ব্রুবাণং সৌমিত্রিং পরদীপ্তমিব তেজসা । অব্রবীল্লক্ষ্মণং তারা তারাধিপনিভাননা ।।১
নৈবং লক্ষ্মণ বক্তব্যো নায়ং পরুষমর্হতি । হরীনামিশ্বরঃ স্যোতুং তব বক্তরাদ্ বিশেষতঃ ।।২
নৈবাকৃতজ্ঞঃ সুগ্রীবো ন শঠো নাপি দারুণঃ । নৈবানৃতকথো বীর ন জিহ্মশ্চ কপীশ্বরঃ ।।৩
উপকারং কৃতং বীরো নাপ্যয়ং বিস্মৃতঃ কপিঃ । রামেণ বীর সুগ্রীবো যদ্যন্যৈর্দুস্করং রণে ।।৪
রামপ্রসাদাং কীর্তিঞ্চ কপিরাজ্যঞ্চ শাশ্বতম্ । । প্রাপ্তবানিহ সুগ্রীবো রুমাং মাঞ্চ পরন্তপ ।।৫
সদুঃখশায়িতঃ পূর্বং প্রাপ্যেদং সুখমুত্তমম্ । প্রাপ্তকালং ন জানীতে বিশবামিত্রো যথা মুনিঃ ।।৬
ঘৃতাচ্যাং কিল সংসক্তো দশ বর্ষাণি লক্ষ্মণ । আহোহমন্যত ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।।৭
স হি প্রাপ্তং ন জানীতে কালং কালবিদাং বরঃ । বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ কিং পুনর্যঃ পৃথগ্‌জনঃ ।।৮
দেহ ধর্মগতস্যাস্য পরিশ্রান্তস্য লক্ষ্মণ । অবিতৃপ্তস্য কামেষু রামঃ ক্ষন্তুমিহার্হতি ।।৯
ন চ রোষবশং তাত গন্তুমর্হসি লক্ষ্মণ । নিশ্চয়ার্থমবিজ্ঞায় সহসা প্রাকৃতো যথা ।।১০ (ঐ,*কিষ্কিন্ধাকান্ড* চৌত্রিশ সর্গ, পৃ : ৭৭১-৭৭২)

২২. অনেন শ্রেয়সা সদ্যঃ সংযোক্ষ্যে হহমিমাং মহীম্ । গতক্লেশো ভবিষ্যামি সুতে তস্মিন্নিবেশ্য বৈ ।।১৪ (*রামায়ণ, অযোধ্যাকান্ড*, দ্বিতীয় সর্গ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা - ১৭৪)

পূর্ব্বক সমর্পণ ব্যবস্থাকেও কি ব্যাপকার্থে দান বলা যায় না? এইভাবে দেখা যায় যে, রামায়ণ মহাকাব্যের বিভিন্ন খন্ডে ভিন্নরূপ অর্থের প্রেক্ষিতে 'দান' শব্দটির ব্যবহার ও উল্লেখ মূল 'দান' শব্দটির ব্যবহারের পরিসরকে সুবিস্তৃত করেছে । ঐসকল অর্থে 'দান' শব্দটির গ্রহণে রামায়ণে এর ব্যাপ্তি ও তাৎপর্য্য যেমন সুবিস্তৃত হয়েছে তেমনি গুরুত্বের মাত্রাকে আরও বেশি গভীরভাবে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করেছে । তবে তার অর্থ এমন নয় যে, যে সকল ক্ষেত্রে কেবলই বিষয় বা বস্তু প্রদান অর্থেই 'দান' শব্দটির ব্যবহার ও উল্লেখ হয়েছে সেখানে এর তাৎপর্য্য কম গুরুত্বপূর্ণভাবে পরিবেশিত হয়েছে । বরং এই প্রসঙ্গে একথাই বলা যায় যে, রামায়ণের পরিসরে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলির নতুন সংযোজন 'দান' শব্দটির ব্যবহারিক পরিধিকে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত করেছে । মহাকাব্যিক পরিসরে এইরূপ ব্যাপকার্থে 'দান' শব্দটির ব্যবহার ও উল্লেখ তা যে কেবল রামায়ণের পরিসরেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে বা সীমিত থেকেছে এমন নয়, বরং মহাভারতেও একইভাবে প্রচলিত অর্থ থেকে ভিন্নার্থে 'দান' শব্দটির ব্যবহার ও উল্লেখ হয়েছে । তাই এই অধ্যায়ের পরবর্তী পর্বে এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মহাভারত মহাকাব্যের বিভিন্ন পর্বের মধ্যে 'শান্তিপর্বে' বর্ণিত কতকগুলি ক্ষেত্রের আলোচনা করে দেখাতে চেষ্টা করবো যে, এক্ষেত্রেও কীভাবে প্রচলিত অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থে বিশেষভাবে 'দান' শব্দটির ব্যবহার বা উল্লেখ হয়েছে ।

তথ্যসূত্র :

- চক্রবর্তী (আচার্য) ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ, *মহর্ষি বাল্মীকি'কৃত রামায়ণম্* (প্রথম খণ্ড), অনুবাদ, আলোচনা ও সম্পাদনা, ১৯৯৬ , প্রকাশক : নিউ লাইট, কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

- চক্রবর্তী (আচার্য) ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ, *মহর্ষি বাল্মীকি'কৃত রামায়ণম্* (দ্বিতীয় খণ্ড), অনুবাদ, আলোচনা ও সম্পাদনা, ১৯৯৭, প্রকাশক : নিউ লাইট, কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

মহাভারত ও দান

মহাভারত মহাকাব্য সনাতন হিন্দু ধর্ম, তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা ও তদানীন্তন সামাজিক নিয়ম নীতি ইত্যাদির পরিচায়ক এবং একই সঙ্গে নির্দেশকও । সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি - নীতি বিষয়ে মহাকাব্যে উল্লিখিত ও প্রদত্ত বর্ণনার যথাযথ পাঠে পাঠকবর্গ তৎকালীন সমাজব্যবস্থার নিরিখে ধর্মীয় নিয়ম নীতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এবং উক্ত বিষয়গুলির স্বরূপ ও গুরুত্ব নির্ধারণে সক্ষম হয় । মূল কাব্যের সূত্র ধরে আলোচনায় অগ্রসর হলে দেখা যায় যে, এর সুবিশাল পরিসরের বিস্তৃতি মূলত আঠারোটি পর্বে বিন্যস্ত হয়েছে, যেমন -- আদিপর্ব , সভাপর্ব, বনপর্ব, বিরাটপর্ব, উদ্যোগপর্ব, ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব, শল্যপর্ব, সৌপ্তিকপর্ব , স্ত্রীপর্ব , শান্তিপর্ব, অনুশাসন পর্ব, অশ্বমেধিকা পর্ব, আশ্রমবাসিকা পর্ব, মৌশল্য পর্ব, মহাপ্রস্থান পর্ব, স্বর্গারোহণ পর্ব । উক্ত সকল পর্বগুলির মধ্যে বর্তমান গবেষণা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব উল্লেখ মতো কেবল শান্তিপর্বে উল্লিখিত কিছু তথ্য ও বর্ণনার অনুসরণ করবো । উল্লেখ্য যে, শান্তিপর্বেই 'দান' সম্পর্কে বহু এমন বর্ণনা পাওয়া যায়, যার উল্লেখ ও ব্যবহার এর বৃহত্তর পরিধি বিষয়ক আলোচনাকে অতি তাৎপর্য্য সহকারে ব্যাখ্যাত করেছে । তাই এবিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই শান্তিপর্ব অনুসারে মহাভারতের পরিসরে বর্ণিত ক্ষেত্রগুলির মধ্যে অন্তঃতপক্ষে এমন কতকগুলির উল্লেখ প্রয়োজন যেগুলি সম্পর্কে আলোকপাত প্রসঙ্গেই পরবর্তীতে দান সম্পর্কিত অপরাপর ক্ষেত্রগুলিরও উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হয় । এই প্রসঙ্গে অনুসন্ধানী হলে দেখা যায়, শান্তিপর্বে 'দান' শব্দটি যেমন ক্ষেত্র বিশেষে প্রচলিত বা প্রথাগত অর্থে ব্যবহৃত বা বর্ণিত হয়েছে তেমনি আবার প্রথাগত অর্থ থেকে সরে গিয়ে কিছুটা ভিন্ন অর্থেও এর উল্লেখ ও প্রয়োগ হয়েছে । তাই মহাভারত মহাকাব্যের 'দান' প্রসঙ্গের আলোচনার প্রয়োজনে প্রথমেই প্রচলিত ক্ষেত্রগুলির উল্লেখ করতে চাইবো । সেখানে দেখা যায়, 'দান' শব্দটি কোথাও যেমন ব্যবহৃত হয়েছে দ্রব্য দান বা বিষয় দান অর্থে , দক্ষিণা অর্থে, ত্যাগ কিংবা মহৎ ত্যাগ রূপে জীবন দান বা প্রাণ দান অর্থে, অন্ন দান বা আহার দান, সুবর্ণ দান অর্থে । তেমনি আবার এইসকল প্রচলিত ক্ষেত্রগুলি অতিরিক্তভাবে 'দান' শব্দটি ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষত্রিয়ের অত্যাবশ্যক ক্রিয়া বা কর্ত্তব্য- কর্ম অর্থে, কোথাওবা ব্রাহ্মণের সিদ্ধিকারক ক্রিয়া এবং প্রশংসনীয় কর্ম এবং নিরর্থক বা নিস্ফল অর্থেও বর্ণিত হয়েছে । যে ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গেই পরবর্তীতে আরও অন্যান্য অর্থ যেমন - পাপের উদ্ধারকারী ক্রিয়া কিংবা পুণ্যজনক ক্রিয়া আবার ভীতিপ্রদ অর্থেরও সংযোজন হয়েছে । প্রচলিত অর্থে 'দান' শব্দটির উল্লেখ প্রসঙ্গে শান্তি পর্বে 'বিষয় বা বস্তু দান' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণভাবে উল্লিখিত হয়েছে । তাই বিষয় দানের প্রেক্ষিত থেকেই মহাভারতে উল্লিখিত 'দান' সম্পর্কিত আলোচনা শুরু করে এইপ্রসঙ্গে উল্লিখিত অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির উল্লেখ পূর্ব্বক তার ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করতে চেষ্টা করবো ।

বিষয় দান অর্থে ব্যবহার :

দাতার দানীয় বিষয়ের তালিকায় 'বিষয় দান' এর স্থান অন্যান্য দানীয় বস্তুগুলির মতোই মহাভারতে সমান উল্লেখযোগ্য ছিল । এ বিষয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, বিষয় অর্থে রাজ্য থেকে শুরু করে জমি , বসত জমি, অন্যান্য সম্পত্তি , নানারকম সোনার ও রুপার গহনা বা অলংকার ও মোহর ইত্যাদি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ছিল লক্ষ্যনীয় । যেমন রাজ্যদান বিষয়ে মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে, -কর্ণ রাজা জরাসন্ধের কাছ থেকে মালিনীনগর প্রতিগৃহীত হয়েছিলেন ; এর উল্লেখ পাওয়া যায় শান্তিপর্বের পঞ্চম অধ্যায়ে । সেখানে বলা হয়েছে, ''মগধাপতি রাজা জরাসন্ধ কর্ণকে তার সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে , প্রীতিপূর্ব্বক অঙ্গ দেশস্থ মালিনীনগর দান করেছিলেন ।'' এইরূপ বিষয় দানে গ্রহীতা দাতার প্রতি প্রীতি মনোভাব সম্পন্ন হলেন । কোথাওবা এর বিপরীত অবস্থাও হয় অর্থাৎ দাতার দান ইচ্ছায় সম্মতি না থাকলে তা ক্ষেত্র বিশেষে নিন্দনীয় পরিবেশ তৈরী করে । যার একটি দৃষ্টান্ত 'অন্যান্য বস্তু ও সুবর্ণ দান' প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, সেখানে দেখা গেছে যে রাজা রন্তিদেব তাঁর রাজ্যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি এড়িয়ে চলার জন্য ব্রাহ্মণগণের ইচ্ছানুসারেই তাঁদের এক সহস্র করে সোনার মোহর দান করেছিলেন । ক্ষেত্র বিশেষে এইরকমই কতকগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে দেখা যায় যে, দাতা কোন কোন ক্ষেত্রে ঐরূপ বিষয় দানে প্রবৃত্ত হয়ে প্রতিগ্রহীতার উপকার করার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ থাকেন । অন্যথায় তাঁর রাজ্যপাঠে অযথা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সূচিত হওয়ার এক প্রবণতা থাকে । এইরকমই একটি পরিস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায় , শান্তিপর্বের সপ্তম অধ্যায়ে উল্লিখিত নকুল ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তথা পাণ্ডব রাজা যুধিষ্ঠিরের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে । যেখানে নকুল যুদ্ধে শোকাতুর ও বিহ্বল রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দিচ্ছেন রাজার করণীয় কর্ত্তব্য প্রসঙ্গে এবং স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবিষয়ে, যে এমত অবস্থায় একজন রাজার রাজ্যবাসীর প্রতি কিরূপ দায়বদ্ধতা থাকে সেই বিষয়ে । কথোপকথন ছিল এইরূপ, '' নরনাথ ! সুসজ্জিত অশ্ব, গরু, দাসী, হস্তিনী, গ্রাম , দেশ, ক্ষেত্র ও গৃহ ব্রাহ্মণগণকে দান না করিয়া পরশ্রীকাতর থাকিয়া আমরাও আপনার সাহচর্য্যবশতঃ কালপুরুষই হইব।'' শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে সতর্ক করে দিয়ে আরও বলেছেন - '(যিনি) অদাতা , অরক্ষক ও রাজার পাপ ভাগী মানুষের দুঃখভোগই করে ; কিন্তু কখনও সুখভোগ করিতে পারে না। ''[১] একইরকম পরামর্শ দ্রৌপদীর বক্তব্যের মধ্যে দিয়েও উল্লিখিত হয়েছে । উল্লেখ পাওয়া যায় শান্তিপর্বের চতুর্দশ অধ্যায়ে , সেখানে দেখা যায় যুদ্ধে প্রিয়জনকে হারিয়ে শোকাতুর যুধিষ্ঠিরকে কীভাবে পঞ্চ পাণ্ডবের স্ত্রী দ্রৌপদী তাঁর স্ত্রী ধর্ম অনুযায়ী স্বামীকে তাঁর কর্ত্তব্যের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন । উক্ত পরামর্শ

১, *মহাভারত, শান্তিপর্ব,* সপ্তম অধ্যায় .

বাক্যগুলির মধ্যে দিয়ে 'দান' শব্দটির ব্যবহার যেমন কোথাও বিষয় দান অর্থে সরাসরি গৃহীত হয়েছে তেমনি আবার বিষয় দানের মধ্যে দিয়েই 'দান' শব্দটি ব্যপকার্থে কর্ত্তব্য -কর্ম অর্থেও গৃহীত হয়েছে। উভয় কথোপকথনের লক্ষ্যই ছিল যাতে রাজা রূপে যুধিষ্ঠির তাঁর রাজ্যে রাজ্যবাসীদের দ্বারা নিন্দিত না হন, পাণ্ডব রাজ্যে যাতে কোন রূপ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সূচনা না হয় সেই বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করা । কারণ দান হল ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কর্ম । যেমন দ্রৌপদী বলছেন , ''যে রাজার ক্ষমাও থাকে, ক্রোধও থাকে, যিনি পারিতোষিকও দেন, দণ্ড (জরিমানা) আদায়ও করেন, অভয় দানও করেন এবং যিনি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ উভয়ই করেন , সেই রাজাকেই রাজধর্মজ্ঞ বলে''।।১৭ [২] অর্থাৎ বিষয় দান অর্থে 'দান' শব্দটি এখানে রাজার অন্যতম কর্ত্তব্য অর্থেও নির্দেশিত হয়েছে।

অন্যান্য বস্তু দান ও সুবর্ণ দান :

পুরাকালে মহাভারত মহাকাব্যের যুগে ধর্মীয় উপচারের প্রয়োজনে গো - অশ্ব , যাঞ্চিত অর্থ, রাজত্ব, সম্পদ ইত্যাদির পাশাপাশি দানীয় বিষয়ের তালিকায় উল্লেখযোগ্য অবস্থান ছিল 'সুবর্ণ দান' প্রথার । এই প্রসঙ্গে মহাভারতে শান্তিপর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে , ইক্ষবাকু বংশোদ্ভূত অলৌকিক বিক্রমশালী পুরুষ শ্রেষ্ঠ ও মহাত্মা 'সগর রাজা নিজের অনুরূপ ব্রাহ্মণগণকে অন্য ও নানাবিধ অভীষ্ট বস্তু সহ নিজের অট্টালিকাও দান করেছিলেন এবং রাজার আদেশে ব্রাহ্মণেরা সেই অট্টালিকাকে বিভক্ত করিয়া লইহয়াছিলেন' ।। ১৩২।। এরকমই অশ্ব , গো ও সুবর্ণদানেরও উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতে , যেমন - 'অমূর্ত্তরাজার পুত্র গয় রাজা সহস্র বৎসর পর্যন্ত প্রতিদিন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া লক্ষ গরু ও দশ সহস্র অশ্ব দান করিয়াছিলেন।।১১৩।।' [৩] মহাভারতে সমগ্র পৃথিবী দানেরও উল্লেখ পাওয়া যায় । যেমন - 'মহাত্মা দিলীপ রাজা একাগ্র চিত্ত হইয়া সেই মহাযজ্ঞে এই ধন সম্পূর্ণ পৃথিবীটাকে ভাগ ভাগ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন ।।৭০।।' [৪] আবার তিনিই যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁর যজ্ঞে নিয়োজিত সকল পুরোহিতকেই স্বর্ণময় সহস্র হস্তী দক্ষিণারূপে দান করিয়াছিলেন ।

এছাড়াও সুবর্ণ দান প্রসঙ্গে শান্তিপর্বেই আরও বর্ণিত হয়েছে, 'রাজা রন্তিদেব বিস্তৃত যজ্ঞসভায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে একশত আটটি করে সুবর্ণ মোহর দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সেই সভায় উপস্থিত সকল ব্রাহ্মণ উচ্চৈস্বরে

---

২. *মহাভারত , শান্তিপর্ব,* চতুর্দশ অধ্যায়
৩. ঐ, ঐ, উনত্রিংশ অধ্যায় , পৃ : ২৬১
৪. ঐ, ঐ, পৃ : ২৫১

বলে উঠেছিলেন, 'আমরা ঐরূপ অল্প অল্প সুবর্ণ লইব না ' ।।১২২।। এরপর রাজা রন্তিদেব প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে তাঁদের সম্মতি অনুসারেই এক সহস্র করে স্বর্ণ মোহর বা সোনার মুদ্রা দান করেন । এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে রাজা রন্তিদেব তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধে অন্নপাত্র, ঘট, বাটী, হাঁড়ি, কড়া, পিড়ি ইত্যাদি সব কিছুই সোনার ব্যবহার করেছিলেন । যেগুলি শ্রাদ্ধ অন্তে পুরোহিতেরই প্রাপ্য হয়েছিল ।[৫] মহাভারতে শান্তিপর্বে সুবর্ণ দান প্রসঙ্গে আরও উল্লিখিত আছে যে, রাজা সুহোত্রের রাজ্যে ইন্দ্রদেব এক বৎসর যাবৎ স্বর্ণ বৃষ্টি দান করেছিলেন তাঁর অতিথিবাৎসল্যের পুরস্কার হিসেবে । রাজার শাসনাধীনে তাঁর রাজ্যের নদী স্বর্ণ বহন করতো । রাজা একবার বিস্তৃত যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়ে অন্যান্য বিষয়ের দানের সঙ্গে স্বর্ণ অলংকারে ভূষিতা দশ লক্ষ কন্যা, দশ লক্ষ হাতি এবং এক কোটি বৃষ দান করেছিলেন । এইভাবেই মহাভারতের শান্তিপর্বে আরও অন্যান্য অধ্যায়েও যজ্ঞে বা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি সোনার ঘর, বাড়ি অন্যান্য ব্যবহার্য্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সামগ্রীর দানের উল্লেখ পাওয়া যায় । তবে উক্ত সকল ক্ষেত্রেই যে প্রশ্নটি অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ , তা হল - ঐসকল ক্ষেত্রেই দান শব্দটি ঠিক কী অর্থে গৃহীত হয়েছে ? 'দান' অর্থে নাকি 'দক্ষিণা' অর্থে ? কারণ রাজা রন্তিদেবের সুবর্ণ মোহর দানের প্রসঙ্গে বলা যায় যে, রাজা তো নিজ ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণগণকে একশত সুবর্ণ মোহর নয় বরং ব্রাহ্মণগণের সম্মতি অনুসারে এক সহস্র মোহর দান করতে বাধ্য হয়েছিলেন । এইরূপ দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এইরূপ অবস্থাকে যদি 'দান' বলা হয় তবে তাতে দাতার স্ব- ইচ্ছার ক্ষেত্রটি গ্রহীতাগণের সম্মতি অনুসারেই চালিত হয় এমন স্বীকার করতে হবে । তাতে ঐরূপ 'দান' ক্রিয়াটী ঠিক কী অর্থে গৃহীত হবে তা আলোচনা সাপেক্ষ। আবার ঐ একই দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণবর্গের একটি চিত্র স্ফুট হয় ; এবং তা হল যেসকল ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রানুসারে প্রসিদ্ধ যজন - যাজনকেই নিজেদের বৃত্তি বা পেশা বলে গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা তাদের পূজার্চনা জন্য কেবল দক্ষিণাকেই নিজ উপার্জন বলে গ্রহণ করতেন না বরং তার সঙ্গে অতিরিক্ত 'দান ব্যবস্থাকে'ও এর অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন নিজেদের অধিক সুবিধার্থে । এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে, সোনার মোহর, ঘটী, বাটি, দান করা কিংবা সেইগুলি লাভ করার জন্য যে এইরূপ ব্যাকুলতা কিংবা এত গভীর আসক্তি ইত্যাদি দৃষ্টান্তগুলির উল্লেখ বা ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে যেন একথাই বলা হয় ,'সোনা' ধাতুটি সেই সময়ে সর্বাধিক মূল্যবান বলেই পরিগণিত হত । এমনকী পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের কাছেও পূজোর জন্য সবচেয়ে পবিত্র ধাতু তামার চেয়েও সোনার জনপ্রিয়তা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিল ।

---

৫. *মহাভারত, শান্তিপর্ব*, পৃ : ২৬৩

দক্ষিণা অর্থে 'দান' শব্দটির উল্লেখ ও ব্যবহার :

দৈনন্দিন জীবনে অনেক সময়েই আমরা 'দান' শব্দটিকে এর অর্থগত ব্যবহারের ব্যপক পরিসরে দক্ষিণা অর্থেও গ্রহণ বা উল্লেখ করি । যদিও এই প্রসঙ্গে ভিন্ন মতও আছে । কেননা 'দান' বলতে সাধারণতঃ বোঝায় কাউকে কিছু দেওয়া এবং তা কোন কিছুর বিনিময়ে নয়, বরং গ্রহীতাকে দাতার নিঃস্বার্থ ভাবে কিছু দেওয়া । যদিও ক্ষেত্রবিশেষে দান বিষয়ে দাতা ও গ্রহীতাকে কতকগুলি বিধির অনুসরণ করতে হয় । কিন্তু 'দক্ষিণা' এই শব্দটির সঙ্গে যেন নির্দিষ্ট কোন কাজের বিনিময়ে ধার্য্য মূল্য প্রদান এইরকম একটি মনোভাব যুক্ত হয়ে থাকে । কেননা 'দক্ষিণা'এই বিধিটি হল একটি সামাজিক তথা ধর্মীয় রীতি বা বিধি যা সাধারণতঃ পুরাকালের সেই সমাজব্যবস্থা থেকে শুরু করে আজও প্রচলিত এবং অব্যাহত সেই সকল ব্রাহ্মণ বর্ণের মানুষদের জন্য ; যারা পূজার্চনাকে নিজেদের জীবিকারূপে গ্রহণ করেছিলেন । শান্তিপর্বে বর্ণিত হয়েছে , ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ রাজার ইচ্ছা ও আদেশ অনুসারে তাঁর মঙ্গলার্থে যেসকল পূজার্চনা ও যাগ - যজ্ঞ ইতাদির ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপচার সম্পন্ন করতেন তার জন্য পারিশ্রমিক মূল্য হিসেবে রাজা পুরোহিতকে তাঁর মনোমত পারিশ্রমিক প্রদান করতেন, তাকেই 'দক্ষিণা' বলা হয় । এইরূপ 'দক্ষিণা ব্যবস্থাটি'র মধ্যে রাজা পুরোহিতকে বেশ কিছু নগদ অর্থ সহ বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদি ও বিষয় সম্পত্তিও প্রদান করতেন । যেগুলি নিয়ম অনুসারেই দানোত্তর কালে পুরোহিতের মালিকানাধীন হতো । একইরকমভাবে রাজ্যের অন্যান্য অধিবাসীরাও তাঁদের গৃহে পূজার্চনা করার জন্য পুরোহিতদের তাঁদের পারিশ্রমিক হিসেবে দক্ষিণা প্রদান করতেন । যদিও এইরূপ 'দক্ষিণা' প্রদান পদ্ধতিটির মধ্যে কোথাও কোন ভাবে 'দান' শব্দটির উল্লেখ বা ব্যবহার না হলেও উভয়ের মধ্যে যেন এক প্রকার পদ্ধতিগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন দেখা যায় , মহাভারতে শান্তিপর্বের সপ্তম অধ্যায়ের একটি বিশেষ অংশে অর্জুন তাঁর জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন , 'যে পৃথিবী যুদ্ধের পূর্বে দিলীপ, নৃগ, নহুস, অম্বরীষ এবং মান্ধাতার ছিল, এখন সেই পৃথিবী আপনার উত্তর আসিয়া রহিয়াছে...... রাজা ! অতএব বর্তমান সময় সর্ব্বপ্রকার দক্ষিণাযুক্ত দ্রব্য দানরূপ যজ্ঞ আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে ; আপনি যদি এখন তাহা না করেন , তাহা হইলে আপনার রাজত্ব সম্বন্ধে পাপ হইবে ।' ১০৬ আলোচ্য ক্ষেত্রটির মূল বক্তব্য হল, উপযুক্ত পরিমাণ দক্ষিণা দান করে যজ্ঞ সম্পাদন করলে রাজা যুধিষ্ঠির যেন যুদ্ধজনিত তাঁর সকল পাপ কর্ম থেকে মুক্তি পেতে পারবেন । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের প্রতি সহোদর অর্জুনের এইরূপ বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়, 'দক্ষিণা' ও 'দান' শব্দদুটি যেন উক্ত ক্ষেত্রগুলিতে প্রায় সম অর্থেই পাশাপাশি অবস্থান করছে । যদিও শব্দদুটির মধ্যে অভিধানিক অর্থগত পার্থক্য বর্তমান । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, যজ্ঞে প্রদেয় সকল দ্রব্যাদির আহুতি এবং যজ্ঞের পুরোহিতের জন্য পারিশ্রমিক রূপে উপযুক্ত দক্ষিণা উভয়ই 'দান' অর্থেই গৃহীত হয়েছে ।

অন্ন দান বা আহার দান :

গ্রহীতার প্রয়োজন অনুসারে দাতার অন্যান্য বিষয় দানের মধ্যে 'অন্ন বা আহার দান' অন্নতম উল্লেখযোগ্য দান । দান বিষয়ক এই ধারণা সময় বা কালের ভেদে অপরিবর্তিত । মহাভারত মহাকাব্যের পরিসরও তার ব্যতিক্রম কিছু নয় । এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, অন্ন দান প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল, আহার বা অন্ন দানে যে দাতা কেবল তাঁর নিজের ইচ্ছানুসারেই পরিমাণ মতো দান করেন বা করতে পারেন এমন নয়, বরং ক্ষেত্র বিশেষে গ্রহীতার যাঞ্চাও থাকে দানের প্রকার ও পরিমাণ বিষয়ে । গ্রহীতার যাঞ্চা অনুসারে দাতা দান করতে পারলে যেমন তিনি আত্ম - সন্তোষ উপভোগ করতে পারেন তেমনি গ্রহীতাও তার প্রয়োজন পূরণ করতে পেরে খুশি হন । এইরূপ অন্ন দানের উল্লেখ পুরাণ , মহাকাব্য সহ বিভিন্ন দার্শনিক গ্রন্থের আলোচ্য পরিসরে পাওয়া যায় । এই প্রসঙ্গে মহাভারতের শান্তিপর্বের অষ্টাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে - অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলছেন , 'একথা নিশ্চয় যে, দাতার অন্নই সাধু সন্ন্যাসীদিগের জীবন রক্ষার উপায় রাজা (গৃহস্থ) যদি দাতা না হয়, তাহা হইলে মানুষ মোক্ষার্থী ভিক্ষু হইবে কেন?'।।২৭।। 'এই জগতে গৃহে অন্ন থাকে বলিয়াই মানুষ গৃহস্থ হয় ; আবার গৃহস্থের নিকট হইতে অন্ন লাভ করে বলিয়ায় মানুষ ভিক্ষু হইয়া থাকে । অতএব যিনি অন্ন দান করেন , তিনি প্রাণই দান করেন । 'বলা বাহুল্য যে, 'দান' ভিত্তিক' এক পারস্পরিক অন্যোন্যজীবিতার সম্পর্ক দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের মধ্যেই মহাকাব্যের যুগ থেকেই প্রসিদ্ধ ছিলো । শুধু তাই নয়, উক্ত অর্থে দান শব্দটির ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে একথাও বলা যায় যে, ধর্মীয় উপাসনার জীবনে যেসকল মানুষ রত হয়ে রয়েছেন তাঁদের আহার ও অন্যান্য জাগতিক প্রয়োজন পূরণ পূর্ব্বক তাদের জীবন রক্ষা করে তাঁদেরকে নির্বিঘ্নে উপাসনা করতে সহযোগীতা করাও যেন রাজা এবং অন্যান্য সকল গৃহস্থের দায় বা দায়িত্ব একথাই মহাভারতে 'দান' শব্দটির বর্তমান ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়েছে ।

জীবন দান অর্থে ব্যবহার :

আহার বা অন্ন দান করে দাতা যেমন গ্রহীতার জীবন রক্ষা করতে পারেন ঠিক তেমনি আবার কখনও তিনি সরাসরিভাবে জীবন দানও করতে পারেন । 'দান' শব্দটির বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে 'জীবন দান' এই অর্থটির ব্যবহার মহাভারতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রূপে পরিবেশিত হয়েছে । কারণ একথা প্রায় সকল দর্শন ও ধর্মেই স্বীকার করা হয় যে , সকল দানের মধ্যে জীবন দানই হল শ্রেষ্ঠ দান । বলা হয় যে , জীবন দানের মতো

ঐরূপ মহৎ দান বা শ্রেষ্ঠ দান আর কোন দানই নয় । এর যে বিভিন্ন উল্লেখ মহাভারত মহাকাব্যের পরিসরে পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম হল 'দাতা কর্ণের দান' । অঙ্গরাজ কর্ণ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন দাতা কর্ণ এইরূপ সম্বোধনে । দাতা হিসেবে তিনি এইরূপ সুপ্রসিদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর রাজ্যবাসীগণ সকলেই একথা বিদিত ছিলেন, কোন যাচ্ঞাকারী কর্ণের কাছে কিছু প্রার্থনা করে নিস্ফল হয়ে ফিরেছেন এমন উদাহরণ নেই । এমনকী তার নিজ জীবন দানেও তিনি উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নি । আর সেকারণেই তাঁর নাম দাতা কর্ণরূপে প্রসিদ্ধ হয়েছে । মহাভারতের পরিসরে এই প্রসঙ্গের উল্লেখে দেখা যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে দেবরাজ ইন্দ্র বিশাল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কর্ণ কর্তৃক অর্জুনের বিপদ দূর করে তাঁকে যুদ্ধে জয়ী করার জন্য কর্ণের কাছ থেকে তাঁর বর্ম্ম ও কবচ কুণ্ডল দুটি প্রার্থনা করেছিলেন । যেগুলি ছিল কর্ণের জীবনের সুরক্ষা কবচ । উত্তরে দাতা কর্ণও প্রার্থিত বিষয়ের অনুপস্থিতিতে যুদ্ধে নিজের মৃত্যু হবে একথা নিশ্চিত জেনেও দেবরাজ ইন্দ্রের প্রার্থনাকে সম্মান জানিয়ে তিনি নিজের সুরক্ষা কবচ কুণ্ডল এবং বর্ম্ম বিনা বাক্য ব্যয়ে দান করেছিলেন।[৬] উল্লেখ্য যে, যদিও তিনি নিজে একথা জানতেন যে, ঐ বর্ম্ম ও কবচ কুণ্ডল ছাড়া যুদ্ধে বীর অর্জুনের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা বা নিজের প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব নয় । এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে ফলও ঘটেছিল তাই । এইরূপ অতিদান প্রসংসনীয় নাকি নিন্দনীয় সেই বিষয়ে মতানৈক্য আছেই । তবে দাতা কর্ণের এই দান যে মহাকাব্যের পরিসরে নিজের জীবনের বিনিময়ে অর্জুনের জীবন রক্ষা করা উভয় ক্ষেত্রেই জীবন দানের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্য্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত তা অবশ্য স্বীকার্য্য ।

প্রশংসনীয় কর্ত্তব্য কর্ম অর্থে ব্যবহার :

'দান' কথাটিকে প্রশংসনীয় কর্ত্তব্য কর্ম অর্থেও ব্যবহার করা হয়েছে । শান্তিপর্বের একাদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত ঋষি দেবস্থান ও পাণ্ডব রাজা যুধিষ্ঠিরের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে এর উল্লেখ পাওয়া যায় । দেখা যায় যে, সেখানে ঋষি দেবস্থান যুধিষ্ঠিরকে মানুষের সন্তোষ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করছেন। সেখানে তিনি বলছেন মানুষের মন যখন সন্তোষ লাভ করে তার মধ্যে দিয়েই সে প্রকৃত আত্মদর্শন লাভ করতে পারে । উল্লিখিত কথোপকথন ছিল এইরূপ - 'দেবস্থান বলিলেন , যুধিষ্ঠির সন্তোষ উত্তম স্বর্গের তুল্য, সন্তোষই পরমসুখ এবং সন্তোষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই । কেননা , সেই সন্তোষই চিত্ত ব্যাপীয়া অবস্থান করে ।।'' [৭] এইরূপ সন্তোষ পূর্ব্বক মানুষ যখন তার ভয়, কামনা, বাসনা মোহ ও বিদ্বেষ ইত্যাদিকে জয় করতে পারে তখন তার প্রকৃত অর্থে আত্মদর্শন হয়।

৬. *মহাভারত, শান্তিপর্ব,* পৃ : ৩৩
৭. ঐ, ঐ, একাদশ অধ্যায় .

এইরূপ আত্মদর্শন লাভ করলে জীবের চিত্তের অবস্থার উত্তরণ ঘটে । ফলে এই অবস্থায় তাঁর মনোভাব তার সমতুল বা তার তুলনায় ছোট কোন প্রাণীর প্রতিই বিদ্বেষ পরায়ণ হতে পারে না । সে তার কায় -মন ও বাক্যে এজাতীয় যাবৎ বিদ্বেষ পরায়ণ আচরণ ও কামনা - বাসনার উর্দ্ধে অবস্থান করে । ফলতঃ ব্রহ্মলাভ করে । এইরূপে অন্যের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষমূলক মনোভাব ত্যাগ করে যে সদাচার বা ধর্ম্মাচার অনুষ্ঠিত হয় তা মহাভারতে 'সজ্জন সম্মত ধর্ম' বলে উল্লিখিত হয়েছে । যেহেতু গ্রহীতাকে দানপূর্ব্বক তার সন্তুষ্টি সাধন করা এবং তার মধ্যে দিয়ে দাতার নিজেরও সদাচার করাও একপ্রকার 'সজ্জন সম্মত ধর্ম' । তাই ব্যাপকার্থে 'দান'ও এইরূপ 'সজ্জন সম্মত ধর্ম' । এই বিষয়ে শান্তি পর্বের একবিংশ অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে, 'স্বায়মভূব মনু বলেছেন , পরের অপকার না করা , সত্য বাক্য বলা , যথাসময়ে অন্ন দান করা, দয়া , ইন্দ্রিয় দান , আপন পত্নীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন, কোমল ব্যবহার, অকার্যকারণে লজ্জা এবং চপলতা না করা এইগুলিতে যে ধর্ম্ম হয় , তাহাই প্রধান ধর্ম্ম ।। অর্থাৎ রাজার সজ্জন সম্মত ধর্ম আচরণেও যে 'দান' ক্রিয়াটীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল এইরকমই নির্দেশিত হয়েছে । এইপ্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে, উক্ত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে 'দান' অর্থে বিষয় দানের সঙ্গে পৃথক ভাবে ইন্দ্রিয় দানের কথাও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে । প্রসঙ্গতঃ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে মহামতি বিদূরের দিব্য দৃষ্টি লাভ এবং তাঁর মাধ্যমে দৃষ্টিহীন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যুদ্ধের পরিস্থিতির বর্ণনার ক্ষেত্র যেন সেই সময়ে ইন্দ্রিয় দানের অন্যতম দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য যে, যজ্ঞ ও সন্ন্যাসের পাশাপাশি মহাভারতে 'দান কর্ম' এবং 'প্রতিগ্রহ'কেও উত্তম কর্ম বলেই উল্লেখ করা হতো। সেই সময়ে প্রভাব পরাক্রমশালী বহু রাজাই স্বধর্ম জনিত আচার - আচরণ যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্ব্বক সত্য, দান ও তপস্যা পরায়ণ ও দয়া - দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণ সমন্বিত করে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন তারাই এই সকল অসাধারণ ধর্ম্ম সমন্বিত গুণের অধিকারী হয়ে সর্ব্বোত্তম গতি লাভ করেন বলে উল্লিখিত হয়েছে ।

ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কর্ম অর্থে ব্যবহার :

প্রশংসনীয় কর্ত্তব্য ছাড়াও ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কর্ম অর্থেও যে 'দান' শব্দটির উল্লেখ ও ব্যবহার পাওয়া যায়, তা ইতিপূর্বেই বিষয় দান প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে এবং এই বিষয়ে শান্তিপর্বে বর্ণিত রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁর স্ত্রী দ্রৌপদী ও সহোদর ভাই নকুল ও অর্জুনের পরামর্শ দানের ক্ষেত্রগুলিরও উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয় দান প্রসঙ্গে উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে 'দান' শব্দটি বিষয় বা বস্তু দান সহ কর্ত্তব্য বলেও বর্ণিত হয়েছে । তবে উক্ত ক্ষেত্রগুলি

ছাড়াও সরাসরি কর্ত্তব্য অর্থেও মহাভারতে ‘দান’ শব্দটির উল্লেখ হয়েছে । এই প্রসঙ্গে শান্তিপর্বের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে, যুদ্ধে প্রিয়জনদের হারিয়ে শোকাতুর যুধিষ্ঠিরকে তাঁর সহোদর ভাই নকুল ও অর্জুন পরামর্শ দিয়ে বলছেন, ‘মনুষ্য শ্রেষ্ঠ আপনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অনুসারে শত্রু জয় ও নিষ্কন্টক রাজ্য লাভ করিয়া সম্প্রতি জিতেন্দ্রিয় হইয়া যজ্ঞ দান করিতে থাকুন । ’ তাঁকে আরও বলেন, ‘নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ ! ইন্দ্র যেমন চিরকালের জন্য শত্রু সন্তাপ শূন্য হইয়া প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন আপনিও তেমন চিরকালের জন্য শত্রু সন্তাপশূন্য হইয়াছেন , এখন প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত বহুতর যজ্ঞ করুন ।’

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পুণ্যজনক কর্ম অর্থে ব্যবহার :

ক্ষত্রিয়ের জন্য প্রশংসনীয় কর্ত্তব্য কর্ম সহ ‘দান’ শব্দটি যে পুণ্যজনক অর্থেও ব্যবহৃত হত তারও উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতে । দেখা যায়, যুধিষ্ঠিরের প্রতি মহর্ষি তাঁর উপদেশ বাক্যে দানাদি ক্রিয়াকে ক্ষত্রিয়ের জন্যে পুণ্যজনক কর্ম বলেও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলছেন, ‘নরনাথ ! যজ্ঞ শাস্ত্রবিদ্যা, শত্রু দমনের উদ্‌যোগ, লব্ধ সম্পদের প্রতি অসন্তোষ (উত্তরোত্তর শ্রী বৃদ্ধি কামনা), রাজ দণ্ডধারণ, উগ্রতা, প্রজাপালন, সমস্ত বেদ জ্ঞান, সম্যক্ তপস্যাচারণ, প্রচুর ধন উপার্জন এবং সৎপাত্রে দান এইগুলি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পুণ্যজনক । আর আমাদের শুনা আছে যে, এই কার্য্যগুলি ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষত্রিয়গণের উৎকর্ষ সম্পাদন করে ।’

ঋণ পরিশোধকারী ও স্বর্গে যাওয়ার উপায় অর্থে ব্যবহার :

তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় যে ‘দান ক্রিয়া’ ঋণ পরিশোধকারী ও স্বর্গে যাওয়ার উপায় অর্থেও ব্যবহৃত হতো তার উল্লেখ পাওয়া যায় চতুর্বিংশ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রতি মহর্ষি বৈশম্পায়নের উপদেশ বাক্যের মধ্যে । দেখা যায় যে, উপদেশ বাক্যে মহর্ষি দানাদি ক্রিয়া সম্পর্কে যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, ‘ ভরতনন্দন যুধিষ্ঠির ! তুমি এখন দান করিয়া প্রার্থীদের , শ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃলোকের এবং পূজা করিয়া দেবতাদের ঋণ পরিশোধ কর । গৃহস্থাশ্রমে তুমি এই সমস্তই করিতে পারিবে ।’ মহর্ষি যুধিষ্ঠিরকে আরও বলেন , ‘ধর্মশীল ও মহাত্মা রাজা যোগ ও দানের গুণে ধর্ম্মোপার্জ্জন এবং যুদ্ধ প্রভৃতির উপায় ও সেনা বিন্যাস দ্বারা শত্রুগণের দমন এবং পৃথিবী পালন করিয়া, সেই

ধর্ম্মের গুণে পরিশেষে স্বর্গে যাইয়া আনন্দ অনুভব করিতেছেন । ’ [৮] একইরূপ মতের উল্লেখ পাওয়া যায় ষড়বিংশ অধ্যায়ে উল্লিখিত মহর্ষি বৈশম্পায়ন ও অর্জুনের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে । যেখানে মহর্ষি বলছেন, ‘অর্জুন ! দান, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও দুষ্কর ইন্দ্রিয় দমন এই সকল বেদোক্ত কর্ম্ম করিয়া যাঁহারা সূর্য্যের দক্ষিণ দিগবর্ত্তী পথে স্বর্গে গিয়াছেন, আমি পূর্ব্বেও (এইরূপ) দানাদিশীল ঋষিদিগের স্বর্গের কথা বলিয়াছি ।’ [৯]

শাস্তি প্রদান অর্থে ব্যবহার :

যথাযথভাবে রাজ্যশাসন, প্রজাপালন ও প্রজাহিতসাধনের জন্য রাজার অপরাপর অবশ্যকৃত কতকগুলি কর্ত্তব্যের সঙ্গে দানাদি ক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে শাস্তি প্রদান অর্থে বা ‘দণ্ড দান’ অর্থেও মহাভারতের পরিসরে স্বীকৃত হয়েছে । শুধু তাই নয় এইরূপ শাস্তিবিধানে অসমর্থ রাজা যে প্রজা হিতসাধক নয় বা এমন রাজার যে রাজ্যে নিন্দা হতে পারে সেই সম্ভাবনারও উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতে । যোগ্য রাজার এইরকমই কতকগুলি কর্ত্তব্যের কথা স্ত্রী দ্রৌপদী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন রাজা যুধিষ্ঠিরকে, যার উল্লেখ পাওয়া যায় শান্তি পর্বের চতুর্দশ অধ্যায়ে । দ্রৌপদী বলছেন , ‘ভরতনন্দন ! দমন করিতে অসমর্থ ব্যক্তি ভূমি ভোগ করিতে পারে না এবং দণ্ড দানে অসমর্থ রাজার প্রজারা সুখ শান্তি লাভ করে না । কারণ তাঁর মতে, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং যুদ্ধে পলায়ন না করা এইগুলি হল রাজার প্রধান ধর্ম ।। যে রাজার ক্ষমাও থাকে, ক্রোধও থাকে, যিনি পারিতোষিকও দেন, দণ্ড (জরিমানা) আদায়ও করেন , যিনি ভয়ও উৎপাদন করেন , অভয় দানও করেন এবং যিনি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ উভয়ই করেন , সেই রাজাকেই রাজ ধর্ম্মজ্ঞ বলা হয় ।।’ [১০] পান্ডব রাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি স্ত্রী দ্রৌপদীর এরূপ পরামর্শ বাক্যের মধ্যে দিয়ে জানা যায় যে, প্রজা হিতসাধনের জন্য অন্যান্য বিষয় বা বস্তু দানের মতো শাস্তি দান বা দণ্ড দানও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দান এবং রাজার অবশ্যকৃত কর্ম বলেই মহাভারতে পরিসরে উল্লিখিত হয়েছে । যা অন্যান্য বস্তু দানের মতো করে সুখদায়ক না হলেও এর প্রয়োজনীয়তা রাজ্য পরিচালনার কাজে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ । কেননা একজন যোগ্য রাজা তাঁর রাজ্যকে সুপরিচালিত করার উদ্দেশ্যে যেমন উত্তম প্রজাদের সন্তোষ বিধান করার হেতু বিভিন্ন বিষয় দান করার জন্য তৎপর হবেন তেমনি পাশাপাশি তাঁর রাজ্য থেকে যেকোন দুষ্টকে বিতারিত করার জন্য বা যেকোন অন্যায় কর্ম

---

৮. *মহাভারত, শান্তিপর্ব,* চতুর্বিংশ অধ্যায়
৯. ঐ, ঐ, ষড়বিংশ অধ্যায়
১০. ঐ, ঐ, চতুর্দশ অধ্যায়

দমন করার জন্যেও তিনি অবশ্যই সদর্থক ভূমিকা পালন করবেন । এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রয়োজন অনুসারে প্রজাদের শাস্তি বিধান বা দণ্ড দান করবেন ।

নিরর্থক বা নিস্ফল অর্থে 'দান ' শব্দটির ব্যবহার :

মহাভারত মহাকাব্যের সুবিশাল পরিসরে আলোচিত 'দান' শব্দটির বিভিন্ন অর্থের মধ্যে 'নিরর্থক বা নিস্ফল' অর্থটি অন্যতমরূপে উল্লেখযোগ্য । উক্ত অর্থটির উল্লেখ ও ব্যবহার পাওয়া যায় শান্তি পর্বের সপ্তম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে । দেখা যায় যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষের জয়লাভের পর যখন পাণ্ডব পক্ষের রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধে তাঁর প্রিয়জনদের মৃত্যুর শোকে শোকাহত হয়ে প্রলাপ করছিলেন এবং নিজেকে সেই পরিস্থিতির জন্য দায়ী বলে দোষারোপ করছিলেন এবং ভ্রাতা অর্জুন তাঁকে সান্তনা প্রদান করছিলেন, তার মধ্যে দিয়েই উক্ত অর্থে 'দান' শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় । যুধিষ্ঠির তাঁর সহোদর অর্জুনকে বলছেন -- ' আমরা সামান্য রাজ্য ভোগ করিবার ইচ্ছায় লোভ ও মোহবশতঃ ছল ও গর্ব্ব আশ্রয় করিয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি' , তিনি আরও বলছেন , 'আমরা বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবী জয়াভিলাষী বন্ধুগণকে নিহত হতে দেখিতেছি, সুতরাং এই অবস্থায় কোন ব্যক্তি ত্রিভুবনের রাজত্ব দান করিয়াও আমাদিগকে আনন্দিত করিতে পারে না । '[১১] 'দান' হল এমন এক ক্রিয়া যার মাধ্যমে যেমন কর্ত্তব্য কর্মের সম্পাদন হয় তেমনি ধর্মীয় রীতি ও নীতির সম্পূরণ হয় । এর মধ্যে দিয়ে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই উপকৃত হন । 'দান ' করে দাতা যেমন তাঁর ধর্মীয় মানের উত্তরণ ঘটাতে পারেন তেমনি গ্রহীতারও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের পূরণ হয় । কিন্তু পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে পাণ্ডব রাজা যুধিষ্ঠিরের ঐরূপ হতাশা এবং নিজের প্রতি খেদোক্তি যেন যুদ্ধের জন্য তাঁর অনিচ্ছা এবং যুদ্ধের ফলের প্রতি অনাগ্রহের সূচনা করেছে তেমনি সমগ্র ত্রিভুবনের রাজত্বের প্রতিও তাঁর অনীহাই প্রদর্শন করেছে । এইরূপ কথোপকথন ও সেই বিষয়ের আলোচনার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে একথা বলা যায় যে, 'দান' ক্রিয়া মাত্রেই যে তা সর্বদা গ্রহীতার কাছে আনন্দ - দায়ক ও পুণ্যজনক পরিস্থিতির সূচনা করবে এমন নয় , বরং ক্ষেত্র বিশেষে 'দান ক্রিয়া' অর্থহীনতা বা নিস্ফলতাতেও পর্যবসিত হতে পারে যদি না তা গ্রহীতার পক্ষে আনন্দজনক পরিস্থিতির কারণ হয় ।

---

১১. *মহাভারত, শান্তিপর্ব,* সপ্তম অধ্যায়

পাপের উদ্ধারকারী ক্রিয়া অর্থে 'দান' শব্দটির উল্লেখ ও ব্যবহার :

শান্তিপর্বের সপ্তম অধ্যায়েই যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে 'দান ক্রিয়া' যে ক্ষেত্র বিশেষে মানুষের পাপ কর্মের উদ্ধারকারী ক্রিয়া অর্থেও ব্যবহৃত হতো তারও উল্লেখ পাওয়া যায় । এখানে দেখা যায় যে স্বয়ং যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলছেন, মানুষ তাঁর পাপকর্ম ও তার মন্দ ফল থেকে যেসকল উপায়ে উদ্ধার পায় তার মধ্যে 'দান' হল অন্যতম একটি মাধ্যম । বক্তব্যের সমর্থনে শান্তিপর্বে বর্ণিত হয়েছে , যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলছেন; 'অর্জুন কেহ কোন পাপ করিলে, তাহা পুণ্য করা, প্রকাশ করা, অনুতাপ, দান, তপস্যা, বিষয় বৈরাগ্য , তীর্থগমন এবং বেদমন্ত্র ও স্মৃতিমন্ত্র জপ দ্বারা বিনষ্ট হয় । বিষয় - বিরাগী লোক পুনরায় পাপ করিতে পারে না, ইহা আমাদের শুনা আছে ।' [১২] উক্তিটির মধ্যে দিয়ে সমাজব্যবস্থার যে চিত্রটির উল্লেখ পাওয়া যায় তাহল - বর্ণ ও আশ্রম ব্যবস্থার অনুসারী ঐ সমাজব্যবস্থায় মানুষ যে কখনও কখনও পাপকর্ম সাধন করে তার একটা স্পষ্ট স্বীকারোক্তি এবং পাশাপাশি তাঁরা ঐরূপ কর্মের মন্দফল থেকেও যাতে মুক্তি পেতে পারেন সেইজন্য কিছু প্রায়শ্চিত্ত কর্মেরও নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল । তবে মুক্তি লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিসকল কি পরিমাণ পাপের জন্য কি পরিমাণ দান করবেন কিংবা কোন কোন পাপের খন্ডনের জন্য জন্য কী কী দান করবেন তাঁর কোন স্পষ্ট নির্দেশ এখানে পাওয়া যায় না । কিন্তু উক্তরূপ আলোচনা মধ্যে দিয়ে দেখা যায় যে, তৎকালীন সমাজে 'দান ক্রিয়া' ধর্মীয় উত্তরণের পাশাপাশি মানুষের পাপাচরণ জনিত কর্মফলের বিনাস সাধনেও অন্যতম তাৎপর্য্যপূর্ণ একটি মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হতো ।

লঘু বা নিন্দনীয় এবং ভীতিপ্রদ অর্থে ব্যবহার :

পাণ্ডব রাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি মহর্ষি বৈশম্পায়ন, পিতামহ ভীষ্ম, ভ্রাতা অর্জুনসহ স্ত্রী দ্রৌপদীর বিভিন্ন পরামর্শবাক্যের মধ্যে দিয়ে 'দান' ক্রিয়া একজন যোগ্য রাজার অন্যতম পরম কর্ত্তব্য বলে উল্লিখিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে সমাজ ও রাজ্যে সুষ্ঠুরূপে শাসন পরিচালনা করার কাজে এটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে 'দান' শব্দটি নিন্দনীয় অর্থেও গৃহীত হয়েছে । যার উল্লেখ পাওয়া যায়, শান্তি পর্বের চতুর্দশ অধ্যায়ে, যখন দ্রৌপদী তাঁর স্বামী পাণ্ডব রাজ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন , '' মহারাজ ! শাস্ত্র জ্ঞান, দান, কোমলবাক্য,

---

১২. *মহাভারত, শান্তিপর্ব,* সপ্তম অধ্যায়

যজ্ঞ কিংবা যাঞ্চ্ঞা দ্বারা আপনি এই পৃথিবী লাভ করেন নাই । ’ অর্থাৎ ‘দান’ যেন এক হীনের প্রাপ্তি এমনটাই নির্দেশিত হয়েছে ।

আবার শান্তিপর্বের পঞ্চদশ অধ্যায়ে অর্জুন যখন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, ‘রাজা ! কেহই পরলোকের ভয় না করিয়া যজ্ঞ করেন না, কোন ব্যক্তিই পরলোকে হইতে ভীত না হইয়া দান করিবার ইচ্ছা করে না এবং কোন লোকই ইহলোকে বা পরলোকের ভয় না করিয়া সৎপথে থাকিতে অভিলাষী হয় না।।’ যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদী এবং অর্জুন উভয়েরই উক্তরূপ পরামর্শ বাক্য শুনে একথা মনে হয় যে প্রজাদের জন্য বা তাদের হিতসাধনের জন্য রাজার যেকোন প্রকার দান একাধারে যেমন পরম কর্ত্তব্য ও প্রশংসনীয় ছিল । তেমনি দান ক্রিয়ার পালন সম্পর্কে যেন একপ্রকার ভীতিপ্রদ মনোভাবেরও প্রভাব ছিল । বিপরীতে তা ক্ষেত্রবিশেষে নিন্দনীয়ও ছিল । যেমনটি দেখা যায় , যুধিষ্ঠিরের প্রতি তার স্ত্রী ও সহোদরের পরামর্শ বাক্যে । যেমন দ্রৌপদীর পরামর্শে দেখা যায়, প্রজাহিতার্থে দান রাজার কর্ত্তব্যকর্ম হলেও তাঁর নিজের জন্য যেকোন প্রকার দান যাঞ্চ্ঞা করা কিংবা তা গ্রহণ করা নিন্দনীয় বলেই উল্লিখিত হয়েছিল । আবার পাণ্ডব রাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভ্রাতা অর্জুনের পরামর্শবাক্য গুলির মধ্যে দিয়ে যেমন ‘দান কর্ম সম্পাদন করা’ কর্ত্তব্য অর্থে নির্দেশিত হয়েছিল স্পষ্টভাবে ঠিক তেমনি দান বিষয়ে ইহলৌকিক কিংবা পারলৌকিক ধর্মীয় ভয়জনিত বাধ্যতাবোধেরও উল্লেখ হয়েছিল । যা দান ক্রিয়ার বিপক্ষে একপ্রকার হীন মনোভাবেরও সূচনা করেছে । যদিও অন্যত্র এইবিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে বলা হয়েছে, দান হল ব্যক্তির ধর্মীয় মানের উৎকর্ষতার এক অন্যতম অঙ্গ । শান্তিপর্ব অনুসারে দানের গুরুত্ব নির্ধারণ প্রসঙ্গে এইরূপ মতের উল্লেখ মেলে ।

দানের গুরুত্ব :

শান্তি পর্বের অষ্টাদশ অধ্যায়ে দানের গুরুত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে অর্জুন বলছেন, ‘যে গৃহস্থ প্রত্যহ প্রথমে দান করেন, পরে হোমের জন্য অগ্নি সংস্থাপন করেন, গুরুজনের প্রয়োজন সাধন এবং বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহা অপেক্ষা কে ধার্মিক হতে পারে ? আমরাও এইভাবে গৃহস্থ হইয়া, ধর্মের অনুসরণ করিতে থাকিয়া দান, তপস্যা, দয়া ও দাক্ষিণ্যযুক্ত কাম ক্রোধশূন্য প্রজাপালন নিরত অত্যন্ত ইন্দ্রিয় দমনশীল এবং গুরুজন ও বৃদ্ধজনের উপদেশ শ্রবণে তৎপর হইয়া অভীষ্ট স্বর্গ লাভ করিব। ’ আর আমরা

বেদের হিতসাধক ও সত্যবানি হইয়া এবং যথাবিধানে দেবতা ও অতিথি ও অন্যান্য প্রাণীদিগকে যথাযোগ্য বস্তু দান করিতে থাকিয়া পরিশেষে অভীষ্ট স্থান লাভ করিব ।'

প্রশ্ন হতে পারে দান বিষয়ে গবেষণা প্রসঙ্গে মহাকাব্যিক পরিসরে রামায়ণ ও মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লিখিত উক্ত ক্ষেত্রগুলির তাৎপর্য্য কীরূপ ? দান - এর দার্শনিক তাৎপর্য্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে বর্তমান অধ্যায়ের এই পর্বে আমার উদ্দেশ্য হল মহাকাব্যিক পরিসরে প্রচলিত অর্থসহ ভিন্নার্থে দান শব্দটির প্রয়োগের উল্লেখ ও তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা । সেখানে দেখা যায় প্রচলিত অর্থে বিষয় বস্তুর দানসহ, দক্ষিণা দান, ভূ- সম্পত্তি দান ইত্যাদির যেমন প্রয়োগ ও ব্যবহার হয়েছে যেখানে দাতার দানে গ্রহীতার চাহিদার পূরণ হয়েছে, তার অভাব দূর হয়েছে এবং সর্বোপরি তার সন্তোষবিধানও হয়েছে । ঠিক সেই প্রকারেই পরিচয় দান , আশ্বাস দান , সংবাদ দান, সান্ত্বনা দান, সম্মতি দান, পরামর্শ দান ইত্যাদি ক্ষেত্রেও একইভাবে দাতার দানে গ্রহীতার উপকার সাধন হয়েছে। যদিও এইরূপ দানে দাতার নিজের কোন বিষয় বস্তুর প্রতি নিজের স্বত্বাধিকারের নিবৃত্তির প্রসঙ্গ নেই তবুও থাকে গ্রহীতার পরম সন্তোষ যা তাকে তার অসহায় অবস্থা থেকে মুক্ত করে , তার পরম সন্তোষ বিধান করে । গ্রহীতার ক্ষেত্রে এইরূপ দান অনেক সময়েই এমন হয় যা কোন বিষয় বস্তুর প্রাপ্তির আনন্দকেও অতিক্রম করে যায় । যেমন - রামায়ণের পরিচয় দান পর্বে দেখা যায়, যেখানে জনক রাজা হরধনু ভঙ্গকারী রামচন্দ্রের এবং তাঁর পিতৃকূলের পরিচয় পেয়ে পরম সন্তোষ লাভ করছেন এবং তাঁর স্নেহধন্যা কন্যাদ্বয় সীতা ও উর্মিলার বিবাহ বিষয়ে আশ্বস্ত হচ্ছেন । একইভাবে দেখা যায়, বনবাসে গিয়ে জটায়ূর পরিচয় এবং তাঁর আশ্বাস পেয়ে সীতার নিরাপত্তার বিষয়ে রামচন্দ্র আশ্বস্ত হচ্ছেন । দেখা যায় , পিতৃসত্য পালনের উদ্দেশ্যে বনবাসে যাওয়ার সময় রামচন্দ্র কর্তৃক বিহ্বল, শোকাতুর, বিলাপরত পিতা দশরথকে সান্ত্বনা দান করে তাঁকে আশ্বস্ত করার প্রচেষ্টা । আরও দেখা যায়, লঙ্কার রাজা দশানন রাবণ ছলনায় রামচন্দ্রের কাটামুণ্ড রচনা করে তা অশোক কাননে বন্দী সীতাকে দেখিয়ে যখন তাঁকে বিহ্বল করতে চেষ্টা করেছিলেন সেই সময়ে হনুমানের দ্বারা রামচন্দ্রের কুশল সংবাদ দানে সীতা যেন জীবিত থাকার কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন । তাই এইপ্রকার দানও তো গ্রহীতার পক্ষে তার জীবনে যেকোন বস্তু প্রাপ্তির তুলনায় অধিক তাৎপর্য্যপূর্ণ । একইভাবে মহাকাব্যিক পরিসরে বর্ণিত পরামর্শ দানের মধ্যে দিয়ে দাতার উদ্দেশ্য হল গ্রহীতাকে তার কর্ত্তব্য কর্ম সম্পর্কে অবগত করিয়ে দিয়ে তাকে তার নিজ ধর্মে বা কর্ত্তব্য কর্মে স্থিত রাখা । সর্বোপরি বলা যায় নিঃস্বার্থে দান সর্বদাই পুণ্যজনক হলেও দান নির্ভরতা সর্বদাই গ্রহণযোগ্য নয় । শাস্ত্রের এইরূপ উপদেশ দানও তো ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এমন এক দান, যা ব্যক্তিকে তাঁর নিজ জীবন যাপনে স্বনির্ভর হতে, তাঁকে তাঁর জীবনে যোগ্য হয়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করে । তাই বলা যায় যে, মহাকাব্যের

পরিসরে বর্ণিত ‘দান’ বিষয়ক ক্ষেত্রগুলির উল্লেখে প্রচলিত অর্থে বিষয় বা বস্তু দানের পাশাপাশি যে ভিন্ন অর্থগুলির সংযোজন হয়েছে তা অভীষ্ট প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রচলিত অর্থের পরিপূরক রূপেই উপস্থাপিত হয়েছে, যা ‘দান’ ক্রিয়ার ব্যবহারিক পরিধিকে সুবিস্তৃত করেছে ।

তথ্যসূত্র :

- দর্শনাচার্য্য শ্রী মন্নীলকণ্ঠ কৃতয়া ভারতভাবদী[প সমখ্যায়া টীকয়া মহানহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য - মহাকবি - পদ্মভূষণেন শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্যণে প্রণীতয়া ভারতকৌমুদী সমাখ্যায়া টীকয়া তৎকৃত বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্ , *মহাভারতম্ মহর্ষি - শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নবেদব্যাস - প্রণীতম্ শান্তিপর্ব* (খণ্ড ৩২) , প্রকাশক : বিশ্ববানী প্রকাশনী । কলিকাতা - ৯ ।

- দর্শনাচার্য্য শ্রী মন্নীলকণ্ঠ কৃতয়া ভারতভাবদী[প সমখ্যায়া টীকয়া মহানহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য - মহাকবি - পদ্মভূষণেন শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্যণে প্রণীতয়া ভারতকৌমুদী সমাখ্যায়া টীকয়া তৎকৃত বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্ , *মহাভারতম্ মহর্ষি - শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নবেদব্যাস - প্রণীতম্ শান্তিপর্ব* (খণ্ড ৩৩) , প্রকাশক : বিশ্ববানী প্রকাশনী । কলিকাতা - ৯ ।

- দর্শনাচার্য্য শ্রী মন্নীলকণ্ঠ কৃতয়া ভারতভাবদী[প সমখ্যায়া টীকয়া মহানহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য - মহাকবি - পদ্মভূষণেন শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্যণে প্রণীতয়া ভারতকৌমুদী সমাখ্যায়া টীকয়া তৎকৃত বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্ , *মহাভারতম্ মহর্ষি - শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নবেদব্যাস - প্রণীতম্ শান্তিপর্ব* (খণ্ড ৩৪) , প্রথম প্রকাশ : ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ , দ্বিতীয় (বিশ্ববানী সংস্করণ) : মাঘ ১৪০০ বঙ্গাব্দ , প্রকাশক : বিশ্ববানী প্রকাশনী । কলিকাতা - ৯ ।

- দর্শনাচার্য্য শ্রী মন্নীলকণ্ঠ কৃতয়া ভারতভাবদী[প সমখ্যায়া টীকয়া মহানহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য - মহাকবি - পদ্মভূষণেন শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্যণে প্রণীতয়া ভারতকৌমুদী সমাখ্যায়া টীকয়া তৎকৃত বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্ , *মহাভারতম্ মহর্ষি - শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নবেদব্যাস - প্রণীতম্ শান্তিপর্ব* (খণ্ড ৩৫) , প্রকাশক : বিশ্ববানী প্রকাশনী । কলিকাতা - ৯ ।

শ্রীমদ্‌ভগবদগীতায় দান

শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা ভাগবদ্ ধর্মের প্রধান গ্রন্থ । সংহিতা , ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ বৈদিক সাহিত্যের এই চতুর্বিভাগের একেবারে শেষ প্রান্তে ঘটে ভাগবদ্ ধর্মের আবির্ভাব এবং প্রচার । তবে উল্লেখ্য যে, ভগবদগীতা হল স্বয়ংসম্পূর্ণ , এবং তাই তা নির্দিষ্ট কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের গ্রন্থ নয় বরং সমগ্র মানব জাতির ধর্ম গ্রন্থ । প্রচলিত আছে, শ্রীমদ্‌ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বিহিত যে উপদেশ পাওয়া যায় তা হল সার্বভৌম ও সর্বজনীন উপদেশ। তাই এই উপদেশ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই অনুসরণ করতে পারেন । বৈদিক ধর্মের ক্রমবিকাশের ধারায় লক্ষ্য করা যায় যে, এর প্রাথমিক পর্বে ব্যক্তির কর্মের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে । যা মূলতঃ ব্রাহ্মণ্য ও সংহিতা বিভাগের আলোচ্য । আবার ঔপনিষদিক যুগে গুরুত্ব পেয়েছে ব্যক্তির জ্ঞানের বিকাশ । বৈদিক সাহিত্যের আরণ্যক ও উপনিষদে এই বিষয়ের আলোচনা প্রাধান্য পাওয়ায় এই বিভাগটিকে বেদের জ্ঞানকান্ড বলা হয় । পরবর্তী পৌরানিক যুগ হয়েছে ভক্তিপ্রধান । এই যুগে ধর্মের প্রচারে ব্যক্তির ভক্তির দিকটি বিস্তৃতি লাভ করেছে । ভগবদগীতায় এই ত্রিবিধ দৃষ্টিভঙ্গিরই অনুসরণ করা হয়েছে কিংবা বলা যায় গীতোক্ত পূর্ণাঙ্গ ধর্মে জ্ঞান-কর্ম এবং ভক্তি এই ত্রিবিধ মার্গের সমন্বয় হয়েছে । জীব আপন স্বভাব বা শক্তিতেই এই ত্রিবিধ ভাবের মধ্যে দিয়ে তার লক্ষ্যে উপনীত হয় ।

গীতায় ভগবান ও জীবের শক্তি বর্ণনা :

ভগবদগীতা অনুসারে জগতের সৃষ্টিকর্তা রূপে ভগবানের ভাব হল সন্ধিনী, সংবিৎ ও হলাদিনী এই ত্রিবিধ শক্তি স্বরূপ । কারণ সৎ - চিৎ - আনন্দ হল ভগবান বা দেবতার ত্রিবিধ ভাব বা স্বভাব । সৎভাবে যে শক্তি ক্রিয়া করে তাই হল সন্ধিনী শক্তি । এই জগতে যা কিছু আছে, যা কিছু সত্য বলে প্রতীত হয় এবং এই জগৎসহ জীব জগৎ ও তাদের কর্মপ্রবাহের, কর্মপ্রবৃত্তির মূলে আছে যে চালিকা শক্তি তা হল ঈশ্বরের সন্ধিনী শক্তি । এই জগতের চেতনভাবের মূলে আছে যে শক্তি তা হল সংবিৎ শক্তি । এই শক্তির প্রভাবেই জীব জগৎ সচেতন হয় । জীব ঈশ্বর কর্তৃক যথার্থ অর্থে চেতনা, জ্ঞান ও প্রেরণা লাভ করে । শেষতঃ ঈশ্বরের আনন্দভাবের যে শক্তি তা হল হলাদিনী শক্তি । এই শক্তির বলেই ঈশ্বর নিজে সর্বদা আনন্দময় থাকেন, জীব জগৎকে আনন্দ দান করেন এবং নিজের স্বরূপানন্দ উপভোগ করেন । [১] এইরূপ ভগবানের প্রতি ভক্ত বা

---

১ . *শ্রীমদ্ভগবদগীতা , 'গীতোক্ত ধর্মের মূল কথা '*, শ্রী জগদীশ ঘোষ, ভূমিকা, পৃ: ৪৮-৪৯

মোক্ষার্থীকে তাঁর কর্মজীবনে হতে হবে অনাসক্ত । কারণ সকাম কর্ম বন্ধনের সূচনা করে মুক্তির নয় । সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এই ত্রিবিধ বুদ্ধির মধ্যে মোক্ষ বা মুক্তি প্রাপ্তির লক্ষ্যে তাকে সর্বদা কর্মের প্রতি কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে সত্ত্বপ্রধান হয়ে উঠতে হবে । তার মধ্যে দিয়েই ঘটবে তার যথার্থ জ্ঞানের প্রকাশ । যে আর্ত এইরূপে যাবতীয় কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে সুখ ও দুঃখে সমত্ববুদ্ধি যুক্ত হয়ে ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণরূপে আত্ম সমর্পণ করতে পারেন তিনিই প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানী ভক্ত । ভগবদগীতা অনুসারে এইরূপ 'জ্ঞানী ভক্তই' ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ অর্থে জ্ঞান ও ভক্তি - শ্রদ্ধা প্রর্দশন করতে পারেন এবং তার মধ্যে দিয়েই ঘটে ভক্তের পূর্ণাঙ্গ মুক্তি। মুক্তি লাভের জন্য ভগবদগীতায় জ্ঞান ও ভক্তি অতিরিক্ত অন্যান্য যেসকল উপায়ের নির্দেশ হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল উপাসনা । এই উপাসনার অন্যতম প্রধান উপায় হল যজ্ঞ, দান ও শ্রদ্ধা । তাই বলা যায়, ভগবদগীতা অনুসারে এই ত্রিবিধ উপায় হল মোক্ষ প্রাপ্তির সহায়ক ।

যজ্ঞ :

যজ্ঞ শব্দটি বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত । বৈদিক সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ ঋগ্বেদ্ সংহিতা অনুসারে আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি যে, বৈদিক ধর্মানুসারে 'যজ্ঞ' হল ঈশ্বর বা দেবতাদের আরাধনা করার এক বিশিষ্ট রীতি বা উপায় বা মাধ্যম । তা যেন ভগবানের প্রতি ভক্তের প্রার্থনা নিবেদন করে কাম্যফল লাভ করার এক অন্যতম উপায় বা মাধ্যম বলেই জ্ঞাত হয়েছে । বেদের কর্মকান্ডে বিবিধ যাগযজ্ঞের মধ্যে দিয়ে যেমন ভক্তের সঙ্গে ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও সাযুজ্য লাভের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তেমনি এর নানা ফললাভের দৃষ্টান্তও বর্ণিত হয়েছে । ভগবদগীতা অনুসারে বলা হয়, যেসকল যজ্ঞ কেবল পরম ঈশ্বরের রূপ, তার সাযুজ্য ও সান্নিধ্য লাভের জন্য করা হয় তা হল নিষ্কাম কর্ম । এইরূপ কর্মে কোন বন্ধন হয় না । কিন্তু যে যজ্ঞে বিষয়াসক্তি বা অন্য কোন ফললাভের বাসনা থাকে তা হয় সকাম কর্ম । তার জন্য বন্ধন হয় । যজ্ঞের মূল উদ্দেশ্যই হল পরার্থে, লোকরক্ষার্থে, ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষার্থে আত্মোৎসর্গ বা অন্য যেকোন ত্যাগ । কারণ এইরূপ ত্যাগের দ্বারাই , পারস্পরিক আদান - প্রদানের দ্বারাই লোকরক্ষা হয় । প্রশ্ন হয়, ফলের কামনায় যেকোন কর্ম সকাম ও কর্মবন্ধনের কারণ হলে যজ্ঞের ভিন্নতা কীরূপে ব্যাখ্যাত হবে ? নাকি মেনে নিতে হবে যে বৈদিক ধর্মানুসারী যজ্ঞও কর্মবন্ধনের কারণ হয় । উত্তরে শ্রীমদ্ভগবদগীতা অনুসারে বলা যায়, কেবলই কামনামূলক যজ্ঞ নিন্দনীয়, কারণ তা কর্ম বন্ধনের কারণ হতে পারে । লোকরক্ষার্থে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে কোন যজ্ঞ করলে তা বন্ধনের কারণ হয় না । এই প্রসঙ্গে গীতায় নির্দেশ করে বলা হয়েছে, যদি নির্দিষ্ট কোন যজ্ঞ সম্পাদন করা হয়, তা স্বরূপগতভাবেই উদ্দেশ্য জন্য হয় । তাই সেখানে পৃথকভাবে ফল কামনা করার প্রয়োজন নেই । যজ্ঞ সম্পন্ন

হলেই যজ্ঞ কর্মের উদ্দেশ্য তার স্বভাবগুণেই চরিতার্থ হবে । তাই কর্মমাত্রই বন্ধনের কারণ হবে এমন নয় বরং আমরা দৈনন্দিন জীবন যাপনের পরিসরে এমন অনেক কর্মই করি যা কাম্যফলের আকাঙ্খা রহিত । ফলতঃ সেই সকল কর্মগুলি ফলজনক না হওয়ায় তা কোনরূপ কর্ম বন্ধনের কারণ হয়না । এর মধ্যে ঈশ্বরের প্রীতি উৎপাদনে কৃত যজ্ঞ অন্যতম । প্রশ্ন হতে পারে, ঈশ্বরের প্রীতি উৎপন্ন করার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক চাহিদার পরিপূরণ ঘটবে এই লক্ষ্যওতো কর্তার কর্মের উদ্দেশ্য হতে পারে। সেক্ষেত্রে কী একথা বলা যাবে যে ঈশ্বরের প্রীতি ও সন্তোষ উৎপন্নকারী যজ্ঞও কর্মবন্ধনের কারণ হয় ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, ভগবদগীতায় নির্দেশিত হয়েছে, ক্ষেত্রবিশেষে যজ্ঞের মাধ্যমে যজ্ঞকর্তার অভীষ্ট ফললাভের উদ্দেশ্য সাধিত হলেও তা সর্বদাই এইরূপ নয় । কারণ যে যজ্ঞ কেবলই ঈশ্বরের প্রীতি এবং সন্তুষ্টি উৎপন্ন করার জন্য করা হয়, তা কখনোই কর্তার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় না । আর সেই কারণেই এইরূপ যজ্ঞজনিত সাফল্য কিংবা বৈফল্য কোনটিই যজ্ঞ কর্তাকে স্পর্শ করতে পারে না । কারণ তার এজাতীয় কর্মের উদ্দেশ্য হল সদ্‌বুদ্ধির সাধন করা । যা প্রকৃতপক্ষে কর্তৃত্বাভিমান বিরহিত ।[২] তাই সেখানে কর্ম বন্ধনের কোন আশঙ্কা থাকে না । এই প্রসঙ্গে গীতায় আরও বলা হয়েছে , যেহেতু যজ্ঞে দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য হব্য প্রদান করা হয় , তাই সেই হব্যে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতা যখন ফলরূপে যজ্ঞান্ন প্রদান করেন তা যদি যজমান সকলকে দিয়ে সবশেষে নিজে গ্রহণ করেন তবে তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্তি পেতে পারেন ।[৩] এইভাবে দেখা যায় যে, মোক্ষার্থীর বা আর্তের সকল পাপের নিয়ামকরূপেও ভগবদগীতায় নিষ্কাম যজ্ঞের নির্দেশ হয়েছে । প্রসঙ্গতঃ ভগবদগীতা অনুসারে কেবলই কামনামূলক যাগযজ্ঞ নিন্দনীয় হলেও কর্ম শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে জীবের জীবনের সমস্ত কর্ম কিংবা কোন বিশেষ যজ্ঞ যদি সুখে ও দুঃখে অবিচলিত থেকে কেবলই লোকরক্ষার্থে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত এইরূপ নিষ্কাম মনোভাবে সম্পন্ন হয় তবে সেই কর্ম বা যজ্ঞ অবশ্যই প্রশংসনীয় । কারণ তাতেই জীবের মোক্ষ ও জগতের অভ্যুদয় উভয়ই সাধিত হয় ।[৪]

যজ্ঞের প্রকার :

ভগবদ্‌গীতায় নিষ্কাম যজ্ঞের পাঁচ প্রকারের উল্লেখ হয়েছে । এই প্রকারগুলি হল, ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ , দৈবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ । অধ্যাপনা করা এবং সান্ধ্য - উপাসনাদি ক্রিয়াকে বলা হয় ‘ব্রহ্মযজ্ঞ বা

---

২ . *শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা,* পন্ডিত শ্রীযুক্তভূতনাথ সপ্ততীর্থ, ৩।১০-১১ ,পৃ : ৩০১
৩ . *শ্রীমদ্ভগবদগীতা* , শ্রী জগদীশ ঘোষ, ৩। ১৩
৪ . ঐ, ১৮। ৪৬

ঋষিযজ্ঞ' দেবতার উপাসনা করা তার সন্তুষ্টির জন্য হোম ইতাদির আয়োজন করে হব্য প্রদান করা হল 'দৈবযজ্ঞ'। 'পিতৃযজ্ঞে' পরলোকগত পিতৃ পুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পনাদি সম্পন্ন করা হয় । 'ভূতযজ্ঞে' মনুষ্যেতর জীবজন্তু - কাক - পক্ষীদের খাদ্য দান করা হয় । শেষতঃ গৃহে আগত অতিথিদের সমাদরে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আসন ইত্যাদি প্রদান সহ খাদ্য দান ইত্যাদিকে বলা 'নৃযজ্ঞ' । ভগবদ্গীতা অনুসারে পঞ্চযজ্ঞের প্রতিটিই ফলপ্রদ এবং তা যদি নিষ্কামভাবে কেবলই লোক - সংগ্রহার্থে সম্পন্ন করা হয় তবে তা একইসঙ্গে মোক্ষেরও কারণ হয় ।[৫] যজ্ঞ হল ঈশ্বরের আরাধনার এক অন্যতম অঙ্গ । 'যজ্ঞ' শব্দটির এইরূপ অর্থ গ্রহণ করে এর আরও পাঁচটি প্রকারের উল্লেখ করা হয়েছে । দ্রব্যযজ্ঞ , তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ , স্বাধ্যায় - যজ্ঞ , বেদজ্ঞান যজ্ঞ বা সমাধি যজ্ঞ । সূর্য, ইন্দ্র, বরুণ প্রমুখ দেবতার উদ্দেশ্যে তাদের সন্তুষ্টির জন্য হব্য বা দ্রব্য ত্যাগরূপ যজ্ঞ হল 'দ্রব্যযজ্ঞ' ।এই যজ্ঞে শ্রৌতকর্মসহ দেব- দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং অন্নসত্রও দান করা হয়। তাই এর অপর নাম 'দৈবযজ্ঞ'। দেবতার সন্তুষ্টি সাধন করে তাঁর কৃপা লাভ করার জন্য কঠোর কৃচ্ছ্সাধনা করা, একনিষ্ঠভাবে ধ্যান বা তপস্যা করা , উপবাস ব্রত ইত্যাদি পালন করা হল 'তপোযজ্ঞ' । যম, নিয়ম ইত্যাদি অষ্টাঙ্গযোগের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়বিষয় আসক্তি সম্পূর্ণরূপে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া বা ত্যাগ করাই হল 'সংযম যজ্ঞ বা যোগযজ্ঞ' । ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে শ্রদ্ধাসহকারে বৈদিক বিধি নিয়মের অভ্যাস আয়ত্ত করা হল 'স্বাধ্যায় - যজ্ঞ' । বেদের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করাই হল বেদজ্ঞান যজ্ঞ বা সমাধি - যজ্ঞ । অষ্টাঙ্গযোগের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়বিষয় আসক্তি সম্পূর্ণরূপে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া বা ত্যাগ করাই হল 'সংযম যজ্ঞ বা যোগযজ্ঞ'। বেদের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করাই হল বেদজ্ঞান যজ্ঞ বা সমাধি - যজ্ঞ । ভগবদগীতায় বর্ণিত হয়েছে, এই সকল যজ্ঞ হল সংসারের নিয়ম । তাই তা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য । প্রত্যেকেরই উচিৎ প্রকৃত অর্থে ত্যাগের মধ্যে দিয়ে এইসকল যজ্ঞ সম্পাদন করা । কারণ এইরূপ যজ্ঞে কৃত নিষ্কাম কর্মের মধ্যে দিয়ে মোক্ষ প্রাপ্তি সম্ভব হয় ।[৬] ত্যাগ বা দান হল যজ্ঞের এক অন্যতম আবশ্যিক অঙ্গ , তাই যজ্ঞের মতোই ভগবদগীতায় দানও আবশ্যিক কর্ত্তব্য বলে উল্লিখিত হয়েছে ।

ভগবদগীতায় দান :

ভগবদগীতা অনুসারে 'দান' হল কর্ত্তব্যবুদ্ধি এবং এমন এক ক্রিয়া যা অবশ্যকর্ত্তব্য এবং চিত্তশুদ্ধিকর বলে বর্ণিত হয়েছে । তবে কামনাসহিত কোন দান এইরূপ নয় । যেকোন প্রকার আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করে

---

৫ . *শ্রীমদ্ভগবদগীতা* , ৩। ১৪ -১৬
৬. ঐ, ৪। ৩০-৩১

কেবল লোকরক্ষার্থে দেয় ‘দান’ই অবশ্যকর্ত্তব্য এবং চিত্তশুদ্ধিকর বলে বর্ণিত হয়েছে । [৭] যজ্ঞের সমান পুণ্যকর্মরূপে তুলনা করে গীতায় ‘দান ক্রিয়া’ যজ্ঞরূপেও উল্লিখিত হয়েছে । বলা হয়েছে, দেবতার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নানারকম ফল ও ফুলের উপচারসহ আয়োজিত পূজার্চনা ও হোমাদি হল দ্রব্যময় যজ্ঞ । এইরূপ যজ্ঞকে দৈবযজ্ঞও বলা হয় । এইরূপ যজ্ঞে যেমন দেবতাদের উদ্দেশ্যে দান কর্ম সম্পাদিত হয় তেমনি আবার গৃহে আগত অতিথিদের অভ্যর্থনা ও সম্মাননা জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয় যে নৃযজ্ঞ, তাতেও দান ক্রিয়া থাকে । এই উভয় প্রকার যজ্ঞই হল ‘দানযজ্ঞ’ । এইরূপ যজ্ঞ স্বর্গাদি ফললাভের কারণ হয়। [৮] ভগবদগীতা অনুসারে দান কেবল অবশ্য কর্ত্তব্য কর্মরূপেই নয় বরং স্বধর্ম অর্থে কর্ত্তব্য কর্মরূপে ব্যক্তির পরমসিদ্ধির সহায়ক বলেও বর্ণিত হয়েছে । বলা হয়েছে , ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণ প্রধান, কাজেই তাদের স্বভাব ও গুণ অনুসারে যজন , যাজন ,অধ্যয়ন , অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি কর্ম তাদের জন্য শাস্ত্রবিহিত হয়েছে । তবে তার মধ্যে জীবিকারূপে তাদের জন্য অনুমোদিত হয়েছে যাজন, অধ্যাপনা ও প্রতিগ্রহ বা অযাচিত দান কেবল এই তিনটিই । ক্ষত্রিয়ের স্বভাব হল সত্ত্বমিশ্রিত রজোপ্রধান । তাই শৌর্য - বীর্য ইত্যাদি হল তাদের চারিত্রিক গুণাবলী । তাই তাদের জন্য শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধর্ম যজন, অধ্যয়ন, দান, রাজ্যরক্ষা এবং প্রজাপালন । বৈশ্যেরা হলেন তমোগুণ মিশ্রিত রজোপ্রধান । তাই তাদের স্বধর্ম হল কৃষি বাণিজ্য, দান ইত্যাদি । শূদ্রবর্ণের মানুষ হলেন রজোগুণ মিশ্রিত তামসিক প্রকৃতির । তাই তাদের স্বধর্মরূপে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে সমাজের অপর তিন বর্ণের জন্য পরিচর্যা বা সেবা দান করা । সমাজকে সুশৃঙ্খলরূপে চালিত করার জন্য প্রতি বর্ণের মানুষের জন্যেই স্বধর্মরূপে তাদের কর্ত্তব্য কর্ম এইরূপে বিহিত হয়েছে । তাই সমাজের সার্বিক মঙ্গলার্থে প্রতি বর্ণের মানুষই নিজ নিজ দায়বদ্ধতা পালন করতে পারেন তাঁদের স্বধর্ম সম্পাদনের দ্বারা । তার মধ্যে দিয়েই ঘটে সমাজের সার্বিক কল্যাণ এবং তাদের পরমসিদ্ধি । [৯]

দান ও যজ্ঞ সম্বন্ধ :

দানের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে ভগবদগীতায় উল্লিখিত হয়েছে, ‘সহযজ্ঞা: প্রজা:’ [১০] দান যজ্ঞের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। দান তার ভূমিকায় যজ্ঞের অন্যতম অঙ্গরূপে অভিহিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে ভগবদগীতায় বর্ণিত হয়েছে,

---

৭. *শ্রীমদ্ভগবদগীতা,* ১৮। ৫-৬
৮. ঐ, ৪। ৩৩
৯. ঐ, ১৮। ৪৩ -৪৪
১০ . *শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা,* পন্ডিত শ্রীযুক্তভূতনাথ সপ্ততীর্থ, ৩।১০

প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে প্রজা এবং যজ্ঞের সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন করে বলেছিলেন, যজ্ঞকার্য্য মানুষের সকল অভীষ্ট পূরণ এবং কল্যানের হেতু হবে । স্বার্থবুদ্ধি ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হলেও এইরূপ যজ্ঞকর্ম ব্যক্তি পরার্থেও সম্পন্ন করে । প্রজাপতির মতে ব্যক্তির এইরূপ পরার্থপর বুদ্ধিও স্বাভাবিক । সদ্‌বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে ঈশ্বরের প্রীতি সাধনের জন্য যজ্ঞ কর্ম সম্পন্ন করার মধ্যে দিয়ে যজ্ঞকর্তার চিত্ত যেরূপে উদার হয় তার বলেই সে অন্যের হিত সাধনার্থে', উপকারার্থে নানাবিধ দানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে । এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই ভগবদগীতায় প্রজা ও যজ্ঞ সহজাত বলে বর্ণিত হয়েছে । সমাজ কল্যাণের লক্ষ্যে যা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণরূপে স্বীকৃত হয়েছে ।

দানের প্রকার :

ভগবদগীতা অনুসারে গুণভেদে দান ত্রিবিধ প্রকারের ; সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ।

সাত্ত্বিক দান : দান করা উচিৎ তাই দান করতে হবে এমন কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে উপযুক্ত দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করে নিষ্কাম মনোভাবে যে দান করা হয় তাই হল সাত্ত্বিক দান । গীতায় সাত্ত্বিক দান সম্বন্ধে তিনটি অবশ্য কর্ত্তব্যের উল্লেখ হয়েছে । প্রথমতঃ কোন প্রকার ফলের আকাঙ্খা না রেখে নিস্কাম মনোভাবে এই দান ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে । দ্বিতীয়তঃ দাতা এইরূপ দানে পাত্র বা গ্রহীতারূপে এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করবেন না, যিনি ইতিপূর্বেই দাতার উপকার করেছেন কিংবা ভবিষ্যতে উপকার করতে পারেন এমন সম্ভাবনা আছে । তৃতীয়তঃ উপযুক্ত দেশ, কাল এবং পাত্রের বিবেচনার যে উল্লেখ হয়েছে এইপ্রকার দানে ; সেখানে 'দেশ' শব্দটি স্থান 'কাল' বলতে সময় এবং 'পাত্র' অর্থে আর্ত ব্যক্তি এইরূপ বিশেষ অর্থে গৃহীত হয়েছে । যেমন, ধরা যাক্ কোন স্থানে পানীয় জলের অভাব দেখা দিয়েছে । সেক্ষেত্রে উপযুক্ত 'দেশ' বলতে বুঝতে হবে যে দেশে বা স্থানে পানীয় জলের অভাব হয়েছে সেখানে লোকরক্ষার্থে পানীয় জলের সংকুলানের জন্য নলকূপ খনন করা কিংবা পুকুর প্রতিষ্ঠা করে তা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য দান করা । 'কাল বা সময়' বলতে বোঝানো হয়েছে কোন নির্দিষ্ট সময় । যেমন, ধরা যাক্ কোন স্থানে কোন নির্দিষ্ট সময়ে যদি কোন সংক্রমিত রোগ বা ব্যাধি দেখা দেয় সেক্ষেত্রে সেই সময় উপযুক্ত দান হবে ঐ ব্যাধি নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধের দান । শেষতঃ নিজ স্বার্থের কারণে কোন অর্থশালী বা বিত্তবান ব্যক্তিকে নয় বরং 'পাত্র' অর্থে বিপদগ্রস্ত কিংবা অভাবী অসহায় ব্যক্তিকে দান করা প্রয়োজন এইরূপ বিবেচনা করা হয়েছে । [১১] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এইরূপ বিচারে গীতায় সর্বদাই সাত্ত্বিক দানক্ষেত্রে পাত্র বা গ্রহীতারূপে শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণ উৎসাহিত হয়েছেন ।

---

১১. *শ্রীমদ্ভগবদগীতা,* ১৭। ২০

আবার পরবর্তীতে আধুনিক সমালোচকদের দ্বারা এইরূপ সাত্ত্বিক দান নিন্দিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বর্ণিত হয়েছে, ‘সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘‘সর্বনাশ! আমি যদি স্বদেশে বসিয়া (অর্থাৎ পুণ্যক্ষেত্রাদিতে নয়, ১ লা হইতে ২৯ শে তারিখের মধ্যে (অর্থাৎ সংক্রান্তিতে নয়) কোন দিনে অতি দীনদুঃখী, পীড়া কাতর একজন মুচি বা ডোমকে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগকে নয়) কিছু দান করি, তবে সে দান ভগবদভিপ্রেত দান হইল না । এইরূপে কখন কখন ভাষ্যকারদিগের বিচারে অতি উন্নত, উদার ও সার্বভৌমিক যে ধর্ম তাহা অতি সঙ্কীর্ণ এবং অনুদার উপধর্মে পরিণত হইয়াছে । ইহারা যাহা বলেন তাহা ভগবদ্বাক্যে নাই, স্মৃতিশাস্ত্রে আছে । কিন্তু বিনা বিচারে ঋষিদিগের বাক্যসকল মস্তকের উপর এতকাল বহন করিয়া এই বিশৃঙ্খলা, অধর্ম ও দুর্দশায় আসিয়া পড়িয়াছি । এখন আর বিনা বিচারে বহন কর্তব্য নহে । ’ [১২] এইরূপ আপত্তির উত্তরে ভগবদগীতা অনুসারে বর্ণিত হয়েছে, ঋষিশাস্ত্র এইরূপ দান বিবেচনায় কোথাও কোন পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেনি বরং কর্ত্তব্য কর্ম বা স্বধর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণগণ হিন্দু সমাজের প্রতিষ্ঠা ও বর্ণাশ্রম ধর্মাদির ব্যবস্থা করে, রাজ্যের রাজত্ব, প্রভূত্ব কর্ম, কৃষিকর্ম, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থ উপার্জনের কর্মে সমাজের অপর সকল বর্ণকে অধিকার দিয়ে নিজেদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন । সেখানে নিজেদের কর্তব্য কর্মরূপে যজন - যাজন, অধ্যাপনা ও প্রতিগ্রহ বা অযাচিত দানের উল্লেখ করেছেন । তাই সমাজ রক্ষার অনুকূলে এইসকল পরার্থপর ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে দান শ্রেষ্ঠ দান, এইরূপ বিচার বা অনুশাসন করা হয়েছে । তবে দানক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণ যে সর্বদাই প্রশংসিত হয়েছেন এমন নয়, কারণ গ্রহীতারূপে বেদজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণগণ নিন্দিতও হয়েছেন । এই প্রসঙ্গে বেদজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণগণকে দান করা হলে দাতা নিম্নগামী হন এমনও অনুশাসন শাস্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে । এইরূপে শাস্ত্রে সাত্ত্বিক দানে শ্রেষ্ঠতার বিচার প্রসঙ্গে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ অর্থহীন বলে উল্লিখিত হয়েছে ।

রাজসিক দান : কোন দাতা নির্দিষ্ট কোন ফললাভের লক্ষ্যে কিংবা প্রত্যুপকারের আশায় বড় কষ্টে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে দান ক্রিয়া সম্পন্ন করেন তাকে বলা হয় রাজসিক দান । এইরূপ দান কার্য্য নিষ্কাম মনোভাবে সম্পন্ন না হওয়ায় তা ফলজনক হয় এবং খুব সঙ্গত কারণেই জীবের মোক্ষলাভের পথে প্রতিবন্ধকতার কারণও হয় । উল্লেখ্য যে রাজস দানের ক্ষেত্রেও দেশ কাল ও পাত্রের বিচার থাকে ।

তামসিক দান : অনুপযুক্ত দেশ, কাল ও পাত্রে দাতা সংস্কার শূন্যভাবে এবং অবজ্ঞা সহকারে যে দান করেন তাকে বলা হয় তামস দান । তামসিক দানে দাতার গ্রহীতার প্রতি কোন শ্রদ্ধা ও সম্মান না থাকায় তা তার

---

১২. *শ্রীমদ্ভগবদগীতা,* শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, পৃ : ৪৯২ ।

ব্যক্তিগত সংস্কারের অধোগতির জনক হয়, ফলে এই প্রকার দানও দাতার মুক্তি পথের প্রতিবন্ধক হয় ।

শ্রেষ্ঠ দান বিচার :

ভগবদগীতা অনুসারে দানের শ্রেষ্ঠতা বিচারের ক্ষেত্রে দাতার ব্যক্তিগত সংস্কার, বিবেচনাবোধ ও গ্রহীতার প্রতি শ্রদ্ধা মনোভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । দানের উল্লিখিত ত্রিবিধ প্রকারের মধ্যে তামসিক এবং রাজসিক দান কর্মবন্ধনের জনক হওয়ায় তা সম্পাদনের আগে দাতার বিবেচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য । সকাম কর্মরূপে রাজসিক দানে দাতা ইহলোকে তার কাম্য ফললাভের লক্ষ্যে উপনীত হলেও তা দাতাকে তার জীবনের মূল লক্ষ্য থেকে যে বিচলিত করে সেই বিষয়ে তাঁকে বিবেচনা করতে হবে । দ্বিতীয়তঃ অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞায় সম্পাদিত তামসিক দানে দাতার তো কোন পুণ্যকর্মের সঞ্চয় হয় না বরং তা তার জীবনে সঞ্চিত সংস্কারের ক্ষেত্রে নিম্নগামী করে তার মন্দ কর্মফলের জনক হয় । এইরূপে দেখা যায় যে, উভয় প্রকার দানই কর্ম বন্ধনের জনক হয় । তাই বলা হয়েছে, দান বিষয়ে শ্রদ্ধার সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । শ্রদ্ধাই প্রধান । ভগবদগীতা অনুসারে শ্রদ্ধা হল সকল উপাসনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ । শ্রদ্ধা চালিত হয় ব্যক্তির বুদ্ধি দ্বারা । সাত্ত্বিকাদি ভেদে বুদ্ধি ত্রিবিধ হওয়ায় তাই শ্রদ্ধাও ত্রিবিধ ।[১৩] এই প্রকারে ব্যক্তির ত্রিবিধ বুদ্ধি আলোচনা প্রসঙ্গে গীতায় বলা হয়েছে, যে প্রকার উপাসনায় ভগবানকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ভক্ত মানুষের বলি দিতেও দ্বিধা করেন না , ব্যক্তির এমন বুদ্ধি হল 'জড়বুদ্ধি' । তা তামস মনোভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন '। তাই এইপ্রকার উপাসনা ক্ষেত্রে দেবতার প্রতি ভক্তের শ্রদ্ধা তামসিক বুদ্ধি প্রসূত । আবার নির্দিষ্ট কোন ফলের কামনায় ফলমূলাদি ও ফুল ইত্যাদি উপচারে পূজার্চনা করা এবং হোমাদিতে হব্য প্রদান করে ভক্ত তাঁর ভগবানের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন তা তার রাজসিক বুদ্ধি জন্য । ভক্ত এই প্রকার উপাসনায় আনেক ক্ষেত্রে বলিদান করে ভগবানের অধিক সন্তুষ্টি লাভ করার ক্ষেত্রে ছাগ, মহিষ ইত্যাদি পশুর ব্যবহার করেন । বলা বাহূল্য যে, তামসিক বুদ্ধির মতো ব্যক্তির এইরূপ রাজসিক বুদ্ধিও তার মোক্ষকর্মের সহযোগী নয় । কারণ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তি মোক্ষকামী জীবরূপে তার কামনা বাসনার আসক্তিকে জয় করতে সমর্থ হতে পারে না । শেষতঃ যদি কোন ব্যক্তি ভক্তরূপে কেবলই নিষ্কাম মনোভাবে দেবতার উপাসনা করার লক্ষ্যেই তার কাম, ক্রোধ ইত্যাদি রিপুকে দানব জ্ঞানে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে বলি দান করেন, তবে সেই দানই সাত্ত্বিক বুদ্ধি বা শ্রদ্ধা প্রসূত দান । এইরূপ দানই নিস্কাম মনোভাবে সম্পন্ন দান, যা মোক্ষফলপ্রদায়ক । তাই বলা হয়, ত্রিবিধ দান মধ্যে সাত্ত্বিক দানই হল শ্রেষ্ঠ দান । সাত্ত্বিক দানের

---

১৩. *শ্রীমদ্ভগবদগীতা,* ১৮। ৩০-৩২

ক্ষেত্রে দাতার যে কর্ত্তব্যবোধের কথা বলা হয়েছে তা তো বহুক্ষেত্রেই ‘এইরূপ দান আমার কর্ত্তব্য’ কিংবা ‘এইরূপ দান আমি সম্পন্ন করতে পারি’ এইরূপ অহংবোধেরও জনক হতে পারে । তাহলে সেক্ষেত্রে দাতার এইরূপ সাত্ত্বিক দান কি তার কর্মবন্ধনের কারণ হয় না ? উত্তরে বলা যায়, ভগবদগীতায় যে সাত্ত্বিক দানের কথা বলা হয়েছে , তা চালিত হয় নিষ্কাম মনোভাবে ও সুখ - দুখে সমত্ব বুদ্ধির দ্বারা । ফলতঃ এই প্রকার দানে দাতার ‘দান করা উচিৎ, তাই দান করি’ কেবলই এইরূপ বোধ হয় । তাই তা তার কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না । পরবর্তী রাজসিক ও তামসিক দান সম্পর্কে প্রশ্ন হয়, এই উভয় প্রকার দানই দাতার কর্মবন্ধনের কারণ হওয়ায় তা ব্যক্তির নিজের মুক্তিলাভের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধক হয়, কিন্তু এই প্রকার দানে কিংবা দানযজ্ঞে যেমন দৈবযজ্ঞ ইত্যাদিতে যজমানকে সাহায্য করেন যে পুরোহিত, কিংবা হোতা, উদগাতা কিংবা অধ্বর্য্য তাঁদেরও কি মুক্তিপথের পরিপন্থী হয় না ? এইধরনের প্রশ্নের উত্তরেও ভগবদগীতা নিষ্কাম কর্মের সমাধান দিয়েছেন, দানের শ্রেষ্ঠতা বিচার বা শ্রেষ্ঠ ফললাভের মধ্যে দিয়েই তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় । সেখানে বলা হয়েছে, ‘লোকরক্ষার্থে আয়োজিত বিভিন্ন যজ্ঞ কর্মে স্বীয় স্বীয় কর্ম সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে জাগতিক স্থিতি অব্যাহত রাখলে তাতেই ভগবানের প্রকৃত অর্চনা করা হয়, তাঁর মধ্যে দিয়েই ঘটে ভগবানের পূর্ণ সন্তুষ্টি ।’ [১৪] তাই গীতায় ভক্তের প্রতি ভগবানের উপদেশ হল, মোক্ষপ্রার্থীকে নিষ্কাম মনোভাবে কেবল কর্ত্তব্য কর্ম সম্পাদনের কর্ত্তব্য বুদ্ধিতেই তার স্বধর্ম পালন করতে হবে , তার মধ্যে দিয়েই সাধিত হবে জগতের প্রকৃত মঙ্গল এবং জীবের পূর্ণ মুক্তি ।

---

১৪. *শ্রীমদ্ভগবদগীতা,* ১৮। ৪৬

তথ্যসূত্র :

- ঘোষ শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত ও শ্রী অনিল চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক সুসংস্কৃত, *শ্রীমদ্ভগবদগীতা* , ১৯৫৮, প্রকাশক - প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী , কলিকাতা - ৭৩

- তর্কভূষণ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ সম্পাদিত, *শ্রীমদ্ভগবদগীতা* , ২০০১, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা - ৯

- সরস্বতী শ্রীমন্ মধুসূদন কৃত টীকা, সপ্ততীর্থ পন্ডিত শ্রীযুক্তভূতনাথ (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত), সম্পাদনা - শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, *শ্রীমদ্ ভগবদগীতা* (প্রথম খন্ড), বঙ্গাব্দ - ১৩৪৫, প্রকাশক - কৃষ্ণ ব্রাদার্স, কলিকাতা ।

কৌটিল্যের পররাষ্ট্রনীতিতে দান প্রসঙ্গ : একটি বিশ্লেষণ

প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিশাস্ত্রের অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য ও প্রামানিক গ্রন্থ হল কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। মহামতি কৌটিল্যের সময়ে বর্ণ ধর্ম এবং তদনুসারী কর্ত্তব্য কর্ম এইরূপ ধর্মীয় অনুশাসন ও মনোভাবের বাইরে গিয়ে মানুষ নতুন ভাবে তাদের জীবন যাত্রা গঠন করতে উৎসাহী হয়েছিল । সেই সময়ে মানুষের মননে স্থান লাভ করেছিল আধুনিকতা । ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবের প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করেছিলেন । যার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব অর্থশাস্ত্রেও পরিলক্ষিত হয় । সমসাময়িক উন্নত ও আধুনিক রাষ্ট্রভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থে যেভাবে তদানীন্তন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রচিন্তার চিত্র অঙ্কিত করেছিলেন সেখানে দেখা যায়, মূলতঃ দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে প্রাচীন ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হতো । প্রথমতঃ ধর্ম ও নীতিবোধের আদর্শে পরিচালিত রাষ্ট্র তথা সামাজিক শাসন ব্যবস্থা, দ্বিতীয়তঃ পররাষ্ট্রনীতির সম্প্রসারণ এবং জটীল কূটনীতিগত রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যান ধারণা ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা । বলা বাহূল্য যে, রাষ্ট্রের যথাযথ শাসন ব্যবস্থার লক্ষ্যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে রাষ্ট্রচিন্তার এই দ্বিতীয় ধারা অনুসারেই রাজার ভূমিকা তথা কর্ত্তব্য নির্দেশিত হয়েছে । রাজ্যে সুষ্ঠুভাবে শাসন কার্য্য পরিচালনা করার লক্ষ্যে রাজার জন্য নির্দেশিত সকল বিধি মধ্যে কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থে দান বিষয়ে বহু নির্দেশ করেছেন । সেই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, রাজার কর্ত্তব্য বিষয়ে কৌটিল্যের উপদেশাবলি ছিল মূলতঃ এই বিষয়ে মনু প্রদত্ত উপদেশেরই অনুরণন । উভয়ের মধ্যে বৈস্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে শুধু এই কথাই বলা যেতে পারে যে, মনুর সব উপদেশই ছিল মূলতঃ রাজার কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম ভিত্তিক। মনুর সব উপদেশই বর্ণ অনুসারে রাজার কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম বলে নির্দেশিত হলেও কৌটিল্যের উপদেশের লক্ষ্য ছিল রাজ্যের শাসনকার্য্য সুপরিচালিত করার উদ্দেশ্যে কূটনৈতিক রাজ্যনীতির সম্প্রসারণ । তবে তাঁর নির্দেশে রাজার এইরূপ পররাষ্ট্রনীতি রাজার ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম অর্থেই উপস্থাপিত হয়েছে । কাজেই এমন নীতিকে 'রাজনীতি' কিংবা 'রাজশাস্ত্র' বললেও গৌরব দোষ হয় না । মহাভারতেও রাজ্য পরিচালনার লক্ষ্যে এইরূপ 'রাজনীতি'র উল্লেখ পাওয়া যায় - 'তোষয়িত্বোপচারেণ রাজনীতিমধীতবান্।'[১] মহাভারতে উল্লিখিত ঐরূপ 'রাজনীতি' বা 'রাজশাস্ত্র' শব্দটির সূত্র ধরেই পরবর্তীতে 'অর্থশাস্ত্র' শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। শান্তিপর্বে একজন শ্রেষ্ঠ রাজার অবশ্যকৃত ধর্ম বা কর্ত্তব্য অর্থে এই 'অর্থশাস্ত্র' শব্দটির ব্যবহারে উল্লিখিত হয়েছে - 'যচ্চার্থশাস্ত্রে নৃপশিষ্টজুষ্টে ।'[২] অতএব একথা বলা যায় যে, কৌটিল্যেরও আগে 'অর্থশাস্ত্র'

---

১ .মহাভারত, ১২ .৩৭ . ৯ (গৃহীত *দণ্ডনীতি,* নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, পৃ: ১৫)
২. ঐ, ১২ . ৩০১ .১০৯ (গৃহীত, *দণ্ডনীতি,* পৃ: ১২)

শব্দটির ব্যবহার ও প্রচলন ছিল । যদিও উক্ত শব্দটির অর্থকে কেন্দ্র করে মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হত । যেমন - ‘অর্থ’ শব্দটির প্রচলিত সাধারণ ব্যবহার ছিল টাকা - পয়সা , ধন- সম্পত্তি ইত্যাদি । আবার ধর্মের প্রেক্ষিতে শব্দটি জীবনের চরম লক্ষ্যরূপে ‘ সৎ পথে উপার্জিত অর্থরূপ পুরুষার্থ’ এই অর্থেও গৃহীত হয়েছে। ধর্মীয় সদাচারের লক্ষ্যে ‘অর্থ’ শব্দটি বিভিন্ন যজ্ঞ জন্য আচরণীয় কাম্য বা বাসনা ফল এই অর্থেও প্রযুক্ত ছিল। এখন অর্থশাস্ত্র শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয় প্রসঙ্গে যদি ‘অর্থ’ বলতে টাকা - পয়সা কিংবা ধন-সম্পদ এইরূপ নির্দেশ করা হয় তবে অর্থশাস্ত্র ‘অর্থ’সংক্রান্ত শাস্ত্ররূপে নির্দেশিত হবে । কিন্তু কৌটিল্য নিজেই তাঁর অর্থশাস্ত্রকে শাসনবিধি বলে উল্লেখ করায় একথা বোঝা যায় যে, তা কেবল অর্থনীতি কিংবা ‘অর্থ’সংক্রান্ত শাস্ত্র ছিল না । কৌটিল্যের মতে যে বিদ্যার দ্বারা রাজ্যজয়, রাজ্যরক্ষা এবং রাজ্যে সুষ্ঠু ভাবে শাসন কার্য্য পরিচালনা করার শাসনবিধি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, তাকে বলা হয় অর্থশাস্ত্র । [৩] আবার অর্থশাস্ত্র শব্দের অন্তর্গত ‘অর্থ’ শব্দটিকে বিনিময়ের মাধ্যম রূপে ব্যবহার করে কৌটিল্য ভূমির উল্লেখও করেছেন । মহামতি কৌটিল্য তাঁর ‘অর্থশাস্ত্রে’ মানুষের বসবাস যোগ্য ভূমিকে এবং সেই ভূমিতে তাদের বৃত্তি বা জীবনধারণের উপায় নির্দেশকারী এই উভয় অর্থেই ‘অর্থ’ শব্দটির ব্যবহার করেছেন । সেই সময়ে মানুষের বসবাস যোগ্য ভূমি ছিল বিনিময়ের মাধ্যম । তাই তিনি বলেছেন - মনুষ্যযুক্ত ভূমিকেই আমরা অর্থ বলতে পারি - মনুষ্যবতী ভূমিরিত্যর্থঃ । আবার সেই মানুষের জীবন ধারণের উপযোগী বৃত্তিও অর্থ , মনুষ্যাণাং বৃত্তিরর্থঃ । এইরূপে উভয় ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র শব্দটির তাৎপর্য্য নির্ণয়ে বলেছেন, যেহেতু মনুষ্যবতী ভূমিই হল অর্থ, তাই যে শাস্ত্রে সেই ভূমির লাভ ও পালনের উপায় বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় অর্থশাস্ত্র । [৪] এইরূপে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে মূলতঃ যে দুটি ধারার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় - যেমন ধর্মশাস্ত্রধারা ও অর্থশাস্ত্রধারা তার মধ্যে ধর্মশাস্ত্রধারার উৎস ছিল বৈদিক সাহিত্য ও ধর্মসূত্র । যে ধর্মশাস্ত্রগুলি ছিল মূলতঃ ধর্ম ও নীতি কর্ত্তব্য বিষয়ক । এই শাস্ত্রগুলিতে রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজার কর্ত্তব্য ও শাসন পদ্ধতি বিষয়ে যেসকল নির্দেশ পাওয়া যায় তাও ছিল বর্ণ - ধর্ম ভিত্তিক । অন্যদিকে রাষ্ট্র পরিচালনা প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রধারায় প্রাধান্য পেয়েছিল পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনৈতিক তত্ত্ব । রাজ্যের সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যাপারে রাজা সর্বদাই সুকৌশলী হবেন, এমন মতের উল্লেখ এখানে পাওয়া যায় । দেখা যায় যে, রাজ্য পরিচালনার এই দ্বিতীয় ধারায় যেকোন উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি তত্ত্ব সমর্থিত হওয়ায় ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মীয় বিধানের অমোঘ নিয়মও শিথীল হয়েছে । এইরূপ রাষ্ট্রধারায় রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে রাজার জন্য যেসকল কর্ত্তব্য কর্মের নির্দেশ পাওয়া যায়, তার মধ্যে ‘দান’ ব্যবস্থা ছিল

---

৩ . *অর্থশাস্ত্রসমীক্ষা,* ধর্ম-অর্থ-নীতিশাস্ত্রসমীক্ষা, পৃ: ১৩২

৪. ‘মনুষ্যাণাং বৃত্তিরর্থঃ , মনুষ্যবতী ভূমিরিত্যার্থঃ
তস্যা পৃথিবী লাভ - পালনোপায়ঃ শাস্ত্রমর্থশাস্ত্রম্ ।’ (*কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ১৫.১*) (গৃহীত, *দণ্ডনীতি,*)

অন্যতম । এক্ষেত্রে 'দান'ক্রিয়া রাজার কাছে উপহার এবং কৌশল উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই 'দান' বিষয়ে মহামতি কৌটিল্যের মতের আলোচনা ও তাৎপর্য্য নির্ণয়ের পূর্বে রাজার কর্ত্তব্য বিষয়ে তাঁর সকল নির্দেশ সম্বন্ধে আলোচনা প্রাসঙ্গিক ।

রাজার ধর্ম ও গুণ :

রাজার ধর্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম প্রসঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সকল নির্দেশ ছিল মনুর উপদেশের সদৃশ একথা পুর্বেই বলা হয়েছে । মনু এই প্রসঙ্গে 'ষাড়গুণ্য বিধি'র উল্লেখ করেছেন । পররাষ্ট্র নীতির প্রাধান্যে পরিচালিত উক্ত 'ষাড়গুণ্য' বিধিগুলি হল - সন্ধি, বিগ্রহ, আসন, যান, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত বিধিগুলির প্রতিটিই পররাষ্ট্র নীতির প্রাধান্যে পরিচালিত হত অর্থাৎ এই বিধি অনুসারেই 'রাজা কার সঙ্গে সন্ধি করবেন, কার উপকার কিংবা অপকার সাধন করবেন, কার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন কিংবা কাকে উপেক্ষা করবেন আবার যুদ্ধের সময়ে কোন রাজার কাছে আশ্রয় বা সাহায্য প্রার্থনা করবেন এবং কার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন, কোন রাজার সঙ্গে আগে সন্ধি করে পরে কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন তা নির্ণয় করতে সমর্থ হতেন ।[৫] মনুসংহিতায় একজন ক্ষত্রিয় বা রাজার ধর্ম অর্থে 'ষাড়গুণ্য' অতিরিক্ত অন্যান্য যেসকল কর্ত্তব্যের উল্লেখ পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম ছিল প্রজারূপে ব্রাহ্মণগণের সেবা ও তাঁদের সন্তোষ সাধন করা, যাগযজ্ঞ করা এবং প্রজা হিতার্থে বহু দান - ধ্যান করা । মহামতি কোটিল্য রাজার ধর্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম প্রসঙ্গে মনু প্রদত্ত উপদেশের অনুসরণ করেই উক্ত ষাড়গুণ্য বিধি সহ রাজার কতকগুলি সহজাত ও আহার্য গুণের উল্লেখ করেছিলেন । তাঁর মতে রাজ্য পরিচালনা করার রাজার শাসন শক্তি যেমন মনু কথিত চতুর্বিধ কৌশল অর্থাৎ সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ - এর উপর নির্ভরশীল তেমনি তা ওতোপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত তাঁর জীবনবোধ বা দর্শনের সঙ্গেও । কৌটিল্য মনে করতেন, রাজার জীবন বোধ ও দর্শন যত সুসংস্কার ও কৌশলময় হবে ততই রাজার পররাষ্ট্রনীতি সুদৃঢ় হবে । তাই কৌটিল্যের মতে, রাজা তাঁর পিতৃ অধিকার বলে শাসক[৬] হলেও তাঁর কতকগুলি সহজাত ও আহার্য গুণ থাকবে । কৌটিল্যের মতে রাজার এই সহজাত এবং আহার্য গুণগুলি হল মোট চার প্রকার । এগুলির মধ্যে প্রথমটি হল আভিগামিক গুণ, যার সংখ্যা ষোলোটি । তার মধ্যে প্রধান হল - বড় বংশে

---

৫. *দণ্ডনীতি* , পৃ ৮.
৬. *মনুস্মৃতি,* ১০.১১৯

জন্ম, বিপদে এবং সম্পদে ধৈর্যশালী থাকা, ধার্মিক, সত্যবাদী, কথায় এবং কাজে একরকম (অবিসংবাদক), পরের উপকার স্মরণে রাখা, দাতা, আরব্ধ কর্মে সদোৎসাহী, অনলস (অদীর্ঘসূত্রী) , শক্যসামন্ত (সামন্ত রাজাদের যিনি নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন) , দৃঢ়নিশ্চয়, অক্ষুদ্রপরিষৎক (যাঁর পার্ষদ অমাত্যেরা গুণবান) এবং বিনয়কাম (শিক্ষাভিলাষী) থাকা । রাজার দ্বিতীয় গুণ হল প্রজ্ঞাগুণ, যাকে আটভাগে ভাগ করা যায় । যথাক্রমে সেগুলি হল - শুশ্রূষা (শাস্ত্র বা পূর্বাচার্যদের নীতি - যুক্তি শোনবার ইচ্ছা), শ্রবণ (যা শুনলেন, তা ভুলে না যাওয়া) , বিজ্ঞাপন (বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি) , ঊহ (কান বিষয় বোঝার জন্য তর্ক করা), অপোহ (দোষযুক্ত যুক্তি - তর্ক পরিত্যাগ করা) এবং তত্ত্বাভিনিবেশ (গুণযুক্ত যুক্তি - তর্কে মনোনিবেশ) । তৃতীয়, উৎসাহগুণ চারটি উৎসাহগুণের মধ্যে আছে - শৌর্য (ক্ষমতা, ভয়হীনতা), অমর্ষ (অন্যায় সহ্য না করা এবং সে বিষয়ে ক্ষমাহীনতা), শীঘ্রতা (করণীয় কার্যে তৎপরতা), দাক্ষ্য (দক্ষতা বা সমস্ত কাজে নিপুণতা) । চতুর্থ, আত্মসম্পদ । আত্মসম্পদের মধ্যে প্রধান গুণগুলি হল, বাগ্মিতা, অতীত বিষয়ের স্মরণ, আগামী বিষয়ের মনন, সহজে অকার্য থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবার ক্ষমতা (স্বগ্রহ), নিজে সেনার কবচ, সেনার দ্বারাই তিনি বিপদের উপশম ঘটান, আপদে এবং সম্পদে ধান্যাদি কৃষিদ্রব্যের সুবিনিয়োগ করতে পারেন যিনি, শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করার ব্যাপারে অভিজ্ঞ এবং বিবাদ করার ব্যাপারেও অভিজ্ঞ (সন্ধিবিভাগী, বিক্রমবিভাগী), শত্রুর ছিদ্রান্বেষী, এবং খুব খারাপ কথাও যিনি হেসে বলতে পারেন ইত্যাদি ।[৭] উক্ত সকল গুণের যথাসম্ভব ও যথাযথ ব্যবহারে একজন যোগ্য রাজার পক্ষে রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালনা করা সহজ হয়ে ওঠে । সেই উদ্দেশ্যেই মহামতি বলেছেন - কোন রাজা যদি উক্তরূপে সকল গুণের অধিকারী হন, রাজ্যের পাঁচটি অঙ্গ যেমন, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোশ এবং দণ্ড যদি তার বশীভূত হয় এবং তিনি উক্ত সকল ক্ষেত্রেই যদি যথাযথভাবে ষাড়্গুণ্য নীতির প্রয়োগ ঘটাতে পারেন তবেই তিনি যথার্থ অর্থে পররাষ্ট্রনীতির সফল প্রয়োগ ঘটাতে পারেন । পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে কূটনীতির উপর গুরুত্ব প্রদান করে রাজার প্রতি কৌটিল্যের নির্দেশ, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে রাজা নিজে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে যেমন যত্নবান হবেন তেমনি তাদের যেকোন অন্যায়ে শাস্তি বা দন্ড দিতেও দ্বিধা করবেন না । এবিষয়ে কৌটিল্য রাজার করনীয় রূপে অভিযান বা আক্রমণ, উচ্ছেদন, পীড়ন এবং কর্শন - এই চার প্রকার কর্ত্তব্যের নির্দেশ করে বলেছেন - 'রেচনং কোশদণ্ডাভ্যাং মহামাত্রবধস্তথা । এতৎ কর্শনমিত্যাহূরাচার্যাঃ পীড়নং পরম্ ।।'[৮]

৭. *দণ্ডনীতি* , পৃ ১৩০

৮.*কামন্দকীয় নীতিসার,* ৮.৬১ গৃহীত *দণ্ডনীতি,* পৃ ২৫৩ , আনন্দাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলি, ১৯৬৪

ষাড়গুণ্য নীতির প্রয়োগ ও চতুরুপায় :

কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে রাজার ষাড়গুণ্য নীতির প্রয়োগ প্রসঙ্গে চার প্রকার উপায়ের উল্লেখ করেছেন , যা একইসঙ্গে পররাষ্ট্র নীতিরও দ্যোতক । বিষ্ণু ধর্মসূত্র ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতেও এই চতুরুপায়ের উল্লেখ ও প্রয়োগ করে বলা হয়েছে, কেবল রাজ্য পরিচালনার জন্য পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেই নয় বরং রাজ্যের সকল প্রজাদের প্রতি ব্যবহার বিষয়েও রাজা উক্ত চতুরুপায়ের প্রয়োগ করবেন ; তাই বলা হয়েছে, 'এতে সামাদয়ো ন কেবলং রাজ্য-ব্যবহারবিষয়াঃ, অপি তু সকললোক - ব্যবহারবিষয়াঃ।'[৯]· এই প্রসঙ্গে বিষ্ণু ধর্মসূত্রে আরও বলা হয়েছে, 'শত্রু - মিত্রোদাসীন - মধ্যমেষু সাম- দান -ভেদ -দণ্ডান্ যথার্থং যথাকালং প্রযুঞ্জীত ।'[১০] অর্থাৎ রাজা তাঁর শত্রু, মিত্র উদাসীন ও মধ্যম রাজা বিবেচনা করে উক্ত চতুরুপায়ের প্রয়োগ করবেন । রাজ্য পরিচালনার জন্য নির্দেশিত চতুরুপায়ের তাৎপর্য্য ও প্রয়োগ প্রসঙ্গে মহামতি কৌটিল্যের অভিমত নির্ণয় করতে গেলে দেখা যায়, উল্লিখিত চতুরুপায়ের কোনটিরই সংজ্ঞা প্রদান বিষয়ে তাঁর বিশেষ কোন অভিমত না থাকলেও প্রয়োগ বিষয়ে নিজস্ব অভিমত আছে । তবে অন্যান্য শাস্ত্রে চতুরুপায়ের সংজ্ঞা এবং প্রয়োগ উভয় বিষয়েই বহু নির্দেশ আছে । যেমন 'সাম নীতি' বিষয়ে শুক্রনীতিসারে বলা হয়েছে -

ত্বৎসমস্তু সখা নাস্তি মিত্রে সামমিমং স্মৃতম্ ।
পরস্পরমনিষ্টং ন চিন্তনীয়ং ত্বয়া ময়া ।
সুসহায্যং হি কর্ত্তব্যং শত্রৌ সাম প্রকীর্তিতম্ ।।[১১]

দ্বিতীয় নীতি বা উপায় অর্থাৎ 'দান' শব্দের সাধারণ অর্থ যে কোন বিষয়ে দাতার সম্পূর্ণ স্বত্ব ত্যাগ করে অপরকে কিছু দেওয়া কিংবা মালিকানার হস্তান্তরকরণ; এবিষয়ে আমরা ইতিপূর্বেই অবগত । কৌটিল্যের পররাষ্ট্রনীতিতে উক্ত 'দান' নামক দ্বিতীয় উপায়ের সাধারণ অর্থের সঙ্গে উপঢৌকন বা উপহার কিংবা বিনিময়ে কিছু প্রদান করে শত্রু রাজাকে নিজের আয়ত্তাধীন করা কিংবা তাকে সন্তুষ্ট করা, এইরকম একটি মনোভাবের সংযোজনা দেখা যায় । শুক্রনীতিসারেও দান ক্রিয়ার এইরূপ ব্যবহার পাওয়া যায় ।

৯.. *যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা* , ১.৩৪৬ মিতাক্ষরা টীকা দ্রষ্টব্য' .
১০.*বিষ্ণু ধর্মসূত্র,* ৩.৩৮
১১. *শুক্রনীতিসার,* ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস : বম্বই , ১৯৯৭ , ৪. ২৫,২৮ : পুনশ্চ দ্রষ্টব্য :কামন্দকীয় নীতিসার, ১৭.৪ - ৫ (গৃহীত *দণ্ডনীতি*)

মম সর্বং তবৈবাস্তি দানং মিত্রে সজীবিতম্ ।

করৈ র্বা প্রমিতগ্রামৈ - র্বৎসরে প্রবলং রিপুম্ ।

তোষয়েত্তদ্ধি দানং স্যাদ্ যথাযোগ্যেষু শত্রুষু ।।[১২]

ভেদনীতির প্রয়োগ বিষয়ে শুক্রনীতিসারে বলা হয়েছে, দুর্বল রাজা ভেদ নীতির সাহায্যে শত্রু পক্ষের সৈন্যবাহিনীকে দুর্বল করে দিতে পারেন কিংবা শত্রু রাজার সহায়তাকারী মিত্র পক্ষের সঙ্গে তাঁর বিভেদ তৈরী করে শত্রু রাজাকে পরাস্ত করতে পারেন অথবা অন্য কোন বিক্রমশালী রাজার আশ্রয় গ্রহণ করে কোন রাজা তাঁর বিরোধী পক্ষ বা শত্রু রাজার সঙ্গে ভেদ নীতির প্রয়োগ করতে পারেন। তাই বলা হয়েছে -

শত্রুসাধক - হীনত্বকরণাৎ প্রবলাশ্রয়াৎ ।

তদ্ধীনতোজ্জীবনাচ্চ শত্রুভেদনমুচ্যতে ।।[১৩]

শেষতঃ দণ্ডনীতি বিষয়ে শুক্রনীতিসারের স্পষ্ট নির্দেশ, কোন রাজা তাঁর তুলনায় দুর্বল ক্ষমতা সম্পন্ন রাজার বিরুদ্ধে কেবল দণ্ড নীতিরই প্রয়োগ করবেন । যদিও এবিষয়ে কিছু লঘু ও গুরু প্রকার আছে । শুক্রনীতিসারে এবিষয়ে বলা হয়েছে, শত্রু রাজ্যে দস্যুবৃত্তি করানো, তাঁদের রাজকোশ এবং খাদ্য শষ্যের ক্ষয় সাধন করে তাদের শক্তি হ্রাস করা, নিজেদের সেনাশক্তি ও কূটনীতির বলে শত্রু পক্ষকে ভয় দেখানো এবং প্রয়োজনে বীরত্বের সঙ্গে নির্ভয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা এই সবই রাজার দন্ডনীতি উপায়েরই অন্তর্ভূক্ত ।

দস্যুভিঃ পীড়নং শত্রোঃ কর্ষণং ধনধান্যতঃ ।

তচ্ছিদ্রদর্শনাদুগ্রবলৈ - নীত্যা প্রভিষণাম্ ।।

প্রাপ্তযুদ্ধানিবর্তিত্বৈস্ত্রাসনং দণ্ড উচ্যতে ।[১৪]

চতুরুপায়ের প্রতিটির প্রয়োগ সম্বন্ধে শুক্রনীতিসারে বিশেষ নির্দেশ অনুসারে বলা যায়, বিজিগীষু রাজা ‘সাম’ ও ‘দান’ নীতির প্রয়োগ করে কেবল তাঁর বিরোধী বা শত্রু রাজাদের নিরস্ত্র করতে পারেন । কারণ এদের উপর কেবল এই দুই নীতির প্রয়োগ করেই তাদের নিয়ন্ত্রনাধীনে রাখা যায় । অন্যদিকে রাজা নিজের তুলনায় অধিক শক্তিশালী শত্রু রাজার জন্য ‘সাম’ ও ‘ভেদ’ নীতির ব্যবহার করে তাঁকে নিয়ন্ত্রণাধীন করবেন । আর নিজের

---

১২. *শুক্রনীতিসার,* ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাস : বম্বই , ১৯৯৭ , ৪.২৫ .২৯ (গৃহীত *দণ্ডনীতি*)
১৩.. ঐ, ৪.৩০
১৪. ঐ, ৪.৩১ - ৩২ (গৃহীত *দণ্ডনীতি*)

সমান শক্তি সম্পন্ন কিংবা তুলনায় দুর্বল রাজার জন্য যথাক্রমে 'ভেদ' ও 'দন্ড' নীতি কিংবা কেবল 'দন্ড' নীতিরই প্রয়োগ করবেন । এইরূপে দেখা যায় যে, শুক্রনীতিসার অনুসারে 'দান' নীতির প্রয়োগ করে বিজিগীষু রাজা কেবল তাঁর বিরোধী শক্তিশালী রাজাদের নিয়ন্ত্রনাধীনে রাখতে পারেন । তবে রাজ্য পরিচালনার চতুরুপায়ের প্রয়োগ বিষয়ে মহামতি কৌটিল্য তুলনায় ভিন্ন অভিমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে বিজিগীষু রাজা যদি তাঁর তুলনায় অধিক শক্তিশালী রাজার বিরুদ্ধে 'সাম' নীতির প্রয়োগ করেন তাতে ঐ রাজা নিয়ন্ত্রণাধীন নাও হতে পারেন বরং তাতে যেন ঐ বিজিগীষু রাজার সামর্থ্যগত দুর্বলতা তার বিরোধী পক্ষের সামনে প্রকাশ পেতে পারে। তাই রাজা অবশ্যই তাঁর তুলনায় শক্তিশালী রাজার বিরুদ্ধে যথাক্রমে 'ভেদ' ও 'দন্ড' নীতিরই প্রয়োগ করবেন এবং তুলনায় দুর্বল শত্রু রাজার জন্য কেবল 'সাম' ও 'দান' নীতির প্রয়োগ করতে পারেন । এই প্রসঙ্গে যুক্তি হল বলবান শত্রু 'সাম' ও 'দান' নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে পরাস্ত না হলেও তুলনায় দুর্বল শত্রু উভয় নীতির দ্বারাই বিজীগিষু রাজার প্রতি বশ্যতা স্বীকার করতে পারেন । তাই অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'সামদানাভ্যাং দুর্বলানুপনয়েৎ, ভেদ - দণ্ডাভ্যাং বলবতঃ।'[১৫] শুধু তাই নয়, প্রতিটি উপায়েরই প্রয়োগের সময় বিজিগীষু রাজাকে যে অতি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সেই বিষয়েও কতকগুলি সতর্কতা প্রদান করা হয়েছে । যেমন, 'সাম' ও 'দান' নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্র বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে কৌটিল্য বলেছেন, তুলনায় দুর্বল রাজা যাতে তাঁর প্রতি বাধ্য থাকেন সেই বিষয়ে বিজিগীষু রাজাকে তৎপর হয়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; যেমন - জীবিকার প্রয়োজনে দুর্বল রাজার পশুচারণের ক্ষেত্র এবং স্থলপথ ও জলপথে তাদের বাণিজ্য ক্ষেত্র ও পণ্যের সুরক্ষা বিধান করবেন । তাঁর নিজের রাজ্যে তাদেরকে যেকোন রকম বিপদ থেকে মুক্ত রাখতে তৎপর থাকবেন । রাজা এইভাবে দুর্বল রাজার প্রতি 'সাম' নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে তার সঙ্গে মিত্রতা বজায় রেখে তাকে নিজের প্রতি বাধ্য রাখবেন । অন্যদিকে 'দান' নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও একইভাবে তুলনায় দুর্বল রাজা যদি কোন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হন তবে তাকে বিপদ মুক্ত করে 'অভয় দান' করবেন । 'ভুমিদান' করে তার আশ্রয় ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবেন । প্রয়োজনে তাকে আর্থিকভাবে সাহায্য প্রদান করার আশ্বাস প্রদান করবেন এবং তার সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় দান করবেন। শুধু তাই নয়, 'সাম নীতি' প্রয়োগের মাত্রা যাতে আরও বেশি সুনিশ্চিত হয় তার জন্য প্রয়োজনে বিজিগীষু রাজা তাকে 'কন্যা দান'ও করবেন । 'ভেদ নীতি' প্রয়োগের ক্ষেত্রে কৌটিল্য শুক্রনীতিসারের তুলনায় কূটনৈতিক মনোভাবকেই প্রাধ্যন্য দিয়ে বিশেষভাবে কতকগুলি কৌশলের উল্লেখ করে বলেছেন, 'বলবান শত্রুকে নিয়ন্ত্রনাধীন করার উদ্দেশ্যে বিজিগীষু রাজা অপর কোন ব্যক্তির সাহায্য নিতে পারেন । তবে তাকে কৌশলে সেই ব্যক্তির অনুসন্ধান করতে হবে।

---

১৫. *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*, ৭.১৬ (গৃহীত *দণ্ডনীতি*)

প্রয়োজনে তিনি ঐ শক্তিশালী রাজার বিরোধী প্রতিবেশী রাজা কিংবা তাঁর রাজ্যের সীমানা রক্ষাকারী কোন সৈন্য বা বিশেষ ভাবে বনাঞ্চল রক্ষাকারী কোন ব্যক্তি কিংবা তাঁর দ্বারা কারাগারে অবরুদ্ধ কোন রাজপুত্র এবং শত্রুকূলে নিজের কোন মিত্র এই সকলের সঙ্গেই বলবান শত্রুর বিভেদ বা 'ভেদ' সাধন করে তাঁকে নিজের নিয়ন্ত্রনাধীন করতে পারেন । অন্যদিকে 'দন্ড নীতি' প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন অনুসারে প্রকাশ্যযুদ্ধ, কূটনৈতিক যুদ্ধ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে ।[১৬]

অর্থশাস্ত্রে 'দান' উপায় :

অর্থশাস্ত্রে ষাড়গুণ্য বিধির প্রথম বিধি অর্থাৎ 'সন্ধি' প্রসঙ্গে 'দান' উপায়ের উল্লেখ পাওয়া যায় । নিজের স্বত্বাধিকার ত্যাগ করে কোন বিজিগীষু রাজা নিজের তুলনায় কোন দুর্বল ক্ষমতা সম্পন্ন রাজাকে রাজকোশ থেকে কিছু সম্পদ বা কোন জমি কিংবা ভূমি 'দান' করে তাঁর দুর্বল শত্রুকে আয়ত্তে আনতে পারেন বা তাঁর নিয়ন্ত্রনাধীন করতে পারেন, এমন অভিমতই মহামতি কৌটিল্য 'দান' উপায় সম্পর্কে নির্দেশ করেছেন । এইরূপ উপায়ের মধ্যে দিয়ে বিজিগীষু রাজার সঙ্গে তাঁর তুলনায় দুর্বল ক্ষমতা সম্পন্ন রাজার মধ্যে একটি মৌখিক চুক্তি বা অলিখিত সন্ধি হয় যে এরা পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন না । তবে যদি এই সন্ধির লঙ্ঘন হয় তবে বিজিগীষু অবশ্যই যুদ্ধ করবেন । কৌটিল্য ঐরূপ 'দান' উপায় প্রয়োগেরও কতকগুলি ক্ষেত্র ও নিয়মের নির্দেশ করেছেন , দান নীতি প্রয়োগ করে বিজিগীষু রাজা দুর্বল ও লোভী শত্রুদের নিয়ন্ত্রনাধীন করার ক্ষেত্রে তুলনায় বেশি সফলতা পাবেন । তবে দান করতে গিয়ে তিনি সেই সকল বিষয়েরই নির্বাচন করবেন যাতে তার নিজের রাজ্যে শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন ক্ষতি না হয় । এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রে পাঁচ প্রকার দানের বিশেষ নির্দেশ পরিলক্ষিত হয় । যেমন - 'প্রথম দান, দেয় - বিসর্গ । ভুমিদানের ক্ষেত্রে, যেসকল নিস্কর জমি ইতিপূর্বেই ব্রাহ্মণদের দিয়ে নিষ্কর করা হয়েছিল তা যদি বিজিগীষু পূর্বে অধিকার করে থাকেন, তবে তিনি সেই সকল জমি আগে দান করবেন । তথাকথিত সমাজে তুলনায় শিক্ষিত শ্রেণি যারা ছিলেন, তাদের যাতে এইরূপ ভূমিদানের ক্ষেত্রে কোন ক্ষোভ তৈরী না হয় তাই নিষ্কর ভূমি দান এমন করার নির্দেশ করা হয়েছে । দ্বিতীয়, গৃহীতানুবর্তন, বিজীগিষুর পূর্বপুরুষ যদি অন্য রাজার জমি পূর্বে অধিগ্রহণ করে থাকেন, তবে সেই জমিতে তিনি শুধু ভোগসত্ত্ব দান করবেন । তৃতীয়, আত্ত - প্রতিদান, বিজীগিষু যে জমি নিয়েছিলেন, সেটা ফিরিয়ে দেওয়া । চতুর্থ, নতুন জিনিষ দেওয়া । পঞ্চম, শত্রুর দেশ থেকে লুণ্ঠিত ধন লুন্ঠনকারীকে বিনা বাধায় নিতে দেওয়া ।'[১৭]

---

১৬ . *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*, ৭ .১৬ , (গৃহীত *দন্ডনীতি*, পৃ : ২১৫-২১৬)
১৭ . *দন্ডনীতি*, পৃ : ২১৬

বলা বাহুল্য যে, অর্থশাস্ত্রের এইরূপ নির্দেশের ভিত্তিতে দান সম্পর্কে একটি নতুন দিকের সূচনা হয় । দেখা যায় যে, কোন দ্রব্য বা বিষয়ের ব্যক্তি মালিকানা ত্যাগ করে অন্যের সাহায্যে তা দেওয়া এইরূপ সাধারণ অর্থের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে দাতার কূটনৈতিক মনোভাব । কৌটিল্যের নির্দেশ অনুসারে কোন রাজা যখন অন্য রাজাকে কিছু উপঢৌকন দান করবেন তখন তার মূল উদ্দেশ্য হবে সেই রাজাকে তাঁর নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা । তবে এমন নয় যে, সেখানে গ্রহীতার কোন উপকার সাধন হয় না । কারণ বিজিগীষু রাজা যখন তুলনায় দুর্বল শত্রু রাজাদের বিপদে সাহায্য করে তাদের অভয় দান করেন কিংবা ভূমি এবং অর্থ দান করে তাদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেন সেই সব ক্ষেত্রেই বিজিগীষু রাজার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল গ্রহীতা রাজার সহায় হওয়া, তার উপকার সাধন করা । তবে এইরূপ সাহায্য করে তিনি যে সুকৌশলে ঐ দুর্বল রাজাকে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখে সুদক্ষ কূটনৈতিক মনোভাবে পররাষ্ট্রনীতি বজায় রাখেন তা দান বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের নতুন সংযোজন ।

অর্থশাস্ত্রে দান নীতির প্রয়োগ ও ধর্ম - নীতিবোধের মূল্যায়ণ :

বৈদিক সভ্যতার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল এই সভ্যতায় মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায়, সামাজিক ও নিত্য কর্মে ধর্মীয় কর্ত্তব্য বোধের অবস্থান । [১৮] বলা বাহুল্য যে, 'ধর্ম বোধ' বলতে এক্ষেত্রে যেমন বর্ণানুসারী কর্ত্তব্য কর্মের কথা বলা হয়েছে তেমনি আবার উক্ত সকল কর্মে পুরুষার্থ অনুসারী ধর্মীয় বোধের অবস্থানের ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে । অর্থাৎ প্রতিটি মানুষই তাঁদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় ও কাজকর্মে যে বর্ণানুসারী যথাযথ কর্ত্তব্য কর্মের সম্পাদন করে নৈতিক থাকবেন এবং এবিষয়ে তাঁরা ধর্মানুসারী হবেন এমনটাই অপেক্ষিত হয়েছে । এইভাবে দেখা যায় যে, সেই সময়ে 'নৈতিকতা' কিংবা 'নীতিবোধ' এই শব্দগুলি ধর্ম বা কর্ত্তব্য - কর্ম অর্থে ব্যবহৃত হত । এক্ষেত্রে ভারতীয় শাখার নৈতিকতা অর্থে হিন্দু নৈতিকতার কথাইবলা হয়েছে । যে নৈতিকতা বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় শাস্ত্রে নির্দেশিত কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের কথা বোধিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ এক্ষেত্রে শাস্ত্রের প্রামাণ্য বিষয়ে যে বেদ এবং অন্যান্য ধর্ম তথা স্মৃতিশাস্ত্রের কথাই উল্লিখিত হয়েছে তা পূর্ব স্বীকৃত । যেমন - ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, -

তস্মচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্মকর্ত্তুমিহার্হসি ।। [১৯]

---

১৮. *শ্রুতি ও ধর্মনীতি, শ্রুতি হিন্দু নৈতিকতার ভিত্তিস্বরূপ*, পৃ ৫

১৯ . *শ্রীমদ্ভগবদগীতা, মধুসূদন* সরস্বতী কৃত টীকা সহিত, ভূতনাথ সপ্ততীর্থ কর্তৃক অনুদিত ও ব্যাখ্যাত , নলিনীকান্ত ব্রহ্ম সম্পাদিত , নবভারত পাবলিশার্স , কলিকাতা ,১৯৮৬, গৃহীত, *শ্রুতি ও ধর্মনীতি, শ্রুতি হিন্দু নৈতিকতার ভিত্তিস্বরূপ*, পৃ ৬

নীতিবোধ বিষয়ে আলোচনাক্রমে কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্যের যে উল্লেখ শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই নির্দেশিত হয়েছে তা মূলতঃ ধর্ম অর্থে ইষ্ট প্রাপ্তি এবং অধর্ম অর্থে অনিষ্টের পরিহার । বেদের লক্ষণেও তাই বলা হয়েছে, 'ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োরলোকিকমুপায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি স বেদঃ '[২০] তাই প্রায় সম সময়েই কৌটিল্য নির্দেশিত রাজার 'ষাড়গুণ্য' নীতির প্রয়োগে উল্লিখিত 'দান নীতি' ব্যবস্থাটি কতদূর নীতি অর্থে ধর্মীয় ছিল সেই সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, মহামতির মতে, রাষ্ট্রে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োগে একজন রাজা যে অবশ্যই ষাড়গুণ্যের অধিকারী হবেন শুধু তাই নয় বরং উক্ত সকল গুণের প্রয়োগে প্রয়োজনে তিনি সুকৌশলীও হবেন । এই কৌশলের প্রয়োগে কৌটিল্য রাজ ধর্ম রূপে যে সকল কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্যের নির্দেশ করেছেন তা শাস্ত্রানুসারী বর্ণব্যবস্থার নিয়ম থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে । কারণ শাস্ত্রে ক্ষত্রিয় বর্ণের ধর্ম রূপে যেভাবে প্রজাপালন, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন এবং ভোগবিলাসে প্রসক্ত না হওয়া ইত্যাদি নির্দেশিত হয়েছিল তার মধ্যে 'দান' ব্যবস্থা ছিল অন্যতম । এইরূপ 'দান' রাজা যেমন তাঁর রাজ্য শাসনে প্রজাদের জন্য তাদের হিতার্থে ব্যবস্থিত করতেন তেমনি তার নিজের ধর্মীয় বোধের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পুরোহিতকেও 'দক্ষিণা' অর্থে প্রদান করতেন । উল্লেখ্য যে, এইরূপ উভয় দানই যাতে যথাযথ ভাবে ধর্ম্ম সম্মত হয় তার জন্য রাজা এই সকল দান অনুষ্ঠানে ধর্ম সম্মত উপায়ে অর্জিত অর্থের ব্যায় করতেন । এই ক্রিয়ায় কোথাও যে রাজা প্রয়োজনে তার জন্য শাস্ত্র নির্ধারিত ধর্মবোধের সঙ্গে আপোস করতে পারেন এমন অভিমত স্পষ্টভাবে কোথাও পরিলক্ষিত হয় না । কিন্তু রাজ্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে মহামতি কৌটিল্য সেই সময় রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রচলিত যে দ্বিতীয় ধারার অনুসরণ করেন তাতে কূটনীতি ও পররাষ্ট্র ভাবনার সঙ্গে ধর্মবোধের অবনমনের অতিরিক্ত অনুষঙ্গ সংযুক্ত হয়েছিল । বক্তব্যের তাৎপর্য্য হল, কৌটিল্যের সময়ে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাবনায় ধর্মীয় সদাচার পালনের গুরুত্ব এবং নীতিবোধের কঠোর অনুশাসন ও তার পালনের গুরুত্ব ক্রমশঃ শিথীল হতে শুরু করেছিল । বরং এই সময়ে এই রকম একটা ভাবনা মানুষের মনে কাজ করতে শুরু করে যে, যেকোন উপায়ে নিজেদের কার্য সিদ্ধি করতে হবে এবং প্রয়োজনে ক্ষেত্রবিশেষে কখনও কখনও ধর্ম ও নীতিবোধের সঙ্গে আপসও করতে হতে পারে । এই সময় থেকেই মানুষের মনে ধর্মীয় নিয়ম নীতি ও অনুশাসন অনুসরণ না করা বা মান্য না করার জন্য যে শাস্তি বা ভীতি মনোভাব কাজ করতো, তা দূর হতে শুরু করেছিল । নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য ক্ষেত্র বিশেষে নীতি বা ধর্মবোধের উপেক্ষাও করা যেতে পারে, এইরকম ধারণা মানুষের মনে প্রশ্রয় পেয়েছিল ।[২১] তাই প্রশ্ন হয়, তবে

---

২০. সায়ণাচার্য, *তৈত্তিরীয়সংহিতাভাষ্যভূমিকা,* পণ্ডিত বলদেব উপাধ্যায় সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস, বারানসী, ১৯৫৮, গৃহীত, *শ্রুতি ও ধর্মনীতি, 'শ্রুতি হিন্দু নৈতিকতার ভিত্তিস্বরূপ',* পৃ ৭

২১. *ধর্ম- অর্থ - নীতিশাস্ত্রসমীক্ষা* , ন্যায়তীর্থ (ডঃ) সুমিতা বসু, পৃ : ১২৭ ।

কি কৌটিল্য তৎকালীন ধর্ম ব্যবস্থার সঙ্গে বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন ? উত্তরে বলা যায়, এমন নয় যে, অর্থশাস্ত্রমতে ধর্মবোধ সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষিত হয়েছিল এবং ক্ষেত্র বিশেষে ধর্মবোধের এইরূপ অবনমন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল । এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, রাজা তাঁর ষাড়গুণ্য নীতির বলে যে রাজ্যের সুশাসন ব্যবস্থা বজায় রাখবেন, সেই রাজ্য প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রে 'সপ্তাঙ্গ তত্ত্বে'র উল্লেখ পাওয়া যায়।[২২] রাষ্ট্রের অঙ্গগুলি হল - স্বামী বা রাজা, অমাত্য বা মন্ত্রী, জনপদ, দুর্গ, কোশ, দন্ড এবং মিত্র । রাজা তাঁর গুণের নিরিখে উল্লিখিত অঙ্গগুলির প্রতিটিকেই সুরক্ষিত ও ভালো রাখতে সদা তৎপর থাকবেন এমনটিই নির্দেশিত হয়েছে । এই ষাড়গুণ্যের ফল হল তিন প্রকার ; যেমন - ক্ষয় বা অবনতি, স্থান বা স্থিতাবস্থা এবং বৃদ্ধি বা উন্নতি । এই তিন রকম ফলের প্রাপ্তির জন্যেই রাজাকে উদ্যোগী হতে হবে । শুধু তাই নয়, রাজার লক্ষ্য হবে প্রথম দুই প্রকার ফলের উর্দ্ধে উঠে তৃতীয় প্রকার ফল লাভে সচেষ্ট হওয়া । তাই তার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্মের অনুসারী হতে হবে নৃপতি বা রাজাকে । এই প্রসঙ্গে কৌটিল্য মানুষের দুই প্রকার কর্মের উল্লেখ করেছেন, যেমন- 'দৈব কর্ম' এবং 'মানুষকর্ম' । এই দুই প্রকার কর্মেরও আবার বিভাগ আছে । দৈব কর্মের দুটি প্রকার, যেমন - 'অয়' এবং 'অনয়' ।[২৩] দেবতার উদ্দেশ্যে পূজার্চনা, যাগযজ্ঞ ও উপাসনা ইতাদি করে যদি তা কোন ব্যক্তির সৌভাগ্যের দিশারী হয় তবে তার সেই কর্ম 'অয়' এবং তা যদি কোন কারণে দৈব কিংবা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে মানুষের দুর্ভাগ্যের কারণ হয় তবে তাকে বলা হয় 'অনয়' । একই ভাবে 'মানুষ কর্মে'র ও দুটি প্রকার পরিলক্ষিত হয়, যেমন - 'নয়' এবং 'অপনয়' ।[২৪] মানুষকর্মের 'নয়' নামক প্রথম ভাগটি প্রসঙ্গে রাজার রাজ্য পরিচালনা করার সার্থকতাই প্রকাশ পেয়েছে । রাজা তাঁর ষাড়গুণ্য নীতির প্রয়োগ করে যদি সব ক্ষেত্রেই লাভবান হন এবং তাঁর রাজ্য সীমার পরিধি বিস্তৃত করতে পারেন তাহলে সেই কর্ম হল 'নয়' বিপরীতে তাঁর কর্মের যদি উপযুক্ত পরিমাণ সার্থকতা না হয় তবে তাকে বলা হয় 'অনয়'। কৌটিল্যের মতে, প্রতিটি 'নয়' এর সঙ্গে থাকে রাজার কূটনীতি ও মন্ত্রী আমলাদের পরামর্শের সার্থকতা এবং 'অনয়' এর সঙ্গে থাকে উভয় ক্ষেত্রের ব্যর্থতা । যা কোন রাজার প্রজাপালন এবং প্রজা হিতসাধনকে খর্ব করে, তাঁর রাজ্য শাসন ব্যবস্থায় সম্মান হানি ঘটায় । যা কাম্য নয়, তাই পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতিবোধে রাজা যাতে সর্বদাই সাফল্য লাভ করতে পারেন সেই বিষয়ে তাঁকে সদা সচেতন হতে হবে এবং সেই মতোই পূর্বোক্ত চতুরুপায়ের প্রয়োগ করতে হবে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যেকোন ব্যক্তিকেই তাঁর স্বধর্ম পালনে সদা উদ্যোগী হতে হবে এমন অভিমত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও পরিলক্ষিত হয়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন যখন তাঁর প্রিয়জনদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করতে

---

২২ . *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র* , বসাক, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ ৩৮, *গৃহীত দন্ডনীতি,* পৃ ১২১
২৩ . *মহাভারত,* ১২.৮৭.২০ - ২২
২৪ .*কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র,* ২.৫

পারবেন না বলে যুদ্ধ না করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তখন তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই শাস্ত্র নির্ধারিত ক্ষত্রিয়োধর্মোচিত আচরণ করতে অর্থাৎ যুদ্ধ করতে সম্মত করিয়েছিলেন তাতে বহু প্রিয়জনের মৃত্য হতে পারে একথা জেনেও । অর্জুনও সম্মত হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। কাজেই নিজের কর্ত্তব্য - কর্ম সাধনে কর্মকর্তা সর্বদা স্থিত হবেন এবং বিনা বাধায় তার কর্ম সম্পন্ন করবেন এমনটিই শাস্ত্র অভিপ্রেত ছিল । তাই কৌটিল্য যখন রাজার পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি প্রয়োগের সাফল্যের উদ্দেশ্যে ক্ষেত্র - বিশেষে ধর্ম ও নীতিবোধের আপোসের কথা বলেছেন তা ছিল মূলতঃ স্বধর্ম বা কর্ত্তব্য - কর্ম পালন জনিত আপোস । কাজেই ‘দান’ উপায় আলোচনা প্রসঙ্গে কৌটিল্যের সঙ্গে তদানীন্তন ধর্ম - নীতিবোধের যেরূপ আপাতবিরোধী অবস্থানের আশংকা করা হয়েছিল তা সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয় । তবে দানের বিষয় এবং উদ্দেশ্য বিষয়ে কৌটিল্যের নির্দেশ যে, ক্ষেত্রবিশেষে শাস্ত্রালোচনার সঙ্গে বিরোধী অবস্থান রাখে তা অস্বীকার করা যায় না । কারণ ‘দান’ বিষয়ে শাস্ত্রের আলোচনাতে একথা সব সময়েই নির্দেশিত হয়েছে, দাতা সর্বদাই গুণমানে উত্তম বস্তু যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা সহকারে গ্রহীতাকে ‘দান’ করবেন এবং অবশ্যই এবিষয়ে দাতার কোনরূপ অহংকার কিংবা কোন স্বার্থমনোভাব থাকবে না । কিন্তু ‘দান’ - এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কৌটিল্যের ভাবনায় এর বিরোধী অভিমতই পরিলক্ষিত হয়েছে, যখন বলা হয়েছে রাজা তাঁর দুর্বল শত্রুদের বশে আনার উদ্দেশ্যেই দান করবেন । আরও বলা যায়, ‘দান’ বিধি এবং বিষয় সম্বন্ধে কৌটিল্য যে পাঁচ প্রকার উপায় তথা ক্ষেত্রের নির্দেশ করেছেন তাতেও ‘দান’ সম্বন্ধীয় প্রচলিত ভাবনা অর্থাৎ দাতার স্বত্বাধিকারের সম্পূর্ণ ত্যাগ, তাও কিছু অংশে লঙ্ঘিত হয়েছে ; যখন বলা হয়েছে, বিজীগিষু রাজা ইতিপূর্বেই ব্রাহ্মণগণকে দান করা জমি পুনরায় অধিকার করে তাঁর শত্রুদের ‘দান’ করতে পারেন কিংবা রাজা নিজের সুবিধার্থে নিষ্কর বা অনেক দূরের জমি ‘দান’ করবেন । কারণ একবার দান করা কোন বিষয় পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়ার তত্ত্ব দান সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ভাবনার সঙ্গে সদৃশ নয় । তাই বলা যায়, ‘দান’ বিষয়ক প্রচলিত বিধির ঐরূপ লঙ্ঘনের কারণে কৌটিল্য নির্দেশিত ‘দানতত্ত্ব’ কতদূর ‘দান’ বিষয়ক মূল ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি সম্পন্ন তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ ।

তথ্যসূত্র :

- ন্যায়তীর্থ বসু সুমিতা (ডঃ), *ধর্ম-অর্থ-নীতিশাস্ত্রসমীক্ষা,* ২০০৬, প্রকাশক - সদেশ, কলিকাতা।
- বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেশচন্দ্র (অনুবাদক), *মনুসংহিতা,* ১৯৯৯, প্রকাশক- আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
- ভাদুড়ী নৃসিংহপ্রসাদ, *দন্ডনীতি,* ১৯৯৮, প্রকাশক : শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি, কলকাতা ।

- ভূতনাথ (শ্রী)সপ্ততীথ (অনুবাদক), *মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য,* (বঙ্গানুবাদ), প্রথম খন্ড - চতুর্থ খন্ড, ১৩৬১, কলিকাতা ।
- বসাক রাধাগোবিন্দ (সম্পাদনায়), *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র,* ১৯৬৪, জেনারেল প্রিন্টার্স, কলিকাতা ।
- হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, মহাভারত , ১৪০০ বঙ্গাব্দ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী , কলিকাতা ।
- সান্যাল ইন্দ্রাণী , শর্মা রত্না দত্ত (সম্পাদনায়), *ধর্মনীতি ও শ্রুতি,* ২০০৯,, প্রকাশক - যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা ।
- Dutt Manmath Nath (Translated), *THE DHARAM SHASTRA HINDU RELIGIOUS CODES*, 1979, Publications, New Delhi , India.

তৃতীয় অধ্যায় : জৈন দর্শনে দান

জৈনদর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য অনুসারী দিন যাপনের নিরিখে শ্রমণ ও শ্রাবক এই দুই বিভাজনের পরম্পরা অনুশীলিত হলেও এটা বলা যায় না যে, উক্ত দুই দার্শনিক চিন্তায় শ্রমণ ও শ্রাবক বিভাজন সর্বদাই স্বক্ষেত্রে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করা হয়েছে । কারণ তাদের বিভিন্ন ধর্মনৈতিক নিয়ম নীতি বিশেষত 'দান প্রক্রিয়ার' মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য করা যায় যে, 'অনাগারী বা শ্রমণ' ও 'আগারী বা শ্রাবক' সম্প্রদায় পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্বন্ধিত হয়ে একে অপরের পরিপূরকও হয়েছে । দার্শনিক আলোচনার পরিসরে আমরা সকলেই এই বিষয়ে জ্ঞাত যে, চার্বাক ব্যতীত সমগ্র ভারতীয় দর্শনের পরিসরে অধ্যাত্মবাদীদের জন্য জাগতিক অস্তিত্বের সীমাবদ্ধতার পীড়ণ থেকে মুক্তির আস্বাদই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। সেই সূত্রেই জগতের অস্তিত্ব , বদ্ধাবস্থা এবং সেই বদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তির উপায়ের আলোচনা ভারতীয় দর্শনে প্রাসঙ্গিক হয়েছে । এই মুক্তির উপায় বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় তাদের স্ব-স্বীকৃত তত্ত্ব আধিবিদ্যক, জ্ঞানবিদ্যক এবং নীতিবিদ্যক প্রেক্ষিত থেকে তাদের স্বীকৃত পারিভাষিক ধারণার মধ্যে দিয়ে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। জৈন দর্শনও সেই একই পরম্পরার ধারক ও বাহক । জৈনদর্শন অনুসারে সত্যদ্রষ্টা আর্য ঋষি, জিন বা তীর্থঙ্করগণ কিংবা অনুগামী দার্শনিকেরা কর্মবন্ধনকে জাগতিক অস্তিত্বের কারণ রূপে দর্শিয়েছেন এবং সেই বন্ধন ছিন্ন করার উপায়ের অনুসন্ধান করেছেন । এই প্রসঙ্গে জৈন ধর্মনীতির আলোচনায় অনাগারী এবং আগারী উভয়েরই জন্য নির্ধারিত কর্তব্য কর্মের মাধ্যমে তাদের চারিত্রিক গুণাবলী এবং নৈতিক জীবনের উৎকর্ষতা প্রসঙ্গে 'দান ক্রিয়া' অতি তাৎপর্য্যময় এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিগ্রহণ করেছে ।

প্রশ্ন হয়, জৈন মতে কৈবল্য লক্ষ্যরূপে স্বীকৃত হওয়ায় এইরূপ তত্ত্বে দান ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা কোথায় ? এই বিষয়ে জৈন মত আলোচনা করলে দেখা যায় যে, অধ্যাত্মবাদী সমগ্র ভারতীয় দর্শনের মূল একতার সূত্র যেখানে নিহিত আছে ভোগসর্বস্বতার বিরুদ্ধতায় ; সেখানে জৈন দর্শনসহ অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ভেদে লক্ষ্য করা যায় যে, গৃহস্থাশ্রমীর জীবন, কিংবা শ্রাবক রূপে জীবন যাপন কিংবা আগারিক জীবন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়নি । দেহধারী মানুষের স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, অর্থ, শারীরিক অন্যান্য প্রয়োজনসহ ও মানসিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য যা যা সামগ্রী বা বস্তু প্রয়োজন তা সবই ভোগ্যবস্তু হলেও তার প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে । কারণ ভোগ ব্যতীত মনুষ্যজীবন ধারণ সম্ভব হতে পারবে কীভাবে ? অথচ জৈন দর্শনে ভোগবাদের বিরুদ্ধতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মুক্তির তত্ত্ব । তাই ভারতীয় দর্শনে ভোগবাদ বিরুদ্ধতা কোন অর্থে গৃহীত হয়েছে সেই বিষয়ে প্রথমে অবগত হতে হবে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ভারতীয় দর্শনের নাস্তিক

শাখায় কেবলমাত্র চার্বাকেরাই ভোগসর্বস্ববাদী বলে বিবেচিত হয়েছেন, কারণ 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' অর্থাৎ ঋণ করেও ঘৃত খাওয়া উচিৎ এমন নৈতিক আদর্শ পালনে তাঁরা উৎসাহিত করেছেন । অপরদিকে মুক্তির লক্ষ্যে ভোগবাদবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অধ্যাত্মবাদী সকল ভারতীয় দার্শনিকেরা পুনঃপুন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ থেকে মানুষ জাতিকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন, পরিহার্য এমন ভোগ্যদ্রব্য বা বিষয় ত্যাগ করতে উৎসাহিত করেছেন । এই প্রসঙ্গেই জৈনদর্শনে স্বীকৃত হয়েছে দানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা । উল্লেখ্য যে, অন্যান্য ধর্মের মতোই জৈন মতেও দানক্রিয়া একপক্ষকে যেমন তাঁদের জীবন ধারণের জন্য অপ্রয়োজনীয় এবং পরিহার্য ভোগ্যবস্তু ত্যাগের জন্য উৎসাহিত করেছে তেমনি অভাবী ব্যক্তিগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য বিষয় ভাগ করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে দানরূপ এক অন্যতম উপায় বা মার্গের নির্দেশ করেছে , যা সমাজের পক্ষে নতুন এক দিশা বা পথ উন্মুক্ত করার প্রক্রিয়ারূপে কল্যাণকর এবং প্রাসঙ্গিক হয়েছে । দান ক্রিয়া যে পরমধর্ম সেই বিষয়ে সকল ধর্মের ঐক্যমত্যের কোন অভাব কখনই দেখতে পাওয়া যায় না । জৈন ধর্মনীতির আলোচনাতেও নানাভাবে দানক্রিয়া কর্ত্তব্য কর্ম, দানক্রিয়া পুণ্যদায়িনী এই জাতীয় বিবৃতি বহুল প্রচারিত । জৈন দর্শনেও দান ক্রিয়া ধর্মনৈতিক ক্রিয়ারূপে বিজ্ঞাপিত ও সমর্থিত হওয়ার সাধারণ কারণ ভোগসর্বস্ববাদের বিরোধিতা করা হয়েছে এবং অনাগারী শ্রমণ ও আগারী শ্রাবক উভয়ের জন্যেই কর্ত্তব্য - কর্ম বা ব্রতরূপে নির্দেশিত হয়েছে । [১] দ্বিতীয়ত, দান ক্রিয়ার গুরুত্ব স্বীকারের মূলে বিশেষভাবে জৈনধর্মনীতি সংক্রান্ত যে কারণ আছে সেটি বর্তমান আলোচনায় উদ্ঘাটন করার প্রয়াস করা হয়েছে । জৈন দর্শনে কঠোর সন্ন্যাসবাদের পরাকাষ্ঠা স্বীকৃত হলেও এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, জৈন সন্ন্যাসবাদে কিন্তু কখনই জীবন বিরোধী মত গ্রহণযোগ্য হয়নি । কারণ শ্রমণ ব্যতিরিক্ত আগারী শ্রাবকের অবস্থানও জৈন দর্শনে যথেষ্ট গুরুত্ব সহযোগে গ্রাহ্য হয়েছে । তাই দান বিষয়ক বর্তমান আলোচনাটি দুটি পর্বে বিন্যস্ত হয়েছে : প্রথম পর্বে জৈন ধর্মনীতিতে অপরাপর স্বীকৃত ধর্মনৈতিক ক্রিয়া কর্মের পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে দানের অবস্থান কোথায় তা বিচার করে দেখতে চেষ্টা করা হয়েছে । দ্বিতীয় পর্বে প্রধানত দান প্রক্রিয়ার স্বরূপ সহ এর বিভিন্ন প্রকার ও ফল, দানের বিষয় এবং দানক্ষেত্রে দাতার ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

(১)

ভারতীয় দর্শনের পরিসরে জৈন দর্শন হল অন্যতম প্রাচীন দার্শনিক সম্প্রদায় । তবে কেবল দার্শনিক ক্ষেত্রেই নয় , ধর্মনীতির ক্ষেত্রেও এর উল্লেখযোগ্য অবস্থান পরিলক্ষিত হয় । 'অহিংসা তত্ত্ব' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জৈন ধর্ম

---

১. *তত্ত্বার্থসূত্র*, উমাস্বতি, ৭।১১

ও দর্শনে নীতিভিত্তিক জীবন যাত্রার আদর্শ নির্দেশিত হয়েছে । ফলতঃ এই ধর্ম তথা দর্শন আলোচনার সময়ে স্পষ্টত দেখা যায় যে, এর দ্বারা স্বীকৃত তত্ত্বমাত্রই 'অহিংসা নীতিতত্ত্ব' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই প্রযুক্ত হয়েছে । উল্লেখ্য যে 'নীতি' অর্থে, জীবনের এক ও অন্যতম সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্যরূপে গ্রাহ্য হতে পারে যে নীতি, সেইরূপ নীতিতত্ত্বই এই ক্ষেত্রে গ্রাহ্য বা প্রসিদ্ধ হয়েছে । একইভাবে জৈনদর্শনে স্বীকৃত দানতত্ত্বেও ত্যাগ অর্থে অহিংসা নীতি তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । জৈনমতে জীব স্বরূপত অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দৃষ্টি, অনন্ত শক্তি সম্পন্ন এবং অপার আনন্দের অধিকারী ; কিন্তু কর্মপুদ্গল জনিত বন্ধনের প্রতিবন্ধকতার কারণে সে তার আত্ম স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হতে পারে না । এইরূপ অবস্থা হল জীবের বদ্ধাদশা । জীবের এইরূপ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন তার নিজ সত্তার স্বরূপতা এবং সর্বজ্ঞতার উপলব্ধি । আর তার জন্য প্রয়োজন প্রথমে চিত্তশুদ্ধি এবং তার পরবর্তী স্তরে ত্রিরত্নের অনুশীলন। জৈন দর্শনানুসারে সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্র হল মানব জীবনের তিনটি মূল্যবান রত্নস্বরূপ। এই তিন প্রকার রত্নই জৈন ধর্মানুসারে 'ত্রিরত্ন' বলে উল্লিখিত হয়েছে । 'সম্যক্দর্শন' বলতে নির্দেশিত হয়েছে - শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসের কথা । সিদ্ধ পুরুষ বা জৈন তীর্থঙ্করদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস পোষণ করা । 'সম্যক্ জ্ঞান' অর্থে আত্মার স্বরূপের জ্ঞান , পুদ্গল, অনু সংঘাত ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে এবং 'সম্যক্ চারিত্র' বলতে সমাজ ও ধর্মের পক্ষে সকল অহিতকর কর্ম থেকে বিরত থেকে ধর্মীয় সদাচারে সদা নিযুক্ত থাকার নির্দেশের উল্লেখ করা হয়েছে । সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে জৈন দর্শনে যেসকল মার্গ অনুশীলন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে খুব স্বাভাবিক ভাবেই তার প্রতিটি নীতি - আদর্শমূলক ।'সম্যক চারিত্র' লাভের জন্য মঠবাসী সন্ন্যাসী বা শ্রমণগণের জন্য 'পঞ্চমহাব্রত' এবং গৃহী বা সংসারী শ্রাবকগণের জন্য পঞ্চমহাব্রতের অপেক্ষা তুলনামূলক নমনীয়রূপে 'পঞ্চঅণুব্রত' বা 'সহজব্রত' বা 'অণুব্রত'-এর উল্লেখ করা হয়েছে । জৈন দর্শনানুসারে 'পঞ্চমহাব্রত' হল - 'অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ'; জৈন দর্শনানুসারে সংক্ষেপে বলা যায়, 'ব্রত' পদের অর্থ হল হিংসা, অসত্য, স্তেয়, অব্রহ্মচর্য্য ও পরিগ্রহ থেকে বিরত থাকা ।[২] এই ব্রতগুলি যে যে ক্ষেত্রে কঠোর নিয়মের সঙ্গে সার্বিকভাবে পালন করা হয়, সেই সেই ক্ষেত্রে ব্রতগুলি মহাব্রত পর্যায়ভুক্ত হয় । আবার এই ব্রতগুলির পালনে হিংসাদির স্থূল থেকে আংশিক বিরতি স্বীকার করার ক্ষেত্রে বা কঠোরতার মান যেখানে শিথিল করা হয়েছে সেক্ষেত্রে এই ব্রতগুলি অণুব্রত বলে গৃহীত হয় । গৃহস্থদের জন্যই মূলত অণুব্রত মান্যতা পেয়েছে । এইরূপে জৈন দার্শনিকেরা অপরাপর ভারতীয় দার্শনিকদের

---

২. হিংসানৃতস্তেয়াব্রহ্মপরিগ্রহেভ্যো বিবর্তির্ব্রতম্ ।।
দেশসর্বতোহণুমহতী ।।২

তত্ত্বার্থসূত্র , উমাস্বতি, ৭.১ - ২ সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধ্রুপদী জৈন সূত্র গ্রন্থ তত্ত্বার্থসূত্র (তত্ত্বার্থাধিগমঃসূত্র রূপেও পরিচিত) এবং সূত্রকার উমাস্বতি (কখনও উমাস্বামিও বলা হয়) । এর পূর্বে প্রাকৃত ভাষায় লিখিত জৈন দর্শনের প্রবক্তারূপে কুন্ডককুন্ড, সিদ্ধসেন দিবাকর ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য ।

তুলনায় নিয়ম নীতি পালনের বিষয়ে শৈথিল্য অনুমোদন না করলেও শ্রমণ ও শ্রাবকের কর্ত্তব্য বিষয়ে মাত্রাভেদের অনুমোদন করে জৈবিক সত্তার দাবি স্বীকার করেছেন ।

পঞ্চমহাব্রত ও মূলব্রতরূপে অহিংসার গুরুত্ব :

জৈন দর্শনানুসারে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ এই পাচটি ব্রতই পঞ্চব্রতের অন্তর্গত । শ্রমণ ও শ্রাবক এইরূপ ব্রতধারীর তারতম্যে এই ব্রতগুলির পালনে কঠোরতা এবং শিথীলতার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পঞ্চব্রতের মধ্যে অহিংসাকে মূল ব্রতরূপে বা পূর্বশর্তরূপে গ্রহণ করে অন্যান্য চারটি ব্রতকে পরোক্ষত অহিংসা ব্রত সাপেক্ষ বলে উল্লেখ করা হয় । 'পঞ্চমহাব্রত' - এর মধ্যে উল্লিখিত প্রথম ব্রত হল 'অহিংসা'। জৈন দর্শনের মূল নীতি ধর্মই হল 'অহিংসা' ; যাকে নেতিবাচকভাবে বলা যায় 'হিংসার অনুপস্থিতি' । জৈন দর্শনে এই তত্ত্ব নেতিগত দিক থেকে এই ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে ; যেমন- অসত্য ভাষণ না করা , মিথ্যা কথা না বলা , চুরি না করা, বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত না হওয়া ইত্যাদি । তবে অহিংসার এবং অন্যান্য ব্রতগুলির অর্থগত ব্যবহার কেবল নেতিবাচক ভাবেই নয় বরং ইতিবাচক দিকেও পরিচালিত হয়েছে । জৈন দর্শনে হিংসার নিন্দা করে বলা হয়েছে, বাহ্যিকভাবে হিংসামূলক আচরণ করার আগেই আমরা হিংসার প্রকাশ করে ফেলি যখন আমরা মনে মনে এবিষয়ে চিন্তা করি । তাই 'অহিংসা' বলতে জৈন দর্শনে কায় - মন ও বাক্যে অহিংসা ব্রত পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । যা 'ত্রিগুপ্তি' নামেও উল্লিখিত হয়েছে । নিজে হিংসাত্মক কর্ম করা, অপর কোন ব্যক্তিকে হিংসাত্মক কর্মে প্ররোচিত করা বা তার কর্মকে সমর্থন করাও জৈন মতে এক প্রকার হিংসা । সুতরাং সচেতন কিংবা অচেতন কোনভাবেই যাতে হিংসামূলক কর্ম প্রকাশ না পায় সেই বিষয়ে সচেতন হতে হবে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, জৈন ধর্মের 'দিগম্বর' মতাবলম্বীগণ নিজেদের নাকের রন্ধ্র দিয়ে যাতে অতি ক্ষুদ্র পরিমাপের জীবাণুরও হত্যা না হয় সেই জন্য নিজেদের নাক একটি কাপড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত রাখেন । জৈন মতে প্রাথমিক ভাবে হিংসা মূলতঃ দুই প্রকার । যেমন - 'ভাব হিংসা' এবং 'দ্রব্য হিংসা' । যখন হিংসা বা হিংসামূলক কর্মকান্ড বিষয়ে মনে মনে ভাবনা বা চিন্তা করা হয় , তাকে বলা হয় 'ভাব হিংসা' । আবার যখন আমাদের আচরণের মাধ্যমে বাস্তবিক ভাবেই হিংসামূলক কর্মকাণ্ডের প্রকাশ হয় বা আমরা হিংসামূলক আচরণ করি তা সে কায়িক হোক বা বাচিক তাকে 'দ্রব্য হিংসা' বলা হয় । এছাড়াও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জৈন দর্শনে বিভিন্ন প্রকারের হিংসার উল্লেখ হয়েছে । জৈন দর্শনানুসারে কায়িক, বাচিক এবং মানসিক হিংসাকে মূলতঃ দ্বিবিভাগেও উল্লেখ করা যায় । যেমন - 'ঐচ্ছিক হিংসা ' এবং 'অনৈচ্ছিক হিংসা' । একজন আত্ম

ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি যখন নিজ ইচ্ছায় কোনরূপ হিংসার প্রকাশ করেন বা সেই প্রকার আচরণ কায়িক, বাচিক কিংবা মানসিকভাবে সম্পন্ন করেন তখন তাকে 'ঐচ্ছিক হিংসা' বলা হয় । এই প্রকার হিংসা যেহেতু ব্যক্তি নিজ ইচ্ছানুসারেই সম্পন্ন করেন তাই তার সম্পূর্ণ দায় ব্যক্তিরই হয় , যেহেতু এই প্রকার আচরণ সম্পন্ন না করার স্বাধীনতাও তার ছিল । যেমন - যেকোন উৎসব বা পূজা ইত্যাদির জন্য প্রাণীহত্যা, পশুশিকার করা, পাখি শিকার করা, নিরামিষ খাবারের স্থানে অযথা আমিষ খাবারের জন্য মাছ কিংবা মাংস খাওয়া ইত্যাদি হল 'ঐচ্ছিক হিংসার' উদাহরণ । আবার নিজ পরিবারের প্রতি কিংবা সমাজের জন্য কোন দায়িত্ব সম্পাদন করতে গিয়ে হঠাৎ আকস্মিকভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেসকল হিংসামূলক আচরণের প্রকাশ হয় তাকে বলা হয় 'অনৈচ্ছিক হিংসা' । এই প্রকার হিংসায় ব্যক্তির কোন দায়বদ্ধতা থাকে না । পরিবারের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যেমন - রান্না করার কাজে, কিংবা নিত্য গৃহস্থালীর কাজে, স্নান করার সময় যদি কোন জীবাণু বা কীট - পতঙ্গের বিনাশ হয় তাতে কিংবা জীবিকার প্রয়োজনে যেমন- চিকিৎসকগণ তাদের রোগীর নিরাময়ের জন্য যে ওষুধ দেন কিংবা কৃষকগণ চাষাবাদ করার সময় যে কীটনাশক ব্যবহার করেন তাতে এই হিংসার প্রকাশ হয় । পরিবারের, সমাজের, দেশের বা রাজ্যের যেকোন ক্ষেত্রে নিজেদের সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজনেও এই প্রকার অনৈচ্ছিক হিংসার প্রকাশ ঘটতে পারে । ব্যক্তি ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিকভাবে যেসকল হিংসা মূলক আচরণ সম্পন্ন করে তাদের মোট চারটিভাগে ভাগ করা যায় , যেমন - সংকল্পী হিংসা, আরম্ভী হিংসা, উদ্যোগী হিংসা এবং বিরোধী হিংসা । এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা তত্ত্বার্থসূত্রগ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে । দ্বিতীয় ব্রত রূপে সত্য বা সুনৃতের উল্লেখ করা হয়েছে । 'সুনৃত' বলতে বোঝায় যা জীবের জন্য 'উপাদেয় ও উপকারী' । অর্থাৎ সকল জীবের জন্য যা উপাদেয় বা উপকারী তাই সত্য বা সুনৃত । এই ব্রতও অহিংসা ব্রতের সাথে সম্পর্কিত । কারণ অপ্রিয় কথন , মিথ্যা কথন অপরের মনকে আহত করে , তাকে ব্যথিত করে যা হিংসারই নামান্তর । এজন্য অপ্রিয় কথা ও মিথ্যা কথা পরিহার করে সদা সত্য কথা বলা বা প্রিয় কথা বলার মার্গই জৈন দর্শনে 'সত্য' বা 'সুনৃত' ব্রতরূপে নির্দেশিত হয়েছে । জৈন মতে, অস্তেয় অর্থে কোনভাবেই অপরের দ্রব্য চুরি বা 'স্তেয়' না করা কিংবা তাতে অন্যায়ভাবে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা না করার কথা বলা হয়েছে। নেতিবাচক অর্থে অস্তেয় বলতে সাধারণতঃ বোঝায় অপরের সম্পদ চুরি না করা । ইতিবাচক অর্থে অস্তেয় 'অচৌর্য' বলেও অভিহিত হয় । তাই, অচৌর্য ব্রতও 'অহিংসা' ব্রতেরই সাথে সম্পর্কিত । কারণ অপরের সম্পদ চুরি বা হরণ করলে তাকে আহত বা ব্যথিত করা হয় । যার মধ্যে দিয়ে অবশ্যই হিংসার প্রকাশ ঘটে । তাই মুক্তির লক্ষ্যে শ্রমণগণকে 'অস্তেয়' ব্রত পালন করতে হবে। জৈন নীতিশাস্ত্রানুসারে শ্রমণগণকে কায়, মন ও বাক্যে নিজেদের জননেন্দ্রিয়ের সংযম সাধন করে ধর্মাচরণে নিজেদের ব্যাপৃত রাখতে হবে । এইরূপ 'ব্রহ্মচর্য' ব্রতের পালন বা অনুশীলন ব্যাপকার্থে অহিংসা ব্রতেরই অন্তর্গত । প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ, সম্পদ, খাদ্য কিংবা অন্যান্য

যেকোন বিষয়েরই গ্রহণ বা সঞ্চয় কোনটিই সমর্থনীয় নয় । তাই অপরিগ্রহ ব্রত অনুসারে, ভবিষ্যতের কথা ভেবে সঞ্চয়, এমন মনোভাব বর্জন করতে হবে । কারণ এইরূপ আত্মসঞ্চয়ী মনোভাব অপর ব্যক্তিগণকে তাদের অধিকার ও প্রয়োজন পূরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে । সুতরাং এইরূপ কর্ম হিংসাত্মক মনোভাবের প্রকাশ করে । তাই তা সমর্থনীয় নয় । জৈন দর্শনে অহিংসা নীতি যে কতদূর গুরুত্বপূর্ণ তা এই আলোচনায় বোঝা যায় । যেহেতু অহিংসার ভাবকে স্থায়ী করা অত্যন্ত দুরুহ কর্ম তাই এই ব্রতগুলিকে স্থায়ীভাবে আত্তীকরণের লক্ষ্যে আরও নানাবিধ ধর্মনৈতিক আচার আচরণ জৈন দর্শনে প্রধান পঞ্চব্রতের উপবিভাগ রূপে প্রস্তাবিত হয়েছে। এই পঞ্চব্রত অবস্থা মানুষের মধ্যে অটলভাবে সুস্থিত করবার উপযোগী যা যা অনুশীলন বা চর্চার প্রয়োজন সেই বিষয়ে পঞ্চমহাব্রতধারী ও পঞ্চঅণুব্রতধারীর ধর্মনৈতিক অবস্থানের তারতম্য অনুসারে পঞ্চব্রতের স্থিতিশীলতা ও পরিপোষণ সহায়ক অনুশীলনীর উপবিভাগ ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে । তত্ত্বার্থসূত্রে দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত দেবনন্দী পূজ্যপাদ কৃত সর্বার্থসিদ্ধি নামক সর্বপ্রাচীন ভাষ্যে এই বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায় । অহিংসা ইত্যাদি পাঁচটি ব্রত সুস্থিত করার প্রয়োজনে প্রতিটি ব্রতের পরিপুষ্টির উপযোগী পৃথক পৃথক পঞ্চ ভাবনার উপদেশ করা হয়েছে । 'ভাবনা' বলতে এখানে যথাযথভাবে পালনীয় বা অনুষ্ঠেয় আচার আচরণের প্রসঙ্গ বিবক্ষিত হয়েছে । অহিংসা ব্রতের পঞ্চভাবনারূপে (১) বচনগুপ্তি (২) মনোগুপ্তি (৩) ঈর্ষা সমিতি (৪) আদান নিক্ষেপণ সমিতি ও (৫) আলোকিত পানভোজন - এর উল্লেখ পাওয়া যায় । [৩] তত্ত্বার্থসূত্র ৭.৪ এ এবং সর্বার্থসিদ্ধি ৭.৯ এ হিংসা ইত্যাদি দোষগুলিকে অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সের বিনাশক প্রবৃত্তি রূপে প্রদর্শন করা হয়েছে এবং সেই অর্থে হিংসাদি ক্রিয়াকর্ম 'অপায়' এবং 'অবদ্য'রূপে বর্ণিত হয়েছে । বলা হয়েছে হিংসা দুঃখের কারণ, তাই হিংসা পরিহর্তব্য ।

অহিংসা, অস্তেয় এবং অপরিগ্রহ ব্রতে দান প্রসঙ্গ :

জৈন ধর্মে স্বীকৃত অহিংসা নীতি আদর্শের উচ্চতম মার্গে উন্নীত হওয়ার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক রূপে শ্রমণ ও শ্রাবক উভয়েরই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ও দায়িত্ব স্বীকৃত হয়েছে যার অন্যতম উপায়রূপে দান ক্রিয়াকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে । এইপ্রসঙ্গে জৈন ধর্মের তত্ত্বার্থসূত্রে উল্লিখিত হয়েছে , 'অহিংসা' নীতি অভ্যাসের একটি অন্যতম মাধ্যম হল দান । কারণ একজন ব্যক্তি যখন অপরের প্রয়োজনে নিজ বিষয়ের অধিকার বা স্বত্ববোধ পরিত্যাগ করবেন তাতেই সেই বিষয়ে তার স্বার্থপর মনোভাবের সংযম হতে পারবে যা হিংসার ত্যাগ ব্যতীত আর কিছু নয় । জৈন পুরুষার্থসিদ্ধিতেও এই বক্তব্যের সমর্থনে বলা হয় , 'কোন ব্যক্তি দান না করলে

---

৩. *তত্ত্বার্থসূত্র*, ৭।৪

তার মধ্যে হিংসার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় '। এবিষয়ে জৈন মত আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, উল্লিখিত পঞ্চবিধ ব্রতের মধ্যে 'অস্তেয়' এবং 'অপরিগ্রহ' ব্রত যেন বিশেষভাবে 'দান' নিয়মের সমর্থন করে । সর্বার্থসিদ্ধি নামক ভাষ্য অনুসারে 'অস্তেয়' ব্রতের বিরোধী স্তেয়ের লক্ষণে বলা হয়েছে, 'অদত্তাদানম্ স্তেয়ম্'[৪] অর্থাৎ দান করা হয়নি এমন কোন বস্তুর 'আদান' অর্থাৎ গ্রহণ হল স্তেয় বা চৌর্য । এখানে লক্ষ্য করা যায় যে দান প্রক্রিয়ার যথাযথ পালন হলে চৌর্য নিবৃত্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ; দানের অনুশীলন সক্রিয়ভাবে অস্তেয় ব্রত পালনের অবশ্যই সহায়ক হয় । জৈন নীতিশাস্ত্রে আবার 'অস্তেয়' শব্দটিকে সাধারণ অর্থে প্রয়োগ না করে সমাজের সকল মানুষের পক্ষে উপযোগী এক বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করে, দাতার সানন্দ দান ব্যতীত তার কাছ থেকে অতিরিক্ত সম্পদ গ্রহণ যেকোন অবস্থাতেই নিষেধ করা হয়েছে । তাই ভিক্ষাজীবী জৈন শ্রমণগণ কেবল সেই পরিমাণেই ভিক্ষা গ্রহণ করবেন যে পরিমাণ ভিক্ষা গৃহস্থ সানন্দে দান করবেন, এইরূপ নির্দেশ করা হয়েছে। কারণ ভিক্ষালব্ধ সামগ্রীর ক্ষেত্রে শ্রমণগণের নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে অপরকে বঞ্চিত করে নিজে পাওয়ার মধ্যে দিয়ে একরকম হিংসা মনোভাব প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে জৈনদর্শনে বর্ণিত দানতত্ত্বের এই আলোচনা থেকে প্রাথমিকভাবে প্রশ্ন হতে পারে এইরূপ বিবিধ ব্রত ও কর্ত্তব্য পালনের মধ্যে দিয়ে কী তবে কেবল শ্রাবকদের জন্যেই দান ক্রিয়া স্বীকৃত হয়েছে ; শ্রমণদের জন্য নয় ? উত্তরে বলা যায়, জৈন দর্শনানুসারে শ্রমণ ও শ্রাবক উভয়েরই এইরূপ অস্তেয় ব্রত পালন কর্ত্তব্য এবং এই ব্রত পালনের মধ্যে দিয়ে যেমন অন্যকে বঞ্চিত করে নিজের অধিক প্রাপ্তি বা সঞ্চয়ের প্রবণতার মধ্যে দিয়ে একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনের হিংসার প্রকাশ করার সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করা হয় তেমনি বিশেষভাবে একজন শ্রমণের পক্ষ থেকে অন্যান্য শ্রমণদের উদ্দেশ্যে দান ক্রিয়াকেও ত্বরান্বিত করা হয় । কাজেই বলা যায় যে, অস্তেয় ব্রত এক অর্থে অচৌর্য্যের অভ্যাস যা একইসঙ্গে শ্রমণ ও শ্রাবক উভয়ের ক্ষেত্রেই দান ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় । সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনার্থে এই অস্তেয় ব্রত শ্রাবকদের উদ্দেশ্যে আরও কতকগুলি অতিরিক্ত কর্ত্তব্যেরও নির্দেশ করেছে , সেখানেও দানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । যেমন - 'অস্তেয়' ব্রত পালনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি অবশ্যই সঠিক ভাবে ও পরিমাণে নিজের বিষয় সম্পত্তির ঘোষণা করবেন, নিয়মিত কর প্রদান করবেন যেগুলির সহায়তায় অপরাপর ব্যক্তির কল্যাণ করার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় । যেমন, কর ব্যবস্থার আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, একজন ব্যক্তির নিজস্ব আয় থেকে নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ অর্থ কররূপে নিয়মিত প্রদানের মধ্যে দিয়ে সমাজ কিংবা প্রতিষ্ঠিত সরকার যে পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন সেই অর্থ সমাজের ও জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যয় করার মধ্যে দিয়ে সমাজের মঙ্গল সাধিত হয় ।

---

৪. ৭.১৫ *সর্বার্থসিদ্ধি* ।

পঞ্চব্রতের মধ্যে অপর আরেকটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্রত হল 'অপরিগ্রহ' অর্থাৎ পরিগ্রহের অভাব । 'পরিগ্রহ' পদের অর্থ হল কোন কিছু জোর করে ধরে রেখে বা এঁটে ধরে রেখে সেই বিষয়ের প্রতি আধিপত্যের মনোভাব বা বাসনা পোষণ করা । এই আধিপত্যের বাসনা কেবলমাত্র কোন বাহ্য বস্তু কেন্দ্রিকই হয় এমন নয়, বরং কোন আন্তর অনুভূতি বা আবেগ সংক্রান্তও হতে পারে । সূত্রকার উমাস্বতি ও ভাষ্যকার পূজ্যপাদ দেবনন্দী ব্যবহৃত পারিভাষিক পদ 'মূর্চ্ছা', 'পরিগ্রহে'র নামান্তর , যেহেতু 'মূর্চ্ছা পরিগ্রহঃ' [৫] এইরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে । অধিগ্রহণের মনোভাব বলতে ইচ্ছা, কামনা, লালসা, বাসনা ইত্যাদি বোঝানো হয়ে থাকে । সুতরাং 'মূর্চ্ছা' আবশ্যিকভাবে মনোভাব। কোন বাহ্য বস্তু না থাকলেও মমত্ব বুদ্ধি দ্বারা আচ্ছন্ন বা আবিষ্ট মানুষেরও স্বত্ববোধ থাকে । প্রশ্ন হয়, যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাবান কিংবা স্বজ্ঞাবান তারও প্রজ্ঞা বা স্বজ্ঞা স্বত্ব কীনা ।

এইপ্রসঙ্গে জৈন দর্শনে দানের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ বলে উল্লিখিত হয়েছে । এখানে দেখা যায় যে, মনুষ্যব্যক্তির স্বত্বভাব বা পরিগৃহীতের ভাব অপনোদন করার জন্য দানের অনুশীলন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হয়। সুতরাং বলা যায়, অধিকৃত করার মনোভাব দোষজনক এবং অপরিগ্রহ ধর্মনৈতিক গুণ । সুতরাং দান ক্রিয়া মানুষের বদ্ধাবস্থা থেকে মুক্ত হতে সহায়ক হয় । দান প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটলে কর্ম বন্ধন দৃঢ় হয় । দানের যা কিছু অন্তরায় হয়, তাই মোক্ষের বাধা স্বরূপ বলে পরিগণিত হয় । এই 'অপরিগ্রহ ব্রতই' ব্যক্তিকে তার চাহিদার সীমিতকরণের অভ্যাস ও আত্মসংযমের অনুশীলন বিষয়ে তাকে সচেতন করে 'অহিংস আদর্শ' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উন্নীত করে । এই বিষয়ে জৈন মত বিচার - বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় যে, ব্যক্তিকে আত্মস্বরূপ সম্পর্কে অবগত হতে হলে তাকে তার আন্তর্প্রবৃত্তি এবং বর্হিপ্রবৃত্তির বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে আত্ম - সংযমী হতে হবে। সাধারণ মানুষ তার প্রয়োজন অনুসারেই সংগ্রহ বা সঞ্চয় করবে তার অতিরিক্ত নয় , কেননা তা পরিগ্রহবৃত্তির সূচনা করবে । জৈনমতানুসারে চার প্রকার আবেগ এবং নয় প্রকার অনুভূতিগুলিকে একত্রে বলা হয় আন্তঃপ্রবৃত্তি। অপরিগ্রহ থাকার লক্ষ্যে আন্তঃপ্রবৃত্তি ছাড়াও জৈন ধর্মানুসারী ব্যক্তিদের মোট দশ প্রকারের বর্হিপ্রবৃত্তির আকর্ষণ থেকেও মুক্ত থাকতে হবে । উক্ত দশ প্রকারের বর্হিপ্রবৃত্তির কারণগুলি হল ভূমি, গৃহ, রূপা, সোনা, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়, খাদ্যশষ্য, গৃহপরিচারক, গৃহপরিচারিকা, পোষাক - পরিচ্ছদ এবং সকল রকম আসবাবপত্র । জৈন মতানুসারে আন্তর্বিষয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে এই সকল বর্হিবিষয়ের আকর্ষণের প্রভাব মুক্ত হলে তবেই কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে আত্ম - সংযমী হতে পারবে । তবেই সে প্রকৃত অর্থে অপরিগ্রহ ব্রতের অনুসারী হবে । অপরিগ্রহ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, 'দান'রূপ কর্ত্তব্যের পালন ক্ষেত্রে

---

৫. ৭.১২ *তত্ত্বার্থসূত্র* , ৭.১৯ *সর্বার্থসিদ্ধি* ।

'বাহ্যিক ত্যাগ বা বর্হিঃ প্রবৃত্তি'র ত্যাগরূপ ব্রতের প্রভাব অপরিসীম । [৬] যখন কোন ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য, বসবাসের জন্য স্থান , কিংবা পরিধানের জন্য বস্ত্র কিংবা অলঙ্কার ইত্যাদির গ্রহণ না করে ত্যাগ করতে শেখে সে যেন এবিষয়ে সেই বিষয়গুলিকে অন্যের প্রয়োজনে 'দান'ই করে । এইভাবেই কার্যত দানও সম্ভব হয় । 'অপরিগ্রহ' ব্রত পালনের জন্য যে যে কাজ না করার জন্য নির্দেশ করা হয়েছে তার কারণই হলো কোন ব্যক্তির দ্বারা সেইগুলির প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণে অন্য ব্যক্তিগণ তাদের যথাযথ অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন । কাজেই এইরূপে অপরকে বঞ্চিত না করে তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করাও এক প্রকার 'দান'। যা জৈন মতে পৃথকভাবে নিত্য কর্ত্তব্য বলেও উল্লিখিত হয়েছে । অনেকান্তবাদী জৈন দর্শনানুসারে দান প্রসঙ্গে 'অহিংসা তত্ত্ব' এবং 'অস্তেয়' এর মতোই অপরিগ্রহব্রতও অন্যতম তাৎপর্য্যপূর্ণ । জৈন দর্শন সমর্থিত এই তত্ত্বগুলি পরস্পরের সঙ্গে যেমন সম্পর্কিত তেমনি অত্যন্ত সঙ্গতি সম্পন্নও । কারণ জৈন মতানুসারী 'দান ব্যবস্থা' একাধারে ব্যক্তিকে তার নিজের বিষয়াসক্তির উর্দ্ধে উঠে অপরের জন্য যেভাবে সাহায্য করার নির্দেশ প্রদান করে তাতে যেমন অসহায় মানুষটির উপকার সাধিত হয় তেমনি তাতে দাতার দানের অভ্যাসও তৈরী হয়, তার অহিংস ধর্মের অনুশীলন হয় এবং সর্বোপরি সমাজের সকল মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্যও সুরক্ষিত হয় ।

জৈন মতে মানুষের নিত্য কর্ত্তব্য সমূহ :

জৈন দর্শনানুসারে শ্রমণ ও শ্রাবকভেদে সকলকেই নিত্য কর্ত্তব্যের সম্পাদন করতে হবে । জৈন ধর্মনীতি অনুসারে শ্রমণ ও শ্রাবকগণের কর্ম - কর্ত্তব্য যেমন নিয়মের কঠোরতা এবং নমনীয়ভাবের দ্বারা যথাক্রমে নির্ধারিত হয় এক্ষেত্রেও তারই পুনুরুল্লেখ পাওয়া যায় । জৈন দর্শনে স্বীকৃত প্রথম নিত্য কর্ত্তব্য হল 'দেবপূজা'। প্রথম নিত্য কর্ত্তব্য বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ্য, যেহেতু জৈনগণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাই তাঁদের নীতিতত্ত্বে স্বীকৃত 'দেবপূজা' নামক কর্ত্তব্যটি প্রথাগতভাবে ঈশ্বরের পূজার্চনা নয় বরং আত্ম -তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের উপযোগী করে তোলা এই অর্থেই গৃহীত হয়েছে । দেবপূজার দুটি প্রকার, যেমন - ভবপূজা এবং দ্রব্যপূজা । উভয় প্রকারই মূলতঃ আত্ম- তত্ত্বের সাক্ষাৎকারের লক্ষ্যেই পরিচালিত হয় । এই প্রকারের প্রথমটির মাধ্যমে তত্ত্ব জিজ্ঞাসু নিজেকে দান ইত্যাদির মাধ্যমে ঐ সাধনার উপযোগী করে গড়ে তোলে , আর দ্বিতীয়

---

৬. *তত্ত্বার্থসূত্র*, ৯।১৯

প্রকারটি তত্ত্ব জিজ্ঞাসুকে বিভিন্ন সদাচার পালনে ব্রতী করে । এইরূপে 'দেবপূজা' রূপ নিত্যকর্ত্তব্য শ্রমণ ও শ্রাবক উভয়কেই আত্মতত্ত্বলাভের মার্গে পরিচালিত করে । দ্বিতীয় নিত্য কর্ত্তব্যরূপে গুরু উপস্তি বা গুরু উপাসনা বন্দনার কথা বলা হয়েছে । এই কর্ত্তব্যে গুরু অর্থে জৈন তীর্থঙ্করগণসহ গুরুজন বা বয়োঃজেষ্ঠ্য সকলের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নির্দেশ করা হয়েছে । লক্ষ্যনীয় যে, এই দ্বিতীয় নিত্য কর্ত্তব্যটিও শ্রাবককে যেমন সমাজের পক্ষে যা মঙ্গলকর, শুভ বা যথোপোযোগী এমন লক্ষ্যেই চালিত করে, তেমনি শ্রমণগণকে নিজেদের সাধনার জন্য আরও বেশী করে সিদ্ধ পুরষ বা তীর্থঙ্করের প্রতি অনুরক্ত করে । অপর সকল নিত্য কর্ত্তব্যরূপে 'স্বাধ্যায়', 'সংযম' এবং 'দান' এর উল্লেখ হয়েছে এগুলির প্রতিটিরই লক্ষ্য হল অহিংস থেকে জিজ্ঞাসুর নিজের এবং ব্যাপকার্থে সমাজেরই কল্যাণ সাধন করা। উক্ত কর্ত্তব্যগুলি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, প্রতিটি নিত্যকর্ত্তব্যই ব্যক্তিকে যেমন আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকারের উপযোগী করে গড়ে তোলে, যার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির মধ্যে অহিংস আদর্শ প্রতিষ্ঠা পায় তেমনি সমাজের জন্য যা কিছু কল্যাণময় এবং উপযুক্ত এমন কর্মনীতির প্রয়োগে সে অভ্যস্ত হয় । যেমন - স্বাধ্যায় ব্রত পালনের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি নিজের ধর্মীয় মানের উন্নতি ঘটায়, তার জীবনের নৈতিক মূল্যবোধ গঠন করে, এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থের পাঠ করা, তার শ্রবণ করা এবং সেই অনুসারে সদাচারে ব্রত হওয়াও স্বাধ্যায়।[৭] সংযম মূলতঃ ত্রিগুপ্তিরই অনুশীলন । কায়, মন ও বাক্যে ব্যক্তিকে সংযমী হতে হবে । এর মধ্যে দিয়েই তার বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় উভয়েরই সংযম সাধিত হবে । এই সংযমে অভ্যস্ত হয়ে ব্যক্তি কাম -ক্রোধ লোভ মোহ ইত্যাদি যাবতীয় কামনা - বাসনার উর্দ্ধে অবস্থান করতে পারবে। তপঃ কর্ত্তব্যে ব্যক্তি ধ্যানকর্ম, উপবাস করা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে নিজের চিত্তের পরিশুদ্ধিকরণ করতে পারবে । যেগুলি তাকে সদাচারে ব্রতী হতে সাহায্য করবে । শেষ নিত্য কর্ত্তব্য রূপে জৈন দর্শনে 'দান' এর উল্লেখ করা হয়েছে , এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে জৈন মতানুসারে বলা যায়, অন্যের প্রয়োজনে এবং হিতার্থে কোন ব্যক্তিকে কিছু সাহায্য করাই হল দান । জৈন মতে কেবল অপরের উপকার সাধন করাই হল সমগ্র 'দান' ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য । [৮]

মূলব্রত ও উত্তরব্রতে দান ভূমিকা :

জৈন ধর্মীয় অনুশাসন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে, সাধারণ মানুষের সদাচারে নিযুক্ত থাকার জন্য পঞ্চমহাব্রত ক্ষেত্র বিশেষে 'মূলব্রত' বলেও অভিহিত হয়েছে , জৈন তত্ত্বার্থসূত্রে তার উল্লেখ পাওয়া যায় ।

---

৭. *তত্ত্বার্থসূত্র,* উমাস্বতি, ৯।২৪
৮. ঐ, ৭।৩৮

উল্লেখ্য যে এই মহাব্রতের সংখ্যা বিষয়ে জৈন দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কারণ তত্ত্বার্থসূত্র অনুসারে মহাবীর মহাব্রত বিষয়ে পাঁচটি মহাব্রতের উল্লেখ করলেও জৈন দিগম্বরগণ 'রাত্রিবেলা আহারের অগ্রহণ' বা 'রাত্রিভোজনবিরাম'- [৯] নামক অতরিক্ত একটি ষষ্ঠ নীতির উল্লেখ করেছেন । মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ রাত্রিবেলায় কোনরূপ রন্ধন কর্ম সম্পাদন এবং আহার গ্রহণ করবেন না, কারণ তাতে বাতাসে ভাসমান অদৃশ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বহু কীট - পতঙ্গের প্রাণ হানি ঘটতে পারে । যদিও এই বিষয়ে মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কারণ জৈন মতের অনুসারীগণের মধ্যে কেউবা বিশ্বাস করেন এই অতিরিক্ত ব্রত মূলব্রতেরই অন্তর্ভূক্ত ছিল আবার কেউবা বিশ্বাস করেন তা মূলব্রতের অন্তর্গত নয় বরং অতিরিক্ত ব্রতের অন্তর্গত ছিল । এখন উক্ত ব্রত মূলব্রত নাকি অতিরিক্ত কোন ব্রত এইবিষয়ে জৈন দর্শনের অন্যান্য প্রবক্তা যেমন, কুন্ডককুন্ড, উমাস্বতি, সামন্তভদ্র, স্বামি- কার্ত্তিকেয়, জীনসেনা, বসুনন্দিন প্রত্যেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের নিজ নিজ মতের উপস্থাপনা করেছেন । এইরূপ আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে, জৈন দর্শনে পঞ্চমহাব্রত ছাড়াও অতিরিক্ত ব্রতেরও উল্লেখ হয়েছিল । সেই অতিরিক্ত ব্রতগুলি কী ? এই প্রশ্নের উত্তর আলোচনা প্রসঙ্গে জৈন তত্ত্বার্থসূত্র অনুসারে বলা যায়, উক্ত পঞ্চব্রত পালনে শ্রমণ ও শ্রাবকদেরঅন্যান্য যেসকল ব্রতগুলি সহায়ক ছিল তাদের বলা হয় 'উত্তরব্রত' বা 'উত্তরগুণ' । তবে এই প্রসঙ্গে জৈন মতানুসারে মহাব্রত এবং উত্তরব্রত পালনের ভিত্তিতেও শ্রমণ ও শ্রাবকের ভেদ [১০] এবং বিশেষভাবে শ্রাবকদের জন্য উত্তরব্রতরূপে অণুব্রতসহ তিনটি গুণব্রত এবং চারটি শিক্ষাব্রতসহ মোট বার প্রকার ব্রতের নির্দেশ হয়েছিল ।[১১] এর প্রতিটিতেই ত্যাগ অর্থে দান ক্রিয়া ধর্মরূপে[১২] গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে । উল্লেখ্য যে, উত্তরব্রতরূপে গুণব্রত এবং শিক্ষাব্রতের পালন শ্রাবকদের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশিত হলেও উত্তম ত্যাগ অর্থে দান শ্রমণ ও শ্রাবক উভয়ের জন্যেই স্বীকৃত হয়েছে । শ্রাবকদের জন্য গুণব্রত অর্থে 'দিগ্ব্রত', 'ভোগপভোগ - পরিমাণব্রত ' এবং 'অনর্থদন্ডব্রত ' - এর উল্লেখ করা হয়েছে । বাকী চারটি শিক্ষাব্রতের মধ্যে চার প্রকার প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায় ; যেমন - দেশাবকাশিকা, সামায়িকা, প্রষধোপবাস এবং দান । জৈন ধর্মানুসারে একজন গৃহস্থের উচিৎ নিয়মিত উক্ত চতুর্বিধ শিক্ষাব্রতের অভ্যেস ও অনুশীলন করা ।

---

৯. *তত্ত্বার্থসূত্র ভাষ্য,* পন্ডিত সুখলাল, অনুবাদক, কে .কে .দীক্ষিত, ৭।১
১০. *তত্ত্বার্থসূত্র,* ৭।১৯
১১. ঐ, ৭।২১
১২. ঐ, ৯।৬, ২২

অণুব্রত :

জৈন দর্শনানুসারে ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন যাপন করার ভিন্নতার নিরিখে পঞ্চমহাব্রতের নীতিগুলি অনুসরণের বা পালনের মাত্রাগত ভিন্নতা স্বীকৃত হয় । যেমন - জৈন মতে, মঠবাসী শ্রমণগণের ক্ষেত্রে উক্ত পাঁচটি নৈতিক আদর্শ 'মহাব্রত'রূপে কঠোর ভাবে অনুসরণীয় হলেও বিপরীতে শ্রাবক বা সংসারী গৃহীগণের জন্য উক্ত পাঁচটি নীতিই শিথিলভাবে 'ব্রত' বা 'সহজব্রত' রূপে নির্দেশিত হয়েছে অর্থাৎ পালনের সামর্থ্যগত ভিন্নতার নিরিখে ব্রতগুলির নামের ভিন্নতা নির্দেশিত হয়েছে । যেহেতু জৈন মতে মঠবাসী শ্রমণগণ মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে যে প্রকার চরম কৃচ্ছ্রতাসাধনের পথ অবলম্বন করতে সমর্থ হন ঠিক সেই পরিমাণ চরম কৃচ্ছ্রতা সাধন করা কোন শ্রাবক বা সংসারী গৃহীগণের পক্ষে সম্ভব নয় । জৈন নীতিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'অণুব্রত' বা 'সহজব্রত' অন্যতমরূপে তাৎপর্য্যপূর্ণ । উল্লিখিত পঞ্চ অণুব্রত পালনে যদি নিয়মের ব্যতিক্রম হয় তবে শ্রাবকের পক্ষে তত্ত্বসাক্ষাৎকার সম্ভব হয় না বলেই জৈন মতে নির্দেশিত হয়েছে । এই বিষয়ে জৈন মতের আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, কোন ব্যক্তিকে কোন কাজে জোর পূর্ব্বক বাধ্য করা , কাউকে আহত করা, দেহের ক্ষতি করা, অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া, অন্ন এবং জল গ্রহণে অস্বীকার করা এই পাঁচ প্রকার কাজ করলে অহিংস ব্রত পালনের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় । একইভাবে পাঁচ প্রকার কর্মের উল্লেখ প্রতিটি ব্রতের জন্যেই উল্লিখিত হয়েছে । যেমন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া, কাউকে অপবাদ দেওয়া, প্রবঞ্চনা করা, কোন সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা, কোন ব্যক্তির গোপন তথ্য সকলের কাছে প্রকাশ করে দেওয়া ইত্যাদি সবই 'সত্য' ব্রত নিয়মের লঙ্ঘনকারী । আবার কাউকে চুরি করতে প্ররোচনা দেওয়া, চুরির দ্রব্য গ্রহণ করা, নিয়মিত কর প্রদান না করা, বিষয় - সম্পত্তির যথাযথ পরিমানের উল্লেখ না করা, বিষয় - সম্পত্তির অন্যায় হস্তান্তর করা - এই পাঁচটি কাজ অস্তেয় ব্রত নিয়মের লঙ্ঘন করে । আবার অন্যের বিবাহের প্রযত্ন করা, অনিয়মিত যৌনাচারে আসক্ত হওয়া, পর - স্ত্রীর প্রতি যৌন আসক্তি প্রকাশ করা অসহায় মহিলাদের উপর যৌন নির্যাতন করা এবং অনিয়মিত যৌনাচারে আকাঙ্খা প্রকাশ করা ইত্যাদি সবই ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের লঙ্ঘন করে । শেষতঃ অপরিগ্রহ ব্রত লঙ্ঘনকারী কর্ম বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়েও বলা হয়েছে যদি কোন ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত বসবাসের জন্য স্থান কিংবা সোনা কিংবা রূপার অলঙ্কারদি দ্রব্য, খাদ্য, গৃহপরিচারক কিংবা ভৃত্য এবং পোষাক ইত্যাদির অপরিমিত ব্যবহার করেন বা সঞ্চয় করেন তাহলেও হিংসার প্রকাশ করা হয় । ফলে 'অপরিগ্রহ' নিয়মের লঙ্ঘন হয় । সে তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের যোগ্য হতে পারে না । তাই এই কর্মগুলি না করার বিষয়ে তত্ত্ব - জিজ্ঞাসুকে সতর্ক হতে বলা হয়েছে ।

গুণব্রত ও দান প্রসঙ্গ :

দিগব্রত :

দিগব্রত মূলত অহিংস আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই নির্দেশিত হয়েছে । জৈন ধর্মানুসারে একজন মুক্তিকামী সাধক তার সমগ্র জীবনে বিচরণ ক্ষেত্রের জন্য যেকোন উচ্চ স্থান যেমন পাহাড়, পর্বত ইত্যাদি ক্ষেত্রে, নিম্নস্থান যেমন - খনি, কূপ, নদী, ইত্যাদি স্থানে এবং সমতলভূমি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই অবশ্যই একটি সীমার নির্ধারণ করবেন,[১৩] যাতে করে অন্ততঃপক্ষে তার বিচরণ ক্ষেত্রের অতিরিক্ত স্থানগুলি তার পদচালনার বা পদাচারণের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, সেই বিষয়ে তিনি যত্নবান হবেন । এইরূপ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় যে, জৈন মতানুসারে কোন ব্যক্তির বিচরণের স্থানগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এবং এই বিষয়ে আরও বলা হয়েছে যে, এইরূপ দিগ্ব্রত পালনে যদি কোন ব্যক্তি নিয়ম ভঙ্গ করেন তবে একের দ্বারা অন্যের ক্ষতি হতে পারে । যেমন, কোন ব্যক্তি যদি তার বিচরণের জন্য পূর্ব ঘোষণা মতো স্থানের অতিরিক্ত ক্ষেত্র অধিকার করে বিচরণ করেন তবে সেই স্থানগুলিতে অপরের বিচরণের অধিকার লঙ্ঘিত হয়। যা হিংসারই প্রকাশ করে । তাই সাধক তার ঘোষিত স্থানের অতিরিক্ত স্থানে বিচরণ না করে সেই স্থানগুলি অন্যের ব্যবহারের জন্য দান করবেন । তাতে ব্রতের যথাযথ পালন ও হিংসার প্রতিরোধ উভয়ই সাধিত হবে ।

ভোগপোভোগ - পরিমাণব্রত : নির্দিষ্ট এই ব্রতের লক্ষ্য হল আহার্য্য বিষয় এবং আহার গ্রহণের সময়ের সীমায়িতকরণ করা । জৈন মতানুসারে নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত খাদ্যগুলিই মানুষ তার খাদ্যরূপে গ্রহণ করবে তার অতিরিক্ত নয় । এই প্রসঙ্গে নির্দেশিত হয়েছে যেমন - কাঁচা ফল অথবা অন্যান্য খাদ্য, কিংবা তার সঙ্গে যুক্ত অথবা সম্পর্কিত ঐরূপ খাদ্যের গ্রহণ করবেন না । [১৪]

অনর্থদণ্ডব্রত : পাঁচ প্রকার দুষ্কর্ম থেকে সকল মুক্তিকামী সাধককেই নিবৃত্ত থাকতে হবে যেমন - প্রথমতঃ উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ও অন্যায়ভাবে অশালীন বাক্য বলা , দ্বিতীয়তঃ অন্যায়ভাবে অযথা মজা করার জন্যে শরীরের অঙ্গ বিকৃতি করা , তৃতীয়তঃ উদ্ধতভাবে অকারণে বেশী কথা বলা চতুর্থতঃ অপ্রয়োজনেই মানসিক, বাচিক এবং শারীরিকভাবে অধিক প্রবৃত্তি করা এবং পঞ্চমতঃ কোনপ্রকার কুরুচিকর, নিন্দিত প্রবৃত্তিরও অনুসরণ

---

১৩. *তত্ত্বার্থসূত্র,* ৭।৩০
১৪. ঐ, ৭।৩৪

করবেন না । কারণ এই সবই হিংসামূলক তাই তা সমর্থনীয় নয় ।[১৫] কামাচার মূলক কোন বাক্যের শ্রবণ করা কিংবা এই জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা বা তার দর্শক কিংবা শ্রোতা হওয়াও সমর্থনীয় নয় । কারণ তা ভবিষ্যতে বহু অপরাধ ও হিংসামূলক কর্মের কারণ হতে পারে । এইরূপ অনর্থদন্ডব্রত লঙ্ঘনেও হিংসার প্রকাশ ঘটে । এই প্রসঙ্গে তত্ত্বার্থসূত্রে বলা হয়েছে, নির্লজ্জ্যভাবে অকারণে অপরের ক্ষতি সাধন করা, চটুল , অর্থহীন কথা বলা, অপরের কাছ থেকে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা না করেই ধার নেওয়া, কিংবা বিনা প্রয়োজনে নিজের জন্যে অধিক পরিমাণে অন্ন, বস্ত্র, অলঙ্কার, তেল ইত্যাদির সঞ্চয় করা সবই অনর্থদন্ডব্রতের লঙ্ঘনকারী । উল্লেখ্য যে জৈন দর্শনে স্বীকৃত অনর্থদন্ডব্রতে যে বিধির উল্লেখ পাওয়া যায়, তা যেন ‘অপরিগ্রহ ব্রতে’রই অনুসারী ও সমর্থক ।

শিক্ষাব্রত ও দান প্রসঙ্গ :

সমাজে অহিংস আদর্শের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জৈন ধর্মে নির্দেশিত নৈতিক বিধিসমূহ এবং নানারূপ ধর্মীয় অনুশাসন সমাজে বসবাসকারী ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক বিভেদের অবসান ঘটিয়েছিল । যার মধ্যে শিক্ষাব্রতের ভূমিকা ছিল অন্যতম । শিক্ষাব্রতের অন্তর্ভূক্ত চার প্রকার ব্রত অর্থাৎ দেশাবকাশিকা, সামায়িকা, প্রষধোপবাস এবং অতিথি সংবিভাগ ব্রত বা দান এর পালন প্রতি শ্রাবকের জন্যই ছিল আবশ্যিক কর্ত্তব্য । এই বিষয়ে জৈন মতানুসারে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, জৈন সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর সামগ্রিকীকরণ বিশেষভাবে তাৎপর্য্যমন্ডিত । এই সূত্রে সমাজব্যবস্থায় গৃহী বা শ্রাবকদের মোট একাদশ প্রকার শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছিল । যাদের মধ্যে প্রথম প্রকার থেকে অষ্টম প্রকারের গৃহস্থদের কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের পরিসরে পরিচালিত হতে হত । বাকি তিন প্রকারের গৃহস্থদের জন্য উক্ত নিয়ম ব্যবস্থার কোন উল্লেখ জৈন ধর্মে পরিলক্ষিত হয় না । বিপরীত দিকে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর গৃহীদের জন্য অহিংস আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ‘পরিগ্রহ পরিমাণ ব্রত’ এবং ‘দান’ উভয় নিয়ম বা অনুশাসনের পালন ছিল আবশ্যিক কর্ত্তব্য ।

দেশাবকাশিকা বা দেশব্রত : দেশব্রতে দিগব্রত কর্ত্তব্যের মতোই দেশ বা বসবাস করার স্থান সম্পর্কিত নির্দেশ পরিলক্ষিত হয় । এই ব্রতে নির্দেশিত হয়েছে, একজন মুক্তিকামী সাধক অবশ্যই তার অধিকারের অতিরিক্ত বিষয়ের চাহিদা রাখবেন না, তার অধিকারের পরিসর লঙ্ঘন করে যত্রতত্র নিজের ভৃত্য বা কর্মচারীকে প্রেরণ

---

১৫. *তত্ত্বার্থসূত্র,* ৭।৩২

করবেন না, অকারণে অতিরিক্ত অধিকার দেখিয়ে নিজের বাক্য কিংবা রূপ দেখিয়ে অন্যদের প্রভাবিত করবেন না , এবং যেন তেন প্রকারে প্রয়োজনে শারীরিক পেশী শক্তিসহ অন্যান্য উপায়ে যেমন পাথর ইত্যাদির ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধিতে উদ্যোগী হবেন না । [১৬] কারণ উক্ত সকল ক্ষেত্রেই দেশ - পরিমাণব্রতের লঙ্ঘন হয়। যার ফলে অপরাপর ব্যক্তির স্বার্থ বিঘ্নিত হয় এবং হিংসার প্রকাশ হয় ।

সামায়িকা : জৈন মতে তত্ত্ব জিজ্ঞাসুকে সামায়িকা ব্রত পালনের জন্য তাদের মানসিকভাবে সংযত হতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন কথা বলবেন না, কাম - ক্রোধ ইত্যাদির বশবর্তী হয়ে কোন কথা বলবেন না বা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না । [১৭] সাধক তার কাম ক্রোধের পরিত্যাগ করবেন। কারণ এইরূপ অনুভূতির বশবর্তী হলে যেকোন বিষয়েই তার সাময়িক অমনোযোগ তার বিস্মৃতির কারণ হতে পারে ।

প্রষধোপবাস : প্রষধোপবাস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ব্যক্তিকে তাঁর প্রতিদিনের নিত্য কর্ত্তব্যরূপে মল, মূত্র পরিত্যাগ এবং শৌচ ইত্যাদি কর্ম অত্যন্ত শুদ্ধিকরণের সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে । এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে কতগুলি স্বাস্থ্যবিধি নির্দেশ করে বলা হয়েছে, সমাজের এবং সমাজে বসবাসকারী সকল সভ্যদের শারীরিক সুস্থতার প্রয়োজনেই প্রত্যেকেই বিশেষভাবে কিছু বিধি নিষেধ মান্য করবেন । হাত -মুখ, নাক ইত্যাদি পরিস্কার রাখার বিষয়ে তিনি যত্নবান হবেন। উপাসনা, পূজা ইত্যাদির জন্য ফল, ফুল ইত্যাদি উপচার সংগ্রহ থেকে শুরু করে বসার জন্য কাঠের আসন গ্রহণ করবেন, অন্য প্রয়োজনে কাঠের ছড়ি সংগ্রহ করবেন । ক্ষুধায় কাতর হয়ে তাদের নিত্য কর্ত্তব্যরূপে আবশ্যাক ধর্ম বা কর্ত্তব্য কর্মের যথাযথ অনুসরণ করবেন । [১৮]

অতিথি সংবিভাগ ব্রত বা দান :

মূলতঃ মনুষ্যেতর অন্যান্য প্রাণীর জীবনের সুরক্ষার্থে ব্যক্তির খাদ্য চাহিদার সংযম ও উদার মনোভাবের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে জৈন মতানুসারে, অতিথি - সংবিভাগ ব্রতে সরাসরি ভাবে সেই সকল বিষয়ের 'দান' করতে নিষেধ করা হয়েছে যেগুলি খাদ্য তালিকারূপে কোন প্রাণের হরণ করে । কিংবা এমন কোন বস্তু বা দ্রব্য অপর কোন বিষয়ের আচ্ছাদন রূপে ব্যবহার করা যাবে না , যাতে অন্য কোন প্রাণের ক্ষতি হয়। যেমন,

---

১৬. তত্ত্বার্থসূত্র, ৭।৩১
১৭. ঐ, ৭।৩৩
১৮. ঐ, ৭।৩৪

কলাপাতা বা পদ্মপাতা এগুলি ছিঁড়ে বা কেটে নিয়ে আচ্ছাদন রূপে ব্যবহার করলে গাছের ক্ষতি হয়। কিংবা এক জনের ব্যবহৃত দ্রব্য অপরকে দান করে দেওয়া যাবে না । আরও বলা হয়েছে অন্য দাতা যা দান করেছেন তা পুনরায় ইচ্ছায় কিংবা অজ্ঞাতসারেও দেবেন না, কিংবা এক জনের ব্যবহৃত দ্রব্য অপরকে দান করবেন না । গ্রহীতাদের প্রতি অসম্মান ও অশ্রদ্ধায় নয় বরং সম্মান ও মর্যাদাসহ সহকারে যথোপযুক্ত সময়ে দান করবেন ।[১৯] যাতে অন্যকে 'দান' করতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে অসময়ে খাদ্য গ্রহণ করার মনোভাবও এই ব্রতানুসারে নিন্দিত হয়েছে ।

(২)

জৈন দর্শনে দান বিষয়টির আলোচনার পরিধিতে দাতা, গ্রহীতা এবং দানের বিষয় সুবিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রতিটি 'দান ক্রিয়ায়' 'দাতা', 'গ্রহীতা' এবং 'দানের বিষয়' এই তিনটি বিষয় অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ । তাই জৈন মতেও দান বিষয়ে আলোচনা সম্পর্কে উক্ত ত্রিবিধ বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে । জৈন মতানুসারে দান ক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় অনুসারী হলে দেখা যায় যে, এই দানক্রিয়া দ্বিমুখী এক সম্পর্ককে ভিত্তি করে পরিচালিত হয় এবং এই সম্বন্ধীদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য বিষয়েও নানা আলোচনা পরিলক্ষিত হয় । বলা যায় , সম্বন্ধীদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য এবং দানপদ্ধতির সাপেক্ষে দান ক্রিয়ার স্বরূপ এবং প্রকার নির্ধারিত হয় । এইবিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায়, অন্যান্য সকল ধর্মের মতো জৈন মতেও দান ক্রিয়ায় 'দাতা' ও 'গ্রহীতা' অন্যতম দুটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়েছে এবং সেই বিষয়ে বিশেষ কতকগুলি নিয়ম ও নীতিরও উল্লেখ হয়েছে । প্রাসঙ্গিকতার বিচারে আমরা প্রথমে দাতা সম্পর্কে জৈন মতের আলোচনা করবো ।

জৈন মতানুসারে দাতার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য :

সকল ধর্মানুসারেই দান হল পুণ্যফল জনক । তাই সকল ধর্মেই এই রূপ দান কর্ম উৎসাহিত হয়েছে । জৈন মতানুসারে অহিংস আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কৃত দান ক্রিয়ায় যেকোন উপায়েই নয় বরং প্রতিটি 'দান' ক্রিয়ার সময়েই দাতাকে নিম্নোক্ত সাতটি বিষয়ে অবশ্যই যত্নবান হতে হবে । যেমন -

---

১৯. *তত্ত্বার্থসূত্র,* ৭।৩৬

প্রথমত ঃ ঐহিকাফলানাপেক্ষ : দাতা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ মনোভাবে দান করবেন, বিনিময়ে কিছু লাভ করার আশায় নয় । দাতা তাঁর দানের বিনিময়ে গ্রহীতার কাছ থেকে বিনিময়ে কোন উপহার , পুরষ্কার কিংবা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ প্রকাশের বা প্রাপ্তি স্বীকারের প্রত্যাশা করবেন না । তিনি সম্পূর্ণতই নিঃস্বার্থ মনোভাবে দান করবেন ।

দ্বিতীয়তঃ ক্ষান্তি : দাতা প্রসন্নচিত্ত হয়ে দান করবেন ।

তৃতীয়তঃ মুদিতা : গ্রহীতাদের দান করার সময় দাতা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে খুশী মনে সন্তুষ্টির সঙ্গে দান করবেন ।

চতুর্থতঃ নিষ্কপটতা : কোনরকম বঞ্চনা বা ছলনা না করে দাতা যথেষ্ট সচেতনতা বা দায়িত্বের সঙ্গে দান করবেন । দান করার সময় দাতা গ্রহীতার প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করবেন ।

পঞ্চমতঃ অনসূয়াত্ব : দাতা ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ বা হিংসা মনোভাবাপন্ন হবেন না । দান কার্য সম্পাদনের পর দাতার মনে দান জন্য কোনরকম অসূয়া মনোভাব অর্থাৎ ঈর্ষা মনোভাব থাকবে না ।

ষষ্ঠতঃ অভিষলাদিত্ব : দান করার পর দাতা দান জন্য কোন রূপ দুঃখ বা অনুশোচনা করবেন না ।

সপ্তমতঃ নিরহঙ্কারিত্ব : দাতা নিরহঙ্কারী হয়ে দান করবেন । দান ক্রিয়ার শেষে দাতার মনে দান জন্য কোন অহঙ্কার থাকবে না ।

গ্রহীতা :

জৈন ধর্মানুসারে দান ব্যবস্থার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বা স্তম্ভ হল ‘গ্রহীতা’ । এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে জৈন মতে ‘দান’ ক্রিয়ার ক্ষেত্রে গ্রহীতাদের জন্য কোন বিশেষ বিধি বা নিয়মের উল্লেখ না থাকলেও যেকোন দান ব্যবস্থায় গ্রহীতা কেমন হবেন সেই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রহীতাদের ত্রিবিধ প্রকারের উল্লেখ পাওয়া যায় । দান ক্রিয়ার কার্যকারিতা কিংবা তার ফলের বিচার প্রসঙ্গে জৈন দর্শনে গ্রহীতা এবং তার স্বরূপের বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে । জৈন দর্শনানুসারে দান ব্যবস্থায় গ্রহীতাগণ ‘পাত্র’ নামে আখ্যাত হয়েছেন । ধর্মকর্মের অভ্যাস, ধর্মাচারণ, ব্রতাচারণ, ধর্মীয় কর্মের অনুশীলনের ভিত্তিতে জৈন মতে ‘পাত্র গণ’ ত্রিবিধ প্রকারে বিভক্ত হয়েছেন । যেমন - সুপাত্র , কুপাত্র এবং অপাত্র ।

সুপাত্র : যাঁরা সম্যক্ দৃষ্টি সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্র এই 'ত্রিরত্ন'সম্বন্ধে যথার্থ বিশ্বাস অনুমোদন করেন, তাতে আস্থা রাখেন এবং যথাযথরূপে নিজ ধর্মকর্মের অভ্যাস বা অনুশীলন করেন তাঁরাই দানক্ষেত্রে সুপাত্র বা উত্তম গ্রহীতা বলে অভিহিত হন । দান পরিসরে এইরূপ উত্তম গ্রহীতাগণ সর্বদা প্রশংসনীয় হন। যেকোন দান ক্রিয়ারই ক্ষেত্রে 'সুপাত্র' গ্রহীতাগণের স্থান সকলের উর্দ্ধে ।

কুপাত্র : যে সকল ব্যক্তি সম্যকরূপে ধর্ম - কর্ম ও ব্রতাচারণ সম্পন্ন করলেও সেই সকল ব্রতের প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাস ও আস্থা পোষণ করেন না , তাদের বলা হয় 'কুপাত্র' ।

অপাত্র : যাঁরা কোনও ভাবেই সম্যকরূপে ব্রতাচারণ করেন না কিংবা তাতে বিশ্বাস বা আস্থাও অনুমোদন করেন না এবং নিজেদের দৈনন্দিন আচরণকেও সংযত করেন না তাঁরা দান পরিসরে জৈন মতানুসারে 'অপাত্র' বলে আখ্যাত হয়েছেন ।

জৈন মতানুসারে উক্ত ত্রিবিধ প্রকার গ্রহীতাগণ যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম এবং জঘন্য এই ত্রিবিধ প্রকারেও উল্লিখিত হয়েছেন । এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে, জৈন মতানুসারে মূলতঃ ব্রত পালনের ভিন্নতার নিরিখেই এইরূপ ক্রমবিভাগের উল্লেখ করা হয়েছে । পূর্বোক্ত রূপ বিভাগের সঙ্গে যা প্রায় সমগোত্রীয় । যেমন -

উত্তম - যেসকল গ্রহীতা যথাযথরূপে মহাব্রত পালন করেন, তাঁরাই 'উত্তম গ্রহীতা' রূপেঅভিহিত হন ।

মধ্যম - যেসকল ব্যক্তিগণ শ্রাবক তাঁরাই জৈন ধর্মানুসারে মধ্যম গ্রহীতা ।

জঘন্য - যেসকল ব্যক্তিগণ যেকোন ব্রত রহিত তবে সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন তাঁরা হলেন এই 'জঘন্য' স্তরের গ্রহীতা ।

দাতাদের প্রতি জৈন ধর্মের বিশেষ নির্দেশ, গ্রহীতার প্রকার বিবেচনা করে দাতা 'দান ক্রিয়া' সম্পন্ন করবেন। 'দান' বিষয়ে জৈন ধর্মে গ্রহীতাদের যে প্রকার নির্দেশিত হয়েছে সে বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে উত্তম গ্রহীতা অর্থে কেবল মঠবাসী সন্ন্যাসী বা শ্রমণদের কথাই উল্লিখিত বা স্বীকৃত হয়েছে । কারণ উত্তম মানের গ্রহীতা হওয়ার জন্য যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে তা কেবল মঠবাসী সন্ন্যাসীগণের ক্ষেত্রেই সম্ভব । জৈন ধর্মানুসারে 'মহাব্রতের' (যা উত্তম মানের গ্রহীতা হওয়ার একমাত্র ও অন্যতম বৈশিষ্ট্য) পালন বা অনুসারী হন একমাত্র মঠবাসী শ্রমণগণ । দ্বিতীয়ত ঃ এইরূপ মধ্যম মানের গ্রাহক হওয়ার বৈশিষ্ট্য অনুসারে কেবল সংসারী বা গৃহীগণই এর অধিকারী হতে পারেন । কারণ জৈন ধর্মানুসারে কেবল সংসারী গৃহীগণই

‘শ্রাবক’ নামে অভিহিত হন । তৃতীয়তঃ এই স্তরের গ্রহীতা হতে পারেন কোন ধরণের ব্যক্তি ? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়ে জৈন ধর্ম স্বীকৃত মঠবাসী সন্ন্যাসী বা শ্রমণ ও সংসারী গৃহী বা শ্রাবক জৈন ধর্ম স্বীকৃত এই দুই শ্রেণীর মানুষ এবং তাঁদের কর্ত্তব্য কর্মের উল্লেখ আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে, উভয়কেই তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নিজ নিজ শ্রেণী অনুসারে যথাক্রমে ‘মহাব্রত’ এবং ‘সহজব্রত’ কিংবা ‘অণুব্রত’ আবশ্যিকভাবে পালন করতে হয় । উভয়ের কেউই ব্রতরহিত হয়ে জীবন যাপন করতে পারেন না । কিন্তু জঘন্য স্তরের এই প্রকার ‘ব্রতরহিত’ হয়ে থাকার বৈশিষ্ট্য যেন জৈন ধর্মের সমাজ ব্যবস্থায় পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর মানুষ ছাড়াও অপর কোন তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ থাকার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয় ।

দানের বিষয় :

দান ব্যবস্থার তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল ‘ দানের বিষয় ’ । ‘দানীয় বিষয়’ কেমন হবে এই প্রসঙ্গে জৈন মত আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে তা প্রায় এইপ্রসঙ্গে ভগবদগীতায় উক্ত মতের সদৃশ । কারণ জৈন ধর্মেও ভগবদগীতায় উক্ত মতের মতোই উপযোগিতা ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে স্থান, কাল ও পাত্রের বিবেচনা করেই ‘দানীয় বিষয়ের’ নির্বাচন ও নির্ধারণ করবেন এমন মত উল্লিখিত হয়েছে । যেমন - দাতাগণ দরিদ্র, অভুক্ত ও অসহায় ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে অন্ন, বস্ত্র ও খাদ্য দান করবেন । আবার মুনি ঋষি কিংবা মঠবাসী শ্রমণদের উদ্দেশ্যে তাঁদের জীবন যাপনের জন্য উপযোগী ও প্রয়োজনীয় বিষয়েরই দান করবেন । এই প্রসঙ্গে পদ্মনন্দিনী পঞ্চ বিংশতি অনুসারে বলা যায়, গরু, সোনা, ভূমি, রথ ইত্যাদি বিষয়গুলি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে প্রদান করা যাবে না । কারণ তাতে পাপ এবং অন্যায় কর্ম সম্পাদিত হয়। দানের বিষয় কেমন হবে এবিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে জৈন মতানুসারে বলা যায় , একজন দাতা কোন গ্রহীতাকে সেই বিষয়েরই দান করবেন যা তাঁর সর্বাধিক প্রয়োজন সাধন বা পূরণ করবে । বলা বাহুল্য যে, দানের বিষয় প্রসঙ্গে এইরূপ বক্তব্যের তাৎপর্য্য হল, দাতা কখনই গুণমানে এমন কোন বিষয়ের দান করবেন না, যা তার ব্যবহার যোগ্যতা কিংবা মূল্যমান হারিয়েছে । কারণ তাতে গ্রহীতা বা দাতা কেউই উপকৃত হবেন না । তাই এইরূপ দান যথার্থ অর্থে ‘দান’ নয় । এইরূপ যথার্থ বিষয়ের ‘দান ক্রিয়ায়’ গ্রহীতাও যথেষ্ট সম্মানিত হবেন । কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, যেসকল দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্যমান আছে তা দান করে দাতা যদি কোন দরিদ্র , অসহায় ব্যক্তিকে তার দুঃখময় অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারেন তবে কেন পদ্মনন্দিনী পঞ্চবিংশতিতে ব্যক্তিগতভাবে গরু, সোনা বিবিধ দ্রব্যের দান নিষেধ করা হল ? উত্তরে , জৈন দর্শন অনুসারে বলা যায়, যেহেতু কর্ম পুদ্গল বন্ধনের কারণে আত্মার বন্ধন হয় ।

তাই যাতে ঐসকল বিষয়জনিত বাসনা বা মোহ বন্ধনের কারণে আত্মার বদ্ধাবস্থা না হয়, সেই কারণেই উক্ত সকল বিষয়ের বা দ্রব্যের দানের নিষেধ করা হয়েছে বলে অনুমান করা যেতে পারে ।

দানের শর্তাবলী :

দান ব্যবস্থার অপর এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল 'দানের শর্তাবলী ' । এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে জৈন মতানুসারে বলা যায়, কার্যত যেসকল বিধি ও পদ্ধতিতে দান ক্রিয়া সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয় এবং তা ক্ষেত্রবিশেষে দাতার জন্য পুণ্যফলজনকও হয় তাই হল দানের জন্য শর্তাবলী । এই সকল শর্তাবলীর মধ্যে যেমন অর্ন্তভূক্ত হয়ে আছে দানক্ষেত্রে দাতার প্রযত্ন ও বৈশিষ্ট্য, দাতার মানের বিচার, তেমনি অন্তর্গত হয়ে আছে গ্রহীতার ব্যক্তিস্বভাব বা স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যও । দান ক্রিয়ার ক্ষেত্রে দাতা এবং গ্রহীতার এইরূপ স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যের ভেদে দানের অপর তিন প্রকার ভেদও জৈন মতানুসারে স্বীকৃত হয়েছে । যেমন - সাত্ত্বিক দান , রাজসিক দান বা রাজস দান এবং তামস দান বা তামসিক দান ।

সাত্ত্বিক দান : জৈন ধর্মানুসারে যখন দাতা দানক্ষেত্রে তাদের জন্য নির্দেশিত সাত প্রকার গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের যথাযথভাবে পালন পূর্ব্বক সুপাত্র গ্রহীতাকে দান করে তার দান কার্য সম্পাদন করেন তখন তা 'সাত্ত্বিক দান' বলে অভিহিত হয় । জৈন মতানুসারে এইরূপ দান কর্ম 'উত্তম মানের দান কর্ম' বলেও স্বীকৃত হয় । তাই এইরূপ দান কর্ম ফলজনকতার বিচারে সকলের শ্রেষ্ঠ । সেকারণেই এইরূপ দান - কর্মের সম্পাদন সবচেয়ে অধিক পরিমাণে উৎসাহিত হয়েছে ।

রাজস দান বা রাজসিক দান : আবেগ প্রবণ হয়ে কিংবা অপর সকলের তুলনায় নিজের সুনাম, অর্থ কিংবা যশ বা খ্যাতি ইত্যাদি প্রচারের উদ্দেশ্যে যে 'দান' করা হয় তাকে 'রাজস বা রাজসিক দান' বলা হয় । ধর্মীয় আদর্শ অনুসারে এইরূপ দানে দাতা নিজে সকল রকম কর্ম - পুদ্গল জাত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্মস্বরূপ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরিবর্তে বিষয় বা অর্থ তথা প্রতিপত্তি ইত্যাদির প্রতি অধিক পরিমাণ আসক্তি বশতঃ সেইগুলির প্রতি আরও বেশী করে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছেন এবং ফলস্বরূপ তিনি তার জীবনের চরম লক্ষ্য থেকে আরও দূরে সরে গিয়ে বিপথে চালিত হন । তাই প্রশ্ন হয়, জৈন দর্শনে স্বীকৃত বিষয় বন্ধনজনিত এইরূপ আদর্শ বিরোধী দানের উল্লেখের কারণ কী ? মুক্তির উদ্দেশ্যে আত্মতত্ত্ব লাভের জন্য এইরূপ দানের প্রয়োজনীয়তা কোথায় ? জৈনদর্শনে স্বীকৃত দৃষ্টিভঙ্গী উত্তরে বলা যায়, তা সম্ভবতঃ এই কারণে যে, এইরূপ

দানের মাধ্যমেও সমাজের অসহায় - দীন দরিদ্র মানুষগুলি তাদের প্রয়োজন ও চাহিদার নিবৃত্তিকরণ ঘটাতে পারেন। এইরূপ দান ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে সমাজ মূলতঃ ত্রিবিধ ভাবে উপকৃত হতে পারে; যেমন - প্রথমতঃ সরাসরি সমাজের অসহায় মানুষগুলো তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে সমর্থ হন, দ্বিতীয়তঃ এইরূপ প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে সমাজে উচ্চবিত্তদের প্রতি এইসকল মানুষগুলোর মনে কোনরূপ হিংসা বা অসূয়া মনোভাবের ক্ষেত্র তৈরী হয় না, ফলে শ্রেণী বৈষম্য নিয়ন্ত্রিত হতে পারে । তৃতীয়তঃ এইরূপ দান ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে সমাজে খানিক পরিমাণে হলেও অর্থনৈতিক ভারসাম্য সুরক্ষিত হয় । তাই মানের বিচারে এইরূপ দান জৈন মতানুসারে 'মধ্যম মানের' হলেও তা তাৎপর্য্যপূর্ণ বলেই উল্লিখিত হয় ।

তামস বা তামসিক দান : কোনরূপ মর্যাদা প্রদর্শন না করে অসম্মানের সঙ্গে নিজে না দিয়ে পরিবারের অপর কোন সদস্য দ্বারা কিংবা অন্য কোন ব্যক্তিকে দিয়ে বা ভৃত্যদের মাধ্যমে যে দান কার্য সম্পাদন করা হয় তা জৈন মতে 'তামস বা তামসিক দান' বলে উল্লিখিত হয়েছে । এইরূপ দান জৈন মতানুসারে 'জঘন্য মানের দান' বলেও অভিহিত হয় । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, দানের পূর্ববর্তী প্রকার দুটিতে গ্রহীতাগণের স্বরূপের বিচার তাৎপর্য্যপূর্ণ বলে উল্লেখ্য হলেও বর্তমান প্রকারটিতে ঐরূপ বিচারের কোন উল্লেখ জৈন মতানুসারে পরিলক্ষিত হয় না ।

দানের বিভিন্ন প্রকার :

শর্তের ভিত্তিতে দানের পুর্বল্লিখিত প্রকারগুলি ছাড়াও জৈন দর্শনে এই বিষয়ে 'চতুর্বিধ দানতত্ত্ব' বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে । এই 'চতুর্বিধ দানে' আহার দান , ঔষধি দান, অভয় দান এবং শাস্ত্র দান অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বলে নির্দেশিত হয়েছে । আবার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে প্রয়োগ তথা প্রদানের ভিত্তিতে জৈন মতে দানের উক্ত প্রকারগুলি ছাড়াও আরও কতকগুলি দান যেমন, অন্বয় দান, সাম দান, পাত্র দান এবং দয়া বা অনুকম্পা দান, জ্ঞান দান ইত্যাদিরও উল্লেখ হয়েছে ।

আহার দান :

অভুক্তকে খাদ্য দানই হল আহার দান । জীবন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে একজন ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন মতো আহারের দান করা জৈন মতে এক অন্যতম দান । এইবিষয়ে জৈন নির্দেশ হল কোন ব্যক্তি যখন তাঁর নিজের

প্রয়োজনে খাদ্য প্রস্তুত করবেন তখন তিনি অবশ্যই অন্যের জন্য কিছু পরিমাণ খাদ্য রেখে দিয়েই বাকী অংশ নিজের জন্য গ্রহণ করবেন । তাই কোন অভুক্ত ব্যক্তি কোন গৃহীর কাছে এসে খাবারের জন্য প্রার্থনা করলে প্রয়োজনে নিজে অভুক্ত থেকে হলেও তাকে তৎক্ষণাৎ আহার প্রদান করতে হবে সেই গৃহীকে; যাতে সেই যাচ্ঞাকারীর কোন কষ্ট না হয় । এমনটি হল জৈন ধর্মীয় অনুশাসন । এই অনুশাসন অনুসারে গৃহী তার এই প্রকার আহার দানের কর্ত্তব্য শ্রমণ ও শ্রাবক উভয়ের জন্যেই সমদায়িত্বে পালন করবেন । যদিও এইরূপ আহার দান কর্ত্তব্যরূপে বিশেষভাবে গৃহীদের জন্য নির্দেশিত হয়েছে তবে এমন নয় যে, এই দায়িত্ব শ্রমণের নয় । কারণ জৈন ধর্মীয় অনুশাসনে অভুক্তকে আহার দান করে তার জীবন রক্ষা করা দাতারূপে সকলের জন্যেই অন্যতম পরম কর্ত্তব্য । আবার গ্রহীতারূপে কোন শ্রাবক কীভাবে কোন শ্রাবক অথবা কোন শ্রমণের কাছ থেকে সেই আহার গ্রহণ করবেন তার জন্য কোন বিশেষ নির্দেশ না থাকলেও গ্রহীতারূপে শ্রমণদের জন্য এবিষয়ে বিশেষ কিছু নির্দেশ জৈন মতে পাওয়া যায় । যেমন সেখানে দেখা যায়, সাধারণভাবে শ্রমণেরা পুষ্টিবিধায়ক আহার্য - যা জীবন ধারণের সহায়ক হয়, তেমনি গ্রহণ করতেন। আবার এই প্রসঙ্গে দিগম্বর জৈন ও শেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু আচরণগত পার্থক্যের উল্লেখও হয়েছে । সেখানে দেখা যায়, দিগম্বর শ্রমণেরা গ্রহীতার কাছ থেকে সপ্তাহে একদিন ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে সেই স্থানেই তীর্থঙ্কর মহাবীরের মত দন্ডায়মান অবস্থায় আহার গ্রহণ করতেন । অন্যদিকে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের শ্রমণেরা কোন গৃহস্থের কাছ থেকে কোন বিশেষ পদ্ধতিতে নয় বরং সাধারণ পদ্ধতিতে প্রস্তুত আহার্যের ভিক্ষা গ্রহণ করে কোন মন্দির বা উপাসনাগৃহে গিয়ে সেই আহার গ্রহণ করতেন । ভিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে এই জাতীয় পার্থক্য দুই সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রথানুযায়ী মান্য আচার - আচরণের অনুসারী । কেন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আচার - আচরণগত এইরূপ ভিন্নতা এই বিষয়ে কোন গূঢ় ধর্মীয় বা ধর্মনৈতিক তাৎপর্য্য আছে কিনা তা স্পষ্ট নয় ।

ঔষধ দান :

দূর্বল অসহায় দরিদ্র অসুস্থ ব্যক্তিদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করতে হবে, তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় ওষুধের সরবরাহ করতে হবে, চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনে তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে এমনটিই হল জৈন মতানুসারে ঔষধ দান ব্যবস্থা ।

বিদ্যা দান বা শাস্ত্র দান :

জৈন ধর্মানুসারে 'বিদ্যা দান বা শাস্ত্র দান' ব্যবস্থার মাধ্যমে অশিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে হবে, নিরক্ষর ব্যক্তিদের স্বাক্ষর করে তুলতে হবে, কোন বিশেষ কারণে বা সমস্যার জন্য যেসকল ছাত্র - ছাত্রী স্কুল বা কলেজ যেতে অনাগ্রহী হয়েছে তাদের সকল সমস্যার সমাধান করে পুনরায় স্কুল ও কলেজে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে । পড়াশোনায় আগ্রহী হওয়ার জন্য ছাত্র - ছাত্রীদের মধ্যে মেধাভিত্তিক বৃত্তি ও পুরস্কার প্রদান করার প্রথা শুরু করতে হবে । অন্যদিকে যারা ধর্মীয় আচার - অনুশাসন সম্পর্কে অবগত নয় তাঁদেরকে ধর্মীয় গ্রন্থ প্রদান করতে হবে, উপযুক্ত ধর্মীয় উপদেশ দান করতে হবে, তাঁদের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় সভার আয়োজন করে তাঁদেরকে ধর্মীয় শাস্ত্র সম্পর্কে অবগত করতে হবে ।

অভয় দান :

নারী - পুরুষ, শিশু - কিশোর, বৃদ্ধ - বৃদ্ধা নির্বিশেষে যেকোন মানুষের যাবতীয় ভয় দূর করে তাদের জীবনকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত করাই হল 'অভয় দান' । এই 'অভয় দান' প্রকল্পে রাত্রিবেলায় পথ- ঘাট সুরক্ষিত করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ আলোর ব্যবস্থা করতে হবে, উপযুক্ত যোগ্যতার নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করতে হবে, পথযাত্রীদের বিশ্রাম ও খাবারের জন্য ধর্মশালার ব্যবস্থা করতে হবে, পাহাড় ও অরণ্যে বসবাসকারী সাধু - সন্ন্যাসীদের জন্য মঠ বা সংঘ বা আশ্রম নির্মাণ করতে হবে । জৈন মতানুসারে যেহেতু জীবনের মূল্যই সর্বাধিক তাই এই জীবনকে সুরক্ষিত করার জন্য অন্যান্য সকল দানের তুলনায় এই 'অভয় দান' হল শ্রেষ্ঠ দান । এই 'অভয় দান' সম্ভব হয়, ব্যক্তির অস্তিত্বে , তার ভাবনায়, বাক্যে এবং আচরণের মাধ্যমে । কোন দাতা যখন কোন ব্যক্তিকে (গ্রহীতাকে) তার প্রয়োজন অনুসারে তার অস্তিত্ব বা জীবন বা প্রাণ রক্ষার্থে আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক তাকে অভয় দেন, কিংবা বাক্যের মাধ্যমে অভয় দান করেন ; তখন সেই দান ক্রিয়ার মূল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জৈন ধর্মে স্বীকৃত হয় ।

অন্বয় দান :

জৈন ধর্মানুসারে এইরূপ দান প্রচলিত অর্থে স্বরূপগত ভাবে সেই অর্থে 'দান' রূপে প্রসিদ্ধ নয় । এই ক্রিয়ায় মূলতঃ কোন এক পরিবারে 'অর্থ' কিংবা 'সম্পদ বা সম্পত্তির' হস্তান্তরকরণ করা হয় । প্রশ্ন হয়, এইধরণের

ক্রিয়া জৈন মতে দান বলে স্বীকৃত হওয়ার কারণ কী ? কারণ স্বাভাবিক নিয়মে উত্তরাধিকারীরূপে কোন পরিবারে উত্তরসূরী পারিবারিক সম্পত্তির অধিকারী হবেন , তাদের নামে সম্পত্তির মালিকানা সুনিশ্চিত করা হবে ; এই নিয়মই তো স্বাভাবিক । সেক্ষেত্রে এই ক্রিয়াকে দানের একটি প্রকার বলে উল্লেখ করার প্রাসঙ্গিকতা কোথায় ? উত্তর প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রথমতঃ অন্যান্য দানক্ষেত্রের মত এখানেও স্বত্বাধিকারের হস্তান্তরকরণ হয় । দ্বিতীয়ত ঃ সম্পত্তির হস্তান্তরকরণ যে কেবলই উত্তরাধিকার প্রকল্পেই করা হয় এমন নয় বরং অনেক সময়েই দেখা যায়, পরিচিত কিংবা অপিরিচিত কোন অসহায় ব্যক্তিকে তার অসহায় অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্যেও কোন কোন মুক্তমনা দাতা অনায়াসেই নিজের সম্পত্তির মালিকানা ঐ ব্যক্তির নামে হস্তান্তর করেন । এইরূপে প্রথমক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীসূত্রে হস্তান্তরকরণে দাতা নিজের অর্জিত সম্পত্তি অন্য ব্যক্তির নামে লিপিবদ্ধ করছেন এও যেমন এক প্রকার দান তেমনি দ্বিতীয়ক্ষেত্রের হস্তান্তরকরণ, যেখানে দাতারূপে কোন ব্যক্তির লক্ষ্যই হল কোন অসহায়ের সহায় হওয়া, যা জৈন ধর্মীয় অনুশাসনে প্রতিটি ব্যক্তির জন্যেই অন্যতম কর্ত্তব্য বলে নির্দেশিত হয়েছে। এইরূপে দাতার কর্ত্তব্য সাধকরূপে জৈন দর্শন অনুসারে অন্বয় দানও দানের একটি প্রকার বলে উল্লিখিত হয়েছে বলে বলা যেতে পারে ।

সাম দান :

জৈন ধর্মানুসারে এই দান ক্রিয়াও মূলতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক কোন 'দান' ব্যবস্থা নয় বরং এটি কোন অনুষ্ঠানে অথবা কোন উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে সমষ্টিগতভাবে বহুজনের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে কৃত দান ক্রিয়া । জৈন ধর্মাদর্শে এইধরণের দানের উদ্দেশ্য হল সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক পরিমাণ হিতসাধন করা । সেই উদ্দেশ্যে উক্তরূপ 'দান ক্রিয়া'য় একজন দাতা গ্রহীতাগণকে তাঁদের প্রয়োজন অনুসারে খাদ্য, বস্ত্রসহ বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় ইত্যাদির প্রদান করেন ।

অনুকম্পা দান :

জৈন ধর্মানুসারে 'দান' বিষয়ে দাতাদের প্রতি গ্রহীতার প্রকার বিচার করার যে নির্দেশ হয়েছে তার একটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রের উল্লেখও হয়েছে । যেমন - 'দয়া বা অনুকম্পা দান' ।[২০] দরিদ্র, অসহায়, ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদেরকে

---

২০. *তত্ত্বার্থসূত্র,* ৬।১২

তাদের প্রয়োজন অনুসারে আবেগবশতঃ খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, ঔষধ ইত্যাদির যে দান তাই অনুকম্পা দান। এক্ষেত্রে দানের জন্য সুপাত্র নির্ধারণের বিষয়টিকে কম গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এইরূপ দান ক্ষেত্রে গ্রহীতার প্রকার বিবেচনা করা দাতার জন্য আবশ্যিক নয়। বরং এক্ষেত্রে উত্তম, মধ্যম ও জঘন্য এই ত্রিস্তরে গ্রহীতার বিচার না করে তাদের স্বরূপ বা স্বভাবগত এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিচার স্বীকার্য্য। এই প্রসঙ্গে জৈন ধর্মের স্পষ্ট নির্দেশ বিশৃঙ্খল, পাপী, নিষ্ঠুর, মদ্যপ এবং মাংস ভক্ষণকারী কোন ব্যক্তিকে এইরূপ 'দয়া দান' করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, এইরূপ 'দান ক্ষেত্রে' ত্রিস্তর ভেদে গ্রহীতার প্রকার বিবেচনা করার পরিবর্তে ব্যক্তি চরিত্রের স্বরূপ - বৈশিষ্ট্য এবং নৈতিকতাবোধের যে বিচার অবশ্যরূপে জৈনধর্মে স্বীকৃত হওয়ায় একথা বোঝা যায় যে, এই বিশেষ দানক্ষেত্রে জৈন ধর্মে মানবিকতার দাবী স্বীকৃতি পেলেও সামাজিক শৃঙ্খলা ও ব্যক্তি চরিত্রের পক্ষে হানিকারক কোন অন্যায় কর্মকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। লক্ষ্যনীয় যে, এইরূপ দয়া বা অনুকম্পা দানের মধ্যে দিয়েও জৈন দর্শনে ব্যক্তি চরিত্রকে সুদৃঢ়রূপে গঠন করার এবং সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করার এক অদম্য প্রচেষ্টা পাওয়া যায়।

জ্ঞান দান :

জ্ঞান দান প্রসঙ্গে মূলতঃ 'ধর্মোপদেশ দান' - এর কথাই উল্লিখিত হয়েছে। জৈন মতানুসারে কোন ব্যক্তি যদি অপরের প্রয়োজনে তার উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক এমন ধর্মীয় দিক দর্শন করেন কিংবা তার জন্য প্রয়োজনীয় ও যথাযথ ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করেন; তা 'জ্ঞান দান' এর অন্তর্গত হয়। এইরূপ 'দান' - এর মাধ্যমে একজন গ্রহীতার যেমন ধর্মীয় চাহিদার পূরণ হয় ; তেমনি উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে দাতাদেরও ধর্মীয় চর্চার অনুশীলন হয় যা তাদের উভয়কেই অধিকতর উচ্চ স্তরের ধর্মীয় মানে উন্নীত করে।

দানের পদ্ধতি :

জৈন মতানুসারে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদাসহ গ্রহীতাকে 'দান' করতে হবে। এবিষয়ে জৈন মতে সাতটি বিধিরও উল্লেখ হয়েছে। যেমন -

প্রথমতঃ প্রতিগ্রহ বিচার করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ গ্রহীতাদের উচ্চাসন প্রদান করতে হবে।

তৃতীয়তঃ তাদের পা ধুইয়ে দিতে হবে ।

চতুর্থতঃ তাদের যথাযথ সম্মান জ্ঞাপন করতে হবে ।

পঞ্চমতঃ দান গ্রহণ করার জন্য তাদের স্বাগত জানাতে হবে ।

ষষ্ঠতঃ ত্রিবিধ উপায়ে তাদের শুদ্ধিকরণ করতে হবে ।

সপ্তমতঃ শুদ্ধিকরণে তাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে ।

তবে প্রয়োজন অনুসারে যখন 'দয়া দান' করতে হবে তখন তার ভিত্তি হবে সম্পূর্ণতই দয়া জন্য মনোভাব এবং অন্যান্য দুর্বিনীত, দাম্ভিক, উদ্ধত অসংযমী আচরণকারীদের উদ্দেশ্যে রাখতে হবে স্থিরতা ও ধৈর্য্য ।[২১]

দানের উদ্দেশ্য :

একজন অপরের প্রয়োজনে সাহায্য করবেন, তাকে তার অসহায় অবস্থা থেকে মুক্ত করবেন । এইভাবে একের প্রয়োজনে অন্যের বিষয় বা সম্পত্তি কিংবা অর্থের যে প্রদান তাই 'দান ব্যবস্থা'; অর্থাৎ দানের মূল উদ্দেশ্যই হল অসহায় ব্যক্তির সহায়তা করা । তবে এই মূল উদ্দেশ্য ছাড়াও জৈন মতানুসারে দানের আরও কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্যও আছে । জৈন ধর্মানুসারে যে উদ্দেশ্যগুলি মোট চারটি প্রকারে বিন্যস্ত হয়েছে । যেমন -

প্রথমতঃ দানজন্য দাতার পাপ কর্মফলের বিনাশ হয় । একজন দাতা তিনি তাঁর অতীতে কৃত পাপকর্ম ফল এই প্রকার 'দান' কর্মের দ্বারা বিনষ্ট করতে পারেন । তাই দাতা এইরূপ কর্ম সাধনে উৎসাহিত হবেন ।

দ্বিতীয়ত ঃ দাতার কাছে যা উদ্বৃত্ত তা যদি অপরের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায় তাতে দাতা, গ্রহীতা উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হয় । কারণ দাতা দান করে যেমন সুকর্মের সম্পাদন করেন তেমনি তাতে গ্রহীতার উপকার সাধিত হয় । উভয়ের এইরূপ মঙ্গলে সমাজেরও সার্বিক উন্নতিকরণ হয় ।

তৃতীয়ত ঃ জৈন ধর্মানুসারে আহার, ঔষধি, অভয় এবং শাস্ত্র বা বিদ্যা দান করার জন্য যে বিভিন্ন কর্মশালা

---

২১. *তত্ত্বার্থসূত্র*, ৭।১১

যেমন -অন্ন ছত্রালয়, ঔষধালয়, বিশ্রামাগার এবং ধর্মশালা বা বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপন করা নির্দেশিত হয়েছে তাতে সমাজের মানুষ থেকে শুরু করে অন্যান্য পশু- পাখি সকলেরই নানাভাবে উপকার সাধিত হতে পারে।

চতুর্থতঃ জৈন ধর্মানুসারে এইরূপ দান ব্যবস্থায় পশু-পক্ষীসহ অনাগারী শ্রমণ ও আগারী শ্রাবক সকলেরই মঙ্গল সাধিত হয় । একের দানে অপরের প্রয়োজনের পূরণ হয় ফলে সকলেই উপকৃত হন । এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, দানলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত অন্নছত্রালয়, বিশ্রামাগার, ঔষধালয় এবং বিদ্যালয় প্রভৃতিতে যথাক্রমে বিনামূল্যে আহার গ্রহণ করার, আশ্রয় পাওয়ার, চিকিৎসা এবং শিক্ষালাভ করার যে ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়েছে তাতে যেমন সরাসরি গ্রহীতাদের চাহিদার পূরণ হয় তেমনি এইসকল স্থানে বহু মানুষের কর্ম সংস্থানেরও সুযোগ হয়, তারা জীবন যাপনে এইসকল স্থানে জীবিকা গ্রহণ করে অর্থ উপার্জন করতে সমর্থ হন । সার্বিক কল্যাণকল্পে আর্থ - সামাজিক পরিকাঠামোয় জৈন দর্শনে স্বীকৃত দান ব্যবস্থার এইরূপ উদ্দেশ্য অন্যতমরূপে গুরুত্বপূর্ণ ।

দানের ফল :

জৈন মতে ব্যক্তির ধর্মীয় অনুশাসনের অন্যতম অঙ্গরূপে ‘দান হল পুণ্যফলজনক’ । দরিদ্র অসহায় ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে সম্পাদিত দান দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই উপকার সাধন করে । কারণ দান জন্য গ্রহীতাগণ যেমন তাদের প্রয়োজন ও চাহিদার পূরণ করতে পারেন তেমনি দাতাগণ এই দানের ফল স্বরূপ ধর্মীয়ভাবে উপকৃত হন । জৈন ধর্মানুসারে দৈনন্দিন জীবন যাপনের প্রয়োজনে ব্যক্তিদের অনিচ্ছাকৃতভাবেই এমন সব কর্ম সম্পাদন করতে হয় যা তাদের জীবনে মন্দ কর্মফলের সূচনা করে । তাদের ধর্মীয় মানের অবনমন ঘটায় । উক্ত সকল ক্ষেত্রেই ‘দান’ ক্রিয়া মন্দ কর্মফলের নিবৃত্তিকরণ করে । এইভাবে ‘দানক্রিয়া’র নিরিখে অর্থ, ধন- সম্পত্তি তথা কৃত কর্মের যেন একরকম শুদ্ধিকরণের কথা জৈন মতে স্বীকৃত হয়েছে । তাই বলা হয়, সামর্থ্য অনুসারে প্রতিদিন স্বল্প পরিমাণে হলেও দান করা উচিৎ। কারণ দান ব্যতীত সর্ব্বত্যাগী একজন দিগম্বর মুনি যেমন মুক্তি লাভ করতে পারেন না ঠিক তেমনি একজন সাধারণ গৃহী বা সংসারীও এই জগৎ সংসারে কর্মজনিত বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন না । কিন্তু এমন নয় যে, জৈন মতে কেবল ‘দান ক্রিয়া’ দ্বারাই এই মুক্তি সম্ভব । [২২] তবে তা অপরাপর কর্মের মধ্যে অন্যতমরূপে তাৎপর্য্যপূর্ণ । দান জন্য ফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ‘সুপাত্র’

---

২২. *তত্ত্বার্থসূত্র*, ১০।৩

গ্রহীতাদের উদ্দেশ্যে দানই জৈন মতানুসারে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং কুপাত্র ও অপাত্রের প্রতি দান নিষিদ্ধ হয়েছে। জৈন মতানুসারে দান কীভাবে বা কীরূপে সম্পন্ন হয়েছে তার ভিত্তিতে দাতা এবং গ্রহীতার কর্মফল নির্ধারিত হয়। দান বিষয়ে জৈনদর্শনের এইরূপ মতের প্রেক্ষিতে 'সুপাত্র দান' সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন হতে পারে, যেমন- যেখানে দান বিষয়ে দাতার কর্ত্তব্য কর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জৈন মতে বলা হয়েছে দাতাগণ যেন বিনিময়ে কোন ফলের আশা না করেই নিজ নিজ দান কর্মের সম্পাদন করেন। তাহলে জৈনমতানুসারে কেন 'সুপাত্র দান' অধিক উৎসাহিত হয়েছে ? কারণ জৈনধর্মানুসারে 'সুপাত্র দান' - এর মধ্যে অধিক পুণ্যফলজনকতার ধারণার অন্তর্ভূক্তি আছে। দ্বিতীয়তঃ জৈন ধর্মানুসারে কর্ম পুদ্গলজনিত বন্ধনে আবদ্ধ হয়েই ব্যক্তিগণ বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন, তাদের আত্ম - স্বরূপের উপলব্ধি ঘটে না। এই পুদ্গলের বন্ধন ছিন্ন হলে তবেই ব্যক্তির মুক্তি হয়। তাই মুক্তির জন্য কর্ম পুদ্গল বন্ধনের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন কাম্য কর্মের প্রতিরোধ। মোক্ষ বা মুক্তি প্রসঙ্গে জৈন ধর্মানুসারে এইরূপ মতেরই নির্দেশ পাওয়া যায়। তাই প্রশ্ন হতে পারে, মোক্ষ বা মুক্তি লক্ষ্যে জৈন ধর্মানুসারে 'সুপাত্র দান' - এর প্রতি এইরূপ অধিক উৎসাহিত মনোভাবের কারণ কী ? কারণ 'সুপাত্র দান' জন্য যে ফল লাভ হয় তার সবটুকুই যে কর্ম - জনিত বন্ধন মুক্তির সহায়ক হয় এমন নয়। শুধু তাই নয়, 'সুপাত্র'কে দান করলে সেই দান জন্য ফল যে অধিকতর সমৃদ্ধ হবে এমন ভাবনাও যে অপরাপর পরবর্তী ক্ষেত্রগুলিতে সকাম কর্ম করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করবেনা তার নিশ্চয়তা কোথায় ? আর তা যদি সত্যি হয় তবে তো এইরূপ মনোভাবজনিত দানকর্মে পুনরায় সেই কর্ম - পুদ্গল জনিত বন্ধনের ক্ষেত্র তৈরি হবে এবং তার ফলস্বরূপ মানুষ বদ্ধাদশা প্রাপ্ত হবেন। এইরূপে জৈন ধর্মে স্বীকৃত মোক্ষ বা মুক্তি তত্ত্বের সঙ্গে তাদের 'দান তত্ত্বের' এক আপাত বিরোধী অবস্থান পরিলক্ষিত হয়।

জৈন দান তত্ত্বের সামাজিক প্রেক্ষাপটে দার্শনিক বিশ্লেষণ :

সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের লক্ষ্যে জৈনধর্মে 'দান তত্ত্ব' যেরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে তাতে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একথা বলা যেতেই পারে যে, এই দান তত্ত্বের উদ্দেশ্যই হল উচ্চতর আদর্শে সমাজের উন্নীতকরণ। যদিও সেক্ষেত্রে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রশ্ন হতে পারে, তবে কি সকল ব্যক্তিই দান করার সময় দাতারূপে কেবলই সমাজের কল্যাণ বা মঙ্গল সাধনকেই নিজেদের লক্ষ্যরূপে স্থির করবেন ? কিংবা সকল দানক্ষেত্রেই কি দাতার উদ্দেশ্য হবে কেবলই সমাজের মঙ্গল সাধন করা ? এই বিষয়ে জৈন মতের অনুসন্ধান করতে গেলে

দেখা যায় যে, তত্ত্বার্থসূত্রে স্পষ্টতই নির্দেশিত হয়েছে, দাতাগণ নিজেদের ফললাভের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারেই ‘দান’ করবেন । ‘দান তত্ত্বের আলোচনায় জৈন মতে যেভাবে সমাজের কল্যাণ সাধনকে মূখ্য লক্ষ্যরূপে ধার্য্য করে অহিংস আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্রতী হওয়ার কথা বলা হয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয় হলেও জৈন তত্ত্বার্থসূত্রের এইরূপ মন্তব্য যেন দানের ফল সম্পর্কিত মতের সঙ্গে বিরোধিতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে । শুধু তাই নয়, দানের উপযোগিতা প্রসঙ্গে দেখা যায় যেভাবে জৈন মতানুসারে ‘সুপাত্র দান’ অধিক উৎসাহিত হয়েছে কিন্তু ‘কুপাত্র দান’ নিন্দিত হয়েছে এবং ‘জঘন্য দান’ একেবারেই অসমর্থনীয় বলে নির্দেশিত হয়েছে তাতে যেন ‘অনুকম্পা দান বা দয়া দান’ - এর প্রসঙ্গটির উপযোগিতা উপেক্ষিত হয়েছে বলেই মনে হয় । বিশ্লেষণমূলক আলোচনার ভিত্তিতে জৈন দর্শনে স্বীকৃত ‘দান তত্ত্বে’ গ্রহীতা বা পাত্র বিষয়ে সুপাত্র, কুপাত্র এবং অপাত্র নামক যে তিন প্রকার বিভেদ উল্লিখিত হয়েছে তার মূলে আছে জৈন ধর্ম তথা ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিদের বিশ্বাস তথা তার অনুশীলনের মাত্রাগত বিভেদ । দানের পাত্র নির্ধারণের এইরূপ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রশ্ন হতে পারে তবে কি জৈন ধর্মে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট ধর্মানুসারী ব্যক্তিদের জন্যেই ‘দান কর্ম’ স্বীকৃত বা নির্দেশিত হয়েছে? উত্তর নঞর্থক হলে, তবে সেক্ষেত্রে অপরাপর ধর্মের অনুসারীগণ কেন জৈন ধর্মের অনুশাসন অনুশীলন করবেন, এই প্রশ্ন পুনরায় হবে, যার উত্তর জৈন ধর্মের গ্রন্থগুলিতে অধরাই থেকে গেছে। বিপরীতে উত্তর সদর্থক হলে অর্থাৎ যদি একথা স্বীকার করা হয় যে, জৈন ধর্মে ঐরূপ পাত্র ব্যবস্থায় কেবল সংশ্লিষ্ট ধর্মানুসারী ব্যক্তিদের জন্যেই ‘দান’ প্রসিদ্ধ হয়েছে । তাহলে বলতে হবে যে, ‘দয়া দান বা অনুকম্পা দান বা করুণা দান’ ব্যতিরেকে অপরাপর ধর্মের অনুসারীগণের জন্য জৈন ধর্মে অন্যান্য কোন দান স্বীকৃত না হওয়ায় ‘দান’ বিষয়ে জৈন তত্ত্বে ধর্মীয় সংকীর্ণতা প্রশ্রয় পেয়েছে । পাশাপাশি ‘সুপাত্র দান’ বিষয়ে জৈন ধর্মের অধিক উৎসাহ প্রদান ঐরূপ সংকীর্ণ মনস্কতাকে যেন সম্পসারিত করেছে । যদিও জৈন দর্শনে উল্লিখিত দান তত্ত্বের ক্ষেত্রবিশেষে এইসকল সীমাবদ্ধতা থাকলেও সমাজে অহিংস আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় সদাচার এর নির্দেশ করে তার অনুশীলন ও অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় । এইরূপ উদ্যোগ যে কেবল সমাজের হিংসার মনোভাবকে দূর করে এমন নয় বরং ধনী - দরিদ্রমূলক শ্রেণীগত অবস্থানেরও বিভেদরেখা মলিন করে সমাজের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর বিন্যাসকেও যে সুদৃঢ় করে সেকথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে দার্শনিক বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে যেকথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য তা হল , জৈন দান তত্ত্বে কর্ম - উপযোগবাদ ও নীতি - উপযোগবাদ উভয়েরই অবস্থান ও প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় । যখন বলা হয়, সেই দানই সর্বাধিক উপযোগী যা ঐ নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় । বলা বাহুল্য, দানের উপযোগিতা সম্পর্কে জৈন ধর্মের এইরূপ মন্তব্য কর্ম - উপযোগবাদেরই সমর্থন করে । আবার দানক্ষেত্রে পাত্র নির্ধারণের যে বৈশিষ্ট্যগত প্রভেদ এবং দাতার কর্ত্তব্য কর্ম বা নিয়ম - বিধির উল্লেখ হয়েছে যার মাধ্যমে উত্তম, মধ্যম এবং জঘন্য রূপে দানের মান

নির্ধারিত হয় তা যেন নীতি - উপযোগবাদের সঙ্গে অভিন্নতা সূচনা করে । এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে, অহিংস আদর্শ প্রচারের জন্য অপরিগ্রহ ব্রত পালন পূর্ব্বক সমাজে চতুর্বিধ দান তত্ত্বের উল্লেখ করে তার প্রচার ও প্রয়োগে জৈন ধর্মের অনুসারীদের যে কর্মশালা গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তাও প্রশংসনীয় । সেখানে দেখা যায়, চতুর্বিধ দান মধ্যে 'আহার দান' প্রয়োগের জন্য ব্যক্তিগত দান ব্যতিরেকে জৈন ধর্মে 'অন্ন - ছত্রালয়' স্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেখানে সকল আর্ত - দূঃখী অসহায় ক্ষুধার্ত শরণার্থীগণ বিনামূল্যে কিংবা একেবারেই স্বল্পমূল্যে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় আহার গ্রহণ করতে পারবেন । একইরকম ভাবে ঔষধ দানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দান ব্যতিরেকে বিভিন্ন স্থানে 'ঔষধালয়' স্থাপন করা হয়, যেখান থেকে সকল দরিদ্র , অসহায় ও অসুস্থ মানুষ বিনামূল্যে তাদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করাতে পারেন। 'বিদ্যাদানে'র জন্যেও ব্যক্তিগত দান ব্যতিরেকে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষালয় স্থাপন করার নির্দেশ করা হয়েছে যেখানে দরিদ্র ছাত্র - ছাত্রীরা বিনামূল্যে তাদের বিদ্যা আহরণ করতে পারেন, ধর্মানুসারীগণ বিভিন্ন ধর্মীয় সভা থেকে ধর্ম - বিষয়ে শাস্ত্র জ্ঞান লাভ করতে পারেন এবং শেষতঃ 'অভয় দান' এর জন্য মানুষের জন্য যেমন বিভিন্ন বিশ্রামাগার স্থাপনের নির্দেশ করা হয়েছে তেমনি মানুষ ব্যতীত অপরাপর পশু - পাখিকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপদ থেকে পরিত্রান করে তাদের প্রাণ রক্ষা করার জন্য নানারকম পশুরালয় - পাখিরালয় নির্মাণেরও নির্দেশ করা হয়েছে । এইরূপ কর্মের মাধ্যমে যে কেবল মানুষ ও পশু-পাখির উপকার সাধিত হয় এমন নয় বরং তা প্রাকৃতিক উপযোগিতাও সূচিত করে । বাস্তুসংস্থানের বিভিন্ন প্রাণিদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা প্রদান করে জীব বৈচিত্র্যকে অক্ষুন্ন রাখে । বলা বাহুল্য যে, অহিংস আদর্শ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে জৈন ধর্মের এইরূপ ধর্মীয় সদাচারের নির্দেশ ও তার প্রয়োগ নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্য্যপূর্ণ । তবে দার্শনিক বিশ্লেষণের প্রেক্ষিত থেকে বিচার করতে গেলে দেখা যায় যে, ধর্মীয় সদাচারের অনুশীলনের ভিত্তিতে দানের যেরূপ পাত্র ভেদ জৈন দর্শনে উল্লিখিত হয়েছে তাতে কর্ম এবং নীতি উভয় প্রকার উপযোগবাদেরই মূল বক্তব্য উপেক্ষিত হয়েছে । কিংবা বলা যায় যে সংশ্লিষ্ট 'দান তত্ত্বে' যেভাবে সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের দিকটির উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে তাতে সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণ মূলক দিকটি গুরুত্ব হারিয়েছে । এই প্রসঙ্গে দার্শনিক দৃষ্টিকোণের প্রেক্ষিত থেকে যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়, জৈন ধর্মে দাতাগণকে দান করার পূর্বে যে সাতটি বৈশিষ্ট্য অবশ্য পালন করার কথা বলা হয়েছে, যার ভিত্তিতে দানের মান নির্ধারণ হয় সেখানে কি কেবলই দাতার ভূমিকাই একমাত্র প্রধান ? নাকি 'দান' বিষয়টির মান নির্ধারণে 'দানের পাত্র বা গ্রহীতাদের ভূমিকাও স্বীকার্য্য । অর্থাৎ প্রকৃত দাতা কে ? যিনি 'সাতটি বৈশিষ্ট্য' পালন পূর্ব্বক যথার্থ পাত্রগণকে দান করে উত্তম মানের দান ক্রিয়া সম্পাদন করলেন সেই দাতা নাকি 'সাতটি বৈশিষ্ট্য' পালন পূর্ব্বক যথার্থ দাতার দান গ্রহণ করে উত্তম মানের দান ক্রিয়া সম্পাদন করার জন্য সম্মতি দিলেন সেই গ্রহীতা?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে জৈন মত অনুসারে আপাতত একথা বলা যেতে পারে যে, দানের উদ্দেশ্য ও ফল নির্ণয়ে গ্রহীতা বা পাত্রদের ভূমিকা অন্যতমরূপে স্বীকার্য্য হলেও প্রকৃত দাতা কে ? - এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে ভবিষ্যতে জৈন মতের আরও বিস্তৃত দার্শনিক আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ অবশ্য প্রয়োজনীয় ।

তথ্যসূত্র :

- Acharya Umasvami, Jain Vijay.K (Eddited By) 2011 , *TATTVARTHSUTRA,* Published by - Vikalp Printers , Dehradun , India.

- Agarwal Sanjay, First Edition : Delhi , 2010 , *DAAN AND OTHER GIVING TRADITIONS IN INDIA THE FORGOTTEN POT OF GOLD ,* Published by - Account Aid TM India , 55 - B , Pocket C, Siddharth Extension, New Delhi - 110014, India.

- Dixit K .K. (Translated by), First Edition : August ,1974 Second Edition : April, 2000 *,PT. SUKHLASLJIS'S COMMENTARY ON TATTVARTHA SUTRA OF VACARA UMASVATI* , Published By – L D. Institute of Indology , Ahmedabad

- Jain Veenus (Dr.), Published-27/05/2016. *"Abhay Dana : Analysis of dana for protection from Fear",SCOPE INTERNATIONAL SCIENCE, HUMANITIES, MANAGEMENT AND TECHNOLOGY,* Prof. Amity Institute of Social sciences, Amity University, Noida, Uttar Pradesh, India .

- Jeffery D Long, First South Asian Edition 2010 , *JAINISM AN INTRODUCTION,* Published by – I.B Tauris & Co Ltd 6 Salem Road, London W2 4BU 175 Fifth Avenue, New York NY 10010 ,

- Shah . J. Nagin (Translated By), First Edition , 1998, *JAINA PHILOSOPHY AND RELIGION , ENGLISH 'TRANSLATION OF"JAINA DARSANA''* by – Muni Shri Nyayavijayaji , Motilal Banarasidas Publishers private Limited, Bhogilal Lehar Chand Institute of Indology & Mahattara Sadhvi Shree Mrigavatiji Foundation Delhi .

- Shah. Nathubhai , *JAINISM, THE WORLD OF CONQUERORS, VOLUME – 1,* Motilal Banarasidass Publishers Private Limited, 41 UA Bungalow Road, Jawahar Nagar, Delhi 110007 ,

- Shastry Pt.Phoolchandra Siddhant (Editor), *SARVARTHASIDDHI OF PUJYAPAD THE COMENTRY ON ACHARYA GRIDDHAPICCHA'S TATTWARTHA SUTRA,* 1955, Bharatiya Jnanapitha, Kashi .

চতুর্থ অধ্যায় : ত্রিপিটকের ভিত্তিতে বৌদ্ধদানতত্ত্বের পর্যালোচনা

ভারতীয় ধর্মনীতির পরিসরে ব্রাহ্মণ্য এবং শ্রমণ এই দুই ঐতিহ্যের ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে হিন্দু ও অপরদিকে বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে সাধারণতঃ একটি বিভেদ রেখা টানা হয় । সাধারণভাবে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য চর্তুবর্ণ তত্ত্বের সমর্থক রূপে পরিচিত হয়েছে । প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য বর্ণতত্ত্ব সমর্থিত বিভাজন নীতির উৎপত্তি কেবল জন্মের দ্বারা কিংবা কেবল কর্মের দ্বারা, নাকি জন্ম ও কর্ম উভয়ের দ্বারাই নির্ণীত হয়েছে এই বিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে । অন্যদিকে শ্রমণ ঐতিহ্য অনুসারী সমাজব্যবস্থায় শ্রমণ ও গৃহপতি বা গৃহপত্নী এই দুই শ্রেণীর অবস্থানের ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থায় শ্রেণীবিন্যাসগত ভেদ স্বীকার করা হয়েছে । এখন এই শ্রমণ পরম্পরা কোথা থেকে এল কিংবা কীভাবে এলো এই বিষয়ে নানা প্রশ্ন ও তার উত্তর থাকলেও সেই সকল উত্তরের মধ্যে কোনও ঐকমত্য নেই । বুদ্ধদেবের রাজ - ঐশ্বর্য্য ও বিলাসবহুল জীবন যাত্রা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে সংসার ত্যাগী সত্যান্বেষী সন্ন্যাসীতে রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, সেই সময়ের সমাজ ব্যবস্থায় এই জাতীয় নৈতিক মূল্যের যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা ছিল ।

শ্রমণ পরম্পরার দুটি বিশাল ধারা ভারতীয় ধর্মনীতির পরিসরে দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়েছে - বৌদ্ধ এবং জৈন । এই দুই ধর্মেরই প্রতিষ্ঠাতা যেমন মহাত্মা বুদ্ধ এবং ভগবান মহাবীর , দুজনেই শ্রমণ ছিলেন এবং তীর্থ তথা ধর্মচক্রের প্রবর্ত্তকরূপে দুঃখময় জগতের বন্ধন থেকে পরিত্রাণের সাধনায় রত ছিলেন । মহাবীর কঠোর তপশ্চর্যা ও ধ্যানের মধ্যে দিয়ে দুঃখমুক্তির সাধনায় কেবলী হয়েছেন । অন্যদিকে বুদ্ধদেবের ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায় যে, ছয় বৎসরব্যাপী কঠোর তপশ্চর্যার মধ্যে দিয়েও মুক্তি লাভ করতে না পারায় পরে গভীর ধ্যানের দ্বারা দুঃখ আছে , দুঃখ সমুদয় আছে , দুঃখের নিরোধ সম্ভব এবং দুঃখ নিরোধের মার্গ বা উপায় আছে এইরূপ চতুরার্য সত্য উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে তিনি সম্বোধি লাভ করেন । কাজেই একথা বলাই বাহুল্য যে, বৌদ্ধ এবং জৈন উভয় দর্শনেই আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতা যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে । এই বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন ও নীতিতত্ত্বের প্রবর্ত্তক বুদ্ধদেবের আদর্শিত মূলপথের অনুসরণ প্রায় তিন হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ভূমির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, বরং পৃথিবীর নানা দেশে দেশে তার ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে । তাই বৌদ্ধ ধর্মনীতি বলতে কোন একবার মাত্র ঘটা কিংবা একেবারে সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধদেবের একক মতামত , যার পরিবর্ধন নেই - এমন নিশ্চল ও নিষ্পন্ন নৈতিক আদর্শকে বোঝায় না । বরং বুদ্ধদেবের পরবর্তী দার্শনিক অনুসারীগণের মধ্যে তাঁর নির্দেশিত নৈতিক আদর্শের ও তাঁর পরবর্তী দার্শনিক অনুসারীগণের

মধ্যে এর ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে এই ধর্মনীতির নিরলস ধারাবাহিকতা, অবিরাম অনুবৃত্তি ও ধারণাভিত্তিক পারম্পর্য্য এই ধর্মনীতিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে ।

বুদ্ধদেবের দর্শন বলতে বুদ্ধদেবের দ্বারা রচিত কোন শাস্ত্রগ্রন্থ বোঝায় না । বুদ্ধদেবের ধর্মবিষয়ক মত ও উপদেশাবলী যা পালি ভাষায় বা কারোর মতানুযায়ী মাগধী প্রাকৃত ভাষায় মৌখিক ভাবে প্রদত্ত হয়েছিল সেই উপদেশাবলীগুলিকে সংকলিত করার প্রয়োজনে তাঁর অনুগামী শিষ্যেরা বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির আয়োজন করেন । এই সঙ্গীতিগুলিতে বুদ্ধের বাণীগুলি সংকলিত করে যে বৌদ্ধশাস্ত্র প্রস্তুত হয় , তার নাম দেওয়া হয় ত্রিপিটক। এই ত্রিপিটকের তিনটি ভাগ হলো সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম পিটক । ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণরূপে তা বৌদ্ধ সাহিত্য নামেও অভিহিত হয়েছে । যা তার ব্যাপকতা ও পরিধিতে সুবিস্তৃত ও সুবিশাল । এইরূপ সুবিস্তৃত ও সুবিশাল পরিসরের বৌদ্ধসাহিত্যে দান বিষয়ক আলোচনা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে, যা আমার বর্তমান নিবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় । এই নিবন্ধে আমি মূলতঃ ত্রিপিটকের কিছু গ্রন্থ সূত্র এবং এর বিভিন্ন শ্রেণী বা 'নিকায়' ধরে 'দান' বিষয়ক আলোচনায় বুদ্ধ মতের অনুসরণ করতে প্রচেষ্টা করেছি । আমি এবিষয়ে দীঘ নিকায়, সংযুত্ত নিকায়, খুদ্দক নিকায় এবং এর কিছু সহায়ক ও আনুষঙ্গিক গ্রন্থ যেমন, ধম্মপদ, সুত্তনিপাত, অবদান সাহিত্য, জাতককথা, থেরোগাথা, মিলিন্দপ্রশ্ন প্রভৃতি গ্রন্থসহ বৌদ্ধ মত সম্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত বুদ্ধ মতের আলোচনার অনুসরণ করেছি ।

বৌদ্ধদর্শনে দানের গুরুত্ব :

বৌদ্ধ দর্শনানুসারে 'দান' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় , বৌদ্ধ দর্শনে নির্বাণ সাধনার প্রারম্ভিক অঙ্গরূপেই দান - এর উল্লেখ করা হয়েছে । 'দান' শব্দটির অর্থ হল সকল স্বত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক দানীয় বস্তু প্রদান করার সচেতন ইচ্ছা । কোন ব্যক্তির নিজের উপার্জিত বা প্রাপ্ত পার্থিব সম্পদ স্থাবর কিংবা অস্থাবর - সম্পত্তির প্রতি সচেতনভাবে নিজের যাবতীয় স্বত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর কোন ব্যক্তি কিংবা কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে প্রদান করাই হল দান । বৌদ্ধ দর্শনে 'দান' - এর ধারণা আলোচনা কালে দেখা যায় যে, এখানে 'দান' এর অর্থ আরও বিস্তৃতি ও গভীরতা পেয়েছে । বৌদ্ধ দর্শনে যে দশ প্রকার কুশল কর্মের নিদান দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হল 'দান' ।[১] 'দান ধম্ম' সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধর্মের নানাবিধ উপদেশ

১. *বৌদ্ধ দর্শনে সত্য দর্শন* , পৃষ্ঠা - ১১২

অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় দুটি প্রধান শ্রেণীর অবস্থান ছিল ; যেমন - প্রথমতঃ সাধারণ সংসারী বা গৃহী এবং দ্বিতীয়তঃ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুগণ । ধর্ম সংক্রান্ত সমগ্র বিধি ব্যবস্থা সমাজে মূলতঃ এই দুই শ্রেণীকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হত । এছাড়া অপর কোন তৃতীয় শ্রেণীর অবস্থান উক্ত বিধি ব্যবস্থার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না । বৌদ্ধ দর্শনের ধর্মীয় অনুশাসনের প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় উক্ত দুই প্রধান শ্রেণীর মানুষ সংসারী বা গৃহীগণ এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুগণ ধর্মীয় এবং জাগতিক বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের তাগিদে একে অপরের উপর নির্ভরশীল ছিলেন । উল্লেখ্য যে, এই দুই শ্রেণীর মানুষের পারস্পরিক প্রয়োজনীয়তা কিংবা চাহিদা এবং তাদের পূরণকে কেন্দ্র করেই বৌদ্ধ দর্শনে সমগ্র দান তত্ত্বের আলোচনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এই তত্ত্বের প্রাথমিক পর্ব থেকেই মূল লক্ষ্য ছিল উভয় ক্ষেত্রেই নীতি কর্তব্য বোধ বিষয়ে সচেতন করার মধ্যে দিয়ে এই সকল মানুষকে তাদের নির্দিষ্ট নির্বাণের পথে পরিচালিত করা ও সেই দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করা । তাই একথা বলা যেতে পারে, নির্বাণ লাভের বিষয়টিকে মূল লক্ষ্যরূপে রেখেই বৌদ্ধ দর্শনে 'দান তত্ত্ব' উপস্থাপিত হয়েছে । বৌদ্ধ দর্শনানুসারে দানের ধারণার সাথে ঔদার্য ও বদান্যতার ধারণা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত । ধম্মপদে বলা হয়েছে , 'কদরিয়ং দানেন জিনে ' [২] অর্থাৎ কৃপণকে দানের দ্বারা জয় করবে । বুদ্ধদেব বিশ্বাস করতেন যে , দাতার ঔদার্য কৃপণের সঙ্কীর্ণতাকে পরাভূত করতে পারে ।

বৌদ্ধ দর্শনে উন্নত ও শুদ্ধ মানব চিত্তের ভিত্তি হল পুণ্যচর্যা । লোভ, দোষ ও মোহ অকুশল অর্থাৎ মন্দ কর্মের উৎস ; অলোভ, অদোষ এবং অমোহ কুশল কর্মের উৎস । দান ধর্ম বলে স্বীকৃত ধর্ম সেই অর্থে কর্মেরই নামান্তর । ধম্মপদে স্পষ্টতঃ বলা হয়েছে, 'ধম্মম্ সুচরিতম্' অর্থাৎ 'দানধম্ম' যথাযথরূপে আচরণ করা উচিৎ। ধর্ম যিনি সুষ্ঠুভাবে আচরণ করেন তিনি ধর্মাচারী এইভাবে আখ্যাত হন । কিন্তু যিনি ধর্মের যথাযথ আচরণ করেন না, তিনি 'ধম্মম্ দুচ্চরিতম্' [৩] । ধর্মাচারী ইহলোকে এবং পরলোকে সুখী হন । তবে দান এক্ষেত্রে অন্যতম আবশ্যিক শর্ত হলেও একমাত্র নয় যা সব কায়িক, চেতসিক ও বাক্যীয় অশুদ্ধতা দূর করতে পারে । কারণ 'দান' অতিরিক্ত অন্যান্য 'শীল' ও 'ভাবনা'রও বৌদ্ধদর্শনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদত্ত হয়েছে । 'দান প্রক্রিয়া' সব সময়েই দ্বিপাক্ষিক, কেবল দাতার প্রেক্ষিত থেকে দানের তাৎপর্য বোঝা যায় না ; এখানে গ্রহীতার ভূমিকা নিতান্ত অনুল্লেখনীয় বা উদাসীন নয় । উল্লিখিত হয়েছে যে, দান গ্রহীতা ভিক্ষার পাত্র হাতে নিয়ে এক গৃহ থেকে আরেক গৃহে ভিক্ষার সন্ধানে যাবে, কেবল তেমন গৃহে ভিক্ষার জন্য যাবে না যেখান থেকে

---

২. *ধম্মপদ , ক্রোধবর্গ* সূত্র ২২৩
৩. *ধম্মপদ , লোকবর্গ* , সূত্র ১৬৮

ভিক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়েছে। অনুমান করা হয় এই ভিক্ষা গ্রহণবৃত্তি বুদ্ধ পূর্ববর্তী কালেও প্রচলিত ছিল। এই ভিক্ষা পাত্র হতে নিয়ে ভিক্ষা সংগ্রহার্থে এক গৃহ থেকে অন্য গৃহে ঘুরে বেড়ানো এক গুরুত্বপূর্ণ প্রথা ছিল। ধ্যান অভ্যাসের চাইতে এই অভ্যাস কোন ভাবেই নিম্নস্তরীয় বা অহেতুক ছিল না। অনুমান করা যায়, ভিক্ষাগ্রহণকারী ভিক্ষুককে যাবতীয় অহংবোধ ত্যাগ করে প্রতিনিয়ত নিজের সাথে কঠিন লড়াই করতে হবে তবে নিজেকে ঐ অবস্থানে অবস্থিত করা যাবে এই মনোভাবে দীক্ষিত হতে হত। এই বৃত্তি অনুসরণ করা কখনই অনায়াস এবং সহজ নয়। যার আত্মসম্মান বোধ আছে, আত্মশ্লাঘা আছে কিংবা আভিজাত্যের অহমিকা আছে তার পক্ষে এই সকল মনোভাব ত্যাগ করে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা গ্রহণে যাওয়ার অভ্যাস আয়ত্ত করা রীতিমত নৈতিক সমৃদ্ধির পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং বুদ্ধদেবের জীবন তার ধর্মতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ উদাহরণ। সিদ্ধার্থের রাজবংশে জন্ম, প্রচুর ধন সম্পদময় জীবন যাত্রা, কিন্তু সেই নাম যশ মর্যাদা ও আভিজাত্য ত্যাগ করে কেবল জঠোরজ্বালা নিবারণের প্রয়োজনেই কী তিনি ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন? ভিক্ষাবৃত্তি বহু সময়ে কর্মবিমুখতার লক্ষণ বলে নিন্দিত হয়, আত্মমর্যাদাহীনতা এবং অসম্মানজনক বৃত্তি রূপে নিন্দার যোগ্য বলেও বিবেচিত হয়। কর্ম বিমুখতার লক্ষ্যে নয় বরং নির্বাণের আদর্শে এই ভিক্ষাবৃত্তির প্রয়োজনীয় ভূমিকা বৌদ্ধ দর্শনে স্বীকৃত হয়েছিল। বুদ্ধদেবের শিষ্যদের মধ্যেও দেবদত্ত, নন্দা, আনন্দ প্রমুখ অভিজাত বংশ থেকে এসেছিলেন। শারিপুত্ত মোগ্গল্লান, মহাকাশ্যপ প্রমুখ বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশ থেকে এসেছিলেন। তারা সকলেই দুঃখ- জরা - ব্যাধিময় ভবচক্র থেকে পুনর্জন্মের ফাঁদে বদ্ধ না থেকে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টায় বুদ্ধদেবের শরণ গ্রহণ করেছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্মনীতির প্রেক্ষিতে ভিক্ষাবৃত্তির গূঢ় নৈতিক তাৎপর্য্য ছিল। এই প্রসঙ্গে 'দান ধম্ম' এবং 'ধম্ম দান' এর নির্দেশ উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ ধর্মানুসারে দান ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংসারী - গৃহীগণ যেমন ভিক্ষু বা শ্রমণ তথা সন্ন্যাসীদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন তেমনি বৌদ্ধ ভিক্ষু বা শ্রমণগণ নিজেদের বস্তু সম্পর্কিত জাগতিক প্রয়োজন সাধনের জন্য সংসারী বা গৃহী ব্যক্তিদের যথাকর্ত্তব্য অনুসারে 'দান ক্রিয়া' সম্পাদনের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। কারণ সর্ব্বত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষু বা শ্রমণ তাঁদের পালনীয় কর্ত্তব্য কর্মের সম্পাদনের মাধ্যমেই যেমন ধর্মীয় বিধিসমূহের প্রতিষ্ঠা করবেন তেমনি তারা সেই সব ধর্মীয় নির্দেশ অর্হৎকামী সকল সংসারী বা গৃহীগণ যাতে সদাচারে পালন করেন সেই বিষয়ে তাদের উৎসাহ প্রদান করবেন এবং তাদের দিকদর্শন করাবেন এমনটাই ছিল ধর্মীয় নির্দেশ। তাই ধর্মীয় স্বার্থেই তাঁদের অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীগণের জীবন ধারণ একান্ত প্রয়োজন আর তার জন্য প্রয়োজন তাদের জাগতিক চাহিদার পূরণ। কারণ, জীবন ধারণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান কিংবা শারীরিক অসুস্থতা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ ইত্যাদির চাহিদা না মিটলে ভিক্ষু

বা সন্ন্যাসীগণকে সাধারণ জৈবিক কারণে তাঁদের কর্ত্তব্য পালনে অমনোযোগী করে তুলতে পারে । তাতে তাদের ধর্ম কর্ম সাধনা ব্যাহত হতে পারে । তাই গৌতম বুদ্ধের নির্দেশ, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা যাতে একনিষ্ঠতার সঙ্গে তাদের নিজেদের যাবতীয় পালনীয় ধর্ম কর্ত্তব্যের থেকে বিচ্যুত না হয়ে পড়েন সে বিষয়ে গৃহীগণকেই দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে । তাই সংসারী গৃহীগণ 'দান ক্রিয়া'র দ্বারা বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীগণের নানাবিধ জাগতিক চাহিদার পূরণ করবেন । বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণদের উদ্দেশ্যে গৃহীগণের এই দান অনিচ্ছাকৃত দায়ভারে সম্পন্ন কোন দান নয় বরং এই দানকে হতে হবে স্বতোপ্রণোদিত 'দান'; যথেষ্ট নিয়ম নিষ্ঠা সহকারে যা গৃহীগণকে সম্পন্ন করতে হবে । এইরূপ দান ব্যবস্থাই বৌদ্ধ ধর্মানুসারে 'দান ধম্ম' বলে উল্লিখিত হয়েছে । আবার বিপরীতে সংসারী গৃহীগণের ধর্মীয় চাহিদা পূরণের জন্য তাদের নির্বাণের পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীগণ গৃহীগণকে যে ধর্মোপদেশ দান করেন , তা বৌদ্ধ ধর্মানুসারে 'ধম্ম দান' নামে অভিহিত হয়েছে । দানের আদর্শের মধ্যে দিয়ে সমাজের এই দুই শ্রেণীর মধ্যে অর্থাৎ বৌদ্ধ শ্রমণ এবং গৃহস্থের পারস্পরিক এক অপূর্ব নির্ভরতার চিত্র ফুটে উঠেছে । এই সম্পর্ক শ্রমণ ও গৃহস্থের মধ্যে পারস্পরিক অন্যোন্যজীবিতার সম্পর্ক ব্যক্ত করেছে । এই সম্পর্ক এক গতিশীল সম্পর্ক যা সমাজের দুটি ভিন্ন স্তরীয় জীবন প্রণালীকে পরস্পর নির্ভরতার মধ্যে দিয়ে এক অভিন্ন সুষ্ঠু জীবন ধারায় মেলাতে পেরেছে ।

বুদ্ধদেবের জীবনে দানের ভূমিকা :

বুদ্ধদেবের জীবনে দানের ভূমিকা আলোচনায় বুদ্ধদেবের জীবনীর কিছু অংশ অবশ্যই স্মরণীয় । ঐতিহাসিক বুদ্ধ যে সস্নেহে লালিত পালিত এক ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন তা বোঝা যায় বুদ্ধ জীবনী সংক্রান্ত নানা কাহিনী থেকে । সেখান থেকে আরও জানা যায় যে, তাঁর পিতা - মাতা, সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করে সত্যের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে যদি ভিক্ষুর জীবন গ্রহণ করেন এই আশংকায় সব সময়েই উৎকণ্ঠিত থাকতেন । গৃহত্যাগ করে সিদ্ধার্থ মগধের রাজধানী রাজগৃহে গেলে সেখানকার রাজা বিম্বিসার বিত্ত বৈভবের দ্বারা রাজগৃহেই বসবাসের অনুরোধ করেন । কিন্তু বিত্তবৈভব যিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন তার কাছে এই সবের কোন মূল্যই থাকতে পারে না । রাজগৃহ থেকে ঋষি অরাড়মুনির আশ্রমে তার ব্রহ্মচর্যাদি সাধন পদ্ধতি ও ধ্যান পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন । [৪] সুত্তপিটকের পালি গ্রন্থ মঝ্‌ঝিমনিকায় গ্রন্থেও সিদ্ধার্থের কঠোর তপশ্চর্যার বিবরণ পাওয়া যায় । সেখান থেকে জানা যায়, তিনি দিনে একবার কিংবা দু'দিনে কিংবা সাতদিনে একবার আহার

৪. অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্যের দ্বাদশ অধ্যায়ে বুদ্ধজীবন পরিবেশিত হয়েছে এবং মঝ্‌ঝিম্ নিকায় এর অন্তর্গত অরিয় পরিবেসন সূত্তে বুদ্ধের নিজের কথা পাওয়া যায় - '*ভারতের ধর্মসাধনা ও গৌতম বুদ্ধ', ধম্মপদ, পৃ* : ৭২-৭৩ ।

গ্রহণ করতেন , অথবা বনে - জঙ্গলের শিকড় -বাকড় ভোজন করে অথবা কোন বৃক্ষ থেকে স্বয়ংচ্যুত ফল ভক্ষন করে মাটিতে কন্টক শয্যায় শয়ন করতেন । তিনি মোটা শনের দড়ি থেকে তৈরী বস্ত্র বা ঘাসের কিংবা গাছের বাকলের বস্ত্র পরিধান করে জীবন যাপন করতেন । কিন্তু এত কঠিন জীবন কাটিয়েও অরাড়ের মতাদর্শে তার পথের সন্ধান না পেয়ে উদ্রক রামপুত্র নামক মুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন । কিন্তু উদ্রক প্রদর্শিত সাধনার পথও তার বাঞ্ছিত লক্ষ্য লাভে সহায়ক হবে না জেনে সেই সাধন মার্গ গ্রহণ করলেন না । এর পর বুদ্ধ গয়ার কাছে তিনি দীর্ঘ ছয় বছর ধরে কঠোর তপস্যায় রত হলেন । কথিত আছে যে , তিনি প্রথমে একটি তিল, বদরী বা তন্ডুল আহার করতেন কিন্তু পরে তাও ত্যাগ করে অনশন ব্রতধারী হয়েছিলেন । অনেকে মনে করেন যে, সেই সময়ে আজীবক নামে এক শ্রমণ সম্প্রদায় কর্তৃক প্রবর্তিত কঠোর তপস্যার পথ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ললিতবিস্তর গ্রন্থেও তাঁর সুকঠোর তপস্যার বিবরণ পাওয়া যায় । সিদ্ধার্থ উপলব্ধি করলেন কঠোর তপস্যার দ্বারা শরীরকে ক্লিষ্ট ও দুর্বল করে অভীষ্ট সম্বোধি লাভ সম্ভব নয় । তখন তিনি শরীর রক্ষার্থে আহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন এবং ভিক্ষার জন্য গ্রামের দিকে যাত্রা করতে উদ্যত হলেন । কথিত আছে যে , সুজাতা নামে এক নারী তাঁকে এই সময় পায়েসান্ন প্রস্তুত করে নিবেদন করেন । নৈরঞ্জনা নদীতে অবগাহন করে ঐ পায়েসান্ন গ্রহণ করে সিদ্ধার্থ সুস্থ হন । বুদ্ধদেবের এই অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করা যায় কেন ভিক্ষুকে গৃহস্থের দান করা উচিৎ বলে তিনি উল্লেখ করেছেন । দান বিষয়ে গৃহস্থের ভূমিকা যে অন্যতমরূপে গুরুত্বপূর্ণ তা বৌদ্ধদর্শনে বহু উল্লিখিত হয়েছে । এই বিষয়ে ব্যাঘাপহ্য সূত্রে উল্লিখিত বুদ্ধদেবের উপদেশ অবশ্য আলোচ্য।

ব্যাঘাপহ্য সূত্র :

অংগুত্তরনিকায়ের ব্যাঘাপহ্য সূত্রে গৃহস্থগণের উদ্দেশ্যে বুদ্ধ নির্দেশিত উপদেশ বাক্যগুলির আলোচনা থেকে জানা যায় যে, ভগবান বুদ্ধ সকল ধনী গৃহস্থগণকে তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের রীতি তথা পদ্ধতি কী হবে সেই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছিলেন । জগতের উন্নতি ক্রমে ভগবান বুদ্ধ গৃহস্থগণের উদ্দেশ্যে উপদেশ প্রদান করে বলেছিলেন তারা কি উপায়ে নিজেদের স্বাস্থ্য, সম্পদ, অর্থ ইত্যাদি রক্ষা করতে পারে এবং সর্বোপরি কোন উপায়ে সমাজে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, এইরূপ সামাজিক কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির নিজের জীবনেরও ধর্মীয় মানের যাতে উন্নয়ন ঘটে তার জন্য ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস, সততা, উদারতা এবং প্রজ্ঞা অন্ততঃপক্ষে এই চারটি গুণ যে আবশ্যিক তা উল্লেখ করেছিলেন । বুদ্ধমতানুসারে ব্যক্তির এই সকল আবশ্যিক গুণ তার মধ্যে যেমন উচ্চমানের মূল্যবোধ গঠন করবে তেমনি তাকে সমাজের

কল্যাণমূলক কাজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হতেও সাহায্য করবে । উল্লেখ্য জাগতিক কল্যাণের লক্ষ্যেও বুদ্ধদেব কতকগুলি উপদেশ প্রদান করেছিলেন, তারও উল্লেখ হয়েছে এই ব্যাঘাপহ্য সূত্রে। বুদ্ধদেব ব্যক্তির জাগতিক বিষয়ের উন্নতির জন্য উত্থান - সম্পদ, অরক্ষ- সম্পদ, কল্যাণমিত্রতা এবং সম-জীবিকতা এই মোট চার প্রকার শর্তের উল্লেখ করেছেন । এই চার প্রকার শর্তের মধ্যে তৃতীয় প্রকার শর্ত ব্যতীত অন্যান্য শর্তগুলিতে বিশেষভাবে দান বিষয়ে কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না ; তৃতীয় প্রকার শর্ত অর্থাৎ 'কল্যাণমিত্রতা'য় দান বিষয়ে বুদ্ধদেবের স্পষ্ট নির্দেশ আছে । কারণ বুদ্ধমতানুসারে এই শর্ত অনুযায়ী ব্যক্তি নিজের এবং সর্বোপরি তার সমাজের কল্যাণের জন্য নিজেদের বিভিন্ন রকম সমাজ কল্যাণ - মূলক কর্মে ব্যাপৃত রাখবেন । যাতে প্রত্যেকের মধ্যেই উচ্চমানের মূল্যবোধ গঠিত হতে পারে, তাই তারা পরস্পর পরস্পরকে সম্মান করবেন, বিশ্বাস করবেন, একে অপরের সঙ্গে নৈতিক আচরণ করবেন , তারা দান করবেন এবং অবশ্যই প্রজ্ঞা সম্পন্ন হবেন । এইরূপে জাগতিক কল্যাণসহ ব্যক্তির ধর্মীয় মানের উন্নতির জন্যেও বুদ্ধদেব একইভাবে চারটি শর্তের উল্লেখ করেছিলেন । যেমন - শদ্ধা - সম্পদ, শীল - সম্পদ, কাগা- সম্পদ এবং পন্না - সম্পদ । এক্ষেত্রেও উল্লিখিত অন্যান্য শর্তগুলির মধ্যে থেকে 'কাগা সম্পদে' বুদ্ধদেব স্পষ্টভাবে দান সম্বন্ধে ব্যক্তিকে অসহায় ও আর্তদের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতে নির্দেশ করেছেন । বুদ্ধদেবের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল তিনি তাদের প্রয়োজনে অন্ন, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা কিংবা ঔষধ জাতীয় যা কিছু প্রয়োজনীয় তা সবই উদার হস্তে বিতরণ করবেন ও এইরূপে নিত্য দান কর্মে তিনি অভ্যস্ত হবেন ।

এইরূপে পরবর্তীকালেও সংকলিত বুদ্ধবচনসহ অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকেও বুদ্ধ যে দানের প্রশংসা করতেন সেই বিষয়ে অবগত হওয়া যায় । বুদ্ধ জাতক কাহিনী বিষহ্যজাতকে বুদ্ধের পূর্বজন্মের এক কাহিনী বিবৃত হয়েছে, যেখানে তিনি এক বৈভবশালী শ্রেষ্ঠী ছিলেন । সেই শ্রেষ্ঠীরূপে তিনি পঞ্চশীলবান ছিলেন ও গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে দানব্রত পালন করতেন । দানব্রত পালনে তিনি সদাই তৎপর থাকতেন । তার নগরে চর্তুদ্বার , নগরের মধ্যভাগ এবং নিজের বাসগৃহ এই ছয় স্থানে দানশালা নির্মাণ করে তিনি দানে প্রবৃত্ত হতেন । প্রশ্ন হল , কেন বুদ্ধদেব এইরূপ দানে প্রবৃত্ত হতেন ? কেনই বা দানব্রত বুদ্ধদেবের কাছে এত প্রশংসনীয় বলে বিবেচিত হয়েছিল? ঐ জাতক কাহিনীর বিবরণ অনুসারে জানা যায়, দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক বুদ্ধের দানের উদ্দেশ্য কী এইরূপ জিজ্ঞাসিত হয়ে বুদ্ধ উত্তরে জানিয়েছিলেন যে, 'সর্বজ্ঞতা লাভের জন্য দান করি '।[৫] বিষহ্যজাতকেরই

৫. *বিষহ্যজাতক* , (৩৮০), ঈষাণচন্দ্র ঘোষের বাংলা ভাষান্তর , ৩য় খণ্ড , পৃ - ৭৭ - ৯ ; গৃহীত হয়েছে *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম* , স্বামী বিদ্যারণ্য, পৃ : ৫৬৪ ।

অপর আরেকটি কাহিনীতে দেখা যায় , সাতজন প্রত্যেক বুদ্ধ [৬] রাজার দান গ্রহণ করে রাজাকে নানাবিধ উপদেশ দেন । সাতজন প্রত্যেক বুদ্ধের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন , তিনি রাজাকে 'অপ্রমত্ত হউন'[৭] বলে উপদেশ দেন । অন্যান্য প্রত্যেক বুদ্ধ রাজাকে মহানির্বাণের মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তাকে অপ্রমত্ত হতে উপদেশ করেন । সুতরাং দানক্রিয়া প্রজ্ঞালাভের সহায়ক এবং প্রজ্ঞা দ্বারা নির্বাণ লাভ করা যায় । তাই দানের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি নির্বাণ লাভ করা না গেলেও পরোক্ষভাবে দান নির্বাণলাভের পথ সুগম করতে পারে ।

বৌদ্ধ অবদান সাহিত্যে প্রথম সৎকর্ম 'দান' বিষয়ক আলোচনা সম্বন্ধে বোধিসত্ত্বের পূর্ব্ব জীবন বিষয়ক বিভিন্ন অবদানের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন- 'বিশ্বন্তরাবদান', 'শিবিসুভাষিতাবদান', 'ব্যাঘ্রী -অবদান' 'শশকাবদান' ইত্যাদি । উক্ত প্রতিটি অবদানই হল বুদ্ধদেবের পূর্ব জীবনের নানা গল্প, যার প্রতিটিতেই দান এর উল্লেখ ও তাৎপর্য্য পরিলক্ষিত হয় । এই অবদান সাহিত্যে বিভিন্ন রকমের দানের যে সমস্ত কাহিনী বিবৃত হয়েছে সেই সমস্ত কাহিনীর কষ্টকল্পিত অতিরঞ্জন বর্ত্তমান যুগের কোন মাপকাঠির দ্বারাই গ্রাহ্য হতে পারে না । অবদান সাহিত্যের অতিকথামূলক কয়েকটা কাহিনীর বর্ণনার মধ্যে দিয়ে এখানে নতুন কোন দার্শনিকতত্ত্ব নয় বরং এটাই দেখাতে চাই যে, দানের গুরুত্ব বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করানোর জন্য বৌদ্ধ দর্শনে কতরকম ভাবে চেষ্টা করা হয়েছে । দান সম্পর্কিত এই সব অতিকথা বৌদ্ধ ধর্মনীতিতে দানের প্রাসঙ্গিকতা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবে । 'বিশ্বন্তরাবদানে' বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দানধর্মের উপদেশ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব রাজা সঞ্জয়ের পুত্র দাতা বিশ্বন্তরের দানের কথা বর্ণনা করে শুনিয়েছিলেন । কুমার বিশ্বন্তর ব্রাহ্মণ দেবদত্তকে তাঁদের রাজ্যের জয়শীল ও সবচেয়ে উপযোগী শত্রুদমনকারী রথটি অনায়াসে দান করেছিলেন । তাঁর এইরূপ দানে রাজ্যবাসী সহ তাঁর পিতা সঞ্জয় রাজ্যের পরবর্তী অবস্থা কী হবে এই বিষয়ে চিন্তিত ও ব্যথিত হলেও এই দান জন্য দাতা বিশ্বন্তরের মনে কোন অনুশোচনা ছিলনা । শুধু তাই নয়, বিদগ্ধ বিশ্বন্তর তাঁর রাজ্যের মঙ্গলস্বরূপ রথরত্ন ও গজরত্ন যাচ্ঞাকারী ব্রাহ্মণদের প্রদান করেছিলেন । এই শোকে বিহ্বল রাজা সঞ্জয় বিশ্বন্তরকে তাঁর রাজ্য থেকে বিতারিত করেছিলেন । কিন্তু তাতেও দাতা বিশ্বন্তরের দান করার ব্যাকুলতার নিবৃত্তি ঘটেনি। বনে গিয়েও

---

৬. নির্বাণ লাভের মার্গে যারা অর্হতের তুলনায় উচ্চতর স্থানে অবস্থান করেন এবং তুলনায় উচ্চ জ্ঞানধর্মের পদবীতে আরূঢ় হয়েছেন তারাই হলেন প্রত্যেক বুদ্ধ । নিজ নিজ সাধনা ও পুণ্যগুণে দিব্যজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হলেও এঁরা জনকল্যাণে জনগনের মধ্যে সেই জ্ঞান বিতরণে অক্ষম । তবে নির্বাণের মার্গে এঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের সাধনায় স্বমহিমায় বিরাজ করেন ।
বৌদ্ধধর্মের রুপান্তর ও বিকৃতি , *বৌদ্ধধর্ম* , পৃষ্ঠা - ১১১

৭. *বিষহ্যজাতক* , (৩৮০), ঈষাণচন্দ্র ঘোষের বাংলা ভাষান্তর , ৩য় খণ্ড , পৃ - ৭৭ - ৯ ; গৃহীত হয়েছে *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম* ,স্বামী বিদ্যারণ্য , পৃ : ৫৬৪ ।

ব্রাহ্মণরূপে ছদ্মবেশ ধারণকারী দেবরাজ ইন্দ্রকে তাঁর পরিচর্যার কাজে নিজের দুই বালক পুত্রদের দান করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দাতা বিশ্বন্তরের এইরূপ 'দান' এর স্বরূপের প্রশংসা করে বলেছিলেন- 'দানই মনুষ্যগণের শ্বভ্রপাতে আলম্বনস্বরূপ । দানই ঘোর অন্ধকার মধ্যে চিরস্থায়ী আলোকস্বরূপ । দুঃসহ দুঃসময়ে দানই আশ্বাসকারী । দানই পরলোকে একমাত্র বন্ধু।'[৮] দান সম্পর্কে বুদ্ধের এই ধরণের নির্দেশ দাতাদের যেমন পরবর্তী দান কর্মে উৎসাহিত করেছিল তেমন অতি দানও যে ক্ষেত্র বিশেষে নিন্দনীয় এবং যেকোন বিপদের কারণ হতে পারে বুদ্ধের কথায় তার ইঙ্গিত ছিল । শিবিসুভাষিতাবদানেও আত্মদান বা দেহ দানের কথা পাওয়া যায়। পুরাকালে শিবি পুরীতে শিবি নামক রাজা যখন ধ্যানে নিরত ছিলেন সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষস রূপ ধারণ করে এসে তাঁর কাছে প্রথমে অর্ধশ্লোকের উচ্চারণ করেন । শ্লোকের মধুরতায় মুগ্ধ হয়ে শিবি রাজা বাকি অর্ধাংশ রাক্ষসের কাছে শুনতে চাইলে তিনি নিজেকে ক্ষুধার্ত বলে জানান , এবং তিনি শিবি রাজাকে তাঁর খাদ্যের জন্য সদ্যকাটা মাংস ও রক্তের প্রার্থনা করেন । শিবি রাজা ঐ অর্ধাংশ শ্লোকের বিনিময়ে রাক্ষসকে তাঁর খাদ্য বিষয়ে আশ্বস্ত করেন । তিনি নিজের দেহ থেকে মাংস কেটে দেওয়ার সময় তাঁর সত্ত্বগুণ দেখে দেবরাজ ইন্দ্র অভিভূত হন । তিনি ছদ্মবেশ ত্যাগ করেন এবং রাজা শিবিকে তাঁর দেহের ব্যাথা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায়, শিবি রাজা উত্তরে বলেন , 'যদি ব্যাথার জন্য তাঁর কোনরূপ বিকার না হয়ে থাকে, তবে সেই সত্যবলে তাঁর দেহ আগের মতো সুস্থ ও সুন্দর হয়ে উঠুক । রাজা এইরূপ সত্য কথা বলায় তার দেহ আগের মতো সুস্থ ও সুন্দর হয়ে ওঠে ।'[৯]

এইরূপে দেহদান সহ সর্বস্বদানেরও উল্লেখ পাওয়া যায়, 'শ্রীসেনাবদানে'। বুদ্ধ কথায় বর্ণিত হয়েছে, প্রাচীন কালে অরিষ্টা নগরীর রাজা শ্রীসেন ছিলেন পরম ধার্মিক, কল্যাণস্বভাব সম্পন্ন এবং অতিমাত্রায় দানশীল । তাঁর দান প্রভাবে তাঁর রাজ্যের প্রজাগণ ছিলেন অত্যন্ত সুখী ও সন্তুষ্ট । তাঁরা অধিকাংশ শ্রী সেনের পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গগামী হয়েছিলেন । কিন্তু স্বর্গ রাজ্যে মানুষের এত ভিড় দেখে দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা শ্রী সেনের ধৈর্য্য পরীক্ষা করার জন্য মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হন। অন্যদিকে বেদাধ্যাপক মুনি রতিপতি রাজা শ্রী সেনের মহিয়সী জয়প্রভার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর এক শিষ্য যে সদ্য ব্রতাধ্যয়ন শেষ করেছে তাঁর কাছে গুরু দক্ষিণারূপে ঐ জয়প্রভাকে যাচ্ঞা করেন । গুরুর এইরূপ যাচ্ঞায় মুনি শিষ্য মহীপতি অর্থিকল্পতরু শ্রী সেনের কাছে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত বলে তাঁর মহিষী জয়প্রভার যাচ্ঞা করেন । এইশুনে শ্রীসেন তাঁকে নিজ স্ত্রী জয়প্রভাকে দান

৮: *বিশ্বন্তরাবদান* , গৃহীত *বোধিসত্ত্বাবদান - কল্পলতা* , পৃ : ২৬৩
৯. *শিবি -সুভাষিতাবদান,* গৃহীত *বোধিসত্ত্বাবদান - কল্পলতা* , পৃ : ৭৬৪

করেন। মুনি শিষ্য সাদরে সেই দান গ্রহণ করে তাঁর গুরুর কাছে পৌঁছালে তিনি লজ্জিত হয়ে শ্রী সেনের মহিষী জয়প্রভাকে তাঁর নিজ সম্ভ্রমে পুনরায় তাঁর গৃহে পাঠানোর বিষয়ে সুনিশ্চিত করেন । এই সকল ঘটনার বৃত্তান্তে দেবরাজ ইন্দ্র রাজা শ্রীসেনের আরও ধৈর্য্য পরীক্ষা নেওয়ার জন্য নিজে এক বীভৎসাকার ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে শরীরের অর্দ্ধাংশ নিয়ে শ্রীসেনের কাছে পৌঁছান । তিনি জানান বনমধ্যে এক হিংস্র বাঘ তাঁর শরীরের অর্দ্ধাংশ ভক্ষণ করেছে। এখন যদি কোন দাতা তাঁর নিজ শরীরের অর্দ্ধাংশ দান করেন তবে তাঁর প্রাণ রক্ষা পাবে, এই মর্মে আকাশবাণী হয়েছে । ব্রাহ্মণের এইরূপ যাচ্ঞাতে রাজা শ্রীসেনের মন্ত্রী পারিষদ্ সকলেই রাজাকে এইরূপ দানে নিরস্ত্র হতে মন্ত্রণা দিলেও রাজা সে দিকে কর্ণপাত না করেই নিজ শরীরের অর্দ্ধাংশ দিয়ে ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষা করার জন্য দ্বিধাহীন চিত্তে উদ্দ্যত হন । সেই লক্ষ্যে রাজা কোনরূপ বিকার না করেই তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন । এইসময় ব্রাহ্মণের দেহ পূর্ণ হলে দেবরাজ ইন্দ্র ছদ্মবেশ ত্যাগ করেন । তিনি রাজার দেহের অর্দ্ধাংশ পুনরায় সংযোজন করে দেন । এই সময়ে তাঁর মহিষী জয়প্রভা উপস্থিত হলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁদের উভয়কে আশীর্বাদ করেন । রাজা শ্রী সেনের এইরূপ দান পুণ্য তাঁর সকল প্রজা বর্গের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয় । একইভাবে মনিচূড়াবদান, ব্যাঘ্রী -অবদান, শশকাবদান, এবং মান্ধাত্রবদানেও গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু সন্ন্যাসীগণের উদ্দেশ্যে যথাক্রমে দান, দানজন্য পুণ্যফল ও বিশেষভাবে জন্মান্তরীয় দানফল বিষয়ে বিভিন্ন কাহিনীর বর্ণনা করেছিলেন ।

দানের প্রকার :

বৌদ্ধ দর্শনানুসারে দান তত্ত্বের বিশ্লেষণে ‘দানের প্রকার’ বিষয়ক আলোচনা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই বিষয়ে বুদ্ধদেবের মত আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে, দানের প্রকার বা শ্রেণীকরণের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি বিশেষ মানদণ্ডরূপে দাতা ও গ্রহীতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে প্রাধান্য দিয়েছেন । তাই বৌদ্ধদর্শনে দানের উল্লিখিত প্রকারগুলি যেমন ক্ষেত্রবিশেষে দাতার প্রেক্ষিত থেকে নির্ধারিত হয়েছে তেমনি তা কখনও নির্দিষ্ট হয়েছে গ্রহীতার প্রেক্ষিত থেকেও । আবার কখনওবা দানের এইরূপ শ্রেণীকরণ দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের প্রেক্ষিত কিংবা দানের বিষয় বা বস্তুর দৃষ্টিকোণ থেকেও বিবেচিত হয়েছে । আরও দেখা যায় যে, উক্ত প্রকারগুলি ছাড়াও বৌদ্ধদর্শনে বুদ্ধকাহিনী অবলম্বনেও দানের অতিরিক্ত কতকগুলি প্রকার নির্দেশিত হয়েছে । তাই একথা বলাই বাহুল্য যে, বৌদ্ধদর্শনে উল্লিখিত বা নির্দেশিত দানের এইরূপ শ্রেণীকরণের বিন্যাস ও বিশ্লেষণ অনায়াসসাধ্য নয় । তথাপি বর্তমান নিবন্ধের আলোচনায় আমি এই বিষয়ে বৌদ্ধ মতের ধারাবাহিকতা ও পর্যায়ক্রম অনুসরণ করে

উক্ত শ্রেণীকরণের বিন্যাস ও সেই বিষয়ের আলোচনা কয়েকটি পর্বের মধ্যে দিয়ে করতে প্রচেষ্টা করেছি এবং বৌদ্ধ অবদান সাহিত্যে উল্লিখিত দান বিষয়ক বিভিন্ন আখ্যানের উদাহরণ আলোচনা করেছি। এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাথমিক পর্বেই দেখা যায় যে , বৌদ্ধ মতানুসারে দানীয় বস্তু ভেদে ‘দান’ মূলতঃ দ্বিবিধ । যথা - আমিষ দান ও ধর্ম দান।

আমিষ দান :

দান ক্রিয়া স্বরূপতঃ ফল প্রদায়ক । নির্দিষ্ট কোন ফল লাভের প্রত্যাশায় যে দান করা হয় তাকে বৌদ্ধ ধর্মানুসারে ‘আমিষ দান’ বা ‘দ্রব্য দান’ বলা হয় । স্বরূপগত তাৎপর্য্যের বিচারে আমিষ দান দুই প্রকার । যেমন - প্রথমতঃ দাতার স্ব - বিষয়ের দান বা নিজের বস্তু দান দ্বিতীয়তঃ বাহ্য জাগতিক বিষয়ের দান বা বাইরের বস্তু দান । বৌদ্ধ ধর্মানুসারে যাচকের বা গ্রহীতার প্রয়োজন অনুসারে তার উপকারার্থে দাতার নিজের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ দান হল দাতার স্ব- বিষয়ের দান বা নিজের বস্তু দান । পরিচিত বা অপরিচিত ভেদে কোন ব্যক্তির সাহায্যার্থে রক্ত দানও এই প্রকার দানের অন্তর্গত । যা আত্মদানেরই নামান্তর মাত্র । যদিও বৌদ্ধ দর্শনে দানের প্রকার নির্ণয় প্রসঙ্গে ‘আত্মদান’ এর পৃথক উল্লেখ পাওয়া যায় । ভগবানের প্রতি ভক্ত যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে সম্পূর্ণরূপে আত্ম সমর্পণ করেন ঠিক তেমনি ভাবে যখন কোন ব্যক্তি অপরের প্রয়োজনে নিজেকে কিংবা নিজের পরিবারের প্রিয় সদস্যের দান করেন তাই বৌদ্ধ দর্শনে আত্ম দান নামে উল্লিখিত হয়েছে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য বৌদ্ধ অবদান সাহিত্যে এইরূপ ‘আত্ম দান’ -এর যে বহু উল্লেখ পাওয়া যায় সেই বিষয়ের আলোচনা ইতিপূর্বেই উপস্থাপন করেছি । আমিষ দানের দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ বাইরের বস্তু দান বা বাহ্য জাগতিক বিষয়ের দান বলতে বৌদ্ধদর্শনানুসারে বলা হয়, কোন একজন দাতার এই জগতে জীবিত থাকার জন্য উপযুক্ত যেকোন বিষয়ের দানই হল, বাইরের বস্তুর দান বা বাহ্য জগতিক বিষয়ের দান । অন্ন, বস্ত্র, পানীয়, বাসস্থান কিংবা শারীরিক অসুস্থতা বা রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে ঔষধ দান ইত্যাদি এই প্রকার দানের অন্তর্ভূক্ত ।

বুদ্ধের দৃষ্টিতে ধর্ম ও ধর্মদান :

দানযোগ্য বা দানীয় বস্তুর ভিন্নতার ভিত্তিতে দানের যে প্রকার আলোচিত হয়েছে তাতে মনে হতে পারে যে, বৌদ্ধ মতানুসারে কেবল গৃহী বা সংসারীদের জন্যই যেন দান ক্রিয়া নির্দিষ্ট হয়েছে । কিন্তু এমন বক্তব্য সমর্থনীয়

নয় । কারণ জাতকে কথিত আছে , গৃহী , প্রব্রাজক সকলেরই দানশীল হওয়া কর্ত্তব্য । অর্থাৎ একথায় বলা যায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্যও দান ক্রিয়া স্বীকৃত হয়েছে । ভগবান বুদ্ধের মতে, ভিক্ষুগণ হলেন ধর্মপতি , সুতরাং তাঁরা 'ধর্ম দান' করতে পারেন । প্রশ্ন হতে পারে , 'ধর্ম দান' বলতে কী বোঝায় ? এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, বৌদ্ধমতে , 'চতুরুপায় পতন হইতে যে ধারণ করে এবং স্বর্গ - ব্রহ্ম - মোক্ষাদি প্রাপ্ত করায় তাকেই ধর্ম বলে। সাধারণতঃ বুদ্ধভাষিত, শ্রাবক ভাষিত , দেব - ভাষিত , ঋষি - ভাষিত ধর্মই ধর্ম'। [১০] 'ধর্ম দান' বিষয়ে বৌদ্ধ মতে নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞার উল্লেখ না পাওয়া গেলেও দান জন্য ফল এর ভিত্তিতে বলা যায়, যে দান সম্পর্কে দাতার নির্দিষ্ট কোন ফল লাভের মনোবাসনা থাকেনা বা নির্দিষ্ট কোন ফল লাভের লক্ষ্যে যে দান ক্রিয়া পরিচালিত হয় না তাকেই বলা হয় ধর্ম দান । বৌদ্ধশাস্ত্রে ধর্মদান অর্থাৎ ধর্মবিতরণ (বা ধর্মোপদেশ বিতরণ) বা ধর্ম শিক্ষার সুযোগ কাউকে প্রদান করাই সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলে স্বীকৃত হয়েছে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বৌদ্ধ দর্শনে ভিক্ষুদের জন্য কেবল ধর্ম দানই নয় বরং ক্ষেত্র বিশেষে আমিষ বা দ্রব্য দান - এরও উল্লেখ পাওয়া যায় । যেমন জাতকে বর্ণিত হয়েছে , কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুর অরণ্যে বসবাসকালীন সময়ে যদি কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি এসে খাদ্যের যাঞ্চা করেন তবে তাঁকে অর্থাৎ ভিক্ষুকে নিজের জন্য তৈরী অন্নের সমস্তটাই পরম সন্তোষের সঙ্গে 'দান' করতে হবে । তবে এই জাতীয় দ্রব্য দান কোন ফল লাভের আশায় নয় বরং তাঁর কর্ত্তব্য কর্ম অর্থেই সম্পন্ন করতে হবে। [১১] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বৃহদারণ্যক উপনিষদেও 'পরিব্রাজক' অর্থে ভিক্ষুদের উল্লেখ পাওয়া যায় । বলা হয়েছে যারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন তারাই হলেন পরিব্রাজক বা ভিক্ষু । কারণ উপনিষদ অনুসারে 'পরিব্রাজক' পদের অর্থ হল -অনবরত পর্যটনকারী ভিক্ষু ।উপনিষদে পরিব্রাজকের প্রসঙ্গ এসেছে এমন সব ব্যক্তির প্রসঙ্গে যারা অরণ্যবাসী কঠোর আত্ম - সংযমী । এবং নৈতিকতায় তন্নিষ্ঠ 'মুনি' , 'তপস্বী' ইত্যাদি আখ্যারও ব্যবহার উপনিষদে এবং পালি নিকায় গ্রন্থে পাওয়া যায় । বৌদ্ধ মতানুসারে যারা বাক্য, কর্ম ও চিন্তায় সংযত হয়ে পরিভ্রমণ করে এবং ভিক্ষা গ্রহণ করে তারা 'পরিব্রাজক' । 'প্রবজ্যা' গ্রহণের কারণে উপনিষদে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি এবং বৌদ্ধ দর্শনে নির্বাণ স্বীকৃত হয়েছে । বৌদ্ধ দর্শনে কঠোর তপশ্চর্যা, কৃচ্ছসাধন এবং আত্ম নিগ্রহের দ্বারা নিজেকে দমন করা সমর্থিত হয়নি । বুদ্ধদেব ও পরবর্তী বৌদ্ধ আচার্যেরা সাধারণতঃ আহারাদি ভোজন বিষয়ে মিতাচারী হতে এবং ইন্দ্রিয় সংযম করতে নির্দেশ দিয়েছেন । দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণে মধ্যপন্থা অবলম্বনে সংযত হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন । বুদ্ধদেব মানুষকে 'আত্মদীপো ভব ' - তুমি নিজেই তোমার দীপ হও এই উপদেশ দিয়েছিলেন। বুদ্ধের বাণীর সার হলো এই যে , মানুষকে নিজেই নিজের

---

১০. *বৌদ্ধ দর্শনে সত্য দর্শন* , পৃ : ১১৯

১১. 'পুরাণ পংডিতেরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া যখন অরণ্যে বাস করিতেছিলেন এবং জলে সিদ্ধ অলবণ কার - পত্র খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন , তখনও যাচক উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে সমস্ত দান করিয়া নিজেরা শুদ্ধ প্রীতিসুখে সময়াতিবাহিত করিতেন । ' অকীতি জাতক (৪৮০) , গৃহীত হয়েছে *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম* থেকে, পৃ : ১৫৮ ।

প্রভু বা আশ্রয় হতে হবে । মানুষ ছাড়া দ্বিতীয় কোন আশ্রয়ের দ্বারা পরিত্রাণ পাওয়া যায় না । বুদ্ধদেবের নির্বাণ লাভ এই পথেই হয়েছিল - তাঁর নিজের প্রজ্ঞা বলেই তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন । তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝেছিলেন মধ্যপন্থাই নির্বাণ লাভের একমাত্র উপায় । তিনি উপলব্ধি করেছিলেন অসংযত ভোগবিলাস যেমন নির্বাণ লাভের সহায়ক হতে পারে না , ঠিক তেমনি কঠোর কৃচ্ছ সাধনার দ্বারাও মানুষের নির্বাণ লাভ হয় না । এই কারণে বৌদ্ধ দর্শনে প্রবজ্যা সমর্থিত হয়েছিল ।

বৌদ্ধধর্ম মানব স্বভাবের উপযুক্ত এমন এক সহজ ধর্মনীতি ভিন্ন আর কিছুই নয় । বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম ও আদর্শে মানুষে মানুষে কোন দেশগত বা জাতিগত বিভেদ স্বীকৃত হয়নি বরং বলা যায় সকল মানুষের স্বভাবসিদ্ধ সাধারণ ধর্ম - ই এখানে আলোচনার বিষয় হয়েছে । যেখানে ঐহিক ও পারত্রিক অভ্যুদয় কামনা করে বহু অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয় করে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান আয়োজন পূর্ব্বক দেবতাদের সন্তুষ্ট করে তাঁদের আশীর্বাদ লাভ করার উদ্যোগ অনুপস্থিত । ধ্যানরত বোধিসত্ত্ব জীবনের সকল প্রকার প্রলোভন , ভয়, কাম - বাসনা ইত্যাদি জয় করে ধর্ম কী তা উপলব্ধি করলেন এবং নির্বাণ লাভ করলেন । তিনি একথাও উপলব্ধি করলেন যে অস্মিতার মূল আসক্তি যেখানে আত্মাভিমান, সেখানে সত্য থাকেনা । বরং ঐপ্রকার আত্মাভিমান থেকে আসে কামনা - বাসনা এবং তার অবশ্যসম্ভাবী ফল রূপে হিংসা - দ্বেষ ইত্যাদির উদ্রেক হয় । তাই স্বার্থের অস্তিত্ব মোহ বলে স্বীকার করতে শিখলে কেবলমাত্র তখনই সত্যের উপলব্ধি সম্ভব । এবং সেই সত্যই ধর্ম । বুদ্ধদেব একথা বুঝেছিলেন যে, সংসারানুরক্ত মানুষ বৈষয়িক চিন্তায় মগ্ন তাই তিনি নিজে যে গভীরতম সত্যের সন্ধান পেয়েছেন তার বৈশিষ্ট্য তথা সেই সত্য সংসারী গৃহস্থদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয় এবং ফলে নির্বাণ লাভ করাও সম্ভব নয় । এইরকম উপলব্ধি থেকেই তিনি বিদ্বেষ ও কামনা - বাসনা পীড়িত মানুষকে তাঁদের মোহ - আসক্তির বন্ধনের কবল থেকে মুক্ত করে তাঁদের রক্ষা করতে উদ্যোগী হলেন । সেই উদ্দেশ্যে যাবতীয় কামনা - বাসনা , আসক্তি ও আতিশয্য দূর করে আত্মজয় করে সত্য ও ধর্মের উপলব্ধি করতে হবে এইরূপ মূল শিক্ষার আদর্শে সকলকে দীক্ষিত করার মার্গ গ্রহণ করলেন । বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ ও তাঁর অনুগামী ভিক্ষুরাও একই আদর্শ অনুসরণ করতেন । বুদ্ধ তাঁর অনুগামী শিষ্যগণকে বলতেন - ‘ বহু প্রাণীর মঙ্গলের জন্য, মানবজাতির কল্যাণের জন্য , জগতের প্রতি করুণায় পরবশ হয়ে ধর্ম প্রচার করতে ’। বুদ্ধদেব তাই বহু সময়েই বলেছেন, ‘ধর্মদান সর্বদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ধর্মের মিষ্টতা অন্য সব মিষ্টতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; ধর্মের আনন্দ অন্য সব আনন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; তৃষ্ণার বিনাশ সর্ব দুঃখ বিজেতা ।’ ‘মানুষ ধর্মে সুখ ও আনন্দ অনুভব করুক, ধর্ম হইতে যেন

তাহার চ্যুতি না হয় , সে ধর্মের বিচার করিতে শিক্ষা করুক .....'[১২] এইরূপ ধর্মপ্রচারে উৎসাহী মগধ সম্রাট অশোক - এর নামও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । পিটক বর্হিভূত আদিস্তরের মিলিন্দপ্রঞ্হ নামক পালি গ্রন্থে সর্ব প্রথম মহারাজ অশোকের নাম 'ধম্মরাজা' বলে উল্লিখিত হয়েছে । বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী অশোক দিগ্‌বিজয় নীতি পরিহার করে ধর্মবিজয় - নীতি গ্রহণ করেছিলেন ।

ভারতবর্ষের রাজাদের মধ্যে প্রথমে মগধরাজ বিম্বিসার এবং পরে সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন । তাঁর অনুশাসন , প্রোথিত স্তম্ভ , গিরি ও গুহায় খোদিত লিপিসকল, কাবুল নদীর উত্তর থেকে দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত , পূর্বে উড়িষ্যা থেকে পশ্চিমে গির্নার (কাঠেওয়ার) পর্যন্ত পূর্বাপর তোয়ানিধির মধ্যস্থ সমুদায় ভারতবর্ষে বিক্ষিপ্ত রয়েছে । এইসকল অনুশাসন পত্রে মৌর্যসম্রাট অশোকের স্বধর্মানুরাগের বিবরণ ও প্রমাণ পাওয়া যায় । তাঁর শিলালিপি , স্থাপত্য , ভাস্কর্য্য শিল্পের অবদান ভারতীয় বিশেষ করে বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিষয়ে বহু অজানা তথ্য উন্মোচিত করেছে । অশোকের বিভিন্ন বাণী উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে বৌদ্ধ দর্শনে ধর্মের ভূমিকা বার বার উঠে এসেছে । ত্রিপিটক সূত্রপিটকের অর্ন্তগত খুদ্দক নিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ ধম্মপদের 'তৃষ্ণাবর্গে' বুদ্ধ বলেছেন - 'সব্বদানং ধম্মদানং জিনাতি' । (পালি) অর্থাৎ 'ধর্মদান সমস্ত দানকে জয় করে , ধর্মদানের ন্যায় আর কোন শ্রেষ্ঠ দান নেই ।' অশোকের শিলালিপিতেও দেখা যায় , তিনি প্রজাসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন - মুক্ত হস্তে দান করা প্রশংসনীয়। কিন্তু ধর্মদানের তুলনায় শ্রেষ্ঠ দান আর কিছু নেই । ধর্মোপকারই শ্রেষ্ঠ উপকার । মৌর্যসম্রাট অশোক তাঁর শিলালিপিতে বার বার ধর্মের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন । যেমন - তাঁর গির্ণার শিলালিপি (৪) থেকে জানা যায় , রাজা অশোক ধর্ম শিক্ষাকে সব কর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর বলে বিবেচনা করতেন । [১৩] সকল ধর্মের মানুষই তাঁর কাছে সমান প্রিয় ছিলেন । গির্ণার শিলালিপি (৯) থেকে জানা যায়, তাঁর মতে প্রকৃত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান মহাফলপ্রদ । যথাযথভাবে ধর্মানুচারণ ও ধর্মানুষ্ঠানের ফলে যেমন ইহ জন্মের উদ্দেশ্য সাধন হয় তেমনি পরজন্মেও অনন্তপুণ্যের অধিকারী হয়ে সীমাহীন সুখ লাভ করা যায় । ধর্মানুচারণের প্রশংসায় অশোক বলেছিলেন, নিরহংকার চিত্তে দান করা প্রশংসনীয় কিন্তু অন্য কোনরূপ দান বা অনুগ্রহ ধর্মদান বা ধর্মানুগ্রহের মত ফলপ্রসু নয় । [১৪] একই বক্তব্য পাওয়া যায় গির্ণার শিলালিপি (১১) তে, সেখানে দেবপ্রিয়

---

১২ *উপদেশ দান, বুদ্ধবাণী* , পৃ : ১১৬
১৩. *অশোকের শিলালিপির আলোকে প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা* , পৃ : ২৮
১৪. ঐ, পৃ : ৩০

প্রিয়দর্শী রাজা অশোক বলেছেন, ধর্মদানের ন্যায় অন্য কোন দান নেই । ধর্ম সম্পর্কের মতো অন্য কোন মানবীয় সম্পর্ক নেই । [১৫]

দাতার মানসিকতার স্তর অনুসারে দানের শ্রেণীকরণ :

দান ব্যবস্থায় বলাই বাহুল্য অন্যতম স্তম্ভ হল দাতা । তাই দানক্রিয়ায় দাতার মানসিকতা গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃত হয়েছে । যেকোন দান বিষয়েই দাতাদের অবশ্যরূপে কতকগুলি শর্তের পালন করতে হবে । যেমন, প্রথমতঃ দাতাগণ দানীয় বস্তু বিষয়ে অবশ্যই শীলবান হবেন । অর্থাৎ সম্যক্ভাবে জীবিকা করে যে অর্থের উপার্জন করেছেন সেই অর্থের দ্বারাই উপার্জিত বিষয়ের তারা দান করবেন । দ্বিতীয়তঃ যেকোন বিষয়েরই দান এর পূর্বে দাতাগণ প্রসন্নমনা হবেন, অর্থাৎ দানকার্যের পূর্বে ‘আমি দান করব’ এইরূপ মনে করে প্রসন্ন চিত্ত হবেন । তৃতীয়ত ঃ দাতার কোন অহংবোধ থাকবে না বরং তিনি বিনয়ী হয়ে এবং প্রীত হয়ে দান করবেন। বৌদ্ধ মতানুসারে দান ক্রিয়া বিষয়টি ব্যক্তি মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত । প্রত্যেকেই প্রতিদিনই নিজের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কিছু না কিছু দান করেন । এইরকম দান সব ক্ষেত্রেই যে যথাযথরূপে ফল প্রদায়ক হতে পারে এমন নয় । যেহেতু অজ্ঞাতসারে দান, বিধি অনুসারে প্রসিদ্ধ নয় । তাই এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের নির্দেশ , দান বিষয়ে দাতাকে সর্বদাই চেতনমনা হতে হবে । অর্থাৎ দাতাগণ দান ক্রিয়া সর্বদাই সচেতন ভাবেই সম্পন্ন করবেন । এর জন্য প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধি । এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মে ত্রিবিধ চেতনার উল্লেখ পাওয়া যায় । যেমন বলা হয় যে , ‘দাতাকে দান করার পূর্বে , দান করার সময় ও দান করার পর - এই তিন অবস্থায় চিত্তকে লোভ - দ্বেষ ও মোহমুক্ত রাখতে হবে । তাহলেই দান কর্মের যথাযথ ফললাভ হবে।’ [১৬] এই প্রসঙ্গেই বৌদ্ধ ধর্মে উল্লিখিত হয়েছে, ‘দান ষড়ঙ্গ সমন্নাগত হয়’ ।[১৭] অর্থাৎ দান ক্রিয়ার মোট ছয়টি অঙ্গ । এর মধ্যে তিনটি অঙ্গ দাতার এবং তিনটি গ্রহীতা বা প্রতিগহীতার । কোন দাতা কীরূপে দান ক্রিয়া সম্পন্ন করছেন তার ভিত্তিতে যেমন সমাজে দাতাদের অবস্থান নির্ভর করে তেমনি তার ‘দান ফল’ নির্ভর করে । এই বিষয়ে বৌদ্ধ মত আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে , সাধারণত তিন প্রকারের গুণ দ্বারা দাতার যোগ্যতা বোঝা হয়েছে । যেমন, ‘দান দাস’, ‘দান সহায়’ এবং ‘দানপতি’। দান করার সময় দাতাগণ প্রকৃত

---

১৫. *অশোকের শিলালিপির আলোকে প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা*, পৃ : ৩১.
১৬ *সদ্ধর্ম - নীতি রত্নমালা*, পৃ : ৬১ ।
১৭. *অংগুত্তরনিকায়* , (৫।৩৭।২),(৩ খং , ৩৩৬ পৃ :) সংগৃহীত *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম* , পৃ : ১৫৭

দান সুলভ মানসিকতা কতদূর রক্ষা করতে পেরেছিলেন সেই বিষয়ে দাতার স্তরভেদ নির্ধারণ করা হয়েছে । ‘দান দাস’ বলতে সেই সব দাতাদের নির্দিষ্ট করা হয়েছে , যারা উত্তম মানের বস্তু নিজেদের জন্য সংরক্ষণ করে গ্রহীতাদের মন্দ মানের বস্তু বা বিষয় দান করেন । আবার যে সকল দাতা নিজেদের এবং গ্রহীতাদের জন্য সমমানের বস্তু বা বিষয়ের দান ধার্য্য করেন সেই সকল দাতাদের ‘দান সহায়’ বলা হয় । যেকোন দান ক্রিয়ার ক্ষেত্রে দান পতিরা সমাজে সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করেন । কারণ এই সব দাতাগণ সর্বদাই নিজেদের জন্য সংরক্ষিত বিষয়ের তুলনায় অধিক উন্নত মানের বস্তু বা বিষয় গ্রহীতাদের উদ্দেশ্যে দান করেন । তাই তারা হলেন ‘দান পতি’। বলা বাহুল্য বৌদ্ধ ধর্মানুসারে ‘দান পতি’দের দান উত্তম মানের ফল জনক হয় ।

গ্রহীতার প্রকারভেদ অনুসারে দানের শ্রেণীকরণ :

বৌদ্ধ ধর্মানুসারে ‘দান’ এর পাত্র দ্বিবিধ । এইরূপ দ্বিবিধ দানের পাত্র ভেদে দান ও দ্বিবিধ বলে স্বীকার করা হয়েছে । প্রথমতঃ কোন ব্যক্তিবিশেষ গ্রহীতা হলে দান হয় প্রাতিপুদগলিক দান ; দ্বিতীয়তঃ গ্রহীতারূপে সংঘ হলে হয় সংঘ দান ।

প্রথমতঃ ব্যক্তিবিশেষকে দান বা প্রাতিপুদগলিক দান ।

কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দানই বৌদ্ধদর্শনানুসারে ব্যক্তিবিশেষকে দান বা প্রাতিপুদগলিক দান নামে অভিহিত হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মে ব্যক্তিবিশেষকে দান বা প্রাতিপুদগলিক দান মোট চৌদ্দ প্রকারের স্বীকার করা হয়েছে । ব্যক্তির নৈতিক চরিত্রের উন্নতির বা নির্বাণ প্রাপ্তির নৈকট্য বা দূরত্ব অনুসারে এখানে ব্যক্তির অবস্থানের স্তর নির্ণয় করা হয়েছে। সর্ব্বোচ্চ স্তর ধরা হয়েছে ১। তথাগত অর্হৎ বা সম্যকসম্বুদ্ধকে দান সুতরাং সেই দানই সর্ব্বোচ্চ দান । এর পর ক্রমান্বয়ে দানের স্তর ভেদ পাই ২। প্রত্যেক বুদ্ধকে দান। ৩। অর্হৎকে দান ৪। অর্হত্বফল লাভে সচেষ্ট বুদ্ধ শ্রাবককে দান ৫। অনাগামীকে দান । ৬। অনাগামী ফললাভে সচেষ্ট বুদ্ধ শ্রাবককে দান ৭। সকৃদাগামীকে দান । ৮। সকৃদাগামী ফল লাভে সচেষ্ট বুদ্ধ শ্রাবককে দান ৯। স্রোতাপন্নকে দান । ১০। স্রোতাপত্তি ফল লাভে সচেষ্ট বুদ্ধ শ্রাবককে দান ১১। বাহ্যিক কামসংযত ব্যক্তিকে বা কর্ম ও ক্রিয়াবাদী লোকীয় পঞ্চ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তাপসকে দান ১২। সাধারণ শীলবান ব্যক্তিকে দান ১৩। সাধারণ এবং দুঃশীল ব্যক্তিকে দান এবং ১৪। তীর্যগযোনিগত পশু - পাখী প্রভৃতিকে দান । প্রশ্ন হল, নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষতার নিরিখে নির্বাণকামী

ব্যক্তিগণের যে স্তরবিন্যাস বৌদ্ধদর্শনে উল্লেখ করা হয়েছে তার মানদন্ড কী ? কীসের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির উক্ত স্তরবিভাগে উন্নয়ন প্রাপ্তি ঘটে ? এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বৌদ্ধ দর্শনানুসারে বলা যায়, নির্বাণকামী ব্যক্তিগণ ধর্মপথে স্থিত হওয়ার জন্য আত্মসংযমী হবেন । তিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করে অন্তঃকরণকে কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা মদ ও মাৎসর্য থেকে নিজেকে মুক্ত করবেন। তবেই তিনি যাত্রার চরম সীমা যে নির্বাণ সেখানে পৌছাতে পারবেন । এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধদর্শনে নির্বাণে পৌছানোর ধাপ ও পথের বিঘ্নকারী রূপে 'দশ সংযোজন বন্ধন বা শৃঙ্খলের' - উল্লেখ করা হয়েছে । এগুলি হল - (১) সংশয়দৃষ্টি , অহমিকা (২) বিচিকিৎসা, সংশয় (৩) শীতব্রত, কর্মকান্ডে আস্থা (৪) কাম (৫)প্রতিঘ, ক্রোধ (৬) রূপরাগ, বিষয়কামনা (৭) অরূপরাগ, স্বর্গ - কামনা (৮) মান , অভিমান , মদ - মাৎসর্য (৯) ঔদ্ধত্য (১০) অবিদ্যা [১৮] বুদ্ধ নির্দেশিত আদর্শ বা মার্গ ধরে যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে ব্যক্তির উত্তরণ ঘটলে নির্বাণ লাভে সচেষ্ট মুমুক্ষুদের সদাচার পালনের মধ্যে দিয়ে প্রতিটি স্তরে উক্ত বন্ধন বা শৃঙ্খলগুলির যে বিয়োজন হয়ে যেতে থাকে তার ভিত্তিতেই মুমুক্ষুর উক্ত স্তরবিভাগে উন্নয়ন প্রাপ্তি ঘটে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে সদাচার পালনের বিবেচনার স্তর অনুসারে মুমুক্ষুগণকে বৌদ্ধদর্শনে স্রোতাপন্ন , সকৃদাগামী , অনাগামী এবং অর্হৎ - এই চারটি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে ।

১) স্রোতাপন্ন -- যিনি নির্বাণের প্রথম ধাপে উঠেছেন, তিনি স্রোতাপন্ন । স্রোতাপন্ন বলতে তাদের বোঝানো হয় যারা নির্বাণের স্রোতে প্রবেশ করেছেন । এটি নির্বাণের অবস্থায় পৌছাবার একটি স্তর । এই সময়ে নির্বাণ লাভের অন্তরায় হয় এমন তিনটি প্রধান বাধা যথা - ক) শাশ্বত কোন আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস খ) সকায় দৃষ্টি এবং গ) বুদ্ধদেব এবং তাঁর তত্ত্ব সম্পর্কে বিচিকিৎসা দূর হয়ে যায় । বৌদ্ধমতে যারা নিয়ত নির্বাণের পথে অগ্রসর হয়েছেন , তাদের সেই নির্বাণের পথ থেকে প্রত্যার্বত্তন হয় না । স্রোতাপন্নেরা সেই কারণে নিশ্চিত নির্বাণের পথেই আছে । তাদের নির্বাণ রূপ মূল গন্তব্যে পৌছতে সময় লাগতে পারে , কিন্তু তাদের অষ্টমবার জন্ম গ্রহণ করতে হবে না ।[১৯] মনুষ্যের নীচে পশ্বাদি যোনিতে তাঁর জন্ম হয় না । যিনি স্রোতাপত্তি মার্গে প্রবেশ করতে পেরেছেন তিনি অর্হত্বের প্রথম সোপানে প্রবেশ করেছেন । তার অর্ন্তদৃষ্টি লাভ হয়েছে এবং তিনি আত্মার মোহ, সংশয় এবং ব্রতানুষ্ঠানের অনুরাগ থেকে মুক্ত হয়েছেন । তিনি চর্তুবিধ দুর্গতি থেকে মুক্ত ; যথা - নিরয় , পশুযোনি , প্রেতলোক এবং অসুরলোক ; এবং ছয় প্রকার অপরাধ তার দ্বারা অসম্ভব । যথা - মাতৃহত্যা , পিতৃহত্যা , অরহন্তের হত্যা , সঙ্ঘে বিচ্ছেদ সৃষ্টি এবং নিত্য মিথ্যা দৃষ্টি । যিনি স্রোতাপন্ন তার পক্ষে কখনই কায়বাক্য ও মন দ্বারা কোন রকমের দুষ্কৃতি করা সম্ভব নয় ।

---

১৮. *বৌদ্ধধর্ম* , সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর , পৃ : ১১০-১১১
১৯. *দীঘনিকায় , মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত* , ১৬ , *সুত্তনিপাত* , ২৩০

২) সকৃদাগামী -- যিনি দুঃখ জন্ম মরণ কন্টকিত ইহলোকে কেবল একবার মাত্র পুনরায় আগমন করবেন। দ্বিতীয় ধাপে কতকগুলি বাধা সৃষ্টিকারী শৃঙ্খলের বিয়োজন হয় , যিনি সেই স্তরে পৌছেছেন , নিঃসন্দেহে তিনি আরও উন্নত স্তরে পৌছেছেন । তথাপি তিনি সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন নি । তাঁকে আরেকবার ফিরতে হবে, তিনি সকৃতগামী ।

৩) অনাগামী -- দ্বিতীয় স্তরের পরবর্তী স্তরে উত্তরণ করতে পারলে কাম, ক্রোধ, বিচিকিৎসা প্রভৃতি পঞ্চবন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ হয়, তখন সাধক 'অনাগামী' পদলাভ করেন , তাঁকে মর্ত্যলোকে আর ফিরে আসতে হয় না । এটি ভিক্ষুর নির্বাণের পথে তৃতীয় ধাপ বলা যায় । বর্তমান দেহ পরিত্যাগ করে ইহলোকে যাদের আর আগমন হবে না বরং পাঁচ প্রকার জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরলোকেই নির্বাণ লাভ করতে পারবেন তাঁরা হলেন অনাগামী । [২০]

৪) অর্হৎ -- অর্হৎ শব্দটির দ্বারা বৌদ্ধ দর্শনানুসারে মাননীয় ব্যক্তিদের বোঝানো হয়েছে । যারা বুদ্ধদেব প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে কাম, ভব, অবিদ্যা এই তিনটি আস্রব ক্ষয় করেছেন । দেহ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অর্হতেরা নির্বাণ লাভ করেন । যিনি চতুর্থ সোপানে আরোহণ করেছেন তার সমুদয় বন্ধন ছিন্ন হয়, জন্মান্তর, স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধিলাভ হয় তখন তিনি জীবনমুক্ত অর্হৎ । তাঁদের আর পুনর্জন্ম হয় না । [২১] অর্হতেরা অপূর্ণ জীব । এদের লক্ষ্য স্থান বা গম্য স্থান এখনো অনেক দূর । বুদ্ধ এবং এদের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর । যে মহাত্মারা এদের অপেক্ষাও জ্ঞানধর্মে উচ্চতর পদবীতে আরূঢ় হয়েছেন তাঁদের নাম প্রত্যেক বুদ্ধ । তাঁরা নিজ নিজ সাধনা ও পুণ্যগুণে দিব্যজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হয়েছেন কিন্তু লোকের মধ্যে সেই জ্ঞান বিতরণে অক্ষম । মহাবুদ্ধের সঙ্গে এইসকল প্রত্যেক বুদ্ধের তুলনা হয় না । তাঁরা তথাগত , সিদ্ধার্থ, চক্রবর্তী প্রভৃতি উপাধি ধারণের যোগ্য তখন হতে পারেন নি । তবে বুদ্ধ নির্দেশিত মার্গের যথাযথ অনুসরণ করলে তারা একসময় দশসংযোজনের বন্ধন থেকে পূর্ণ মুক্তি লাভ করে নির্বাণ লাভে সক্ষম হবে ।

দ্বিতীয়তঃ সংঘ দান :

বৌদ্ধ দর্শনানুসারে ভিক্ষু সংঘকে যে দান দেওয়া হয় তাই 'সংঘ দান বা সাংঘিক দান' নামে প্রসিদ্ধ । এই

---

২০. *দীঘনিকায়* , *দসুত্তরসুত্ত* , (৩৪) ৩য় খন্ড, সংগৃহীত *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম,* পৃ : ২১৭ ,
২১. *ধম্মপদ* , পৃ : ২৩৩

প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, যেকোন ভিক্ষু সংঘের সদস্য সংখ্যা যদি দশ জন হয় , তবে সেই দান সংঘ দানরূপে স্বীকার্য্য । কিন্তু যেকোন প্রত্যন্ত গ্রামে স্থিত কোন সংঘের সদস্য সংখ্যা নূন্যতম পাঁচ জন বা তার অধিক হলেই তা সংঘ দানরূপে বিবেচ্য হবে । আমাদের দেশের অবস্থান যেহেতু মধ্যপ্রদেশের বাইরে তাই যেকোন পাঁচ জন ভিক্ষুর সংঘেই দান এক্ষেত্রে সংঘ দান রূপে স্বীকৃত হয় । উল্লেখ্য যে, যেকোন সংঘ দানের ক্ষেত্রেই গৃহী ভিক্ষুদের দান গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারে । ভগবান বুদ্ধের মতে সংঘ দান মোট সাত প্রকার । যেমন - ১। বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘকে দান ২। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘকে দান ৩। কেবল ভিক্ষু সংঘকে দান ৪। কেবল ভিক্ষুণী সংঘকে দান ৫। ভিক্ষু সংঘের কাছে উপস্থিত হয়ে কয়েকজন নির্দিষ্ট সংখ্যক ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীগণের প্রেরণের উদ্দেশ্যে দান ৬। ভিক্ষু সংঘের কাছে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভিক্ষু যাচ্ঞা করে দান এবং ৭। ভিক্ষু সংঘের কাছে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভিক্ষুণী যাচ্ঞা করে দান । বৌদ্ধ মতে ‘সংঘ দান’ যে প্রকারেরই সাধিত হোক না কেন তা সর্বদাই ফলজনকতার বিচারে প্রাতিপুদ্গলিক দানের তুলনায় উত্তম বা শ্রেষ্ঠ ।

সঙ্ঘদানের বৈশিষ্ট্য এবং তাৎপর্য কী তা বুঝতে হলে বৌদ্ধ দর্শনে সঙ্ঘের স্থান কোথায় এবং কীভাবে তার উৎপত্তি হয়েছিল সেই বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন । বুদ্ধ এবং ধর্ম ব্যতীত সংঘকে শরণ করতে বৌদ্ধ দর্শনে সব সময়ে অনুপ্রাণিত করা হয় । উনপন্চাশদিন ব্যাপী ধ্যানে নিরত থেকে পরমানন্দময় বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর তপুষ্য ও ভল্লিক বণিকদ্বয় প্রদত্ত অন্নপিষ্টক ও মধু বুদ্ধদেবের প্রথম আহার । তপুষ্য ও ভল্লিক বণিকদ্বয় বুদ্ধদেবের পবিত্রতা উপলব্ধি করে তার ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন , তারা বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন । বুদ্ধদেবের প্রথমে সংশয় হয়েছিল তার উপলব্ধ সত্য - ধর্ম প্রচার করলে লোকেরা যদি তা গ্রহণে উৎসাহী না হয় তাহলে তিনি কেবলমাত্র ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট হবেন । কিন্তু পরে ব্রহ্মা সহম্পতির অনুরোধে যে , ‘শ্রবণ করিবার জন্য যাহাদের কর্ণ আছে , অমরত্বের দ্বার তাহাদের নিকট উন্মুক্ত হউক । সবিশ্বাসে তাহারা ধর্মলাভ করুক ।’ এই ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্যেই বুদ্ধদেব তার পূর্বতন পঞ্চ শিষ্যদের মুক্তির মার্গের দিশা দিতে তৎপর হলেন । তার শিষ্যের সংখ্যা যখন ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তারা অরহত্ব প্রাপ্ত হন , তখন তিনি তাদের লোক কল্যাণার্থ ধর্ম প্রচারে আদেশ করেন । তার শিষ্যদের তিনি একত্র হয়ে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে এবং পরস্পরের প্রয়াসকে সার্থক করতে উৎসাহিত করেন । তিনি অবগত ছিলেন সহায়হীন মানুষের দুর্বলতা কিভাবে তাদের সত্যমার্গ থেকে পথভ্রষ্ট করতে পারে । শিষ্যদের পারস্পরিক হৃদ্যতা তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার উপর বুদ্ধদেবের গুরুত্ব ছিল । তাই শিষ্যদের মধ্যে যাতে পারস্পরিক বৈরতা না উৎপন্ন হয় সেই বিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন । তিনি বলেছিলেন ‘তোমাদের মধ্যে ভাতৃভাবের উন্মেষণ হউক ; তোমরা মৈত্রীতে , পবিত্রতায়

এবং সত্যের জন্য ঐকান্তিকতায় মিলিয়া একীভূত হও ’ । বুদ্ধদেবের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম , সমাজ যা বুদ্ধদেবে আশ্রয় পেয়েছে তাই হল সংঘ । সঙ্ঘ ভিক্ষুদের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠাকারী এক পবিত্র সম্পদ । বৌদ্ধ ভিক্ষুদের শ্রমণও বলা হয় । ধম্মপদের ভিক্ষুবর্গে বলা হয়েছে , বুদ্ধের অনুশাসন পালনে সদা প্রসন্ন ও আনন্দময় ভিক্ষুরা সকল সংস্কারের নিবৃত্তি সাধন করে সুখময় শান্তপদ - নির্বাণ লাভ করে । [২২] এই সংঘের উদ্দেশ্যে পূর্ণ দানই শ্রেষ্ঠদান। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ সাহিত্য অবদান শতকে বর্ণিত দান কথা অবশ্য আলোচ্য ।

সঙ্ঘ দান ও শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা :

সঙ্ঘ দান প্রসঙ্গে বৌদ্ধ অবদান সাহিত্যে অনাথপিন্ডিকের বস্ত্রদানের উল্লেখ তাৎপর্য্যপূর্ণ্য । বুদ্ধদেবের নির্দেশ অনুসারে বুদ্ধ এবং সঙ্ঘের জন্য ধনী অনাথপিন্ডিক একসময় গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করলেন । স্বয়ং বুদ্ধ এবং তাঁর সঙ্ঘের কল্যাণকর্মে প্রয়োজনীয় জেনে বহু গৃহস্থ এবং ধনী ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে প্রভূত পরিমাণ অর্থ, বিষয়, রত্ন - অলংকার ইত্যাদি যেমন দিলেন তেমনি সাধারণ গৃহস্থগণও তাঁদের সামর্থ্য অনুসারে অন্ন, অর্থ, বাসন ইত্যাদির দান করলেন । কিন্তু এই সব বস্তু দানে পেয়েও অনাথপিন্ডিকের মনেরসন্তোষ সাধন হচ্ছিল না । তিনি মনে করছিলেন এই সকল দানই তো দাতাগণ তাঁদের নিজ নিজ সামর্থ্যের মধ্যে থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণেই দান করছিলেন । কিন্তু এই সকল দানের কোনটিই যেন ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করার মতো নয় । এইরূপ ভাবতে ভাবতে ধনী অনাথপিন্ডিক একটি বাগানে গিয়ে এক বৃদ্ধার কাছে পৌঁছলেন । যার কাছে পরনের কাপড় ভিন্ন অন্ন কোন অতিরিক্ত বিষয় ছিলনা । অনাথপিন্ডিক সেই বৃদ্ধার কাছে ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁর সঙ্ঘের জন্য কিছু ভিক্ষা যাচ্ঞা করলেন । ভগবান বুদ্ধের প্রয়োজনে লাগবে জেনে সেই বৃদ্ধা তখন নিজের ঐ একমাত্র সম্বল পরনের কাপড়টিকেই ভগবান বুদ্ধের জন্য দান করলেন । এই দানে ধনী অনাথপিন্ডিকের মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো । অনাথপিন্ডিক বৃদ্ধার এইরূপ পূর্ণ দানে প্রীত হয়ে বৃদ্ধাকে ধন্য ধন্য করলেন ।

> ‘ধন্য মাতঃ, করি আশীর্বাদ,
> মহাভিক্ষুকের পুরাইলে সাধ
> পলকে।’ [২৩]

তিনি অনুভব করলেন এই সেই শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা যা স্বয়ং ভগবানের চরণে অর্পণ করা যায় ।

---

২২. ধম্মপদ ,ভিক্ষুবর্গ সূত্র ২২, পৃ : ২০৬
২৩. *শ্রেষ্ঠভিক্ষা, কথা ও কাহিনী* , শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

বুদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে দানের অন্যান্য প্রকার :

দান বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে গৃহীগণের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধধর্মে আরও কতকগুলি প্রকার ‘দান’ নির্দেশিত হয়েছে, ‘গৃহীগণের যথাসময়ে পুদ্‌গলিক দান, সংঘদান , অষ্ট পরিষ্কার দান, কঠিন চীবর দান ইত্যাদি সম্পন্ন করা উচিৎ। আগন্তুক ভিক্ষুকে ও কোথাও গমনেচ্ছু ভিক্ষুকেও দান করা উচিৎ । রুগ্ন ভিক্ষুকে ঔষধ পথ্যাদি দান করেও পুণ্যার্জন করা যুক্তিযুক্ত ।’[২৪] দান বিষয়ে গৃহীগণের উদ্দেশ্যে নির্দেশিত প্রকারগুলির মধ্যে প্রথম দুটি বিষয়ে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে । পরবর্তী দুটি প্রকার অর্থাৎ অষ্ট পরিষ্কার বা পরিখা দান, কঠিন চীবর দান বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে , দানের উক্ত দুটি প্রকারই বৌদ্ধ দর্শনে ভিক্ষুগণের উদ্দেশ্যেই স্বীকৃত হয়েছে ; অর্থাৎ কেবলমাত্র বৌদ্ধ ভিক্ষুগণই উক্ত দুই প্রকার ‘দান’ - এর গ্রহীতা হতে পারেন।

অষ্ট পরিখা দান :

ভিক্ষুগণের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় মোট আট প্রকার বস্তুকে অষ্ট পরিখা বলা হয় । উক্ত প্রয়োজনীয় আটটি বস্তু হল - সংঘাটি (বহির্বস্ত্র) , উত্তরাসংঘ বা দেহবস্ত্র , অন্তর্বাস বা পরিধেয় বস্ত্র , ভিক্ষুগণের জন্য ভিক্ষা গ্রহণের পাত্র, এছাড়াও অন্যান্য নিত্য কার্য্য সম্পাদন করার জন্য ক্ষুর, সূঁচ- সুতা, কোমরবন্ধনী বা কটি বন্ধনী, জলছাঁকনি। এই আট প্রকার বস্তু দান হল অষ্ট পরিখা দান । বৌদ্ধ মতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনে অন্ততঃপক্ষে একবার কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে এই অষ্ট পরিখা দান করা উচিৎ ।

কঠিন চীবর দান :

বৌদ্ধ মতানুসারে আশ্বিন মাসের পুর্ণিমার পরের দিন প্রতিপদ তিথি থেকে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমার সূর্যোদয়ের আগে পর্যন্ত একমাস ব্যাপী যে সময় তাকে ‘কঠিন মাস’ বলা হয় । এই ‘কঠিন মাসে’ই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের পরিধানের যেকোন বস্ত্র , যেমন - সংঘাটি বা উত্তরাসংঘ বা অন্তর্বাস যেকোন বস্ত্র দানই ‘কঠিন চীবর দান’ রূপে প্রসিদ্ধ । দানের উল্লিখিত প্রকারগুলি ছাড়াও বৌদ্ধদর্শনে ‘বিহার দান’, ‘পুকুর ও পুষ্প উদ্যান দান’, ‘পুণ্যদান’ এর কথাও পরিলক্ষিত হয় ।

---

২৪. *সদ্ধর্ম - নীতি রত্নমালা,* পৃ : ৬৩

বিহার দান :

বৌদ্ধমতে ভিক্ষুগণের বসবাস করার জন্য উপযুক্ত স্থান বা আশ্রম নির্মাণ করে যে 'দান' করা হয় তাকে বিহার দান বলা হয় । বিহার দান বিষয়ে বুদ্ধ মতের আলোচনা প্রসঙ্গে অনাথপিন্ডিকের প্রতি ভগবান বুদ্ধের ধর্মোপদেশ বাক্যের উল্লেখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । অনাথপিন্ডিক ছিলেন রাজগৃহ নগরের একজন ধনী ব্যক্তি । তিনি ছিলেন পুণ্যবান এবং দানশীল । দানশীলতার গুণে নগর জোড়া খ্যাতি ছিল তাঁর । তাঁর নগরীতে তিনি অনাথের প্রতিপালক এবং দীন দরিদ্রের বন্ধু এই নামেও সুপরিচিত ছিলেন । ধর্ম বিষয়ে তিনি ছিলেন সদা অনুরক্ত । সেই সময়ে ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহ নগরের বেণুবনে অবস্থান করছেন শুনে তাঁর কাছে গিয়ে ধর্ম বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করতে তিনি মনস্থির করেন এবং সেই মতো সেখানে উপস্থিত হন । অনাথপিন্ডিকের এইরূপ প্রার্থনা শুনে গৌতম তাঁকে ধর্মবিষয়ে উপদেশ প্রদান করে বলেন , 'মহান অষ্টাঙ্গ মার্গে প্রবিষ্ট ব্যক্তিমাত্রই ধার্মিক জীবনের পরম সুখময় অবস্থা লাভ করিতে সক্ষম । যিনি ধনসম্পদে তাঁহার অত্যধিক আসক্ত, তাঁহার পক্ষে উহা ত্যাগ করাই শ্রেয়, কারণ উহাতে তাঁহার অন্তঃকরণ বিষাক্ত হইতে পারে ; কিন্তু অনাসক্ত হইয়া যিনি ধনের সদ্ব্যবহার করেন, তিনি সর্ব প্রাণীর মঙ্গল করণে সক্ষম ।' [২৫] তিনি আরও বলেন, 'মানুষ যাহাই করুক , সংসারে থাকিয়া শিল্পী, বণিক এবং রাজ কর্মচারীই হউক, কিংবা সংসার ত্যাগী হইয়া ধর্মচিন্তায় নিরত হউক, সর্বান্তঃকরণে তাহাকে স্বীয় কর্মে নিযুক্ত হইতে হইবে ; তাহাকে পরিশ্রম ও উদ্যমশীল হইতে হইবে । এইরূপে পদ্ম যেমন জলে উৎপন্ন ও বর্ধিত হইয়াও জলস্পৃষ্ট নহে, মানুষও যদি সেইরূপ দ্বেষ ও হিংসার বশবর্তী না হইয়া জীবন সংগ্রামে রত হয়, যদি সে অহমাকারের অনুসরণ না করিয়া সত্যের অনুগামী হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ রূপে সে শান্তি ও পরমানন্দ অনুভব করিবে। '[২৬] ধর্ম তথা কর্তব্য বিষয়ে বুদ্ধের কাছে এইরূপ উপদেশ বাক্য শুনে ধনী অনাথপিন্ডিক বুদ্ধ সঙ্ঘের ধর্মানুশীলনের জন্য একটি বিহার দানের ইচ্ছা প্রকাশ করে তা গ্রহণ করার জন্য বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করেন। অনাথপিন্ডিকের এইরূপ ইচ্ছা যে তাঁর অহংকারের প্রকাশ নয় বরং সত্যিই এই দান অন্তঃকরণ প্রসূত এই বিষয়ে বুদ্ধ নিশ্চিত হয়ে সেই দান গ্রহণে সম্মতি দেন । শুধু তাই নয় বরং তিনি অনাথপিন্ডিকের উদ্দেশ্যে দান বিষয়ে কিছু উপদেশ বাক্যেরও নির্দেশ করেন । সেই সকল উপদেশ বাক্যের অনুসরণ করলে দেখা যায়, দান, দান জন্য ফল, দানের পদ্ধতি ও সময় বিষয়ে ভগবান বুদ্ধ কীরূপে নিজ অভিমত প্রকাশ করেছেন । তিনি বলেছেন, 'দানশীল মনুষ্য সকলেরই প্রিয় ; তাঁহার বন্ধুত্ব অতি মূল্যবান

---

২৫. *অনাথপিন্ডিক, বুদ্ধবাণী,* পৃ : ৪৬
২৬. ঐ, পৃ : ৪৬

বিবেচিত হয় ; মৃত্যুতে তাঁহার অন্তঃকরণ বিশ্রান্ত ও আনন্দপূর্ণ, কারণ তাঁহার অনুতাপ নাই ; তিনি পুরস্কারের মুকুলিত পুষ্প ও তৎপ্রসূত ফল লাভ করেন ।'[২৭] আবার দানের সময় বিষয়ে উপদেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'দানের উপযুক্ত সময় ও প্রণালী আছে ; বীর্যবান যোদ্ধা যেরূপ যুদ্ধ যাত্রা করেন, দান করিতে সমর্থ ব্যক্তিও তদ্রুপ। তিনি সমর্থ যোদ্ধার ন্যায়, তিনি শক্ত ও সমরকুশল বীর ।'[২৮] দানের ফল বিষয়ে তিনি আরও বলেন, 'প্রীতি ও করুণা প্রণোদিত হইয়া ভক্তির সহিত তিনি দান করেন এবং হৃদয় হইতে সর্ব প্রকার দ্বেষ, হিংসা ও ক্রোধ দূর করেন । দানশীল ব্যক্তি মুক্তির মার্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন । বাল - বৃক্ষ রোপণকারী মনুষ্য যেরূপ ভবিষ্যতে উহার ছায়া, পুষ্প ও ফল উপভোগ করে, তিনিও তদ্রূপ ; নির্বাণও তদ্রূপ।'[২৯]

পুকুর ও পুষ্প উদ্যান দান :

বৌদ্ধ ভিক্ষুর উপাসনার কার্যে প্রয়োজনীয় কিংবা অপরাপর গৃহীগণের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপযোগী পুকুর ও পুষ্প বাগান বা উদ্যান নির্মাণ করে এইরূপ দান কার্য সম্পন্ন করা হয় । ফুলের বাগান তৈরী করে কিংবা ভ্রমণ করার জন্য উদ্যান নির্মাণ করে দান করা হয় । এই বিষয়ে বৌদ্ধ সাহিত্যে 'বেণুবনদান' উল্লেখযোগ্য ঘটনারূপে প্রসিদ্ধ ।

বেণুবনদান :

দান বিষয়ে রাজা বিম্বিসারের 'বেণুবনদান' বৌদ্ধ দর্শনে উল্লিখিত অন্যান্য দানের মতোই অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ দান। মগধের রাজা বিম্বিসার ভগবান বুদ্ধকে তাঁর রাজ্যে অবস্থান করার সময় তাঁর থাকার জন্য নিজের প্রমোদোদ্যান বেণুবন দান করেছিলেন । এই ঘটনাই বৌদ্ধ সাহিত্যে 'বেণুবনদান'রূপে প্রসিদ্ধ । এই বিষয়ে আলোচনায় দেখা যায়, পুরাকালে রাজা বিম্বিসার তাঁর রাজ্যে ভগবান বুদ্ধের আগমন বার্তা শুনে সকল মন্ত্রী ও সৈন্যসহ ভগবান বুদ্ধের দর্শনে গেলেন । সেখানে গিয়ে দেখেন, বুদ্ধদেব মহামুনি কাশ্যপের সঙ্গে ধর্মোপদেশ বিষয়ে আলোচনায় রত । ধর্মবিষয়ে উপদেশ দান শেষ হলে মগধ রাজা বিম্বিসার ভগবান বুদ্ধের শরণ নিয়ে তাঁকে জানালেন, ''দেব, অতীতকালে যখন আমি রাজকুমার ছিলাম, তখন আমি পঞ্চবিধ বাসনা হৃদয়ে পোষণ

---

২৭. *দান সম্বন্ধে উপদেশ, বুদ্ধবাণী,* পৃ : ৪৭
২৮. ঐ , পৃ : ৪৭
২৯. ঐ , পৃ : ৪৭

করিতাম । আমার প্রথম বাসনা - অমি যেন নৃপতি হইতে পারি, সে বাসনা পূর্ণ হইয়াছে । আমার দ্বিতীয় বাসনা - আমার রাজত্বকালে ভগবান বুদ্ধ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যেন আমার রাজ্যে আগমন করেন ; সে বাসনা আমার পূর্ণ হইয়াছে । আমার তৃতীয় বাসনা - আমি যেন তাঁহার পূজা করিতে পাই ; এইক্ষণে সে বাসনা আমার পূর্ণ হইল । আমার চতুর্থ বাসনা - আমি যেন পুণ্যাত্মার নিকট ধর্মোপদেশ প্রাপ্ত হই এইক্ষণে সে বাসনাও আমার পূর্ণ হইল । আমার পঞ্চম বাসনা, সর্বোচ্চ বাসনা - আমি যেন বুদ্ধের ধর্ম উপলব্ধি করিতে পারি , এই বাসনাও পূর্ণ হইয়াছে ।'' এইরূপ বক্তব্যের শেষে রাজা বিম্বিসার বুদ্ধ এবং সঙ্ঘকে পরের দিন তাঁর প্রাসাদে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করে এলেন । পরের দিন বুদ্ধ এবং সঙ্ঘ রাজা বিম্বিসারের প্রাসাদে এসে রাজার অনুরোধে আহারাদি গ্রহণ করলেন । এই সময় রাজা এইবিষয়ে চিন্তান্বিত ছিলেন যে, ''পুণ্যাত্মার বাসের জন্য কোথায় এমন স্থান নির্দেশ করি যাহা নগর হইতে বহু দূরবর্তী নয়, যে স্থান গমনাগমনের উপযোগী, তাঁহার দর্শনপ্রার্থী ব্যক্তি মাত্রেই যেখানে বিনা আয়াসে গমনক্ষম হয়, যে স্থান দিবাভাগে জনসঙ্কুল নয় এবং রাত্রিকালে নীরব , যে স্থান স্বাস্থ্যকর এবং অবসর প্রাপ্ত জীবনোপযোগী ? আমার প্রমোদোদ্যান বেণুবন সর্বতোভাবে উপযুক্ত। বুদ্ধ যে সঙ্ঘের নেতা ঐ সঙ্ঘকে আমি এই উদ্যান উৎসর্গ করিব । নৃপতি সঙ্ঘকে ঐ উদ্যান উৎসর্গ করিয়া কহিলেন, আমার প্রার্থনা, পুণ্যাত্মা এই দান গ্রহণ করুন । তদনন্তর পুণ্যাত্মা নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন পূর্বক ধর্মালোচনা দ্বারা মগধ নৃপতির অন্তঃকরণ আনন্দিত ও উন্নত করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।''[৩০]

পুণ্যদান :

সদাচারে কোন ধর্মকর্ম সম্পন্ন করলে যে পুণ্য অর্জিত হয় তা অপরের প্রয়োজনে সম্পূর্ণ রূপে দান করাকে বলা হয় পুণ্য দান । বৌদ্ধ জাতক কাহিনীতে এবং অবদান সাহিত্যে এই পুণ্য দানের বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। অবদান সাহিত্যে এই বিষয়ে উল্লিখিত দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে । ভগবদ্‌গীতা , পুরাণেও এই প্রকার পুণ্যদানের বহু উল্লেখ পাওয়া যায় । প্রশ্ন হতে পারে, এইরূপ পুণ্যদানের ক্ষেত্র কিকর্মবাদের সঙ্গে বিরোধিতা সূচনা করে না ? কারণ ভারতীয় ধর্মনীতির পরিসরে এযাবৎ প্রসিদ্ধ 'কর্মবাদ' - এর মূল বক্তব্যই হল কর্মকর্তা তাঁর আপন কর্মানুসারে ফল ভোগ করবেন । কিন্তু অপর কোন ব্যক্তি যদি কর্ম কর্তার দোষ লাঘবার্থে নিজের পুণ্যফল প্রদান করেন তবে তো ঐ ব্যক্তি তাঁর নিজ কর্মফল থেকে বঞ্চিত হলেন। যা ধর্ম নীতির সঙ্গে বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন । এইরূপ পরিস্থিতিতে বৌদ্ধ দর্শন স্বীকৃত পুণ্যদানের সমর্থনে হয়ত একথা বলা

৩০. *নৃপতির দান , বুদ্ধবাণী,* পৃ : ৪১ -৪২

যায়, যেহেতু পুণ্যদানে পুণ্য বর্ধিত হয় , তাই একজন পুণ্যফল প্রদানকারী দাতা সমাজের মঙ্গলার্থে আপন পুণ্যফল প্রদান করে সমাজে আরও অনেক মঙ্গলময় বা পুণ্যফলজনক পরিস্থিতির উদ্রেক করেন । তাই এইরূপ পুণ্যফলের দান ধর্মনীতির পরিসরে প্রচলিত কর্মনীতির প্রসঙ্গে কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এই অর্থে না গ্রহণ করে বরং ইতিবাচক ক্ষেত্রেরই বিস্তৃতি ঘটায় এইভাবে গ্রহণ করা যায় ।

প্রেত দান :

আত্মীয় স্বজন বা পরিবারের কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁর পারলৌকিক কর্ম সম্পাদন করার সময় যে দান করা হয় তা বৌদ্ধ দর্শনানুসারে প্রেত দান নামে স্বীকৃত হয়েছে । মিলিন্দ প্রশ্নে রাজা মিলিন্দ এবং নাগসেন এর কথোপকথনেও এইরূপ দানের উল্লেখ পাওয়া যায় । সেখানে বলা হয় যে, পারলৌকিক ক্রিয়ার ফল যদি প্রেতগণ গ্রহণ না করেন তাতেও ঐ কর্মফল বিনষ্ট হয় না । বরং দাতাগণ ঐ ফল লাভ করেন । তাই বলা যায় বৌদ্ধ মতানুসারে দান জন্য ফল নিস্ফল হয় না । [৩১]

দানের সময় অনুসারে দানের শ্রেনীকরণ :

দানের উক্ত প্রকারগুলি ছাড়াও বৌদ্ধ দর্শনে অতিরিক্ত আরও পাঁচ প্রকার কাল দান - এর উল্লেখ পাওয়া যায় । প্রশ্ন হতে পারে কাল দান বলতে কী বোঝায় ? বৌদ্ধ মতানুসারে উপযুক্ত সময়ে নির্দিষ্ট যাচকগণকে তাদের প্রয়োজন অনুসারে যে দান করা হয় তা কাল দান রূপে অভিহিত হয়েছে । এর প্রকারগুলি হল -
১) আগন্তুক ভিক্ষুগণকে তাদের প্রয়োজন অনুসারে দান ২) বিদেশে যেতে ইচ্ছুক এমন ব্যক্তির সাহায্যার্থে দান ৩) অসুস্থ ,রুগ্ন ভিক্ষুগণের সাহায্যার্থে যে দান ৪) দুর্ভিক্ষের সময় প্রয়োজন অনুসারে সকলের উদ্দেশ্যে দান এবং ৫) দাতার নিজের বাড়ীতে উৎপন্ন যেকোন নতুন শষ্যের দান ।

বুদ্ধ বচনের নিরিখে দান ও তার ফল :

ভগবান বুদ্ধের মতে দান বহু প্রশংসনীয় ও মহাফলপ্রদ । দানের দ্বারা সর্বজ্ঞতা লাভ হয় । এই দানের মাধ্যমেই

---

৩১. *মিলিন্দ প্রশ্ন* , গৃহীত *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম* , পৃ : ৪৮০

যে নির্ব্বাণ লাভ করা সম্ভব এই বিষয়ে জাতকে ভগবান বুদ্ধের পূর্ব জীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আদীপ্ত জাতকেও দেখা যায়, ' সাতজন প্রত্যেক - বুদ্ধ রাজার দান গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে উপদেশ দেন । উঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন তিনি দানের মহাফল কীর্তন করিয়া 'মহারাজ অপ্রমত্ত হউন' বলিয়া রাজাকে উপদেশ দিলেন' ।[৩২] বৌদ্ধ মতানুসারে 'দান মহাফলপ্রদ একটি বিষয় । কোন কোন বস্তু দান করলে কী কী ফল লাভ করা যায় তারও উল্লেখ বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলিতে বর্ণিত হয়েছে । যেমন - দানের ফল সম্বন্ধে 'দীর্ঘনিকায়ে' বলা হয়েছে, 'ভাল অন্ন বস্ত্রাদি দান করলে স্বর্গ লাভ হয় , -- স্বর্গে দেবতারূপে জন্ম হয় যে ব্যক্তি সৎকারে নিজের হাতে, প্রসন্ন মনে দান করে তার স্বর্গে তেইশজন দেবতার মধ্যে জন্ম হয় । আবার এই প্রসঙ্গে সংযুক্ত নিকায়ে নির্দেশিত হয়েছে যে , যারা দান করে তারা সুখলাভ করে । আর যারা দান করে না তাদের ধন চোর হরণ করে কিংবা রাজা হস্তগত করে । তাই বৌদ্ধ মতানুসারে মেধাবী দাতাগণ স্বেচ্ছায় আপন বিষয়ের দান করবেন । দানের ফলে দাতাগণ বিস্তর ধন উপার্জন করে ধনী হতে পারেন । গ্রহীতার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান এবং দান জন্য শ্রদ্ধা মনোভাবের জন্য দাতা সুন্দর ও রূপবান হবেন । দান বিষয়ে ভক্তি থাকলে দাতাগণের প্রতি স্ত্রী, পুত্র দাস - দাসীগণ অনুরক্ত ও অনুগত হন । দান ক্রিয়া যদি উপযুক্ত সময় মতো সাধিত হয় তবে দাতাগণ ধন - সম্পত্তি লাভ করে সুখে বসবাস করতে পারেন । কোন কোন বস্তু দান করলে কী কী ফল লাভ করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, বৌদ্ধ মতানুসারে 'অন্নদাতা বলবান হয়, বস্ত্রদাতা বর্ণবান হয়, যানদাতা সুখী হয় , দীপদাতা চক্ষুষ্মান হয়। যে ব্যক্তি উপাশ্রয় বা আশ্রয় 'দান' করেন সে আশ্রয় দান করে সর্বদাতা হয় । যে ধর্ম অনুশাসন করে, সে অমৃতদাতা হয় '।[৩৩] আবার যেসকল ব্যক্তি প্রসন্ন চিত্তে 'অন্ন দান' করেন তাঁর ইহলোক এবং পরলোকে খাদ্য সুনিশ্চিত হয় । পক্ষান্তরে যেসকল ব্যক্তি এইরূপ দান করেন না কিংবা নিজের খাদ্য গ্রহণের সময় উপস্থিত কোন বৌদ্ধ ভিক্ষু বা শ্রমণগণকে দান না করে ফিরিয়ে দেন তাদের নিন্দা করা হয় । বৌদ্ধ ভিক্ষু বা ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয় যে দান যেমন - অষ্টপরিখা দান এর ফল বিষয়ে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অতি প্রসন্নতার সঙ্গে এইরূপ দান করতে সমর্থ হবেন তিনি ভোগবান এবং

---

৩২. অপর পাঁচ প্রত্যেক - বুদ্ধ দানের প্রশংসা করিয়া বলেন,

''দান বহু প্রশংসার্হ, নাহিক সংশয়,
দানাপেক্ষা ধর্মপদ শ্রেষ্ঠ অতিশয় ।
তদূর্ধ্বে নির্বাণ, যাহা দান - প্রজ্ঞা - বলে
লভিলেন সাধুগণ পূর্ব পূর্ব কালে । '' আদীপ্ত - জাতক, ৪২৪, গৃহীত *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম*, পৃ : ৫৬৪

৩৩. *সংযুক্তনিকায়* , (১।৫।২), গৃহীত *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম*, পৃ : ১৫৫-১৫৬

ধনবান হতে পারবেন। আবার গৃহী বা সংসারী পরিবারের গৃহকর্ত্রী স্ত্রীগণের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, তারা প্রসন্নচিত্তে এইরূপ দানকার্য্য সম্পাদন করতে পারলে ধনবতী, ভোগবতী ও রূপবতী হবেন । যিনি ভিক্ষুগণকে ভিক্ষা পাত্র দান করবেন তিনি নানা প্রকার নতুন নতুন বাসনাদি পেতে পারেন । ভিক্ষুগণকে বা ভিক্ষুসংঘকে ক্ষুর দান করলে দাতা শীলবান বা প্রজ্ঞাবান হন । দাতা সূঁচ, কোমরবন্ধনী এবং জলছাঁকনি প্রসন্নমনে দান করলে যথাক্রমে প্রথিতযশা শিল্পী হন, তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেন এবং শেষতঃ বিশুদ্ধকায় অবস্থায় নীরোগ ও নির্ভরহীন ভাবে জীবন যাপন করতে পারেন । [৩৪] বৌদ্ধ মতানুসারে উপযুক্ত পাত্রে অর্পিত দান উর্বর ক্ষেত্রে রোপিত বীজের ন্যায় প্রচুর পরিমাণ ফল প্রসব করে । কিন্তু ভোগাসক্তভাবে অর্পিত দান অনুর্বর ক্ষেত্রে রোপিত বীজের ন্যায় । দানে গ্রহীতার ভোগাসক্তি পুণ্যার্জনের বিঘ্নকারক । বুদ্ধ বিশাখাকে তার দানফল বিষয়ে সাধুবাদ প্রদান করে বলেন : 'ধর্মপরায়ণা স্ত্রীলোক বুদ্ধের শিষ্য হইয়া হৃষ্টচিত্তে এবং সর্বান্তকরণে যাহাই দান করুক , ঐ দান স্বর্গীয় , দুঃখপনোদনকারী এবং মঙ্গলপ্রসূ । অপবিত্রতা মুক্ত হইয়া তাঁহার জীবন শান্তিময় হইবে । শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া তিনি সুখলাভ করেন ; নিজের উদার অনুষ্ঠানে আনন্দ অনুভব করেন ।'[৩৫] দান বিষয়ে ক্ষেত্রবিশেষে অতিদানও যে একইভাবে ফল প্রসব করে এই বিষয়েও বৌদ্ধমতের সমর্থন পাওয়া যায় । এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ সাহিত্য মিলিন্দ প্রশ্নের আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ ।

মিলিন্দ প্রশ্ন :

প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ সাহিত্যের এক অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'মিলিন্দপঞ্হ বা মিলিন্দ প্রশ্ন' । গ্রীক রাজা মিলিন্দ এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু সন্ন্যাসী নাগসেনের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে অভিধর্মপিটকের বহু জটিল তত্ত্ব তথা প্রশ্নের সমাধান বর্ণিত হয়েছে । এই গ্রন্থে উভয়ের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে 'দান' বিষয়েও বহু আলোচনা যেন গল্পের আকারে পরিবেশিত হয়েছে । এই বিষয়ে মিলিন্দ প্রশ্নের অষ্টম বর্গে উল্লিখিত 'বেস্‌সন্তর রাজার দান' অন্যতম উল্লেখযোগ্য আখ্যায়িকা । এই আখ্যায়িকায় বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেন রাজা মিলিন্দের 'অতিদান' যে নিস্ফল নয় তারই উল্লেখ করেছেন । এই গ্রন্থে বুদ্ধদেবের পূর্বজীবনে রাজা বেস্‌সন্তর হয়ে জীবন যাপন এবং তাঁর দান বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় ; যা বর্ত্তমান আলোচনায় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য । [৩৬] কথিত আছে, পূর্বজন্মে

---

৩৪. *রত্নমালা,* পৃ : ২০৮

৩৫. বিশাখানামক শ্রাবস্তিনগরের একজন ধনশালিনী এবং বহু সন্তানসন্ততি সম্পন্না রমনী পূর্বারাম নামক উদ্যান সঙ্ঘকে দান করেছিলেন সেই প্রসঙ্গে বুদ্ধের উক্তি । *বুদ্ধবাণী* , পৃ :৬২

৩৬. *মিলিন্দ প্রশ্ন ,অষ্টম বর্গ বেসসন্তর রাজার দান ,* পৃ:২২৯

বুদ্ধ যখন রাজা বেস্সন্তর হয়ে জীবন যাপন করছিলেন তখন তাঁকে অন্যায়ভাবে নিজ রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়ে রাজ্যের সমস্ত ধন সম্পত্তি এমনকী অশ্বসহ নিজের রথটিকেও দান করতে হয় । পরে তিনি স্ত্রী , পুত্র ও কন্যা সহ বনে পাতার কুটিরে বসবাস করতেন এবং বনের ফলমূল খেয়ে কোনক্রমে নিজেদের জীবন ধারণ করতেন । সেই সময়ে এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষুককে তার পুত্র এবং কন্যাকে ভিক্ষা দিলেন । এরপর স্বর্গ থেকে ইন্দ্র এসে তার স্ত্রীকে নিতে চাইলেন। রাজা বেস্সন্তর সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর সতী সাধ্বী স্ত্রীকেও দান করলেন । দেবতারা তার দানে সন্তুষ্ট হয়ে পুষ্পবৃষ্টি করলেন । রাজা বেস্সন্তর বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির আশায় প্রিয়ভার্যা , পুত্রকন্যাদের দান তুচ্ছ ঘটনা বলে মনে করলেন । প্রশ্ন হল রাজা বেস্সন্তের এইরূপ দান কী শ্রেষ্ঠ দান হল ? রাজা মিলিন্দ ও স্থবির নাগসেনের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বেস্সন্তর রাজার স্ত্রী পুত্র ও কন্যা দানের প্রসঙ্গে বহু নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপিত ও আলোচিত হয়েছে । উল্লেখ্য যে, এই প্রসঙ্গে রাজা মিলিন্দের প্রশ্নগুলি সেই যুগের তুলনায় রীতমত আধুনিক ছিল বলা যেতে পারে । তার প্রশ্ন ছিল যে, এ জাতীয় স্ত্রী পুত্রের দান সকল বোধিসত্ত্বেরই করণীয় কিনা এবং ভার্যা ও পুত্র- কন্যার দান কীভাবে কুশলকর্ম রূপে গৃহীত হতে পারে ? নাকি এইরূপ দান অকুশলকর্ম বলেই বিবেচিত হওয়া উচিৎ ? রাজা মিলিন্দ এই প্রশ্নও করছেন । যদিও এই দান বিষয়ে রাজার ভার্যা অর্থাৎ স্ত্রী সম্মত ছিলেন কিন্তু তাঁর সন্তানদ্বয় অর্থাৎ পুত্র এবং কন্যা উভয়েই দানের সময় কান্নাকাটি করে ঐ দান ক্রিয়ায় অসম্মতি প্রকাশ করেছিল। রাজা মিলিন্দ বেস্সন্তের এইরূপ স্ত্রী ও পুত্র দানকে 'দুস্করতর কর্ম' বলে অভিহিত করেছেন সাতটি কারণে । যেমন - (১) নিজের ঔরসজাত পুত্রগণকে ব্রাহ্মণের দাসত্বের জন্য দান করেছেন (২) এই দান ক্রিয়া সম্পাদনে তিনি নিজে চিত্ত বিকারহীন থেকেছেন (৩)তাঁর ধর্মপত্নীর গর্ভজাত সন্তানদের ভয় - বিহ্বলতা উপেক্ষা করেছেন (৪) তিনি সন্তানদের কাতর অনুরোধেও তাদের আশ্বস্ত করেন নি (৫) তাদের প্রার্থনাকে সমর্থন করেন নি (৬) তিনি এই বিষয়ে করুণাহীন থেকেছেন (৭) এবং নির্দয় থেকেছেন । তাই মিলিন্দ নাগসেনকে প্রশ্ন করছেন, 'ভন্তে । পুণ্যকামীর পক্ষে এই প্রকারে পরকে দুঃখ দেওয়া উচিৎ কি ? বরং ইহা অপেক্ষা নিজেকে দান দেওয়া তাঁহার উচিৎ ছিল নহে কি ?' [৩৭] নাগসেন প্রথমে উত্তর দিচ্ছেন যে, এই ধরণের দান করবার জন্যই বোধিসত্ত্বের কীর্তি দেব ও মানব সকলের মধ্যে ঘোষিত হয়েছে । আর এইরূপ ঘোষণার মধ্যে দিয়েই বোধিসত্ত্বের দশধরণের গুণের কথাও উল্লিখিত হয়েছে । যেমন - (১) অগৃধ্নুতা (২) সাংসারিক বিষয়ে উদাসীনতা (৩) ত্যাগ (৪) বৈরাগ্য (৫) সংকল্প দৃঢ়তা (৬) সূক্ষ্মতা (৭) মহত্ত্বতা (৮) দূরধিগম্যতা (৯) দুর্লভতা (১০) বুদ্ধধর্মের অসদৃশ্যতা । [৩৮] মিলিন্দ পুনরায় প্রশ্ন করছেন : 'ভন্তে নাগসেন !

---

৩৭. *মিলিন্দ প্রশ্ন ,অষ্টম বর্গ বেসসন্তর রাজার দান* , পৃ:২৩০

৩৮. ঐ, পৃ:২৩০

যিনি পরকে কষ্ট দিয়া দান করেন , সেই দানের ফল কি ভাল হয় ? উহাতে কি স্বর্গ লাভ হয় ? নাগসেনের উত্তর পরকে কষ্ট দিয়ে প্রদত্ত দান থেকেও স্বর্গদায়ক ও সুখজনক ফল পাওয়া যায় । তিনি নানা ধরণের দৃষ্টান্তের সাহায্যে তার মত স্থাপন করেছেন । কিন্তু এইরূপ অপরকে কষ্ট দিয়ে প্রদত্ত দানও যে সুখদায়ক এবং যশস্কর হয় মিলিন্দের কাছে এইরূপ যুক্তি যথেষ্ট সমর্থনযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি । তার মনে হয়েছে রাজা বেসসন্তের এইরূপ দান 'অতিদান' হয়েছে অর্থাৎ যথার্থ দানের পরিবর্তে দানের আতিশয্য হয়েছে । তিনি নিজের ভার্যা বা স্ত্রীকে অপরের স্ত্রী হওয়ার জন্য দান করেছেন, নিজের ঔরসজাত সন্তানগণকে ব্রাহ্মণের দাসত্ব নিমিত্ত দান করেছেন। বুদ্ধিমানদের এইরূপ অতিদানও নিন্দিত ও গর্হিত । তার থেকে ভাল ফলের প্রত্যাশা করা যায় না । এর উত্তরে নাগসেন যা বলেছেন , তা প্রকৃত প্রশ্নটির মধ্যে যে তীব্র বিরোধিতা ছিল তার সমমানের হয় নি । বরং নাগসেনের প্রদত্ত উত্তরে তা যেন অনেকটাই সাধারণত সমাজ যা গ্রহণ করে তাই স্বীকার করে নেওয়ার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । নাগসেন তাঁর উত্তরে এইরূপ দানের অতিদান হওয়ার ক্ষেত্রটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন । কারণ তিনি মনে করেন যে, দানের তুলনায় অতিদান দাতাকে সংসারে অধিক কীর্তিভাজন করে । আর সেকারণেই রাজা বেস্সন্তর ঐরূপ দান পন্ডিতদের মধ্যে প্রশংসিত, স্তুত, সম্মানিত, পূজিত ও কীর্তিভাজন হয়েছে বলেছেন এবং সেকারণেই কেবল দান নয় বরং নানা প্রকার দৃষ্টান্তের সাহায্যে নাগসেন অতিদানের গুরুত্বও প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেমন - অতি উত্তম জাতীয় ঔষধ, অধিক শীতলতা, অধিক উষ্ণতা , অতি মহত্ততা, অতি উচ্চতা, অতি বলবত্তা , অতি শীলবত্তা , অতি পুণ্যবত্তা, ইত্যাদির সমান অতিদান অতি কীর্তিজনক এমন যুক্তি দিয়েছেন ।

দান ও কূটদন্তের যজ্ঞ :

ভগবান বুদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীগণের জন্য বৈদিক হোম ও যজ্ঞের অনুষ্ঠানেরও অনুমোদন করেছিলেন । সূত্ত নিপাতের মাঘ সূত্তে এর উল্লেখ পাওয়া যায় । মাঘ ভগবান বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কে শুদ্ধ হয়, মুক্ত হয় ? আর কে বন্ধনগ্রস্ত হয় ? কিসের দ্বারা মনুষ্য নিজের প্রচেষ্টায় ব্রহ্মলোকে গমন করে ? '' [৩৯] যুবক মাঘের এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বুদ্ধ বলেন, ' যে ত্রিবিধ যজ্ঞ - সম্পদের অনুষ্ঠান করে, সে দাক্ষিণেয়দিগের সহিত সিদ্ধি লাভ করে । সর্বদা প্রার্থনা - পুরোন্মুখ এইরূপ অনুষ্ঠানকারী ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, ইহাই আমার বাণী ।' [৪০]

---

৩৯ . সূত্তনিপাত ৫০৮ (মাঘসূত্ত ২২), গৃহীত *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম,* পৃ ১৫১
৪০. ঐ, ৫০৯ (ঐ,২৩) গৃহীত *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম,* পৃ ১৫১

যজ্ঞের ত্রিবিধ সম্পদ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ,'যজ্ঞানুষ্ঠানের পুর্বে , সামগ্রী সংগ্রহের সময়ে, যজ্ঞানুষ্ঠানকালে কিংবা যজ্ঞানুষ্ঠান শেষ হইয়া যাওয়ার পরে মনে যেন এই অনুশোচনা না হয় যে যজ্ঞে বহু ধন ব্যয় হইতেছে বা হইয়াছে । ইহাই যজ্ঞের তিন বিধি বা ত্রিবিধ যজ্ঞসম্পদ ।'[৪১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কূটদন্তসূত্তে ব্রাহ্মণ কূটদন্ত এবং ভগবান বুদ্ধের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে অল্প সামগ্রী ও সম্ভারযুক্ত হিংসারহিত যুদ্ধ ও তার মহাফলবিষয়ে বহু আলোচনা পরিলক্ষিত হয় ।

এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, মগধের জনৈক এক ব্রাহ্মণ কূটদন্ত ছিলেন এক প্রসিদ্ধ বেদ অধ্যাপক । দেশ - বিদেশ থেকে বহু বিদ্যার্থী তাঁর কাছে বেদের অধ্যাপনা করতে আসতেন । তিনি তাঁদের বেদ বিষয়ক জ্ঞান উপদেশ করতেন । মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ব্রাহ্মণ কূটদন্তকে সম্মান - মর্যাদা ও শ্রদ্ধা - ভক্তি প্রদর্শন সহ তাঁকে একটি গ্রাম দান করেন । ব্রাহ্মণ কূটদন্ত তাঁর গ্রাম খানুমতে একসময় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান আয়োজন করার উদ্দেশ্যে বহু পশু যেমন - গরু, বাছুর, স্ত্রী বাছুর , ছাগল ও ভেড়ার সংগ্রহ করেন। এই সকল পশুর প্রতিটিই মোট সাতশত সংখ্যায় সংগ্রহ করেন । উদ্দেশ্য ছিল মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে মহাফললাভ করা । সেই সময়েই ভগবান বুদ্ধ তাঁর মহাভিক্ষুসংঘের সঙ্গে কূটদন্তের গ্রাম মগধের খানুমতে পৌঁছলে কূটদন্ত এইবিষয়ে সিদ্ধান্ত করেন যে, ঐ গ্রামে বুদ্ধ এবং তার ধর্ম প্রচারসহ তাঁর আয়োজিত ঐ বিশাল যজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে তিনি বুদ্ধের উপদেশাবলী শুনবেন । কারণ তিনি ইতিপূর্বেই শুনেছিলেন যে বুদ্ধ ত্রিবিধ উপায়ে এবং ষোড়শ উপচার সহ যজ্ঞ করতে পারেন । তাই সিদ্ধান্ত মতো বুদ্ধের কাছে গিয়ে কূটদন্ত তার সেই ইচ্ছাই জ্ঞাপন করলেন । ব্রাহ্মণ কূটদন্তের এইরূপ অনুরোধে বুদ্ধদেব তাঁকে প্রাচীন রাজা মহাবিজিতের কাহিনী শোনালেন , যিনি একসময় এমন এক যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করার ইচ্ছা করেছিলেন যা চিরকালীন তাঁর হিতার্থে এবং সুখার্থে বিদিত হবে। রাজা মহাবিজিত ভাবলেন যে, তিনি বহু অর্থ উপার্জন করেছেন - স্বর্ণ , রৌপ্য, সম্পত্তি অর্জন করেছেন , বহু রাজ্য জয় করেছেন । সুতরাং তাঁর নিজের সমৃদ্ধি ও শান্তির জন্য বিশাল যজ্ঞ করা প্রয়োজন । রাজার মনের ঐরূপ ইচ্ছায় মন্ত্রী তাঁকে পরামর্শ দিয়ে জানালেন যে ডাকাতের উপদ্রবে রাজার রাজত্বে বহু লোক অত্যাচারিত ও বিধ্বস্ত । তাদের উৎপাতে গ্রাম , শহর ও নগরের লোকজন বিধ্বস্ত এবং জনপথ তাদের উপদ্রবে অধ্যুষিত । তাই এই অবস্থায় রাজা যদি ঐরূপ বিশাল যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সাধারণ জনগণের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপান তাতে জনমত রাজার বিরুদ্ধে যাবে

৪১. *দীঘনিকায়,* কূটদন্তসূত্ত, (৫) ১ম খণ্ড, *গৃহীত বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম,* পৃ ১৫১

এবং রাজত্বে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখা দেবে । মন্ত্রীর কাছে এইরূপ পরামর্শ শুনে ডাকাতদের উপদ্রব থেকে তাঁর রাজত্বকে রক্ষা করার জন্য সম্ভাব্য উপায়রূপে রাজ ক্ষমতাবলে ডাকাতদের সর্ব্বস্ব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাদের বন্দী করা, দন্ডাদেশ দিয়ে তাদের শাস্তি দান করা, তাদের নির্বাসিত করা কিংবা প্রাণদন্ড দিয়ে তাদের হত্যা করা ইত্যাদি ভেবেও বিজিত রাজা ঐসকল হিংসামূলক পথের কোনটিরই আশ্রয় না নিয়ে চিরতরে ঐরূপ বর্বরোচিত প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে তিনি ভিন্ন পথের আশ্রয় গ্রহণ করলেন ; এবং সেই উদ্দেশ্যে রাজ্যে বসবাসকারী প্রতিটি ব্যক্তি যে যে উপায়ে অর্থ উপার্জন করেন তাকে তার কর্মে ব্যস্ত রাখতে উদ্যোগী হলেন এবং সেই বিষয়ে সাহায্য করলেন। যেমন - কৃষককে কৃষি কর্মের জন্য বীজ দিয়ে সাহায্য করলেন, পশুপালককে পশুপালন কর্মের জন্য গবাদি পশুর খাদ্য দিলেন , ব্যবসায়ীকে তার ব্যবসার জন্য অর্থ সাহায্য প্রদান করলেন এছাড়াও রাজকর্মচারীদের জন্য তাদের শ্রমের বিনিময়ে খাদ্য এবং বেতন সুনিশ্চিত করলেন । লক্ষ্য ছিল একটাই , প্রতিটি লোক যদি নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে এবং প্রত্যেকের কাছেই যদি তাদের ও তাদের পরিবারের সকলের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান থাকে তাহলে আর তারা কেউই একে অপরকে বিরক্ত বা উপদ্রুত করবে না বা করতে পারবে না । তাতে সময়মতো কর ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে রাজার রাজকোষ যেমন পরিপূর্ণ হবে তেমনি তাঁর রাজত্বও সকল প্রকার হিংসা ও অত্যাচার বিমুক্ত হয়ে নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হবে । এই সকল কর্মকান্ড পূর্ণ হলে রাজা মনস্থির করেন যে বৃহত্তর মঙ্গল এবং সমৃদ্ধির স্বার্থে এবার তিনি ত্যাগ করতে চান এবং সেই উদ্দেশ্যে রাজা মহাবিজিত প্রথমে অভিজাত ভূমধ্যিকারী বা সামন্ত রাজা, মন্ত্রী পরিষদ , সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও স্বচ্ছল গৃহস্থ এই চার প্রকারের সহায়ক নির্ধারণ করেন এবং তাঁদের কাছে এইরূপ দান ক্রিয়ার অনুমোদন চান । আবার এই বিষয়ে তিনি অতিরিক্ত আট প্রকারের আনুষঙ্গিকও নিয়োগ করেন । তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন - (১) সুবংশোদ্ভূত পিতৃকূল ও মাতৃকূল উভয়দিক থেকেই সাতপুরুষ ধরে তর্কাতীত এবং নিষ্কলঙ্ক এমন ব্যক্তি (২) সুপুরুষ ও সৌন্দর্যবান এবং বৈভব ও মর্যাদার অধিকারী (৩) ধনী ,যাঁর কাছে ছিল প্রচুর স্বর্ণ , মণি মাণিক্য ও রত্নরাজি । অপার সম্পদ ও ধনধান্যে যাদের রাজকোষ ছিল সর্বদাই পরিপূর্ণ (৪) তারা ছিলেন পরম শক্তিশালী । চর্তুসৈন্যবাহিনী ছিল সর্বদাই তাদের অনুগত ও আজ্ঞাবাহক (৫) তারা ছিলেন উদার ও মহান দাতা । যাদের দ্বার সব সময়ে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকত (৬) সন্ন্যাসী , ব্রাহ্মণ , কপর্দকশূন্য, ভবঘুরে ও পর্যটক সকলের জন্যেই তাদের মনোভাব ছিলো উদার ও সমমনোভাবাপন্ন (৭) তাদেরকে হতে হত যথেষ্ট শিক্ষিত এবং বোধক্ষম । যেমন - ‘এই বাক্য দ্বারা এটা বোঝানো হচ্ছে কিংবা ওই বাক্য দ্বারা ওটা বোঝানো হচ্ছে’ এই আকারের অনুধাবন বোধ তাদের ছিল । (৮) তারা ছিলেন কৌশলী ও বুদ্ধিমান । যে কোন সমস্যার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত নিহিতার্থ অনুধাবন করার সামর্থ্য তাদের ছিল । এদের সকলের পরামর্শে রাজা তাঁর যজ্ঞে ঘি, তেল, মাখন, দৈ, মধু ও গুড়ের আহুতি দিয়েই সম্পন্ন করেন । যে যজ্ঞে কোন

গাছ কাটা হয় নি, কোন পশু যেমন গো, ছাগ, মেষ কিংবা শূকর ইত্যাদির বলি হয় নি এবং যজ্ঞভূমিতে কোন ঘাসও ছড়ানো হয় নি । এরপরে ভূমধ্যিকারীগণ, মন্ত্রী - পারিষদ, সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ ও ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার জন্য অর্থ ও সম্পদ দিয়ে রাজাকে সাহায্য করতে উদ্যোগী হলে পরম স্নেহে রাজা তাদেরকে জানিয়েছিলেন যে , যথাসময়ে তাদের প্রদেয় করই রাজাকে তাঁর ঐরূপ বিশাল দান - যজ্ঞ সম্পন্ন করতে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের যোগান দিয়েছে তাই এর জন্য আর অতিরিক্ত কোন অর্থের প্রয়োজন নেই । বলা বাহুল্য যে , রাজা মহাবিজিতের ঐ বিশাল দান - যজ্ঞের ব্রাহ্মণ ছিলেন স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ । এইরূপ হিংসারহিত যজ্ঞানুষ্ঠান যে নিস্ফল হয় না সেই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব কূটদন্তকে উপদেশ করে আরও বলেছেন, ‘হে ব্রাহ্মণ! আমি জানি যে ঐ প্রকার যজ্ঞ করিয়া কিংবা করাইয়া (মনুষ্য) দেহত্যাগ হইলে, মরণের পর, সুগতই স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয় । ’’ [৪২]

বৌদ্ধ দান তত্ত্বে অভিনবত্ব ও তদানীন্তন সমাজচিত্র :

ব্রাহ্মণ ও সংহিতা পর্বের শেষ ভাগ থেকে শুরু করে প্রায় মৌর্য্যযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত বৌদ্ধ যুগে যে সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় সেখানে দেখা যায় যে, একটা ব্যপক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সামাজিক পরিকাঠামো নতুন করে সুসজ্জিত হয়েছিল । যার মধ্যে অন্যতম ছিল তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত বৈদিক চিন্তাভাবনা তথা ধ্যান - ধারণার পরিশুদ্ধিকরণ । এর প্রয়োজন হয়েছিল কারণ এই সময়ে সাধারণ মানুষ উভয় সভ্যতার মতাদর্শগত ভেদাভেদে ক্রমশই বিভ্রান্তি ও অস্থিরতায় পর্যবসিত হচ্ছিল । তাই প্রয়োজন হয়েছিল তাদের চিন্তাভাবনাকে বিচার - বিশ্লেষণমুখী করে তোলা ; যেটি তারা ধীরে ধীরে আয়ত্তাধীনও করেছিল । বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তিকালে তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থার যে সার্বিক অগ্রগতি বা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল তাতে দান ক্রিয়া অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে, এই সময়ে সমাজ ব্যবস্থা নতুন ধর্মব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করেছিল । আর তার ফলে ঘটেছিল মূল্যবোধ ও নব্য সংস্কৃতির মেলবন্ধন । যার সূচনা হয়েছিল মূলতঃ দান ক্রিয়া ব্যবস্থার নবরূপের মধ্যে দিয়ে । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বর্তমান আলোচনায় ‘নবরূপ’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে কারণ এই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতকগুলি নতুন ভাবনার সূচনা হয়েছিল যা সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল । যেমন - প্রথমতঃ গৃহী বা

---

৪২ *দীঘনিকায়, কূটদন্তসূত্ত, (৫)* ১ম খণ্ড, পৃ -১৪৩, গৃহীত *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম,* পৃ ১৫২

সংসারী এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু বা শ্রমণ সমাজের এই দুই প্রধান শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয়তঃ দানীয় বস্তু বা বিষয়ের পুনঃবিতরণ ব্যবস্থার প্রচলন, তৃতীয়তঃ দারিদ্র দূরীকরণ সহ ব্যক্তি নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় স্তরের উত্তরণ, চতুর্থতঃ সমাজের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের সুদৃঢ়করণ ও নীতিবোধের প্রতিষ্ঠা এবং পঞ্চমতঃ সমাজব্যবস্থায় নারীদের সম্মানমূলক অবস্থান ও ভূমিকার স্বীকৃতি প্রদান ।

প্রথমতঃ গৃহী বা সংসারী এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু বা শ্রমণ সমাজের এই দুই প্রধান শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বৌদ্ধ মতের পর্যালোচনা করলে স্পষ্টত বোঝা যায় এই অন্যোন্য মিথোজীবিতা যা 'দান প্রক্রিয়া'র মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় তা ছিল পারস্পরিক ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়ামূলক । তার ফলে গৃহী বা সংসারী এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু বা শ্রমণ সমাজের এই দুই প্রধান শ্রেণীর মধ্যেই বিস্ময়করভাবে দুঃখ কষ্টময় জগতের উদ্ধার কর্ত্তার ব্যঞ্জনা যুক্ত হয়েছে, যা দাতা - গ্রহীতার পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে নতুন তাৎপর্য্যের সূচনা করেছে । যা দানের সময় ও প্রক্রিয়ার শর্তসাপেক্ষ বলেও উল্লিখিত হয়েছে । জাগতিক ও আধ্যাত্মিকতার বিভাজন অনুসারে সমাজস্থ সকল মানুষের এই ভিন্নতা পারস্পরিক সুবিধা বৃদ্ধি করেছে । Elison Banks Findly তাঁর গ্রন্থ Dana , Giving and Getting in Pali Buddhism - এ মন্তব্য করেছেন এই 'দান প্রথা' প্রাচীন প্রচলিত 'দান প্রথা'র ফলরূপে উদ্ভূত হওয়ায় এবং তুলনায় তার থেকে কিছুটা ভিন্ন পথে চালিত হওয়ায় পালি বৌদ্ধ সম্মত 'দান প্রথা' নতুনত্ব পায়।

দ্বিতীয়তঃ দানীয় বস্তু বা বিষয়ের পুনঃ বিতরণ সম্বন্ধে বলা যায় , ইতিপূর্বে একবার দান করা হয়েছে এমন বিষয়ের পুনর্বার দান করার ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত ছিল না। তবে বৌদ্ধ ধর্মে এই ব্যবস্থার প্রস্তাব হল । শুধু তাই নয়, প্রস্তাব অনুযায়ী এই ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত হল এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজন ও নিয়মের নিরিখে সমধিক প্রসিদ্ধিও লাভ করলো । এই দানীয় দ্রব্যের পুণঃ বিতরণের প্রক্রিয়াটি বৌদ্ধ সমাজ ব্যবস্থায় এতই প্রসিদ্ধ হয় যে, এটি তদানীন্তন কালে প্রায় ধর্মীয় অভ্যাসের আকার ধারণ করে । তবে এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে , সেই সকল ক্ষেত্রেই দানের এই পুনঃবিতরণ প্রক্রিয়া প্রচলিত হয়েছিল যেখানে বিষয়টির প্রয়োজন প্রথম গ্রহীতার তুলনায় দ্বিতীয় গ্রহীতার কাছে অধিক বলে অনুভূত হয়েছে । যেহেতু এইরূপ দান ক্রিয়ায় দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের ইচ্ছার প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছিল তাই এই নিয়ম অনুসারে দাতা তার সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রহীতাকে তার প্রয়োজনের ভিত্তিতে যেকোন মূল্যের বিষয় দান করতে পারতেন । শুধু তাই নয়, ব্যক্তি ইচ্ছার পাশাপাশি এখানে গুরুত্ব পেয়েছিল ব্যক্তিগুণও । অর্থাৎ দান ক্রিয়ায় দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই ব্যক্তিগুণের প্রাধান্য ছিল । যার ভিত্তিতে সমাজে ব্যক্তি হিসেবে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই বিশেষ মর্যাদার স্থানাধিকারী হতেন । বৌদ্ধ ধর্মে

এই দান ক্রিয়ার দ্বারা দাতা পুণ্যার্জন ও গ্রহীতা নিজ নির্বাণ সাধনা মার্গে সমর্থ হতেন একথা স্বীকৃত হয়েছিল । তবে ব্যক্তি ভেদে নিয়মের ভিন্নতা ছিল । অর্থাৎ দাতা তার ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনুসারে দান করতে পারলেও গ্রহীতার জন্যেও তাকে কতকগুলি নিয়ম পালন করতে হত। যেমন তিনি দান করার সময় গ্রহীতার প্রয়োজনের দিকটির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করবেন এবং এই দান ক্রিয়ায় যাতে গ্রহীতার প্রতি যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা হয় সে বিষয়ে তিনি যত্নবান হবেন । একইভাবে গ্রহীতাকেও কতকগুলি নিয়ম পালন করতে হত, যেমন তিনি অপ্রয়োজনে যাঞ্ঞা করে দাতার বিরক্তি বোধের উদ্রেক করবেন না । দাতা তার প্রয়োজন সাধন করতে সক্ষম না হলেও তিনি দাতার নিন্দা করবেন না । এর তাৎপর্য্য ছিল যে, এই দান ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ - এর ধর্মীয় জীবনের গুণমাণ আরও বেশী উৎকৃষ্ট হয়ে উঠতে পারে সেবিষয়ে উভয়কেই সতর্ক হতে হবে ।

তৃতীয়তঃ দারিদ্র দূরীকরণ সহ ব্যক্তি নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় স্তরের উত্তরণ বিষয়ে বলা যায় ,নির্বাণের লক্ষ্যে পরিচালিত বৌদ্ধ দানতত্ত্বে যেভাবে বস্তু বা বিষয়ের পুনঃ বিতরণের বিষয়টিতে গুরুত্ব প্রদান করেছে তার লক্ষ্য হল , ধন - সম্পত্তির যথাযথ ও সর্বোচ্চ ব্যবহার সুনিশ্চিত হোক এমনটিই বৌদ্ধ মতের দাবী । কারণ এক্ষেত্রে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা যে রুদ্ধ নয় বরং তার পরিবর্তনও যে সম্ভব এমন সম্ভাবনার ক্ষেত্রই তৈরীর চেষ্টা করা হয়েছে । বৌদ্ধ দানতত্ত্ব অনুসারে কোন একজন ব্যক্তি, তিনি যদি গৃহী হন তবে তার উপার্জিত ধন - সম্পত্তি নিজের প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করে বাকি অংশটুকু তিনি তার ধর্মীয় স্বার্থেই অপরাপর দরিদ্র সংসারী গৃহীগণের জন্য কিংবা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বা সংঘের উদ্দেশ্যে দান করবেন । অর্থাৎ তিনি শুধু তার কথাই নয় বরং সমাজের অপরাপর ব্যক্তিগণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও সচেতন হবেন এমন উদ্দেশ্যেই এক্ষেত্রে লক্ষ্য রূপে স্বীকৃত হয়েছে । বৌদ্ধ ধর্মানুসারে এই ধর্মীয় নিয়মই একসময়ে দারিদ্রতার দূরীকরণ করে সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনীতিকে একটি নির্দিষ্ট বিধিতে পরিচালিত করবে । যেখানে মানুষের চাহিদার সংযমই হবে মূল লক্ষ্য যাতে তাদের চারিত্রিক নৈতিকতার বৃদ্ধি হতে পারবে । বৌদ্ধ দর্শনের সকল তত্ত্বই মূলতঃ নির্বাণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়ে সাধারণ গৃহী বা সংসারীগণকে এবং অবশ্যই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকেও যে সকল মার্গ অনুসরণের নির্দেশ দেয় তার লক্ষ্যই হল মানুষের চাহিদার নিয়ন্ত্রণ বা সংযম করা । একইভাবে বৌদ্ধ দানতত্ত্বেও সহায় - সম্পদ কিংবা অর্থ যেকোন বিষয়েরই সমবন্টনের উপর গুরুত্ব প্রদান করায় একটি বিষয় সুনিশ্চয় হয়েছে যে ,সমাজে যারা বিত্তবান কেবল তাদের কাছেই অর্থ কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে এবং তারা যেভাবে খুশি এর যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারছেন এমন নয় । বরং বৌদ্ধ নির্দেশ অনুসারে একবার ব্যবহারের পরে সেই বিষয়ের পুনঃ ব্যবহার সম্ভব কিনা সেই বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে । অপ্রয়োজনীয় কিংবা অতিরিক্তভাবে কি গৃহী বা কি

সন্ন্যাসীগণ কোন কিছুর ব্যবহার করবেন না । এইজন্য সংসারীগণের জন্য চাহিদার সংযম যেমন নির্দেশিত হয়েছে তেমনি বৌদ্ধ শ্রমণ বা ভিক্ষুগণের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য, পরিধানের বস্ত্র, ভিক্ষা পাত্র , কিংবা তাদের নিত্য ব্যবহার্য্য বিষয়ের গ্রহণ ও বন্টনে যথেচ্ছতাকে অনুমোদন করেননি বরং প্রয়োজনের ভিত্তিতে সংঘ কর্তৃক বন্টনের বিধির নির্দেশ করেছেন । বলা বাহূল্য বৌদ্ধ ধর্মে নির্দেশিত উক্ত বিধিসমূহে সংসারী গৃহী ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু উভয়েরই চারিত্রিক দৃঢ়তা ও নৈতিকতার প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে । শেষতঃ তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত ‘দানতত্ত্ব’ অনুসারে মূল দুই শ্রেণী অর্থাৎ সংসারী গৃহীগণ এবং বৌদ্ধ শ্রমণগণ কর্ত্তব্যের বাধ্যতাবোধে যেভাবে পারস্পরিক প্রয়োজনীয়তার দায়ভার গ্রহণ করে একে অপরের চাহিদা পূরণ পূর্ব্বক ধর্মীয় স্তরে উত্তরণের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ । কারণ সংসারী গৃহীগণ যখন বৌদ্ধ শ্রমণগণের জাগতিক চাহিদার পূরণ করেন তখন তাদের উদ্দেশ্য হল - প্রথমতঃ যাতে বৌদ্ধ শ্রমণগণ নিশ্চিন্তে এবং নির্বিঘ্নে ধর্মীয় সাধনা করতে পারেন সেই বিষয়ে সচেতন হওয়া এবং দ্বিতীয়তঃ বৌদ্ধ শ্রমণগণের সাধনার ভিত্তিতে সংসারী গৃহীগণেরও ধর্মীয় স্তরের চাহিদা পূরণ করে তাঁদেরকে নির্বাণের পথে পরিচালিত করবে এই বিষয়কে সুনিশ্চিত করা । বৌদ্ধ ধর্মনীতির এইরূপ অনুশাসনের মূল লক্ষ্য ছিল দ্বিবিধ, প্রথমতঃ, সত্যের অনুসন্ধান ও বোধিলাভে সচেষ্ট ভিক্ষুর ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা সুরক্ষিত হলে তার ক্ষুৎপিপাসা সংক্রান্ত উৎকণ্ঠার সমাধান হতে পারবে এবং জাগতিক বস্তুর প্রতি আকর্ষণ দুর্বল হতে পারবে । বুদ্ধবচন ও ধর্মপালনে ভিক্ষু মনোযোগী হতে পারবে । তার সত্য অনুসন্ধানের চেষ্টা ত্বরান্বিত হতে পারবে । দ্বিতীয়তঃ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের দ্বারা ভিক্ষুর আত্মদম্ভ, মিথ্যা আত্মসম্মান দূর হতে পারবে। ভিক্ষুর ভিক্ষাবৃত্তি পালন করতে গৃহ থেকে গৃহান্তরে গমন করার মধ্যে দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মনীতির প্রেক্ষিত থেকে প্রতিটি মানুষের সম মর্যাদা এবং সাম্য যে স্বীকার করা হয়েছিল সেই বার্তা সুস্পষ্ট ।

চতুর্থত ঃ সমাজের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের সুদৃঢ়করণ ও নীতিবোধের প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে দানের তাৎপর্য্য উল্লেখ করে বলা যায় , যেকোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব তার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিপোষণের উপরে নির্ভরশীল । বৌদ্ধ সংঘগুলি সংসার ত্যাগী ভিক্ষুদের সাথে জনপদবাসী গৃহস্থদের প্রাত্যহিক আদান - প্রদানের দ্বারা রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়ে থাকতো । এর মূলে দান নৈতিকতার বিশেষ অবদান ছিল ; বৌদ্ধধর্মের বিদ্যমানতা ও প্রসারণের প্রেক্ষাপটে এটি একটি মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিল । দান প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত সংযতভাবে ধনী - দরিদ্র বিভাজনের পথ তৈরী রুদ্ধ হয়েছিল । দান প্রক্রিয়া প্রচলিত অভিন্নতার আন্তর্ব্যক্তিক স্বরূপের উপর জোর দেয় । এখানে বুদ্ধদেব বলেছেন যে, ‘আত্মদীপোভব’ অর্থাৎ নিজেই নিজের পথ দেখাও । লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এখানে যাঁরা কৈবল্যবাদী তাঁরা প্রচলিত প্রথাগত নীতি থেকে সরে গিয়ে একধরণের স্বতন্ত্র্যতার নীতি সমর্থন করেছেন ।

যেমন, বৌদ্ধ ধর্মনীতিতে আমরা লক্ষ্য করি ভিক্ষাজীবি সন্ন্যাসীর সাথে দানের মধ্যে দিয়ে সাধারণ গৃহীর ক্রিয়া কর্ম নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্য পায় । দীঘনিকায় গ্রন্থের সিংগালোবাদ সূত্তে বুদ্ধদেবের এক নবীন গৃহস্থকে দেওয়া তাঁর উপদেশাবলী থেকে জানা যায়, বৌদ্ধ ধর্মনীতিতে নৈতিক ও নির্বাণ উপযোগী কর্মরূপে দান কে প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে দিয়ে বিত্ত বা অর্থের গুরুত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে । বৌদ্ধ ধর্মনীতিতে ব্যক্তির কেবল নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই নয় - বরং তা নিজের স্বার্থ অতিক্রম করে অপরের নির্বাণ লাভের সহায়ক হওয়ার জন্য অর্থের মধ্যস্থতা স্বীকার করা হয়েছে । অর্থের মূল্য ক্রয় বিক্রয় ক্ষমতার উপর নির্নীত না হয়ে অর্থের মূল্য দাতা এবং গ্রহীতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে ত্রাতার ভূমিকা লাভ করেছে । এই প্রসঙ্গে দীঘনিকায় গ্রন্থে ‘সিংগালোবাদ সূত্তে’ নবীন গৃহস্থকে অর্থ উপার্জন , ব্যয়নির্বাহ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করে অর্থের অপচয় নিষেধ প্রসঙ্গে বহু উপদেশ প্রদান করা হয়েছে ।

এইরূপে দান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বহু সময়েই হিন্দু ধর্মনীতি ও বৌদ্ধ ধর্মনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে পান্ডিত্যপূর্ণ এবং বিতর্কমূলক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে । যেখানে বৈদিক ও বৌদ্ধ সমাজের মতাদর্শগত বিরোধ দেখা দিয়েছে সেখানে কেউ মনে করছেন বৌদ্ধধর্ম সনাতন বৈদিক ধর্মের অভ্যন্তরীন বিকাশের এক রূপান্তরিত রূপ ; শ্রৌত যাগ যজ্ঞের ধারণার আত্তীকরণের মধ্যে দিয়েই বৌদ্ধ সম্মত দান - এর ধারণার উৎপত্তি হয়েছে । অপরদিকে বিরোধীপক্ষ ঐতিহ্যের আত্তীকরণের প্রশ্নে ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ এই জাতীয় স্পষ্ট উত্তর পরিহার করে ‘দানে’র ধারণার মধ্যে সনাতন পন্থী ব্রাহ্মণ্য উৎসের অতিরিক্ত কিছু আভাষ আছে বলে মন্তব্য করেছেন। আরও দৃঢ়তার সঙ্গে কেউ কেউ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন বৌদ্ধ সম্মত ‘দান’ - এর ধারণা স্পষ্টতঃ বৈদিক যজ্ঞীয় ধর্মের বিরোধিতা করেছে । প্রশ্ন হতে পারে, তবে কি বৌদ্ধধর্ম বৈদিক ধর্মের একটি বিরোধী বৈশিষ্ট্যসূচক বিকল্প নাকি বৈদিক ধর্মের ক্রমিক বিকশিত রূপান্তরের বিভিন্ন ধারার মধ্যের কোন একটি বিকল্প ? এই প্রশ্নের উত্তর অমীমাংসীত । কিন্তু এইরূপে বৌদ্ধধর্মে স্বীকৃত দানের ধারণার সঙ্গে বৈদিক ধারণার অবিরাম অনুবৃত্তির প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মে ‘দান’- এর ধারণার নৈতিকতার প্রসঙ্গ যুক্তি সহ আলোচনায় যে কোন নূন্যতা থেকে যায় এমন নয় । চতুঃবর্ণের সমাজ ব্যবস্থা হিন্দু সমাজের মধ্যে ক্রমাগত জাতপাতের ভেদাভেদ চরম ভিন্নতার এবং বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছে । অনেকেই মনে করেছেন বৌদ্ধ সমাজ ব্যবস্থায় এই ‘দান’ প্রক্রিয়া যেমন একদিকে ভোগসুখ পরিহারকারী আত্মত্যাগী ভিক্ষুদের দৈনন্দিন দৈহিক স্থূল প্রয়োজনের সিদ্ধ করতে পেরেছে, তেমনি অপরদিকে বিত্তশালীদেরও অর্থসংগ্রহের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও ধার্মিক কর্মসমূহের আবশ্যিক অঙ্গ সাধনের কর্মে নিবিষ্ট করতে পেরেছে । এইরূপ পুণ্যকর্ম সাধনের ফলে তাদের উৎকৃষ্টতর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা

বৃদ্ধি পেয়েছে । সুতরাং এই দান প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অর্থের উপার্জন এবং অর্থের ব্যয় নির্বাহ এক নৈতিক মাত্রা পেয়েছে।

পঞ্চমত ঃ সমাজব্যবস্থায় নারীদের সম্মানমূলক অবস্থান ও ভূমিকার স্বীকৃতি প্রদান প্রসঙ্গে বলা যায় , বৌদ্ধ যুগের সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত দানতত্ত্ব যেভাবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে তদানীন্তন আর্থ - সামাজিক চিত্র তুলে ধরে ঠিক সেইভাবেই সেই সময়ের সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান ও ভূমিকা সম্বন্ধেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখপূর্ব্বক তার ব্যাখ্যা প্রদান করে । সময়ের বিচারে যা অবশ্যই নতুনত্বের দাবী রাখে। এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে, বৌদ্ধ যুগে দান বিষয়ে নিজেদের মত প্রদানে কিংবা যেকোন দান ক্রিয়ায় সমাজে নারীদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছিল । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধ যুগের পূর্বে প্রচলিত বৈদিক যুগেও নারীদের দান করার অনুমোদন ছিল তবে বৌদ্ধ দর্শনে কেবল অনুমোদন নয় বরং তার তুলনায় ভিন্নরূপে ও উৎকৃষ্টমানে সমাজে নারীদের সম্মানীয় অবস্থান সুনিশ্চিত করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় , বৌদ্ধযুগের নারীগণ কেবল গৃহপতির স্ত্রী অর্থাৎ গৃহপত্নী হয়ে দান করার অধিকারী ছিলেন এমন নয়। বরং এক্ষেত্রে নারীগণ তাদের নামের নিরিখেই সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবেই নিজ নিজ পছন্দ অনুসারে দান ক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারতেন । তাদের কাছে কোন ভিক্ষু এসে অন্নের জন্য যাচ্ঞা করলে গৃহকর্ত্রীগণ কীভাবে তাদের চাহিদা পূরণ করবেন, যেমন - সিদ্ধান্ন কিংবা অপ্রস্তুত অন্নই দেবেন কিনা এই সিদ্ধান্ত ছিল সম্পূর্ণই তাদের এবং এর জন্য তাদের পরিবারের কর্তার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল এমন কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না । ফলতঃ একথা স্বীকার্য্য যে সেই যুগের আর্থ - সামাজিক পরিকাঠামোর বিন্যাসে নারীগণের উল্লেখযোগ্য অবস্থান ও ভূমিকা ছিল । তাৎপর্য্য এই যে, বৌদ্ধযুগের পূর্বে যেখানে সমাজে নারীদের অবস্থান বিষয়ে কোন গুরুত্ব প্রদান করা হোত না কিংবা স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রদানের সুযোগ দেওয়া হোত না, সেই সীমাবদ্ধতার অবসান ঘটেছিল বৌদ্ধযুগে। তৎকালে প্রচলিত দানতত্ত্বকে কেন্দ্র করে নারীগণের এইরূপ অবস্থান যে বৌদ্ধযুগের সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষদের মতোই সমানভাবে স্বাধীন ছিল ও ও তাদের জন্য যেরূপে ব্যক্তি -স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ দিয়েছিল তা অবশ্যই অভিনব প্রশংসার দাবী রাখে ।

তথ্যসূত্র :

- আচার্য্য মহাস্থবির বিশুদ্ধানন্দ, *বৌদ্ধ দর্শনে সত্য দর্শন (তুলনা মূলক দার্শনিক আলোচনা),* ১৯৫৩, প্রকাশক - মহাবোধি বুক এজেন্সী ,কলিকাতা - ৭৩ ।

- গুপ্ত মিহির (অনুবাদ ও ব্যাখ্যা), সেন রণব্রত (সম্পাদনা), *ধম্মপদ ,* ১৯৭৪ , প্রকাশক- হরফ প্রকাশনী , কলকাতা - ৭ ।

- চৌধুরী সাধনকমল , *বিশুদ্ধ মজ্ঝিমনিকায় ,* ১৪১৫ , প্রকাশক : করুণা প্রকাশনী ,কলকাতা - ৯ ।

- চৌধুরী (ডঃ) সুকোমল , *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন ,* ১৯৯৭, মহাবোধি বুক এজেন্সী , কলিকাতা- ৭৩ ।

- চৌধুরী (ডঃ) সুকোমল, *মহামানব গৌতম বুদ্ধ ,* বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ গ্রন্থমালা - ১ , ১৯৯৫, মহাবোধি বুক এজেন্সী , কলিকাতা - ৭৩ ।

- ঠাকুর সত্যেন্দ্রনাথ , *বৌদ্ধধর্ম ,* ১৯০১, মহাবোধি বুক এজেন্সী , কোলকাতা - ৭৩ ।

- বড়ুয়া (শ্রী) সুভূতি রঞ্জন, *সদ্ধর্ম - নীতি রত্নমালা ,* ১৯৬৪, প্রকাশক - মহাবোধি বুক এজেন্সী , কলিকাতা - ৭৩ ।

- বিদ্যারণ্য (স্বামী) , *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম,* ১৯৮৪ , প্রকাশক - পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ , কলিকাতা - ১৩ ।

- ব্রহ্মচারী (শ্রী) শীলানন্দ , *অভিধর্ম - দর্পণ (বৌদ্ধদর্শন ও মনস্তত্ত্বের আলোচনা) ,* অখন্ড সংস্করণ ১৩৯৮ ,প্রকাশক : শ্রী তপন ব্রহ্মচারী , বসুনগর উত্তর ২৪ পরগণা ।

- ব্রহ্মচারী (শ্রী) শীলানন্দ , *সংযুক্ত নিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড),* ১৪০০ সালঃ, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কোলকাতা - ৭৩ ।

- ভিক্ষু (ডঃ) এফ. *অশোকের শিলালিপির আলোকে প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা* , দীপংকর, ২০১১, পরিবেশন: মহানন্দ সংঘরাজ বিহার, চট্টগ্রাম ।

- ভিক্ষু শীলভদ্র (অনূদিত), *দীঘনিকায়* (অখন্ড) , সন ১৩৫৩, প্রকাশক : মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা - ৭৩ ।

- ভিক্ষু শীলভদ্র , *সুত্ত নিপাত* , সন ১৩৮৩ খ্রীঃ, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কোলকাতা - ৭৩ ।

- ভিক্ষু শীলভদ্র, *বুদ্ধবাণী* , ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ, প্রকাশক : মহাবোধি বুক এজেন্সি, কোলকাতা - ৭০০০৭৩ ।

- মহাস্থবির ধর্মাধার পন্ডিত, *বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন* , ২০১৫ , প্রকাশক: মহাবোধি বুক এজেন্সী , কলিকাতা - ৭৩ ।

- রায় (শ্রী)শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদূর (অনুদিত), *বোধিসত্ত্বাবদান - কল্পলতা* , ক্ষেমেন্দ্র (মহাকবি) বিরচিত, ২০০০, মহাবোধি বুক এজেন্সী , কলিকাতা -৭৩ ।

- রায় (শ্রী) তারক চন্দ্র , *ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড),* ১৯৫৮, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলিকাতা - ৬ ।

- সমন পুন্নানন্দ সামী, *রত্নমালা* , ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী - গ্রন্থমালা -২৪, সমন পুন্নানন্দ সামী, ১৩২৯ , প্রকাশক - ডঃ সুকোমল চৌধুরী , কলিকাতা - ১৫ ।

- সান্যাল ইন্দ্রাণী , শর্মা রত্না দত্ত (সম্পাদনায়), *ধর্মনীতি ও শ্রুতি,* ২০০৯, (১৪১৫), প্রকাশক - যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবোধি বুক এজেন্সী , কলিকাতা ।

- সেন (ডঃ) অমূল্য চন্দ্র, *বুদ্ধকথা* , ১৯৫৫, প্রকাশক - মহাবোধি বুক এজেন্সী , কলিকাতা -৭৩ ।

- হালদার (দে) মণিকুন্তলা , *বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস* , বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ - গ্রন্থমালা - ৪ , সম্পাদক - ডঃ সুকোমল চৌধুরী, প্রথম প্রকাশ ঃ১৪০২ , প্রকাশক - মহাবোধি বুক এজেন্সী , কলিকাতা - ৭৩।

- Agarwal Sanjay , *DAAN AND OTHER GIVING TRADITIONS IN INDIA ,THE FORGOTTEN POT OF GOLD,* First Edition : Delhi , 2010 , Published by - Account Aid TM India , New Delhi - 110014, India

- Findly Ellison Banks, *DANA GIVING AND GETTING IN PALI BUDDHISM* , Volume - 52, Firs Edition : Delhi, 2003, Motilal Banarasidass, Publishers Private Limited.

পঞ্চম অধ্যায় : ইসলামধর্মে দান

ইসলাম ধর্মানুসারে 'দান ক্রিয়া' কেবল ধর্মীয় অনুশাসনের অঙ্গ রূপেই নয় বরং তা ব্যক্তির স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য বলেই স্বীকৃত হয়েছে । এই ধর্মানুসারে 'দান' করার তাগিদ ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ বা স্বরূপগত । তাই সংশ্লিষ্ট ধর্মের ব্যক্তিগণ তাদের অভ্যন্তরীণ কর্তব্যবোধের দায়বদ্ধতায় 'দান কর্ম ' সম্পাদন করেন । ইসলাম ধর্ম যে মূল পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত , সেগুলি হল - বিশ্বাস , প্রার্থনা, দান, উপবাস এবং হজ । এই ধর্ম স্বীকৃত সকল নীতিই যদিও তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিক থেকে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার উপরে আলোকপাত করে ; তথাপি এবিষয়ে বিশেষভাবে বিচার - বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় যে, তাত্ত্বিক দিক থেকে নীতিগুলি মূলতঃ আল্লার অস্তিত্ব , জন্নত সম্বন্ধীয় (বা স্বর্গীয়) তত্ত্বের বর্তমান ও অতীতকালীন স্বীকৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করে । অন্যদিকে ব্যবহারিক নীতিতে প্রাধান্য পায় প্রার্থনা এবং আল্লা কর্তৃক প্রদত্ত বিষয়ের বিতরণ ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় আলোচনা । যা ব্যাপকার্থে 'দান' শব্দটির দ্বারাও উল্লিখিত হতে পারে । ইসলাম স্বীকৃত দান ব্যবস্থার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম রূপে উল্লেখ্য যে, এই ক্রিয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ধর্মে জনগণের হিতসাধন বা জন কল্যাণের মানোন্নয়নের উপর গুরুত্ব প্রদান করার এক সুন্দর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় । ইসলাম ধর্মের মূল গ্রন্থ কোরআন শরীফ অনুসারে 'দান ক্রিয়া' মূলতঃ দুই প্রকার ; যেমন - প্রথমতঃ বাধ্যতামূলক দান বা আবশ্যিক দান। দ্বিতীয়তঃ ঐচ্ছিক দান । সংশ্লিষ্ট ধর্মানুসারে প্রথম প্রকার দানটি 'জাকাত' এবং দ্বিতীয় প্রকারটি 'সাদাকা' নামে উল্লিখিত হয়েছে । এছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি 'দান' যেমন - উশ্র, খুমস্, ইদ্ - উল - ফিতর, ইদ্ -উদ্ - জোহা ইত্যাদিরও উল্লেখ পাওয়া যায় । যেগুলি - উক্ত দুই প্রকার দান ব্যবস্থার বৃহৎ পরিসরের মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত ।

কোরআন শরীফ অনুসারে যেকোন সুষ্ঠু ও নিয়মশৃঙ্খল পরায়ণ সমাজব্যবস্থায় অবশ্য কর্তব্যমূলক ক্রিয়া হল 'জনকল্যাণ সাধন' করা । যার অন্যতম মাধ্যম হল 'দান ক্রিয়া' । এই ক্রিয়ার যথাযথ সম্পাদন বা দায়িত্ব পালন করা যেমন একাধারে সমাজ তথা সমাজবাসীর অন্যতম কর্তব্য তেমনি তা লাভ করা বা পাওয়াও সমাজের ব্যক্তিবিশেষের অধিকার । এইরূপে কর্তব্যের পালন এবং অধিকার ভোগ করার মধ্যে দিয়েই সমাজের প্রতিটি সদস্য একে অপরের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন । এমন নির্দেশই পরিলক্ষিত হয় সুষ্ঠুরূপে সমাজ

পরিচালনার কাজে ইসলাম ধর্ম নির্দেশিত আদর্শরূপে । উল্লেখ্য যে , মানব অধিকার সম্পর্কিত তিনটি ক্ষেত্রের উল্লেখ কোরআন নির্দেশিত আদর্শে এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়; যেমন -

প্রথমতঃ আল্লার অধিকার (Huquq- ul- Allah) or (Rights of God) ।

দ্বিতীয়তঃ আল্লার সকল সন্তানের অধিকার স্বরূপ সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় সদস্যদের পারস্পরিক একাত্মতা বোধ (Huquq- ul- Abad) or (Rights of Man on man) ।

তৃতীয়তঃ আত্ম বিকাশের অধিকার (Huquq- un- Nafs) or (Rights of Self Development) ।[১]

উল্লিখিত অধিকারগুলির মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ 'আল্লার অধিকার' - এর প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে, ইসলাম ধর্মানুসারে এই বিশ্ব এবং তার অন্তর্গত সব কিছুই (সকল জড় ও অজড় পদার্থসমূহ) যেহেতু আল্লা কর্তৃক সৃষ্ট, তাই এক্ষেত্রে 'আল্লার অধিকার' - এর ক্ষেত্রটিকে নির্দিষ্টরূপে বিশ্ব এবং তার অন্তর্গত সকল জড় ও অজড় পদার্থের প্রতি 'আল্লার' নির্দেশ ও তার পূরণের অধিকার এবং বিপরীতে আল্লার প্রতি উক্ত সকল জড় ও অজড় পদার্থ সমূহের যে অধিকার বা দাবী এইরূপ উভয় দিক থেকেই সাধিত হতে হবে । উক্ত অধিকারের ক্ষেত্রটিকে জীবের প্রতি আল্লার অধিকার এবং আল্লার প্রতি জীবের অধিকার ; এইরূপ উভয় দিক থেকেই সুসম্পন্ন হতে হবে । উল্লেখ্য যে, যেহেতু অধিকার ও কর্ত্তব্য পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত তাই এরাঁ প্রত্যেকেই আল্লার নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করার লক্ষ্যে সমাজের প্রতি আপন আপন ভুমিকা পালন করে নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করবেন, এমনটি আল্লার ইচ্ছা বা সকল সন্তানের প্রতি তাঁর অধিকার । বিপরীতে সমাজের প্রতি সকল দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জীব আল্লার কৃপা লাভ করবেন এমনটি তাদের অধিকার ।

দ্বিতীয়ত ঃ সমাজের সকল স্তরের মানুষ যাঁরা আল্লার কৃপাধন্য হয়েছেন, তাঁরা সমাজের অপরাপর ব্যক্তিদের সঙ্গে যারা তা লাভ করেননি তাদের সঙ্গে এই কৃপা ভাগ করে নেবেন । এমনটিই তাঁদের অধিকার ; অর্থাৎ ব্যাপকার্থে সমাজের সকলেরই 'আল্লার' কৃপা পাওয়ার অধিকার আছে ।

তৃতীয়তঃ সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই নিজেদের সামগ্রিক উন্নতি বিধান কল্পে পরিপূর্ণরূপে আত্মবিকাশ ঘটানোর অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

---

১. *Spiritual Value of Social Charity* , Wazir Singh and N.K.Singh, P . 105 - 106

পূর্বোক্ত উক্তিতে ব্যবহৃত "Huquq ' শব্দটি এসেছে আরবী শব্দ "Haq ' থেকে , যার অর্থ অধিকার বা 'Right ' এবং ' Abad ' এই শব্দটির দ্বারা আল্লা সৃষ্ট অতীত - বর্তমান - ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের মানুষ সহ অন্যান্য মানবেতর পশু - পাখী , কীট - পতঙ্গ , বৃক্ষ - তরুলতা ইত্যাদি সকলের প্রতিই কোরআন শরীফ অনুসারে সমাজের প্রতিটি মানুষকেই কৃপাময় হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে । কারণ উল্লিখিত ধর্মগ্রন্থের আদর্শ অনুসারেই এইভাবেই বিশ্বের প্রতিটি প্রাণী একে অপরের প্রতি দায় - দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে ; সমাজব্যবস্থা হয়ে উঠবে সুশৃঙ্খল এবং পরিপূর্ণরূপে সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বময় । এইভাবেই সমাজের যেসকল মানুষ আল্লার কৃপা লাভ করেছেন তারা তাদের সেই কৃপার অংশ সমাজের অপর সেই সকল মানুষগণের মধ্যে পৌঁছে দেবেন যারা সেই কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন কিংবা এখনও পাননি পরে পাবেন । একই নিয়মে 'দান' ক্রিয়াও সম্পাদিত হবে । তবে বিষয়টি কখোনই এমন নয় যে , সমাজের সকল সুযোগ ও সুবিধা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কেবল দয়াপরবশতঃ হয়েই সমাজের অপরাপর দরিদ্র , অসহায় ও দুঃখী মানুষগণকে সম্পদ, অর্থসহ তাদের প্রয়োজনীয় অপরাপর বিষয়ের সাহায্য দান করবেন । বরং দাতাগণ উক্ত সকল বিষয়েরই দান করবেন পরম কর্ত্তব্য বোধের বাধ্যবাধকতায় । কারণ খাদ্য , বস্ত্র , অর্থ , শিক্ষা কিংবা জ্ঞান যেকোন বিষয়ই হোক না কেন আল্লার সৃষ্ট জীবরূপে এইগুলি পাওয়ার অধিকার সমাজের প্রত্যেকেরই আছে তা সে যত উচ্চবিত্ত কিংবা নিম্নবিত্তই হোন না কেন । যেহেতু একটি নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় বেঁচে থাকার এবং পরিপূর্ণরূপে নিজেদের সত্তার বিকাশের উপযোগীরূপে এইগুলি লাভ করার অধিকার সমাজের প্রতিটি সভ্যেরই আছে । যাকে ইসলাম ধর্মানুসারে 'স্বীকৃত অধিকার বা 'Haqul ma'aloom' বলা হয় ।[২] এইভাবে দেখা যায় যে, ইসলাম ধর্মানুসারে দান ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সমাজের দীন - দরিদ্র মানুষগণের প্রতি অপরাপর ধনী ব্যক্তিবর্গের সহানুভূতি বা দয়াপ্রদর্শনের মতো কোন ক্ষেত্র নয় বরং ধর্মীয় কর্ত্তব্যসহ দায় বা বাধ্যবাধকতাবোধই পরিলক্ষিত হয় ।

ইসলাম মতাদর্শে বাধ্যতামূলক দান বা আবশ্যিক দান বা 'জাকাত' (Zakat):

ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভটি হল 'জাকাত' (Zakat) । 'জাকাত' (Zakat) শব্দটি এসেছে 'Zakah ' থেকে যার অর্থ হল শুদ্ধিকরণ (Purify) । সংশ্লিষ্ট ধর্মের সকল সদস্য যাদের উপার্জিত অর্থ নির্দিষ্ট একটি সীমা অতিক্রম করেছে তাদের প্রত্যেকেরই সেই অর্থের শুদ্ধিকরণ আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক । এইরূপ ধর্মীয় নির্দেশের প্রেক্ষিতে মনে হতে পারে যে , ইসলাম ধর্মের এই নির্দিষ্ট দান ক্রিয়ায় ব্যক্তি স্বাধীনতার বা ব্যক্তি

---

২. *Spiritual Value of Social Charity* , P . 107.

মতের কোন স্থান নেই । বরং এযেন এক ধর্মীয় বাধ্যতাবোধ । যা সম্পাদনে প্রত্যেক ধর্মীয় সদস্য যেকোন পরিস্থিতিতেই দায়বদ্ধ । তবে এইরূপ বাধ্যতাবোধ বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোন বাধ্যতাবোধ নয়, বরং তা ব্যক্তিগণের অভ্যন্তরীন বা আন্তরিক দায়বদ্ধতা । কারণ ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় আদর্শ অনুসারে বলা হয় যে , সমাজের যেসকল সদস্যের কাছে উপার্জিত সম্পদ বা অর্থের পরিমাণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তারা ঐ পরিমাণ সম্পদ বা অর্থের জন্য যথোপযুক্তহারে ‘জাকাত’ প্রদান পূর্ব্বক শুদ্ধিকরণ করবেন । যেহেতু সংশ্লিষ্ট ধর্মানুসারে সকল সম্পদ ও অর্থের প্রদান কর্তা হলেন স্বয়ং ‘আল্লা’ , তাই তাঁর নির্দেশ ও ইচ্ছানুসারে সমাজের যে সকল ব্যক্তি প্রভূত পরিমাণে ঐ সহায় সম্পদের অধিকারী তারা প্রত্যেকেই সমাজের অপরাপর সহায় সম্পদহীন ব্যক্তিগণের মধ্যে তাদের অতিরিক্ত পরিমাণ সম্পদের বা অর্থের বিতরণ এমনভাবে করবেন যাতে সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকে কাজেই ‘জাকাত’ দান প্রসঙ্গে এইরূপ ধর্মীয় নির্দেশের পালন ইসলাম ধর্মের প্রত্যেক সভ্য বা সদস্য ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিকতার তাগিদেই সম্পন্ন করেন । যেহেতু সুষ্ঠু ভাবে সমাজ পরিচালনার কাজে নির্দিষ্ট নিয়ম ব্যবস্থার প্রচলন ও প্রয়োগে সকলেরই দায়বদ্ধতা আছে ।

যদিও ‘জাকাত’ প্রদান আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক তথাপি এই বিষয়ে কোরআন শরীফে নির্দিষ্ট কোন পরিমাণের উল্লেখ পাওয়া যায় না । তবে এবিষয়ে অন্যান্য সূত্রে প্রচলিত আছে, এমন একটি ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে দেখা যায় যে , প্রতি এক অর্থ বৎসরে জীবিকার উপার্জনের ভিন্নতা অনুসারে কোন দাতা কি পরিমাণে ‘দান’ করবেন , তার জন্য নির্দিষ্ট একটি বিধি প্রচলিত আছে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে প্রতি এক অর্থ বৎসরে এইরূপে নির্দিষ্ট হারে ‘দান’ প্রদান করার ব্যবস্থাটি সংশ্লিষ্ট ধর্মানুসারে ‘নিসব’(Nisab) নামে উল্লিখিত হয় । তবে এই প্রসঙ্গে বিষয়ের ভিন্নতা অনুসারে ‘জাকাত’ এর পরিমাণের ভিন্নতা দেখা যায় । যেমন - রূপো এবং সোনার ক্ষেত্রে এদের মোট পরিমাণ যদি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে যায় তবে যথাক্রমে ২০০ ধীরাম বা ৫২ ১/২ তোলা এবং সোনার ক্ষেত্রে ৭ ১/২ তোলা (স্বর্ণাদি ওজনের পরিমাণ বিশেষ) [৩] ‘জাকাত’ দিতে হয় । নগদ অর্থের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট নিয়ম প্রযোজ্য । ‘জাকাত’ প্রদান করার রীতি বিষয়ে Dictionary of Islam, -এও প্রাণীদের জন্য ‘জাকাত’ প্রদান বিষয়ে বহু উদাহরণের উল্লেখ পাওয়া যায় । যেমন - যেসকল ব্যক্তির কাছে পাঁচটির কম সংখ্যক উট আছে তাদেরকে এর জন্য কোন ‘জাকাত’ প্রদান করতে না হলেও পাঁচটি উট থাকলে তবে তার জন্য তাকে একটি ছাগল ‘দান’ করতে হবে । আবার সংখ্যাটি যদি দশ থেকে চৌদ্দ - এর মধ্যে হয়

৩. *The Religion of Islam ,A Comprehensive Discussion of the Sources, Principles and Practices of Islam* , Ali Maulana Muhammad , P. 349.

তবে তার জন্য জাকাত দিতে হবে দুই থেকে চারটি ছাগল এবং যদি উট হয় কুড়ি থেকে চব্বিশটির মধ্যে তবে তার জন্য জাকাত প্রদান করতে হবে তিনটি ছাগল । একই রকম নিয়ম প্রযোজ্য গরু এবং মহিষদের জন্যেও।[৪]

'জাকাত' দান - এর গ্রহীতা :

ইসলাম ধর্মানুসারে 'জাকাত' - এর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে, সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ধর্মের প্রত্যেক সদস্যই নিজ নিজ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে 'জাকাত' প্রদানে দায়বদ্ধ । এই 'জাকাত' থেকে সংগৃহীত অর্থ কিংবা অন্যান্য কোন বিষয় কীভাবে ব্যবহার করা হবে এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মূলতঃ জনকল্যাণমূলক কর্মের কথাই উল্লিখিত হয় । যদিও এই 'জাকাত' গ্রহণের অধিকারী হতে পারেন কারা সেই বিষয়ে হাদিস্ কিংবা কোরআন শরীফে কোন স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না, তথাপি সংশ্লিষ্ট ধর্মের অন্যান্য সূত্রানুসারে 'জাকাত দান' - এর গ্রহীতা হতে পারেন এমন মোট সাত প্রকার ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় । এঁরা হলেন যথাক্রমে -

১। 'দরিদ্র' [৫] যাদের কাছে নিজেদের জীবন যাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি নেই ।

২। 'অসহায় ও আর্ত ' [৬] ব্যক্তিগণ, যারা অপর ব্যক্তিগণের সাহায্যে নিজেদের জীবনের সকল মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারেন ।

৩। যারা 'জাকাত' সংগ্রাহক' [৭]

৪। যারা দাস, [৮] তাদের দাসত্বের জীবন থেকে মুক্তি দিতে 'জাকাত' প্রদান করতে হবে । কারণ প্রত্যেকেই আল্লার সন্তান, কাজেই দাসত্বের জীবন নয় বরং প্রত্যেকেরই সম্মানের সঙ্গে জীবন যাপন করার অধিকার

---

৪. 'The zakat of camels . zakat is not due upon less than five camels, and upon five camels it is one goat or sheep....., one goat is due upon any number of camels from five to nine ; two goats for any number of camels from ten to fourteen ;three goats for any number from twenty to twenty four ....The zakat of bulls , cows and buffaloes .No zakat is due upon fewer than thirty cattle, and upon thirty cattle which feed on pasture for the greater part of the year a tabiah , or a one year old calf .... Zakat upon Sheep and goats . No zakat is due upon less than forty, which have fed the greater part of the year upon pasture, upon which is due one goat until the number reaches one hundred and twenty ; for one hundred twenty one to two hundred , it is two goats or sheep ; and above these one for every hundred '[3] *Dictionary of Islam,* By – Thomas Patrick Hughes , P. 699- 700.

৫. Faqirs, *Dictionary of Islam,* By – Thomas Patrick Hughes , P . 700.

৬. Miskins, I.bid,

৭. The Collector of Zakat, I.bid

৮. Slaves', I.bid

আছে ।

৫। যারা ঋণি, [৯] তাদের ঋণমুক্ত করতে 'জাকাত' প্রদান করতে হবে ।

৬। যারা আল্লার নামে বা ধর্মের নামে বা যুদ্ধ করেন, [১০] তাদের জন্য এই 'জাকাত' প্রদান করা যেতে পারে । কারণ তারা তাদের জীবন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছেন ।

৭। যারা পর্যটক , [১১] কোন ভাল উদ্দেশ্যে কিংবা কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে পর্যটনা করছেন, অথচ অর্থের অভাবে তাদের পর্যটন সম্পূর্ণ করতে পারছেন না তাদের জন্যেও এই অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই সূত্রে এমন কয়েকজন ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় যারা এই 'জাকাত' -এর অধিকারী হতে পারেন না । যেমন -' মহম্মদ এবং তাঁর পরিবার ও পরিজনদের কারুরই 'জাকাত' গ্রহণের অধিকার নেই।' [১২] সংশ্লিষ্ট ধর্মানুসারে গ্রহীতাগণের জীবনযাপনের জন্য তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণের উদ্দেশ্যে এবং বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা গঠনে এই 'জাকাত' আবশ্যিকভাবেই প্রদেয় । এর আবশ্যিকতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, এটি যেন নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে কর প্রদান ব্যবস্থার মতো আবশ্যিক । যেখানে একজন ব্যক্তি কোনও অর্থবর্ষে যেমন তার উপার্জন অনুসারে 'কর' প্রদানে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন ঠিক তেমনি আবশ্যিকতা যেন 'জাকাত' এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । তাই ক্ষেত্র বিশেষে এই 'জাকাত' কে 'কর' প্রদান ব্যবস্থার সঙ্গে সমতুল্য বলে বিবেচনা করে বাধ্যতামূলক বলে উল্লেখ করা হয়েছে । [১৩] ইসলাম ধর্মানুসারে, বস্তুতঃ এই বিষয়টির ব্যাখ্যা এইরূপ , এটি যেন আল্লার কাছে প্রদত্ত ধৈর্য্য , আত্মত্যাগ এবং পরার্থে হিতসাধনের একটি পরীক্ষা স্বরূপ । যে ব্যক্তি এই পরীক্ষায় যত ভাল ফল করবেন তিনি ততই ধর্মীয়ভাবে উপকৃত হবেন । কাজেই 'দান' - এর ক্ষেত্রে দানীয় দ্রব্যবিষয়গুলিরও এমন হওয়া চলবে না যে, দাতার যে বিষয়গুলির আর

---

৯. Debtors, I.bid
১০. Fi Sabilillah', I.bid
১১. Travellers , I.bid
১২. *Daan and Other Giving Traditions In India ,The Forgotten Pot of Gold,* P. 67

১৩.In practice , zakat works like an annual tax of about 2.5 % on the believers wealth . There are detailed rules regarding the items on which zakat is leviable, and how it should be calculated. Zakat can be given in cash or in kind . – however old or defective items should not be given as zakat . (I.bid P. 68)

প্রয়োজন নেই কিংবা গ্রহীতার যে বিষয়গুলির দ্বারা উপকার সাধন হবে না সেগুলি দাতা 'দান' করতে পারেন, এবং তাতেই যেন তিনি ধর্মীয় ভাবে উপকৃত হবেন । কিংবা বলা যায় ধর্মীয় উচ্চ স্তরে উন্নীত হবেন । তা তো হবেই না, বরং এতে তার বিপরীতই হবে । সুতরাং কোন অপ্রয়োজনীয় বিষয় নয় বরং গ্রহীতার জীবনে যেটি সর্বাধিক প্রয়োজনীয় দাতার কাছে তা যতই কষ্ট সাধ্য হোক্ না কেন তাই 'দান' করা উচিৎ । তা সে হতে পারে টাকা - পয়সা , ধন - সম্পত্তি কিংবা শিক্ষাগত মর্যাদায় প্রাপ্ত কোন বিষয় অথবা জীবনের দক্ষতা এবং কৌশলগত সামর্থ্যে অর্জিত কোন বিষয়, তা সে যাই হোক না কেন দাতা বিনা বাক্য ব্যায়ে প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিষয়গুলির 'দান' করবেন। এই বিষয়ে ইসলাম ধর্মের আদর্শ অনুসারে বলা যায় , কোন ব্যক্তি যখন অপরের হিতার্থে , সমাজের কল্যাণে কোন ভাল কর্ম বা মঙ্গলজনক কর্মের সাধন করবেন তখন তিনি সেই কর্ম কেবল ভালো ভাবেই নয় বরং অত্যন্ত উৎকর্ষতার [১৪] সঙ্গে সাধন করবেন । যাতে তাঁর কর্মে সত্যিই মানুষের উপকার হয় এবং তিনি নিজে উপকারী ব্যক্তিরূপে সমাজে পরিচিত হতে পারেন । একইভাবে যখন কোন দাতা 'দান' করবেন তখন তার দানে যাতে গ্রহীতার প্রকৃতই উপকার সাধিত হয় সেই বিষয়ে তিনি নিঃস্বার্থ [১৫] মনোভাবে আন্তরিকতার [১৬] সঙ্গে যথেষ্ট যত্নবান হবেন । এই প্রসঙ্গে কোরআন শরীফে উল্লিখিত নির্দেশ হল - দাতার যতবেশী সম্ভব দান করা উচিৎ, যাতে গ্রহীতার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির অতিরিক্ত চাহিদার বিষয়গুলিও অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায় ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে , এই বিষয়গুলির 'দান' যে কেবল 'জাকাত' এর জন্যই সংগৃহীত হবে এবং সেই উদ্দেশ্যেই খরচ হবে এমন নয় , বরং তা সমাজের দীন - দরিদ্র , অসহায় মানুষদের জন্য কিংবা নির্ধারিত অন্যান্য যেকোন জনকল্যাণমূলক কর্মের জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে , এবিষয়ে দাতাগণের কোন ব্যক্তি মতামত থাকতে পারে না । তাদের দায়িত্ব কেবল আল্লার নির্দেশ অনুসারে মুক্ত মনে 'দান' করা । এটি তাদের পরম কর্ত্তব্য, যার অন্যথায় তাদেরকে যেকোন প্রকার ধর্মীয় শাস্তি পেতে হবে । এই বক্তব্যের সমর্থনে বলা যায় , চতুর্থ খলিফা হজরত আল- এর মতানুসারে, আল্লার নির্দেশ হল সমাজের ধনী ব্যক্তিগণ তাদের সম্পত্তি ও উপার্জিত অর্থের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ সমাজের দরিদ্র ব্যক্তিগণের প্রয়োজন ও চাহিদানুসারে দান করবেন, যাতে তারা তাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্ন, বস্ত্রসহ অপরাপর প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির চাহিদা পূরণ করতে পারেন । ইসলাম ধর্মমতে ধনী ব্যক্তিগণের এইরূপ কর্ম তাদের অন্তিম বিচারের দিনে তাদের পক্ষে

১৪, ১৫, ১৬ : *Spiritual Value of Social Charity* , P. 112.

সহায়ক হবে । সংশ্লিষ্ট আলোচনার পরিসরে যেকথা অবশ্য উল্লেখ্য তাহল, কেবল ‘জাকাত’ নামাঙ্কিত ‘দান’ এর ক্ষেত্রেই নয় বরং যেকোন ‘দান’ বিষয়েই দাতাগণকে মুক্তমনা হতে হবে । এযেন দাতাগণের প্রতি গ্রহীতাগণের এক অধিকারের স্বীকৃতি ।

জাকাত দানের ফল :

জাকাত দান প্রসঙ্গে কোরআন শরীফে বলা হয়েছে , অধিক কিছু পাওয়ার আশায় নয়, বরং তোমার কর্ত্তব্য জ্ঞানে তুমি অসহায়কে সাহায্য কর । অন্যদের প্রয়োজনে কিংবা অভাবগ্রস্ত যারা তাদের সাহায্যার্থে যদি কোন ব্যক্তি তার স্বচ্ছল কিংবা অসচ্ছল যেকোন অবস্থাতেই প্রকাশ্যে দান করেন তবে তার জন্য তা ভাল কর্মফলের সূচনা করে কিন্তু এই দানই যদি তিনি গোপনে করেন তবে তা তার জন্যে আরও অধিক ভাল কর্মফলের জনক হয় । এই সকল করণাময় কল্যাণকারী ব্যক্তিদের প্রতি আল্লাহ্ স্নেহশীল হন এবং এইরকম করুণাময় দানকর্মের জন্য তারা প্রতিপালক বা আল্লাহ্র কাছে পুরস্কৃতও হন । তবে অন্যকে দান করে কিংবা অসহায় ব্যক্তিকে তার প্রয়োজনে সাহায্য করে পরে সেই বিষয়ে ঐ ব্যক্তিকে যদি কোন কথা বলা হয় তবে তা মন্দ কর্মফলেরও জনক হয় । এই প্রসঙ্গে সুদ এর প্রত্যাশা সম্পর্কেও নিন্দামূলক মনোভাব কোরআন শরীফে পোষণ করা হয়েছে । বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি সুদের প্রত্যাশায় অপর ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য প্রদান করেন এবং সুদের হারে নিজের ধনসম্পদের আরও বৃদ্ধি ঘটাবেন বলে মনে করেন আল্লাহ্র কাছে সেই ব্যক্তি নিন্দিত । কারণ আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি দেন । যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সন্তুষ্টি লাভের জন্য জাকাত দান প্রদান করেন তাদেরই ধন সম্পদ বৃদ্ধি পায় , তারাই অর্থশালী হন । যে ব্যক্তি বদ্ধমুষ্টি না থেকে বা কৃপণ না হয়ে তার নিজের অর্জিত সম্পত্তি নিঃস্বার্থভাবে বিনিময়ে কোন প্রত্যাশা না রেখেই কেবল আত্মশুদ্ধির জন্যে কিংবা অপরের সাহায্যার্থে দান করেন আল্লাহ তার প্রতি অত্যধিক সন্তুষ্ট হন । তারা আল্লাহ্কেই যেন ঋণে ঋণী করেন । কোরআন শরীফে এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে, আল্লাহ্র আশীর্বাদে যে ব্যক্তি নিজের সামর্থ্যে অর্জিত সম্পদ থেকে কেবল উত্তম বিষয়েরই দান করেন সেই দানশীল পুরুষ এবং দানশীল নারীদের প্রতি আল্লাহ্ সদা সন্তুষ্ট হন, তাদেরকে তিনি মহাপুরস্কারে পুরস্কৃত করেন । যে ব্যক্তি আপন ধন আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শষ্য বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মে , প্রতিটি শীষে থাকে একশত শষ্য দানা । এবং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি দেন । আল্লাহ্ হলেন উত্তম অভিভাবক, তাই তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য , তাঁর

অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য জাকাত দান করা অন্যতম কর্ত্তব্য । [১৭] এইভাবে দেখা যায়, জনকল্যাণের লক্ষ্যে ইসলাম ধর্মে যে 'জাকাত দান' - এর উল্লেখ পাওয়া যায়, তার ফলাফল পরিলক্ষিত হয় মুলতঃ তিনটি স্তরে । যথা - ধর্মীয় স্তর, সামাজিক স্তর ও নৈতিক স্তর ।

ধর্মীয় স্তরে প্রভাব :

প্রথমত ঃ 'জাকাত' ইসলাম ধর্মের তৃতীয় স্তম্ভ । এই স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা ও তার আদর্শের পরিপূরণ ও সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট ধর্মানুসারী প্রতিটি ব্যক্তির মূখ্য উদ্দেশ্য । তাই যথোপযুক্ত নিয়মে 'জাকাত' প্রদান একজন ব্যক্তির ধর্মীয় উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক হয় ।

দ্বিতীয়তঃ জীবিকার মানের ভিন্নতা অনুসারে যথোপযুক্ত হারে 'জাকাত' প্রদান পূর্ব্বক আল্লার বিশ্বস্ত ও কৃপাধন্য হওয়া যায় ।

তৃতীয়তঃ উপার্জিত অর্থের সবটুকুই নিজেদের স্বার্থে বা উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশের 'জাকাত' প্রদান করে অপরাপর ব্যক্তিগণকেও এই ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সামিল করা যায় ।

সামাজিক স্তরে প্রভাব :

প্রথমতঃ উপযুক্ত হারে 'জাকাত' প্রদান সমাজের শ্রেণি বৈষম্য হ্রাস করতে সহযোগিতা করে । যেহেতু ধনী ব্যক্তিগণ সমাজের সকল অসহায় ও দরিদ্র ব্যক্তিগণের চাহিদার পূরণ করেন ।

দ্বিতীয়তঃ সমাজে ইসলাম ধর্ম তথা আদর্শ দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় । তাঁদের ধর্মীয় স্তরের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়তঃ বাধ্যতামূলক 'জাকাত' প্রদান সমাজের সকল মানুষের মন থেকে পরশ্রীকাতরতা ও মোহ মুক্তিতে

---

১৭. *আল - কোরআনের আহ্বান , কোরআন শরীফ*

সহায়তা করে ।অপর ব্যক্তির সাহায্যার্থে যেকোন প্রয়োজনীয় কর্ম করার মানসিকতা গড়ে তোলে। এই কর্ম সাধনে মনে যাতে কোনরূপ বিরক্তিভাবের উদ্রেক না হয় সেইরূপে মনকে তৈরী করে ।

চতুর্থতঃ উপার্জিত অর্থ তথা ধন - সম্পত্তির এইরূপ যথোপযুক্ত ব্যবহার তথা শুদ্ধিকরণের প্রয়াস ঐ সকল ধন- সম্পত্তির উৎকর্ষতার মান বৃদ্ধি করে সেগুলির উপযোগিতার পরিসর আরও বৃহত্তর করে ।

নৈতিক স্তরে প্রভাব :

প্রথমতঃ 'জাকাত' প্রদান প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও উন্নত রুচিবোধ গড়ে তোলে । এই ধর্মের সকল সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক সৌভাতৃত্বের বোধ ও বন্ধন দৃঢ় করে ।

দ্বিতীয়তঃ সমাজের অপরাপর অসহায় ব্যক্তিগণের জন্য তাদের সাহায্যার্থে দাতাগণের মনে দয়াজন্য মনোভাবের সঞ্চার হয় । তাই ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার তাগিদেই 'জাকাত' প্রদান পূর্ব্বক সমাজের অসহায় ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে দাতাগণ নিজেদের কর্ত্তব্যের সম্পাদন করেন ।

তৃতীয়ত ঃ পরার্থে সহযোগিতা প্রদান পূর্ব্বক ধর্মানুসারী ব্যক্তিগণের হৃদয় ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে ।

চতুর্থতঃ ফলতঃ ঐ সকল ব্যক্তিগণের লোভ ও স্বার্থ মনোভাবজনিত সংকীর্ণতার দূরীকরণ হয় ।

ইসলাম মতাদর্শে ঐচ্ছিক দান বা 'সাদাকা' (Sadaqa) :

ইসলাম আদর্শে স্বীকৃত দ্বিতীয় প্রকার 'দান ক্রিয়া' 'সাদাকা' (Sadaqa) নামে উল্লিখিত হয় । কোরআন শরীফে এই 'দান কর্ম' প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট কোন নিয়মের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয় না । স্মিত হাসি থেকে শুরু করে সমাজের অসহায় ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে যেকোন প্রকার ঐচ্ছিক দানই এইরূপ 'সাদাকা দান' - এর পরিসরের অন্তর্গত। 'সাদাকা' শব্দটির অর্থ হল 'ন্যায়পরতা' । কাজেই সত্য ও সৎ পথে থেকে ন্যায়োচিত উপায়ে অন্যের সাহায্যার্থে যেকোন প্রকার দানই ইসলাম আদর্শ অনুসারী 'সাদাকা দান '। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে এই প্রকার

‘দান’ পূর্ব আলোচিত ‘জাকাত দান’ - এর মতো বাধ্যতামূলক নয় বরং সম্পূর্ণতঃ ঐচ্ছিক । এক্ষেত্রে দাতার ইচ্ছাই প্রধান । তিনিই নির্ধারণ করবেন যে গ্রহীতার কোন প্রয়োজনে তিনি কীরূপ সাহায্য তাকে প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে ‘জাকাত দান’ এর মতো এক অর্থ বৎসরে নির্দিষ্ট হারে ‘নিসব’[১৮] ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায় না । বরং এইরূপ ‘দান ক্রিয়ায় দাতাগণ স্বেচ্ছায় ও স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন । ইসলাম আদর্শ অনুসারে সংশ্লিষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় একজন সদস্যের জীবন যাপন করার জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় তার পূরণে ‘সাদাকা’র ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য । এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারেই ইসলামিক সাহিত্যগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রদানের শর্ত ব্যতিরেকে (অর্থাৎ ইচ্ছার স্বাধীনতা ও কর্তব্যবোধের দায়বদ্ধতা ব্যতিরেকে) ‘সাদাকা’ ও ‘জাকাত’ - এর মধ্যে সমাজের প্রতি ভূমিকাগত কোন পার্থক্য নেই । উভয়ের লক্ষ্যই হল জনকল্যাণ সাধন করা । ‘সাদাকা’ প্রসঙ্গে আরও উল্লিখিত হয়েছে যে, এইরূপ ‘দান ক্রিয়ায়’ সময়গত নিয়মানুবর্তীতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ‘দান’ ব্যাপারে দেরী না করে সময়মতো সুসম্পন্ন করতে হবে । ‘কোরআন শরীফ অনুসারে একজন দাতা এই ‘দান ’ক্রিয়াজন্য প্রচার করতে পারেন, তবে প্রচারবিহীন দানই অধিকতর শ্রেষ্ঠ । অপরাপর দাতাগণকে অধিক অধিক ‘দান’ ক্রিয়ায় উৎসাহিত করার ক্ষেত্রগুলি ব্যতিরেকে দাতাগণ কখোনই নিজেদের ‘দান’ প্রসঙ্গে অকারণ প্রচার বা প্রশংসা করে অহংবোধের প্রকাশ করবেন না । কারণ তাতে ‘দান ক্রিয়া’ সম্পূর্ণ নিস্ফল হবে । [১৯]

সাদাকা দানের ফল :

ইসলাম ধর্মাদর্শে স্বীকৃত ‘সাদাকা দান’ ও পূর্বোক্ত ‘জাকাত দান’ এর ন্যায় ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক এই ত্রিস্তরকেই প্রভাবিত করে ।

ধর্মীয় স্তরে প্রভাব :

ধর্মীয় স্তরে ‘সাদাকা’ দানের প্রভাব তাৎপর্য্যপূর্ণ । নিত্য ‘সাদাকা দান’ - এর মাধ্যমে আল্লার কৃপাধন্য

---

১৮. *Dictionary of Islam,* P . 699.

১৯ Sadaka literally means “righteousness” from the root sadaka “to speak truth, to be true “. Ibu Arabi goes on to say that “sadaka is a voluntary act of worship, a choice made by one’s own free will. If it is not the case , then it is no voluntary Sadaka . For, man makes it obligatory upon himself as God makes mercy obligatory upon Himself towards those who repent”. All the expenditures of the people in need in an Islamic Society are covered by sadaqa, meaning voluntary alms. This is referred to in Islamic literature as ‘ sadakat – al- tatawwu’(alms of spontaneity). There is no great difference between sadaka and zakat , in that the zakat is the obligatory alms, while sadaka is voluntary alms. Alms are caused sadaka to indicate the sincerity(sidk) of the alms – giver’s religious belief.(*Spiritual Value of Social Charity* , P. 124).

হওয়া যায় । কারণ উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদাসহ যেকোন প্রকার ‘সাদাকা দানে’ই আল্লা তার সন্তানের (দাতার) প্রতি অতি সন্তুষ্ট হন এবং তার প্রতি আশীর্বাদ করেন । যাতে সংশ্লিষ্ট ধর্মানুসারী ব্যক্তিগণ তঁদের অন্তিম বিচারের দিনেও এই ‘দান জন্য ফল ’ স্বরূপ আল্লার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন এবং তাদের মন্দ কর্ম ফলের ক্ষয় হয় । তাই বলা হয় যে, কোন ব্যক্তি তার অপরাধ বা পাপ কর্ম ফল ক্ষয়ের উদ্দেশ্যে এইরূপ ঐচ্ছিক দান বা ‘সাদাকা’ প্রদান করতে পারেন । অতীতে কোন ‘জাকাত’ বাকি থেকে গেলে তার জন্য কোন মন্দ ফল উদ্ভুত হলে তাও ক্ষয় হতে পারে উপযুক্ত ‘সাদাকা’ প্রদানের দ্বারা । এই দান জন্য ফলের শক্তি এইরূপ যে তা দাতাগণকে যেকোন প্রকার বিপদ থেকেও রক্ষা করতে সমর্থ । তাই সংশ্লিষ্ট ধর্মের ব্যক্তিগণের প্রতি ধর্মীয় আদেশ এইরূপ যে নিত্য ‘সাদাকা’ প্রদান করতে হবে । কারণ ইসলাম মতে এই ‘সাদাকা’ দান জন্য কর্মফলের শক্তি ধর্মীয়ভাবে অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ । এই প্রসঙ্গে কথিত আছে, ‘বাগদাদ শহরে বসবাসকারী ইসলাম ধর্মের এক যাজককে তাঁর ভৃত্য তিনি কিছু খাবেন কিনা জেনে তা প্রস্তুত করে দিতে চাইলে যাজক উত্তরে ভৃত্যকে বলেন, তাঁর জন্য প্রস্তুত খাবার কাছেই থাকা ক্ষুধার্ত অনাথ শিশুদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে । কারণ এই খাদ্য তিনি গ্রহণ করলে তাঁর ক্ষিদের নিবৃত্তি হবে ঠিকই যা সাময়িক; কিন্তু তা যদি ঐ অনাথ শিশুরা গ্রহণ করে তবে তার জন্য যাজকের হিতার্থে কর্ম ফল সঞ্চিত হবে ।’ কেবল বিশেষ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বা উৎসবে নিয়ম অনুসারে প্রভূত পরিমাণে দান করার তুলনায় পরিমাণে অল্প হলেও নিত্য এই দান করার উপযোগিতাই বেশী, কারণ তাতে সংশ্লিষ্ট ধর্মের ঈশ্বর বা আল্লা অধিক সন্তুষ্ট হন । আল্লাহ্ই হলেন একমাত্র শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, তিনি ব্যতীত উপাস্য নেই । তাই আল্লাহ্র দান দৃঢ়রূপে গ্রহণ করে তাতে বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হবে । তাতে অন্তিমে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় পাওয়া যাবে। [২০]

সামাজিক স্তরে প্রভাব :

যথোপযুক্ত নিয়মে উপযুক্ত পরিমাণে ‘সাদাকা দান ক্রিয়া’ সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ববোধের মানোন্নয়ন ঘটায় । সমাজের কোন ব্যক্তিই যাতে অযথোচিত কোন উপায়ে নিজেদের জীবন ধারণ করতে বাধ্য না হয় সেই বিষয়ে ‘সাদাকা দান ক্রিয়া’ সচেতন থাকে । সচেতনতা পূর্ব্বক ‘সাদাকা দান ক্রিয়া’ সুসম্পন্ন হয় । বলা বাহুল্য যে , এইপ্রকার কর্ত্তব্যের দায়বোধ সংশ্লিষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় অসহায় ও দরিদ্র ব্যক্তিগণকে তাঁদের জীবন - যাপন করার জন্য অসৎ বা অন্যায় আচরণের পথ গ্রহণ করা থেকে বিরত রেখে সমাজের অবনমন প্রতিরোধ করে ।

---

২০. *সূরা বক্‌রা* , দ্বিতীয় অধ্যায়, *কোরআন শরীফ*

নৈতিক স্তরে প্রভাব :

'সাদাকা দান ' ব্যক্তি চরিত্রের নৈতিকতার মূল্যমান নির্ধারণ করে তার উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় । ধর্মীয় স্তরের প্রভাব প্রসঙ্গে প্রদত্ত উদাহরণেই যার উল্লেখ পাওয়া যায় । তথাপি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলা যায়, 'সাদাকা দান' এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট ধর্মানুসারী ব্যক্তিগণ নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে সমাজের সকল স্তরে নিজেদের ভূমিকা বজায় রাখতে তৎপর হন । তারা এক সৌভাতৃত্বময় ও সমঅধিকার সম্পন্ন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কর্মে উদ্যোগী হন । [২১] এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে আরও দেখা যায় যে, 'সাদাকা দান' জন্য মোট দশ প্রকার প্রভাব নৈতিক স্তরে পরিলক্ষিত হয় । যার মধ্যে প্রথম পাঁচটি এই জীবনেই উপলব্ধ হতে পারে , যেমন - উপার্জিত অর্থের শুদ্ধিকরণ, পাপক্ষয়, অসুস্থতার মুক্তি ইত্যাদি। পরবর্তী পাঁচটি ফল বর্তমান জীবনের পরবর্তী স্তরে বা এই জীবনের শেষে কিংবা ভবিষ্যতে উপলব্ধ হয় । যেমন --

পূর্ববর্তী পাঁচটি ফল :

১. যথোপযুক্ত নিয়মে উপযুক্ত 'সাদাকা' দান দাতাগণকে তাদের পূর্ব জীবনের যেকোন অন্যায় কর্মজনিত মন্দ কর্মফল থেকে আড়াল করে ।
২. দাতাগণের বর্তমান জীবনেরও পাপ কর্মফল ক্ষয় করতে সহায়ক হয় ।
৩. দাতাগণের যেকোন ভালো কর্মফলকে উৎকর্ষতা প্রদান করে তার মানোন্নয়ন ঘটায় ।
৪. বর্তমান জীবনের শেষে কর্মফল অনুসারে দাতাগণকে যেকোন প্রকার নরক যন্ত্রনা থেকে দূরে রাখে ।
৫ বর্তমান জীবনের শেষে কর্মফল অনুসারে তাদের আরও উচ্চ পর্যায়ের স্থানে উন্নীত করে ।

পরবর্তী পাঁচটি ফল :

১. এই বিশ্বজগৎ এবং জগতে সব কিছুই আল্লার দান ; তাঁর কৃপা । কাজেই উপযুক্ত হারে 'জাকাত' কিংবা 'সাদাকা' উভয়েরই প্রদান সমাজে আল্লার নির্দেশ ও তাঁর ইচ্ছার শ্রেষ্ঠতাকেই স্বীকৃতি প্রদান করে । মানুষের মন আরও উদার করে গড়ে তোলে । তাদের উপার্জিত অর্থের শুদ্ধিকরণ করে ।

---

২১. Sadaqa is also a means of moral edification . It purifies the soul from the evil of avarice . Sadaqa is a reflection of the generosity of God the All-giving. (*Spiritual Value of Social Charity* ,).

২. দাতাগণের দেহ ও মনকে পাপবোধ থেকে মুক্ত করে ।

৩. দাতাগণকে তাদের ভবিষ্যতের ক্ষয় ক্ষতি ও অসুস্থতা থেকে প্রতিরোধ করে ।

৪. দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের মনে খুশি ও আনন্দ নিয়ে আসে । সংশ্লিষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের মনে অভ্যন্তরীণ ন্যায়পরতা ও সততার বোধ দৃঢ় করে ।

৫. আল্লার কৃপায় দাতাগণের সহায় ও সম্পত্তির বৃদ্ধি ঘটে ।

একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে ,উক্ত দুই প্রকার 'দান ক্রিয়া' ছাড়াও আরও কয়েকটি 'দান' এর উল্লেখ ইসলাম ধর্মাদর্শে পাওয়া যায় । যেমন- 'সাদাকা জারিয়া'(Sadaqa Zariah),'জাকাত - উল - ফিতর' (Zakat – ul – Fitr) বা 'সাদাকা - উল - ফিতর' (Sadaqa – ul – Fitr), 'ইদ্- উল - ফিতর' (Id - ul – Fitr) , 'ইদ্ - উদ্ - জোহা ' (Id – al – Adzha), 'খুমস্' (Khums), 'উশর্' (Ushr) ইত্যাদি। এইসকল দান প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে উল্লিখিত 'দান' গুলির মধ্যে এমন কয়েকটি 'দান' এর উল্লেখ পাওয়া যায়, যেগুলি এক কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন নামে উল্লিখিত হয়েছে মাত্র । যেমন -

'সাদাকা জারিয়া'(Sadaqa Zariah) :

সমাজের বৃহত্তর পরিসরে জনকল্যাণের জন্য প্রদেয় যেকোন প্রকার 'সাদাকা দান' ই 'সাদাকা জারিয়া' নামে উল্লিখিত হয় ।

'জাকাত - উল - ফিতর' বা 'সাদাকা - উল - ফিতর' :

ইসলাম ধর্ম স্বীকৃত দান ব্যবস্থায় প্রধান দুটি 'দান' রূপে 'জাকাত' (Zakat) ও 'সাদাকা' (Sadaqa) উল্লিখিত হলেও এই প্রসঙ্গে অপর দুটি 'দান' - এরও উল্লেখ দেখা যায় , যেমন - 'জাকাত - উল - ফিতর' (Zakat – ul – Fitr) বা 'সাদাকা - উল - ফিতর' (Sadaqa – ul – Fitr) উক্ত দুই প্রকার 'দান ক্রিয়া' 'ইদ্- উল - ফিতর' (Id - ul – Fitr) অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । 'জাকাত - উল - ফিতর' (Zakat – ul – Fitr) বা 'সাদাকা - উল - ফিতর' (Sadaqa- ul – Fitr) 'দান ক্রিয়া'য় সংশ্লিষ্ট ধর্মানুসারী ব্যক্তিগণ পবিত্র রমজান মাসে দরিদ্র অসহায় ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে অন্ন , বস্ত্র কিংবা তাদের সম পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন ।

প্রাথমিকভাবে উক্ত ‘দান’ জন্য অর্থ - এর সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট কোন ধর্মীয় সংস্থা । পরবর্তী কালে প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা অনুসারে সেই অর্থ জনগণের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়। এইভাবে দেখা যায় ইসলাম ধর্মানুসারে, ‘জাকাত দান’ জন্য অর্থ ‘জাকাত - উল - ফিতর’ (Zakat – ul – Fitr) এবং ‘সাদাকা দান’ জন্য অর্থ ‘সাদাকা - উল - ফিতর’ (Sadaqa – ul – Fitr) নামে উল্লিখিত হয়েছে । রমজান মাসে রোজা সম্বন্ধে কোরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে , এটি একটি একমাস সময়ব্যাপী উপবাসব্রত । যারা এই নিয়ম অনুসারে এই উপবাস ব্রত পালন করতে সক্ষম নন , যারা কোথাও বিদেশে ভ্রমণ যাত্রায় গেছেন কিংবা যে ব্যক্তি অসুস্থ তাদের জন্য এই উপবাস ব্রতের অন্য সময় নির্ধারিত আছে । কিন্তু যাদের কোন অসুবিধা নেই তারা অবশ্যই এই ব্রত নির্দিষ্ট সময়েই পালন করবেন, এই ব্রত পালনের মধ্যে দিয়ে তারা ধৈর্যশীল হবেন । [২২]

ইদ্ - উল - জোহা (ইদ- উদ্- জোহা) :

ইদ্ - উল - ফিতর অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরও একটি দান ক্রিয়া হল ইদ্ - উল - জোহা (Id – ul – Adzha) । এই ধর্মানুষ্ঠানে কোন একটি পরিবার ধর্মীয় নিয়ম অনুসারে একটি প্রাণির জীবন উৎসর্গ করেন ; তারপর তার মাংস বিতরণ করেন সংশ্লিষ্ট ধর্মের সকল অসহায় ও দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে । ত্যাগ প্রসঙ্গে ইসলামধর্মাদর্শীদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ, আল্লাহর করুণা পেতে হলে ব্যক্তিকে তার সবচেয়ে মমতার জিনিষটি ত্যাগ করতে হবে । [২৩] বর্তমানে দেখা যায়, ঐ মৃত প্রাণিটির দেহের চামড়া ইত্যাদি বিক্রী করে তার নির্ধারিত মূল্য দরিদ্র অনাথ সংস্থাগুলিকে তাদের উন্নতির জন্য এবং ধর্মকর্মে নিয়োজিত কোন সংস্থাকে তাদের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে দান করা হয় ।

‘খুমস্’ (Khums) :

ইসলাম ধর্ম স্বীকৃত ‘দান’ ব্যবস্থায় ‘খুমস্’ নামক ‘দান’ - এর উল্লেখও পাওয়া যায় । স্বরূপগত ভাবে এটিও

---

২২ *সূরা বক্‌রা* , দ্বিতীয় অধ্যায়, কোরআন শরীফ
২৩. *আল - কোরআনের আহ্বান* , কোরআন শরীফ

এক প্রকার বাধ্যতামূলক দান । অন্যান্য 'দান ক্রিয়া'র মতো এই 'দানে'রও লক্ষ্য হল অসহায় দরিদ্র ব্যক্তিগণের প্রতি সাহায্য প্রদান । কোরআন শরীফ অনুসারে এইরূপ দান ক্রিয়ার গ্রহীতা কেবল অসহায় দীন দরিদ্র ব্যক্তিরাই নন বরং সংশ্লিষ্ট কোন যাজক বা 'ইমাম' এবং ধর্মীয় আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে যারা 'পর্যটক' তাদের লক্ষ্য পূরণ কল্পেও এইরূপ 'দান' করা হয় । যেহেতু এই 'খুমস'. প্রদান বাধ্যতামূলক তাই তা প্রদান করতে অস্বীকার করলে শাস্তি অবশ্যসম্ভাবী । এইক্ষেত্রগুলি ছাড়াও ব্যক্তি হিত সাধনার্থে এবং সমাজের কল্যাণ সাধনার্থে ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে, দাতা ব্যক্তি যারা নিত্য দান করেন তাদের প্রতি মহম্মদ অধিক দান করার নির্দেশ প্রদান করেছেন । এই প্রসঙ্গে আরও নির্দেশিত হয়েছে, যারা অনাথ তাদের জন্য যথাযথ পরিমাণ সম্পত্তি দান করতে হবে ।[২৪] সমাজের স্ত্রীজাতি বা নারী জাতিদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে , যে স্ত্রীকে তার স্বামী বিবাহের পর স্পর্শ করেননি তাকে যদি তিনি কোন কারণে বর্জন করেন তবে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । সেই স্ত্রী যদি দরিদ্র, অসহায় হন কিংবা তার নিজের ভরণ - পোষণ চালানোর মতো যদি তার সামর্থ্য না থাকে তাহলে তার জন্য যথাযথ ধন দান করতে হবে ।[২৫] তাতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধান হবে, তাতে মক্কা জয় হবে ।[২৬]

মূল্যায়ণ :

কোরআন শরীফে বর্ণিত আদর্শ অনুসারে ইসলাম ধর্মে প্রচলিত 'দান' ক্রিয়া সম্বন্ধে পূর্বোক্তরূপ আলোচনায় দেখা যায়, এই ধর্ম স্বীকৃত 'দান' ব্যবস্থা মূলতঃ সমাজে জনকল্যাণের আদর্শে পরিচালিত হয় । তাই ইসলাম ধর্মানুমোদিত আদর্শগুলি অর্থনীতির উপর নয় বরং জনকল্যাণের সম্প্রসারণের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করার স্বপক্ষে নির্দেশিত হয়েছে । তবে বিষয়টি এমন নয় যে, এই ধর্মানুসারী সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটি অবহেলিত হয়েছে , বরং এক্ষেত্রে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত যথোপযুক্ত 'দান ক্রিয়া'র মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে । এই প্রসঙ্গে 'জাকাত' ও 'সাদাকা' এই উভয় প্রকার 'দান ক্রিয়া'র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বলা বাহুল্য যে, জনকল্যাণের আদর্শে পরিচালিত উভয় প্রকার 'দান ক্রিয়া'ই সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক স্তরে যেরূপে প্রভাব বিস্তার করে তা তাৎপর্য্যপূর্ণ । কিন্তু এইরূপে সমাজে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলাম ধর্মে যে 'দান তত্ত্বে'র উল্লেখ পাওয়া যায় সে বিষয়ে পর্যালোচনা করতে

---

২৪ *সূরা নেসা , চতুর্থ অধ্যায়, কোরআন শরীফ*
২৫. *সূরা বক্‌রা , দ্বিতীয় অধ্যায়, ঐ*
২৬. *সূরা নস্‌র , দশাধিকশততম অধ্যায়, ঐ ।*

গেলে দেখা যায় যে, উক্ত তত্ত্বে জনহিতসাধনের মতো মহৎ আদর্শ সম্পূর্ণরূপে নয় বরং আংশিক পরিসরে গৃহীত হয়েছে । প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ইসলাম ধর্মানুমোদিত 'দান' ব্যবস্থায় আবশ্যিক দান বা 'জাকাত' এর গ্রহীতা প্রসঙ্গে প্রচলিত বিভিন্ন সূত্রের তথ্যানুসারে ব্যক্তিভেদে তথা ধর্মভেদের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা সংশ্লিষ্ট ধর্মের 'আবশ্যিক দানতত্ত্বে'র মর্যাদাকে খর্ব করে। কারণ একথা বলাই বাহুল্য যে, জনহিতসাধনের মতো মহৎ আদর্শ ব্যক্তিভেদ ও ধর্মভেদের তারতম্যে আংশিক পরিসরে সুসম্পন্ন হতে পারেনা । যেহেতু তাতে আদর্শ সীমাবদ্ধতা প্রাপ্ত হয় ; যা কাম্য নয় । এপ্রসঙ্গে আরও বলা যায়, ইসলাম আদর্শে যেভাবে 'জাকাত দান' ব্যাখ্যাত হয়েছে তাতে স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে, এইরূপ 'দান' ক্রিয়ায় মানুষ বাধ্যতাবোধেই তাদের নিজ নিজ দায়িত্বের পালন করেন । সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে , তবে কি এইপ্রকার 'দান' প্রকৃতই 'দান' রূপে স্বীকৃত হতে পারে ? দ্বিতীয়তঃ যদি তা 'দান' রূপে স্বীকৃতই হয় তবে তাতে কি কোন প্রকার নৈতিকতার অবস্থান থাকে ? ইসলাম ধর্মদর্শনের দৃষ্টিকোণের আঙ্গিকে উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করতে গেলে বলা যায়, 'জাকাত' বা 'আবশ্যিক দান' - এর বাধ্যতাবোধ বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোন বাধ্যতাবোধ নয় বরং তা সম্পূর্ণরূপেই ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ। তাই এপ্রসঙ্গে অনৈতিকতা কিংবা অনৈচ্ছিকতার কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে পারে না । কিন্তু সেক্ষেত্রে পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে, যদি এপ্রকার বাধ্যতাবোধ কেবল অভ্যন্তরীণই হয় তবে তা প্রদান করতে কোন ব্যক্তি অস্বীকার করলে সমাজে তিনি নিন্দিত হতে পারেন কিন্তু তা কখোনোই শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে উল্লিখিত হতে পারেনা । কিন্তু ইসলাম ধর্মাদর্শ অনুসারে 'জাকাত' প্রদানে অস্বীকার একপ্রকার শাস্তিযোগ্য অপরাধ ।[২৭] এই প্রসঙ্গে বলা যায়, হজরত মহম্মদের পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট ধর্মের বিভিন্ন তথ্যানুসারে এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, একসময় সদ্য ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত কিছু সদস্য এইরূপ বাধ্যতামূলক 'দান' প্রদান করতে অস্বীকার করলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি স্বরূপ যুদ্ধের ঘোষণা করা হয় । যদিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এইরূপে বাধ্যতামূলকভাবে 'জাকাত' থেকে সংগৃহীত অর্থের ব্যয় পূর্বনির্ধারিত ও ঘোষিত জনকল্যাণের উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা যাবে । তার অতিরিক্ত অন্য কোন ক্ষেত্রে নয় । এবিষয়ে সরকার বা ঐ নির্দিষ্ট ধর্মীয় সংস্থা যারা 'জাকাত' সংগ্রহ করেন ; তারা কেউই স্বাধীন নন । এ প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে 'জাকাত' এর ক্ষেত্রে যে 'নিসব' প্রথার প্রচলন দেখা যায় , তাতে নির্দিষ্ট ভাবে উপযুক্তহারে কোন ব্যক্তি কী

---

২৭. '.....Hence , Islam considers obligatory charity such an essential one that its negation is taken to be a rebellion against Islam and offenders are liable to stern punishment including a war against them, if they are organised and powerful .' ..This Really happend in early Islamic history , when some of the newly converted tribes refused to pay Zakah after the death of Prophet Muhammad, peace be upon him and during the reign of Khalifah Abu Bakra, who waged a war against Islam . Hence, it is obvious that Islam ordains authorities to forcefully collect the obligatory charity from people coming under that slab and to distribute it on the prescribed heads . Any Islamic authority or governments are not free to utilise such collected amounts other than on the specified welfare heads (*Spiritual value of social charity ,*)

পরিমাণ ‘জাকাত’ প্রদান করবেন তারও উল্লেখ থাকায় একথা বলা যেতে পারে যে. ‘জাকাত’ দান আন্তরিক দায়িত্ববোধ বলে উল্লিখিত হলেও তাকে ‘দান’ বলা বিষয়ে ইসলাম ধর্মের অনুমোদন প্রশ্নসূচক ; কারণ যা সম্পন্ন করার দায়বোধ শাস্তি ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে কীভাবে ‘দান’ বলা যাবে ? শুধু তাই নয়, ইসলাম ধর্মাদর্শ অনুসারে ‘সাদাকা’র মতো করে ‘জাকাত’ও পাপ ও পুণ্যফল প্রদায়ক । তাই সেক্ষেত্রে দার্শনিক বিচারের প্রেক্ষাপটে পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে , যে ক্রিয়া বাধ্যতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তা কীভাবে পাপ ও পুণ্যফল প্রদায়ক হবে ? কারণ সেক্ষেত্রে ‘দান ক্রিয়াটি’ সম্পন্ন না করার কোন উপায় গ্রহণ করার মতো সুযোগ নেই । ফলতঃ সেই কর্ম জনিত ভাল ও মন্দ ফলের দায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নয় ; তাই বলা যায় যে ইসলাম ধর্মে যেরূপে ‘জাকাত’ - পরিলক্ষিত হয় তা কর্ত্তব্যবোধ কিংবা দায়িত্ববোধ বলে স্বীকৃত হলেও উক্ত বিষয় সম্পর্কে ‘দান’ এর অনুমোদন নীতিগত দিক থেকে প্রশ্নসূচক । নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে উক্ত ‘দানতত্ত্ব’ সম্পর্কে আরও কতকগুলি প্রশ্ন হয়, যেমন -

প্রথমতঃ ইসলাম ধর্মানুমোদিত ‘দানতত্ত্বে ‘জাকাত’- এর প্রদানকারী ও গ্রহীতা বিষয়ে যে ব্যক্তি ও ধর্মভিত্তিক বিভেদের উল্লেখ করা হয়েছে তা কি আদৌ কোন জনহিতকর আদর্শ বলে স্বীকৃত হতে পারে ? কারণ যা জনহিতকর তা সকলের জন্যেই প্রযুক্ত হয় এবং সর্ব্বজনীন হয় । কোথাও কোন রূপ বিভেদের সীমারেখা থাকে না । তাই একথা বলাই বাহুল্য যে, ধর্মভিত্তিক সীমারেখায় আবদ্ধ কোন তত্ত্ব আদর্শ তত্ত্বরূপে গৃহীত হতে পারে কীনা সেই প্রশ্ন থেকেই যায় ।

দ্বিতীয়তঃ ‘জাকাত’ থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যে ধর্মযুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, সেই বিষয়ে প্রশ্ন হতে পারে, ‘এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কতকগুলি জনকল্যাণ ছাড়া অন্যান্য জনকল্যাণের জন্য এই অর্থের ব্যয় করা যাবে না, ’ - এই যদি নিয়ম হয়, তাহলে কোন যুদ্ধ যে ধর্মযুদ্ধ তা নির্ধারিত হবে কোন মানদণ্ডের প্রেক্ষিতে ? তার সঙ্গে যে জনকল্যাণের আদর্শ ওতোপ্রোত এমন নিশ্চয়তাই বা কোথায় ? কারণ ধর্মযুদ্ধের আড়ালে তো এমন বহু যুদ্ধই সংঘটিত হতে পারে যা সমাজে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সূচনা করতে পারে । তাই বলা যায় ইসলাম ধর্মানুমোদিত ‘দানতত্ত্ব’ যে জনহিতকর আদর্শকে লক্ষ্য করে পরিচালিত করার চেষ্টা করা হয়েছে তা অবশ্যই বর্তমান সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রশংসনীয়, তবে সম্পূর্ণরূপে এই তত্ত্ব আদর্শ ‘দানতত্ত্ব’রূপে কতটা প্রযুক্ত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তা অবশ্যই অনুসন্ধান সাপেক্ষ ।

তথ্যসূত্র :

- সেন (ভাই) গিরিশচন্দ্র (অনুদিত), *কুরআন শারীফ* (বঙ্গানুবাদ) , ২০১১, হরফ প্রকাশনী , কলকাতা - ৭।

- Agarwal Sanjay, *DAAN AND OTHER GIVING TRADITIONS IN INDIA,THE FORGOTTEN POT OF GOLD,* 2010, Published by - Account Aid TM India , New Delhi – 110014.

- Ali Maulana Muhammad, *THE RELEGION OF ISLAM , A COMPREHENSIVE DISCUSSION OF THE SOURCES, PRINCIPLES AND PRACTICES OF ISLAM ,* 1994, Published by - Motilal Banarasidass Publishers Private Limited , Bunglow Road , Jawahar Nagar , Delhi 110007

- Singh Wazir and Singh N.K(Editted by), *SPIRITUAL VALUE OF SOCIAL CHARITY*, 2001, Published by - Global Vision Publishing Hoiuse , India ,Delhi - 110093

- Hughes Patrick Thomas, *A DICTIONARY OF ISLAM*, 1885, London W.H. Allen & Co,18, Waterloo Place, Pall Mall S.W.

ষষ্ঠ অধ্যায়

খ্রীষ্ট ধর্ম ও অন্যান্য সভ্যতায় দান : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

খ্রীষ্টান ধর্ম অনুসারে তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল হল 'ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য', তাঁর নির্দেশ । এর মূল দুটি অংশ - পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়ম । উভয় নিয়মেই রচিত হয়েছে বহু গ্রন্থ ; যেমন - পুরাতন নিয়মে রচিত হয়েছে, আদি পুস্তক , যাত্রা পুস্তক , লেবীয় পুস্তক, গণনা পুস্তক, দ্বিতীয় বিবরণ , যিহোশূয়, বিচারকর্তৃগণের বিবরণ, গীতসংহিতা, হিতোপদেশ, দানিয়েল ইত্যাদি গ্রন্থ। দ্বিতীয় নিয়মে রচিত গ্রন্থগুলি হল, মথি, মার্ক, লূক, যোহন, করিন্থীয় ১, করিন্থীয় ২, পিতর ১, পিতর২, ইফিপীয়, ফিলিপীয়, কলসীয় ইত্যাদি । ভিন্ন ভিন্ন রচয়িতা বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থগুলি রচনা করেছেন । এই গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রথম অংশে যেমন বর্ণিত হয়েছে খ্রীষ্ট ধর্মানুসারীদের পূর্বসূরীরূপে ইস্রায়েলী জাতির সূচনার ইতিহাস, জীবন বিধি , কর্মাদর্শ তেমনি আবার দ্বিতীয় অংশে, যীশুর ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কর্মের বিস্তৃত আলোচনাসহ খ্রীষ্টান ধর্মানুরাগীদের উদ্দেশ্যে তাদের জীবন যাপনের আদর্শরূপে যীশুর বহু নির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে । এর মধ্যে পুরাতন নিয়মে রচিত আদি পুস্তক , যাত্রা পুস্তক , লেবীয় পুস্তক, গণনা পুস্তক, দ্বিতীয় বিবরণ গ্রন্থগুলির রচয়িতা হলেন মোশি । মোশির রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ যাত্রা পুস্তক ইস্রায়েলীয় জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায়, মোশির জন্ম কাহিনী । সেখানে জানা যায়, মোশি ছিলেন মিশর দেশে ইস্রায়েলীয় গোষ্ঠীর উদ্ধার কর্তা । জন্মসূত্রে মোশি ছিলেন মিশর দেশের ইব্রীয় বা ইস্রায়েলী গোষ্ঠীর সন্তান । যদিও তিনি লালিত - পালিত হন মিশরের ফরৌণের রাজকন্যার সন্তানরূপে তার প্রকৃত মায়ের কাছে । একসময় মিশর দেশে ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যা খুব দ্রূত হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় মিশরের রাজা 'শিফ্রা ' ও 'পূয়া ' নামে দুজন ধাইকে ইস্রায়েলীয় স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসব করানোর সময় পুত্র সন্তান হলে তাদেরকে নীল নদীতে ফেলে মেরে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন । সেই আদেশ অনুসারেই মোশির জন্মের পর তার মা তাকে লুকিয়ে বনের মধ্যে রেখে গেলে ফরৌণের রাজকন্যা এবং দাসীরা এসে তাকে উদ্ধার করেন এবং রাজকন্যা নিজের অজ্ঞাতেই মোশির প্রকৃত মাকেই তাকে লালন করার দায়িত্ব অর্পণ করেন । মোশি বড় হয়ে ফরৌণের রাজপরিবারে ফিরলেও নিজেদের গোষ্ঠীর উপর মিশরীয়দের অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন । এর পরবর্তীকালে মোশি সদাপ্রভূ ঈশ্বরের নির্দেশে মিশরের অত্যাচার থেকে ইস্রায়েলীয় গোষ্ঠীর মানুষদের উদ্ধার করেন ।[১] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যাত্রাপুস্তকেই খ্রীষ্ট ধর্মে ইস্রায়েলীয় গোষ্ঠীর অনুশাসকরূপে বা

---

১ . বাইবেল পুরাতন নিয়ম, '*যাত্রাপুস্তক*', *১, পবিত্র বাইবেল (পুরাতন ও নূতন নিয়ম)*

ঈশ্বররূপে সদাপ্রভূর উল্লেখ পাওয়া যায় । [২] এইরূপে মোশি রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন তথ্য। যেমন - পুরাতন নিয়ম অনুসারে রচিত আদিপুস্তকে ইস্রায়েলীয় জাতির সূচনা পর্বসহ তার ভূমিকায় প্রথমে বর্ণিত হয়েছে, সদাপ্রভূর সৃষ্টিকার্য্য রূপে এই জগৎ এবং তাতে বসবাসকারী স্ত্রী ও পুরুষের সৃষ্টিকাহিনী, তাদের জীবন - যাপনের জন্য বিভিন্ন বৃত্তি চাষাবাদ বাণিজ্যসহ বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানের সূচনাপর্ব ইত্যাদি । তৃতীয় গ্রন্থ লেবীয় পুস্তকে মোশি আলোচনা করেছেন, পবিত্রতা বজায় রেখে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উৎসর্গ অনুষ্ঠান সম্বন্ধে। এই গ্রন্থে মোশি সদাপ্রভূ ঈশ্বরের উপাসনা বা আরাধনা করার জন্য ইস্রায়েলীয় জাতির মানুষদের শুচি বা শুদ্ধিকরণের জন্য বহু নির্দেশ প্রদান করেছেন । মোশি রচিত গণনা পুস্তকে লোক সংখ্যার গণনাসহ সেবা দান করা , আত্মিক উন্নতি ও অবনতিমূলক ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে সচেতন থাকা ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। শেষ গ্রন্থ দ্বিতীয় বিবরণ - এ মোশি যাত্রাপুস্তক ও গণনাপুস্তকে বর্ণিত বিষয়গুলির পুনঃআলোচনাসহ ইস্রায়েলীয় জাতির জন্য সদাপ্রভূ বা ঈশ্বরের নতুন নির্দেশসমূহও বিবৃত করেছেন । মৃত্যুর আগে ইস্রায়েলীয় জাতির উদ্দেশ্যে মোশির তিনটি বক্তৃতাও সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থেই । পুরাতন নিয়মে মোশি রচিত এই গ্রন্থগুলিসহ অন্যান্য গ্রন্থ যেমন বংশাবলি, গীতসংহিতা, হিতোপদেশে, উপদেশসহ নতুন নিয়মে রচিত বহু গ্রন্থ যেমন, মথি, লূক, রোমীয়, করিন্থীয়, ফিলীমন প্রভৃতিতে 'দান' সম্বন্ধে বহু তথ্যের বর্ণনা ও নির্দেশ করা হয়েছে। খ্রীষ্টান ধর্ম অনুসারে কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছায় ও স্বতোপ্রনোদিত ভাবে কোন কিছু অপরের সাহায্যে দেওয়াই হল দান । এখানে 'দান' শব্দটির অর্থ হল পরম ভালবাসা যেখানে স্বার্থের উদ্দেশ্য থাকবেনা, থাকবেনা সমাজের নিয়ম নীতিজনিত কোন দায়বদ্ধতা, থাকবে শুধু অন্তরের আকুতি । এই ধরণের ব্যবহারে খ্রীষ্টান ধর্ম অনুসারে 'দান' বলতে শুধুই অন্যের মঙ্গল সাধন করা নির্দেশিত হয়েছে । ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ব পালনের অন্যতম উপায় বা অঙ্গ হল 'দান' । দান ক্রিয়াকে হতে হবে পরহিতে সাধিত মঙ্গলময় একটি ক্রিয়া । তবে এই মঙ্গলক্রিয়া যে কেবল অন্যকে সাহায্য করার মধ্যে দিয়েই সাধিত হবে এমন নয় বরং কখনও নিজের, জাতির এমনকী ব্যাপকার্থে সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্যেও দানের নির্দেশ হয়েছে । এইক্ষেত্রে বস্তুত ধর্মীয়ভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে 'উৎসর্গ' অর্থে দানের নির্দেশ হয়েছে । অসহায়ের প্রতি সাহায্য দানের উপদেশে যে বাধ্যতাবোধ কিংবা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সাধিত উৎসর্গ অনুষ্ঠানে পালনীয় যে নিয়ম বা আচারের উল্লেখ খ্রীষ্টীয় অনুশাসনে হয়েছে তার সঙ্গে অন্যান্য সভ্যতা যেমন - উত্তর আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয় এবং মেলানেশীয়দের সভ্যতা এবং মায়া, ইনকা এবং আজতেক পৃথিবীর অন্যতম এই তিন প্রাচীন সভ্যতায় বর্ণিত দান ও উৎসর্গতত্ত্বের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য পাওয়া যায় । 'দান' শব্দটির ব্যবহার প্রসঙ্গে অন্যান্য সভ্যতার মত আলোচনা করতে গেলে

---

২ . বাইবেল পুরাতন নিয়ম, '*দশ আজ্ঞা, যাত্রাপুস্তক*', ২০

দেখা যায় যে, সেখানে কোথাও এই দান শব্দটি তার পরিসরে উপহার প্রদান এই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে বিনিময় উপহার প্রাপ্তির অবশ্যসম্ভব্যতার এক নতুন মাত্রার যেমন সংযোজন করেছে তেমনি আবার কোথাওবা এইরূপ দানকর্ম ব্যক্তি ও সমাজ মঙ্গলের উদ্দেশ্যে সাধিত হলেও তার পদ্ধতি হয়েছে অতি কঠিন ও কঠোর । তার সঙ্গে অন্যান্য সভ্যতা যেমন - উত্তর আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয় এবং মেলানেশীয়দের সভ্যতা এবং মায়া, ইন্‌কা এবং আজতেক পৃথিবীর অন্যতম এই তিন প্রাচীন সভ্যতায় বর্ণিত দান ও উৎসর্গতত্ত্বের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য পাওয়া যায়। গবেষণাপত্রের বর্তমান অধ্যায়ের লক্ষ্য হবে খ্রীষ্টীয় অনুশাসনসহ পূর্বোক্ত সভ্যতাগুলিতে নির্দেশিত দানতত্ত্ব ও পদ্ধতির উল্লেখসহ তাদের মধ্যে উপস্থিত সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যগুলি সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনাপূর্ব্বক তার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য্য নির্ধারণ করা ।

খ্রীষ্ট ধর্মে দান :

বাইবেলে খ্রীষ্ট ধর্মের উভয় নিয়মেই দান কখনও সদাপ্রভূর প্রতি তার পরম ভক্তদের ভক্তি, শ্রদ্ধা আবার কখনওবা যীশুর এবং তার অনুগামীদের মধ্যে নিঃস্বার্থ ভালবাসা এইরূপে বর্ণিত হয়েছে । তাঁর কৃপা, করুণা এবং ভালবাসাই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে বিনিময়ে সকলের মধ্যে এই ভালবাসার আশীবাদ পৌঁছে দিতে । তাই খ্রীষ্টান ধর্ম অনুসারে, যীশুকে ভালবাসা আর প্রতিবেশীকে ভালবাসার মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই, উভয়েই এক বা সমতুল । অপরের সাহায্যার্থে সম্পাদিত কোন দান ক্রিয়া শর্ত সাপেক্ষ কোন ক্রিয়া নয় বরং তা ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন - যাপনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত আবশ্যিক একটি ক্রিয়া । দুর্বল, আর্ত, অসহায় দরিদ্রকে অর্থ কিংবা অন্যান্য বিষয় দিয়ে সাহায্য করা ব্যক্তির জীবনের আদর্শ হওয়া উচিৎ । দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে খ্রীষ্টান ধর্ম মতে, যাঁরা ভগবান যীশুকে ভালবাসেন তাদের সকলেরই এই সকল অসহায় - আর্তদের প্রতি দায়িত্ব আছে । সমাজের সার্বিক মঙ্গলের লক্ষ্যে ব্যক্তি উক্ত সকল ক্ষেত্রে তাঁর জন্য নির্ধারিত দায়িত্বের পালন করবেন এমনটিই অভিপ্রেত । ব্যক্তির এইরূপ সামাজিক দায়িত্ব পালনের অন্যতম উপায় বা অঙ্গ হল ‘দান’ । খ্রীষ্টান ধর্ম অনুসারে ‘দান ক্রিয়া’কে হতে হবে নিঃস্বার্থভাবে পরহিতে সাধিত মঙ্গলময় একটি ক্রিয়া । খ্রীষ্টান ধর্মমতে অন্যের প্রতি এইরূপ নিঃস্বার্থ সেবার মধ্যে দিয়েই ভগবান যীশুর প্রকৃত সেবা করা হয় । এইরূপ দানই ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের আদর্শ । তাই যতক্ষন না পর্যন্ত কোন ব্যক্তি কোন দিনে দাতারূপে অন্যের সাহায্যার্থে কিছু দান করতে পারছেন ততক্ষন পর্যন্ত সেই দিন বৃথা । অপরকে ভালবেসে তার জন্য নিঃস্বার্থভাবে কিছু দেওয়া বা তার সাহায্যার্থে কিছু করাই হল দান । দান প্রসঙ্গে পুরাতন নিয়মে রাজা শলোমন ও অন্যান্যদের লেখা নিয়ে রচিত হিতোপদেশে বহু উল্লেখ হয়েছে । সেখানে ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কর্মের মধ্যে ‘দান’ ক্রিয়াকে অন্যতম

গুরুত্বপূর্ণ বলে নির্দেশ করা হয়েছে । হিতোপদেশ অনুসারে যে ব্যক্তি উদার মনে খোলা হাতে অন্যদের যেকোন প্রকার সাহায্য দান করেন তিনি ঈশ্বরভক্ত, তিনি জ্ঞানী । এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি হলেন দানশীল । যে ব্যক্তি নিজে ক্ষুধার্ত হলেও নিজের খাবারের ভাগ থেকে অন্যদের দিয়ে তারপর নিজে গ্রহণ করেন তারা কখনই কেবল নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ বিষয়ে সর্বদা অনুগত হয়ে থাকেন না । বরং অসহায়দের সাহায্য করার জন্য তারা সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন । এইরূপ দানই হল ব্যক্তি জীবনের আদর্শ । যে ব্যক্তি এইরূপে জ্ঞানী ও উদার তাদের সদাপ্রভূ সর্বদা পছন্দ করেন, যেকোন বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করেন, মামলায় তাদের পক্ষ সমর্থন করেন এবং জীবনে চলার পথে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করেন । যাতে তারাও তাদের ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত মানের জীবন - শিক্ষা দিতে পারেন । এইরূপ দানের ফল বিষয়ে উল্লেখ করে বলা হয়েছে , যে ব্যক্তি এইরূপে দান করেন তিনি দানের অধিক ফললাভ করেন , তিনি জীবনে প্রভূত উন্নতি করেন, অন্যকে তৃপ্ত করে তিনি নিজেও তৃপ্ত হন । সদাপ্রভূর আশীর্বাদে এইরূপ ঈশ্বরভক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি তার সমগ্র জীবনে গাছের সবুজ পাতার মত সতেজ থাকেন । তিনি অন্যদের মন জয় করে তাদের কাছে জীবন - গাছের পরম আশ্রয় দান করেন । এদের মনোবাসনা সমাজের সার্বিক মঙ্গল সাধিত করে । কিন্তু যেসকল ব্যক্তি এইরূপ উদার নন, অসহায়কে সাহায্য করেন না , বরং সময় - সুযোগে নিজেদের স্বার্থে অন্যদের প্রতারিত বা বঞ্চিত করতেও পিছপা হন না তারা মন্দ, দুষ্ট লোক বলে সমাজে পরিচিত হন । এইরকম দুষ্ট বা মন্দ লোকেদের শাস্তি এবং ধ্বংস অনিবার্য্য । তারা জীবনে অভাবগ্রস্ত হয়, তাদের ক্ষতি হয় । অবিবেচকের মত তারা নিজেদের জীবনের ভাল - মন্দ নির্ধারণ করতে পারেন না । তাদেরকে অন্যরা অসম্মান, ঘৃণা এবং তিরস্কার করেন । তাদের জীবনে সদাপ্রভূ বা ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে আসে । সদাপ্রভূ তাদের প্রাণ হরণ করেন । [৩]

বাইবেলের দ্বিতীয় অংশে নতুন নিয়ম অনুসারে রচিত গ্রন্থ ‘মথির লেখা সুখবর’ গ্রন্থটিতে রচয়িতা মথি খ্রীষ্ট ধর্মের পরম ঈশ্বররূপে যীশু খ্রীষ্টের জন্ম বৃত্তান্তসহ, ধর্মীয় অনুশাসন বিষয়ে তাঁর নির্ধারিত আদর্শ, কর্ম পদ্ধতি ইত্যাদি যে বিষয়গুলির উল্লেখ করেছেন সেখানেও ‘দান’ ব্যক্তির জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া বলে নির্দেশিত হয়েছে । মথি যীশুর জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন, যাকোবের পুত্র যোষেফ ও তাঁর স্ত্রী মরিয়মের সন্তান যীশু ইস্রায়েলীয় রাজা দায়ূদ এবং আব্রাহাম বংশেরই উত্তরাধিকারী । তিনি পরম মশীহ, জীবনে চলার পথে ঈশ্বর উপদিষ্ট আইন - কানুনের মহান শিক্ষক । প্রভূর উদ্দেশ্যে মহান শিক্ষক যীশুর প্রার্থনাই আজ অধিকাংশ খ্রীষ্টান ধর্মানুসারীদের প্রার্থনা । [৪] মথি তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন ইস্রায়েলী বংশের উত্তরাধিকারীরূপে

---

৩ . *বাইবেল পুরাতন নিয়ম, ‘হিতোপদেশ’, ১১- ২২*
৪ . *বাইবেল নতুন নিয়ম, ‘ভূমিকা, মথির লেখা সুখবর’,*

পরম মশীহ যীশু কীভাবে ইস্রায়েলীয়দের দৈনন্দিন জীবন - যাপনের নানাক্ষেত্রে আদর্শ নির্দেশ করেছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর পূর্বসূরী ইস্রায়েলীয় জাতির আদিপিতারূপে আব্রাহাম, ইস্‌হাক, যাকোবসহ অন্যান্যদের এবং সদাপ্রভূর পরম ভক্ত ও অনুসরণকারী মোশির অনুসরণ করেছিলেন । মথির বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়, যীশু ইস্রায়েলীয়দের উদ্দেশ্যে বলছেন , 'এই কথা মনে কোরো না যে, আমি মোশির আইন - কানুন আর নবীদের লেখা বাতিল করতে এসেছি । আমি সেগুলো বাতিল করতে আসিনি বরং পূর্ণ করতে এসেছি । আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আকাশ ও পৃথিবী শেষ না হওয়া পর্যন্ত, যতদিন না আইন - কানুনের সমস্ত কথা সফল হয় ততদিন সেই আইন - কানুনের এক বিন্দু কি এক মাত্রা মুছে যাবে না । তাই আদেশগুলোর মধ্যে ছোট একটা আদেশও যে কেউ অমান্য করে এবং লোককে তা অমান্য করতে শিক্ষা দেয় তাকে স্বর্গ- রাজ্যে সবচেয়ে ছোট বলা হবে । কিন্তু যে কেউ সেই আদেশগুলো পালন করে ও শিক্ষা দেয় তাকে স্বর্গ - রাজ্যে বড় বলা হবে আমি তোমাদের বলছি, ধর্ম - শিক্ষক ও ফরীশীদের ধার্মিকতার চেয়ে তোমাদের যদি বেশী কিছু না থাকে তবে তোমরা কোনমতেই স্বর্গ - রাজ্যে ঢুকতে পারবে না । '[৫] এইভাবে দেখা যায় যে, নতুন নিয়মে মথির বর্ণনা অনুসারে ইস্রায়েলীয় জাতির উদ্ধারকল্পে সদাপ্রভূর আদেশ অনুসারে মোশি নির্দেশিত আইন - কানুনের পরবর্তী কালে পরম মশীহ যীশু তাদের জীবনের শিক্ষাদান করেছিলেন মোশিকে অনুসরণ করেই । খ্রীষ্ট ধর্মানুসারীদের যীশু 'দান' বিষয়ে শিক্ষা দিতে গিয়ে যেসকল উপদেশাবলী প্রদান করেছেন তাও মথিতে উল্লিখিত হয়েছে । সেখানে দেখা যায় যীশু বলছেন , ''সাবধান, লোককে দেখাবার জন্য ধর্মকর্ম কোরো না; যদি কর তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার কাছ থেকে কোন পুরস্কার পাবে না । এইজন্য যখন তুমি গরীবদের কিছু দাও তখন ভণ্ডদের মত কোরো না। তারা তো লোকদের প্রশংসা পাবার জন্য সমাজ - ঘরে এবং পথে পথে ঢাক - ঢোল বাজিয়ে ভিক্ষা দেয় । আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে । কিন্তু তুমি যখন গরীবদের কিছু দাও তখন তোমার ডান হাত কি করছে তা তোমার বাঁ হাতকে জানতে দিয়ো না, যেন তোমার দান করা গোপনে হয় । তাহলে তোমার পিতা যিনি গোপনে সব কিছু দেখেন, তিনিই তোমাকে পুরস্কার দেবেন।[৬] দানের শ্রেষ্ঠতা বিচার প্রসঙ্গে যীশুর মত উল্লিখিত হয়েছে লূক গ্রন্থেও । সেখানে দেখা যায়, ঈশ্বরের উপাসনা গৃহে প্রার্থনা করতে এসে প্রনামী বাক্সে প্রত্যেকেই তাদের সামর্থ্য অনুসারে মনোমত দান বাক্সে প্রদান করছেন। এই উপাসনা গৃহে এক অসহায় দরিদ্র বিধবাও প্রার্থনা করতে আসেন এবং সকলের মতো করে প্রনামী দান বাক্সে নিজের কাছে থাকা সাকুল্যে দুটি পয়সাও দান করেন । এই দেখে যীশু তাঁর শিষ্য ও অনুসারীদের বলেছিলেন এই দরিদ্র বৃদ্ধার দানই শ্রেষ্ঠ , পরম । কারণ অনদের কাছে তো প্রভূত ধন - সম্পদ আছে তার

---

৫ . *বাইবেল নতুন নিয়ম, 'মথির লেখা সুখবর, '* ৫ । ১৭- ২০
৬ . ঐ, ঐ, ৬ ।১ -৪

থেকে তারা কিছু পরিমাণ ঈশ্বরের নামে দান করছেন । কিন্তু এই বিধবার সম্বল ছিল কেবল এই দুটি পয়সাই, তাও তিনি ঈশ্বরের নামে দান করলেন । তাই এই দান, তার মানসিকতার নিরিখেই পরম দান, শ্রেষ্ঠ দান । [৭]

দানের ফল :

খ্রীষ্ট ধর্ম অনুসারে দান হবে দাতার সাধ্য অনুসারী এবং তাতেই ঈশ্বর পরম তৃপ্ত হবেন । কারণ এক্ষেত্রে দানজন্য মনোভাব বা আগ্রহই মূল । দাতা যেমন দান করবেন তেমন ফল লাভ করবেন । এই প্রসঙ্গে করিন্থীয়তে দানের নিয়ম উল্লেখ করে বলা হয়েছে, মনে রেখ, যে অল্প বীজ বোনে সে অল্প ফসলই কাটবে আর যে বেশী বীজ বোনে সে বেশী ফসল কাটবে । প্রত্যেকে মনে মনে যা ঠিক করে রেখেছে সে যেন তাই দেয় । কেউ যেন মনে দুঃখ নিয়ে না দেয় বা দিতে হবে বলে না দেয়, কারণ যে খুশী মনে দেয় ঈশ্বর তাকে ভালবাসেন । [৮] দানের ফল সম্বন্ধে উল্লেখ করে নতুন নিয়মে রচিত রোমীয় গ্রন্থে বলা হয়েছে, যেসকল ব্যক্তি এইরূপ দান ক্রিয়ার মাধ্যমে যীশুর অনুসারী হয়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন , তারা সকলেই পবিত্র আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন । তাদের সকলের অন্তরই পবিত্র । কোন বিপদই তাদের স্পর্শ করতে পারবে না ; এমনকী মৃত্যুও নয় । কারণ যে ঈশ্বর যীশুকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন তিনিই এই সকল পবিত্র ধর্মানুসারীদের মৃত দেহেও প্রাণ দান করে তাদের জীবন দান করবেন । [৯] খ্রীষ্ট ধর্মের অনুসারী এবং যীশু খ্রীষ্টের অনুরাগী ফিলীমনের গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে যে, 'দান' ও 'দয়া' জোর পূর্ব্বক আদায় করার বিষয় নয় , বরং তা হয় স্বভাব নিয়মে । সেখানে দেখা যায় যে, পৌল যিনি যীশু খ্রীষ্টের অনুরাগীরূপে জেলবন্দী অবস্থায় ছিলেন , তিনি ওনীষিমের অনুরোধে ফিলীমনকে চিঠি লিখে ওনীষিমকে ক্ষমা করে তাকে নিজের ধর্মভাইরূপে গ্রহণ করার অনুরোধ জানান । ওনীষিম ছিলেন ফিলীমনের ক্রীতদাস , তিনি একসময়ে ফিলীমনের কাছ থেকে পালিয়ে আসেন , এবং পরে খ্রীষ্ট ধর্মে অনুরাগী হন । এই সময়ে তার মনের পরিবর্তন হয়, তিনি মনে করেন তার নিজের অপরাধ স্বীকার করে তিনি ফিলীমনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি ফিলীমনের উদ্দেশ্যে পৌলকে একটি চিঠি লিখে দিতে অনুরোধ করেন । পৌল ওনীষিমের এইরূপ অন্তরের দায়বদ্ধতা ও অনুরোধ উল্লেখ করে ফিলীমনকে চিঠি লেখেন । তিনি জানান ওনীষিমকে ফিলীমনের এইরূপ ক্ষমাদানের মধ্যে

---

৭ . *বাইবেল নতুন নিয়ম,, লূক,* ২১ । ১- ৪
৮ . *বাইবেল নতুন নিয়ম,* ২, *'করিন্থীয়, '* ৯। ৬-৭
৯ . ঐ, *'রোমীয়, '* ৮।২। ৯ - ১১

দিয়েও তার উপর প্রভূ যীশুর আশীর্বাদ বর্ষিত হবে । তবে অনুরোধ রাখার বাধ্য-বাধকতায় নয় বরং অন্তরের দায়বদ্ধতায় । [১০]

দান শব্দটির প্রচলিত পরিসরে এইরূপ আন্তরিক দায়বদ্ধতার উল্লেখ খ্রীষ্ট ধর্ম সহ উত্তর আমেরিকার পলিনেশীয় সভ্যতাতেও পাওয়া যায় । এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে, এখানে ‘দান’ শব্দটি উপহার দান এই অর্থে যেমন গৃহীত হয়েছে তেমনি তা পাশাপাশি সমাজের সুষ্ঠু পরিচালন ও কল্যাণের স্বার্থে ‘বিনিময় উপহার’ এই প্রত্যয়েরও সংযোজনা করেছে । এই প্রসঙ্গে অন্যতম সমাজতাত্ত্বিক মার্সেল মাউস আমাদের অবগত করেছেন । অসাধারণ লেখনী সামর্থ্যের অধিকারী মার্সেল মাউস (Marcel Mauss) ছিলেন অন্যতম বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক এমিলি দুরখেইমের ভ্রাতুষ্পুত্র । ফরাসী সমাজতত্ত্বে ছিল যার অগাধ পান্ডিত্য । মাউস তার কাকা এমিলি দুরখেইমকে বহু রচনার কাজে সহযোগিতা করেছেন । দুরখেইমের রচনা ‘Annie Sociologique’ তারই মধ্যে একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত । তবে শুধু সহযোগিতার কাজেই নয় বরং এককভাবে গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রেও তার কীর্তি সমান অবিস্মরণীয় । এই বিষয়ে তাঁর রচিত সকল গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ‘THE GIFT’ । এই গ্রন্থে মাউস তাঁর আলোচনায় ‘উপহার’ শব্দটির ব্যবহারে এমন এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী তথা আঙ্গিক প্রদান করেছেন যার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন অর্থে দান শব্দটির ব্যবহার প্রচলিত পরিসরে নব মাত্রা সংযোজিত হয়েছে । উল্লেখ্য যে, ‘দান’ বিষয়ক বর্তমান গবেষণায় আমি ইতিপূর্বেই বহু অধ্যায়ের আলোচনাতেই যে মূলবিষয়টির উপর আলোকপাত করতে চেয়েছি তা হল কোন বিষয়ের উপর সম্পূর্ণরূপে নিজের সত্ত্ব পরিত্যাগ করে দাতার এই যে কিছু দেওয়া তা ক্ষেত্র বিশেষে কোন নতুন আঙ্গিক পেয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করে দেখা । বলা বাহুল্য যে, উপহারের প্রদানও তার ব্যতিক্রম কোন ক্ষেত্র নয় । যেখানে মাউস তাঁর রচনায় এক নতুন আলোক প্রদান করেছেন। তাই বর্তমান আলোচনার পরিসরে আমাদের লক্ষ্য হবে মাউস তার ‘ THE GIFT’ গ্রন্থে উপহার প্রসঙ্গে কোন নতুন মাত্রার সংযোজনা করেছেন তা অনুসন্ধান করে দেখা । এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে , মাউস এবং তাঁর সহযোগী মি. ডেভি উভয়েই ‘উপহার’ বা ‘Gift ’ শব্দটির অর্থগত ব্যবহারের পরিসরে ‘বিনিময় বা পরিবর্তিত উপহার’ বা ‘Return Gift ’ নামক নতুন মাত্রার সংযোজনা করেন । তাঁরা তাঁদের আলোচনায় দেখান, পলিনেশীয় সভ্যতায় তৎকালীন সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক পর্বে উপহারের এইরূপ পরিবর্তিত অর্থের প্রচলন না থাকলেও পরবর্তীকালে এই অতিরিক্ত অর্থের সংযোজনা ঘটে । সেখানে দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সমাজব্যবস্থায় এইরূপ পরিবর্তিত

---

১০ . *বাইবেল নতুন নিয়ম*, *‘ফিলীমন ’*, ১ -১৫

উপহারের প্রথাটি প্রসিদ্ধ না থাকলেও দলীয় ক্ষেত্রে এর প্রভাব ছিল বিস্তর । সেখানে এইরূপ বিনিময় বা পরিবর্তিত উপহারের ক্ষেত্রে উপহারের দ্রব্যরূপে যেমন কোন বিষয় বা বস্তু, নগদ অর্থ কিংবা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির উল্লেখ পাওয়া যায় তেমনি প্রথাগত বিভিন্ন আচার ব্যবহারের বিনিময়, সালীনতা, সহযোগিতা প্রভৃতিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ব্যক্তিগত রুচির ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা প্রসিদ্ধ ছিল এমন নয় বরং উপহারের এই বিনিময় প্রথার প্রচলন পলিনেশীয় সভ্যতায় সামাজিক আচার ব্যবহারের পরিকাঠামোয় প্রায় বাধ্যতামূলকভাবেই যেন প্রচলিত ছিল । যাকে অমান্য করার অভ্যাস কিংবা সাহস দলীয় কোন সদস্য কিংবা দলনেতা কারুরই ছিলো না ।

পরিবর্তিত বা বিনিময় উপহার :

বিনিময় উপহার প্রসঙ্গে পলিনেশীয় সভ্যতায় অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রথা হল পট্‌লাচ্ (Potlach) প্রথা ।[১১] ‘Potlach’ শব্দটির আভিধানিক বা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল পরিবর্তিত বা বিনিময় উপহার । দেখা যায় যে, উক্ত প্রথার ব্যবহার যে সর্বজনীন ছিল এমন নয় , বরং এর উল্লেখ পাওয়া যায় কেবলই উপজাতিগত পরিসরে । বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানে এই প্রথার প্রচলন ছিল । এইসূত্রে পরিবর্তিত উপহাররূপে কেবলই যে বস্তুগত বিষয়ের কিংবা আচার - ব্যবহার বা রীতি - নীতির উল্লেখ পাওয়া যায় এমন নয় বরং ক্ষেত্র বিশেষে সংস্কৃতি তথা সভ্যতা সহ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মেলবন্ধনের বিভিন্ন অবস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় । এই রকম প্রথার প্রচলন প্রসিদ্ধ ছিল পশ্চিম - আমেরিকান সভ্যতায়, মেলানেশিয়া ও পাপুয়া প্রভৃতি স্থানে । পট্‌লাচ্ প্রথার মূল বক্তব্য হল উপহার প্রদানের মধ্যেই ‘পরিবর্তিত বা বিনিময় উপহারের’ ধারণাটি অনিবার্য ভাবেই অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকে । শুধু তাই নয়, এদের উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক বাধ্যতামূলক । অর্থাৎ উপহার গ্রহণের ক্ষেত্রে বিনিময় উপহারের বিষয়টি যেন অবশ্যসম্ভাবী হয়ে পড়ে । কিন্তু কেন একজন ব্যক্তি উপহারের গ্রহণের ক্ষেত্রে বিনিময় উপহার প্রদানের জন্য বাধ্য থাকবেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে মার্সেল মাউসকে অনুসরণ করে বলা যায়, প্রচলিত এই পট্‌লাচ্ প্রথাটির মধ্যে যেন অলিখিতভাবে একটি চুক্তির ভূমিকা কার্যকরী থাকে । প্রথা অনুসারে এইরূপ চুক্তিগত ভাবে উপহারের আদান - প্রদান করার ব্যবস্থাই ‘বিনিময় বা পরিবর্তিত উপহার’ নামে পরিচিত ছিল । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে এই প্রথার প্রচলন ও ব্যবহার উত্তর পশ্চিম পলিনেশীয় সভ্যতা এবং তারও বাইরে ফ্রান্স ও জার্মানিতেও দেখা যায় । এই স্থানগুলিতে ঐরূপ পরিবর্তিত উপহার প্রথা ছাড়াও শিশু

---

১১ . ‘*Prestation, Gift and Potlach*’ , *The Politics of Charity*

জন্মের অনুষ্ঠান ও বৈবাহিক অনুষ্ঠানে ‘স্যামোয়া’ নামক অপর একটি প্রথারও প্রচলন দেখা যায় । যেখানে দুজন বা দুই পরিবারের প্রধানের মধ্যে মাদুড় বিনিময় করার প্রথা প্রসিদ্ধ ছিল । পলিনেশীয় সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে এই প্রথা দুই পরিবারের প্রধান এবং শিশুর পিতা - মাতার সম্মান বৃদ্ধি করতো । এছাড়াও উপহারের অপর দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীরও উল্লেখ এখানে পাওয়া যায়, যেমন - ‘টোঙ্গা’ এবং ‘ওলোয়া’ । ‘টোঙ্গা’ প্রথা অনুসারে কোন শিশুর পিতা তার প্রতিপালনের জন্য মাতুলালয়ে তাকে তার মামার হাতে তুলে দিতেন । এই ক্ষেত্রে শিশুটি মাতুলালয়ে তার মামার কাছে ‘টোঙ্গা’ নামে অভিহিত হত, যে কিনা ঐ পরিবারেরই কন্যা সন্তানের অংশ বা উত্তরাধিকারীরূপে মাতুলালয়ের সকল সম্পত্তির স্বাভাবিক উত্তরাধিকারীরূপেই বড় হত । এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে শিশু এবং শিশুর পিতা - মাতা উভয়েই সম্মানিত হত । যা শিশুটিকে ভবিষ্যতে তার পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠাকল্পে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়ে উঠতে সাহায্য করত । দ্বিতীয়তঃ ‘ওলোয়া’ পদ্ধতিতে একটি শিশু বিদেশে কোন পিতা - মাতার কাছে গৃহীত দত্তক সন্তান হিসেবে বড় হত এবং তাঁদের সকল সম্পত্তির অধিকারী হত । উল্লেখ্য যে, ‘ওলোয়া’ প্রথায় কোন দত্তক শিশুর এইরূপে যে সম্পত্তি ইত্যাদির অধিকার স্বীকৃত ছিল তা কিন্তু কেবলই তার জীবিত অবস্থা পর্য্যন্তই সীমিত ছিল । সেই সময়ের পরিসরে সে তার পরিবার এবং পরিবারের সকল সহায় - সম্পদের উপর স্বাভাবিক অধিকার বজায় রাখার যোগ্য অধিকারী বলে বিবেচিত হত । [১২]

পট্‌লাচ্‌ প্রথা ও তার স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য :

পলিনেশীয় সভ্যতায় প্রচলিত এইরূপ পট্‌লাচ্‌ প্রথার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে, উক্ত প্রথাটির অন্তর্গত উপহার বিনিময়ের এইরূপ অলিখিত চুক্তি বা বাধ্যতাবোধ প্রদান এবং গ্রহণ উভয় ক্ষেত্রেই ছিল । এইরকম বাধ্যতাবোধে অধিকার ও কর্ত্তব্যবোধ উভয়ের সহ অবস্থান লক্ষ্য করা যায় । এই প্রসঙ্গে মাউস দেখিয়েছেন, কোন একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে নিমন্ত্রিত সকল ব্যক্তির কর্ত্তব্য ছিল সেই বাড়ীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে সেখানে অংশগ্রহণ করা এবং অনুষ্ঠানের আয়োজক ব্যক্তি বা তার পরিবারের কোন সদস্যদের উদ্দেশ্যে উপহার প্রদান করা । যা বর্তমানেও স্বাভাবিক এবং প্রচলিত এক প্রথা । পাশাপাশি এই ক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ

---

১২ . “*Total Prestation Masculine and Feminine Property*” *Gifts and the obligation to return gifts* , The Politics of Charity

কর্তার দায়িত্ব বা অবশ্যকর্ত্তব্য হল নিমন্ত্রিতদের উপহার গ্রহণ করা । অর্থাৎ এক্ষেত্রে বাধ্যতাবোধ হল দুটি । যেমন - নিমন্ত্রিতের নিমন্ত্রণ গ্রহণ বা রক্ষা করার বাধ্যতাবোধ এবং নিমন্ত্রণ কর্তার নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সকলের দেয় বা প্রদেয় উপহার গ্রহণের বাধ্যতাবোধ । এইরূপে বিষয়ের আদান - প্রদান বা বিনিময় যে কেবলই কোন নির্দিষ্ট বস্তু বা বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয় বরং তা সংশ্লিষ্ট সমাজ ও সভ্যতায় খাদ্য, বস্ত্র, জমি সহ অন্যান্য সহায় - সম্পদের মধ্যেও বিস্তৃত হয়েছিল । এই বাধ্যতাবোধের অবস্থান যে সেই সমাজে কী পরিমাণ চূড়ান্ত ছিল তার বর্ণনা প্রসঙ্গে মার্সেল মাউস বলছেন, এইরকম বাধ্যতাবোধের ক্ষেত্রে কোথাও কোন বিচ্যুতি ঘটলে তা সমাজে যেকোন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সূচনা করতো । বাধ্যতাবোধের এই পরিসরে ইতিবাচক বা সদর্থক ক্ষেত্রে মাউস আরও দেখিয়েছেন, উপহার আদান - প্রদানের এইরূপ বাধ্যতাবোধ দাতা এবং গ্রহীতার মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব এবং অধিকারবোধের দায়বদ্ধতারও সূচনা করে । যেমন - বাড়ীর কোন অনুষ্ঠানে গৃহকর্তা যেমন তার আত্মীয় - পরিজনেদের নিমন্ত্রণ করবেন, কারণ এ তার কর্ত্তব্য এবং তার আত্মীয় - পরিজনেদের অধিকার । বিপরীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে ও উপহার প্রদান করে আত্মীয় - পরিজনেরা নিমন্ত্রণ কর্তার মান রক্ষা করবেন এ হল তার অধিকার আর পরিজনেদের কর্ত্তব্য । একইভাবে পরিজনেদের প্রদেয় উপহার গ্রহণ করে নিমন্ত্রণ কর্তা তাদের মান বজায় রাখবেন এ তারও কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব অতিথি পরিজনেদের প্রতি । এইরূপ পারস্পরিক দায় এবং কর্ত্তব্য বোধের ভিত্তিতেই পলিনেশীয় সভ্যতায় ও সমাজ ব্যবস্থায় পট্‌লাচ্‌ প্রথা প্রচলিত ছিল । প্রসঙ্গতঃ, অধিকার ও কর্ত্তব্যবোধের এইরূপ বাধ্যতামূলক অবস্থান যে দৈনন্দিন জীবন - যাপনে নিত্য কর্ত্তব্যরূপে কেবল ব্যক্তিগত স্তরেই উপহার বিনিময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয় বরং তা একইসঙ্গে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছিল । যেমন ,ঈশ্বরের কৃপালাভ করার উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের পূজার্চনা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করে , তাঁর কৃপা লাভ করবেন এ যেমন উপাসকের কর্ত্তব্য এবং উপাস্যের অধিকার। তেমনি উপাস্য ঈশ্বর খুশি হয়ে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর উপাসককে যথেষ্ট আশীর্বাদ করবেন, তার যাচিত বিষয় দান করবেন এ হল উপাস্যের কর্ত্তব্য আর উপাসনাকারীর অধিকার । আবার ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও কৃপা লাভ করে উপাসক ব্যক্তি কেবলই যে তা নিজের জন্যই ব্যবহার করবেন তা নয় , বরং নিজের জন্য প্রয়োজনীয় অংশটুকু রেখে দিয়ে বাকী সবটুকুই সমাজের অন্য অসহায় ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ব্যয় করবেন এমনটিই ঈশ্বরের ইচ্ছা । এইরূপ আলোচনার প্রেক্ষিতে পলিনেশীয় সভ্যতায় পট্‌লাচ্‌ প্রথার অবস্থান ও প্রভাব যে সুদূর প্রসারী ছিল সেকথা বলাই বাহুল্য ।

নিমন্ত্রণ ও উপহার বিনিময় প্রথার গুরুত্ব :

অনেক সময় দেখা যায় যে, উপহার প্রদান ব্যক্তির জনপ্রিয়তার নির্ণায়ক হয় এবং অনেক সময় যথাযথ নিয়মে এই উপহারের প্রদান ব্যক্তির পদমর্যাদাতে স্থিত থাকার পক্ষে সহায়কও হয় । এই প্রসঙ্গে পলিনেশীয় সভ্যতায় দেখা যায় যে, কোন একজন ব্যক্তি যিনি পরিবারের এবং গ্রামের প্রধান তিনি উপহার প্রদানের মধ্যে দিয়ে নিজ পরিবারে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু - বান্ধবসহ তাঁর নিজ জাতিতে, গ্রামে এবং অন্যান্য উপজাতির মানুষদের মধ্যে নিজের প্রভাব বজায় রাখতে পারেন । শুধু তাই নয় , এইভাবে উপহার প্রদান প্রসঙ্গে তিনি যদি নিজেই তার উৎসাহ অন্যদের কাছে প্রমান করতে সমর্থ হন, তবে তিনি নিজেই নিজের সৌভাগ্যের কারণ হন । কারণ যথাযথভাবে উপহারের প্রদান জনপ্রিয়তার সূচকও হয় । এইভাবে উপহার দান করে যে ব্যক্তি যত অধিক জনপ্রিয় হবেন, ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বিচারে তিনি ততবেশী স্থায়ী বলে নির্বাচিত বা বিবেচিত হবেন । অন্যথায় ক্ষমতায় আসীন একজন গ্রাম প্রধানও জনরোষের কারণে তার পদমর্যাদা পর্য্যন্ত হারাতে পারেন । এই সভ্যতায় জনপ্রিয়তা নির্ধারণের অপর দুই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল নিমন্ত্রণ করা এবং নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা । যে ব্যক্তি নিজের বাড়ীর অনুষ্ঠানে সকলকে নিমন্ত্রণ করতেন তিনি তুলনায় অধিক জনপ্রিয়, যিনি সকলকে নয় বরং কোন কোন ব্যক্তি কিংবা দল বিশেষকে নিমন্ত্রণ করতেন তার জনপ্রিয়তা খর্ব হত । আবার এইসব ক্ষেত্রে যদি কখনও এমন হত যে, জাতিগতভাবে কিংবা একই গ্রামে বসবাস করেন অন্য কোন জাতির মানুষ যিনি ঐ গোষ্ঠীপতির বাড়ীতে নিমন্ত্রণ পাওয়ার আশায় ছিলেন অথচ গোষ্ঠী প্রধান মনের ভুলে কিংবা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই ঐ সকল জনগোষ্ঠীকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলেন না তাহলে এই নির্দিষ্ট কারণে অপমানিত জনগোষ্ঠী সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরী করতেন । তাতে জনগোষ্ঠীর প্রধানকে জনরোষের মুখে পড়তে হত । তার জনপ্রিয়তার হানি ঘটত । তাই এইরকম পরিস্থিতি যাতে না হয় সেই দিকে প্রধান সর্বদাই সতর্ক থাকতেন এবং সেই কারণেই সকলকে নিজের বাড়ীর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতেন এবং তার সঙ্গে অন্যদের বাড়ীর অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত অতিথিরূপে অংশগ্রহণপূর্ব্বক সেখানে উপযুক্ত উপহার প্রদান দায়বদ্ধ থাকতেন । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ফ্রান্স ও জার্মানীর শহরাঞ্চলে এইরূপ ধারণা প্রচলিত আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি নিমন্ত্রণ কর্তার বাড়ীতে গিয়ে তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা না করেন তবে ঐ ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ কর্তার বিরোধী ব্যক্তিরূপে গন্য করা হয় । শুধু তাই নয়, বরং লোকমধ্যে এমন ধারণাও প্রচারিত হয় যে, ঐ ব্যক্তি নিমন্ত্রণ কর্তার প্রতি হিংসা বা বিরোধী মনোভাব সম্পন্ন । সেই কারণে ঐ ব্যক্তি নিমন্ত্রণ কর্তার বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত থাকতে পারেন নি । বলা বাহুল্য যে, এইরকম বোধ সামাজিক নিন্দারও কারণ হয় । [১৩] একইরকমভাবেই উপহার গ্রহণের ক্ষেত্রেও বাধ্যতাবোধ দেখা যায় ।

---

১৩ . *"Moral Conclusions" Conclusion* , *The Politics of Charity*

গোষ্ঠী প্রধান অহংকারের আতিশয্যে তার বাড়ীর অনুষ্ঠানে কেবল তার সঙ্গে সম পদমর্যাদার, তার তুলনায় উচ্চতর কিংবা নিম্নতর সকলকে নিমন্ত্রণ করে কেবলমাত্র সমান কিংবা উচ্চতর পদমর্যাদায় আসীন নিমন্ত্রিতদের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করলে তুলনায় যারা স্বল্প সামর্থ্য সম্পন্ন তারা অপমানিতবোধ করতেন । সেক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যক্তিরাও এই ধরণের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অস্বীকার করতেন । কারণ সংশ্লিষ্ট সভ্যতায় সামাজিক অনুশাসন অনুসারে কোন অনুষ্ঠানে উপহার প্রদান বা গ্রহণে অস্বীকার করার অর্থই হল ‘বিনিময় উপহার’ প্রদানে অস্বীকার করা এবং নিজ পদমর্যাদার ও ক্ষমতার হানি করা । তাই এই সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেকেই এই বাধ্যতাবিধি পালনে দায়বদ্ধ ছিলেন । এইভাবে দেখা যায় যে, বিনিময় উপহার প্রদানের প্রত্যয়টি এই সমাজব্যবস্থায় বাধ্যতামূলকভাবে হলেও এক উল্লেখযোগ্য রীতি বলেই উল্লিখিত হয়েছে ।

মায়া, ইনকা এবং আজতেক সভ্যতায় দান :

মায়া, ইনকা এবং আজতেক পৃথিবীর অন্যতম তিন প্রাচীন সভ্যতা । দান প্রসঙ্গে বিশেষত রক্তদান ও বলিদান বিষয়ে পৃথিবীর অন্যতম এই তিন প্রাচীন সভ্যতার বহু তথ্যে এমন সব নির্দেশ ও বর্ণনা পাওয়া যায়, যার মধ্যে দিয়ে ঐ তিন সভ্যতায় বর্তমান লাতিন আমেরিকায় প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় দৈনন্দিন জীবন যাত্রা সহ তাদের জীবনে ধর্মীয় অনুশাসনের গুরুত্বও প্রকাশিত হয় । সমাজ চিত্র প্রসঙ্গে লাতিন আমেরিকার কথা বলা হল কারণ উল্লিখিত তিন সভ্যতাই বর্তমান লাতিন আমেরিকার গুয়াতেমালা, বেলিজ, সালভাদোর ও মেক্সিকো সহ পেরুর কুজকো প্রভৃতি শহরগুলির বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল । প্রাচীন এই তিন সভ্যতার উৎস রূপে যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের অনুসন্ধান পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় , দক্ষিণ ইউরোপের স্পেন শহরটি একসময় আমেরিকাতেও নিজেদের প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে সেই দেশের বাজার দখল করে সেখানে উপনিবেশ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়ে সফল হয় । এর ফলে সেই সময় উভয় সভ্যতার মধ্যেই পারস্পরিক সংস্কার ও রীতি - নীতির মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে । উভয় দেশের আর্থ - সামাজিক বিন্যাস সহ তাঁদের রাজনীতির মানচিত্রের পটেও পরিবর্তনের সূচনা হয় । পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসের প্রাক্‌কথন পর্বে অন্যতম প্রাচীন বলে যে সভ্যতার নাম পাওয়া যায় তা হল ‘মায়া সভ্যতা’ । কালের বিচারে ও ইতিহাসের পরিসরে এই সভ্যতার সময় সীমাকে মূলতঃ দুটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে , প্রাথমিক পর্ব এবং পরবর্তী পর্ব । যদিও মায়া সভ্যতার সূচনা নিয়ে মত দ্বৈধতা আছে । তবে আনুমানিক ভাবে বলা হয় যে, মায়া সভ্যতার সূচনা হয় ১৬০০ খ্রীষ্টপূর্ব

শতকে। [১৪] জানা যায়, মায়া সভ্যতার প্রাথমিক ভাগরূপে যে চতুর্থ থেকে দশম শতকের কথা পাওয়া যায়, সেই সময়ে মায়া জনজাতির বসবাস ছিল মূলতঃ বর্তমান লাতিন আমেরিকার গুয়াতেমালা শহরে । আর এর পরবর্তী পর্বে মায়া সভ্যতার যেভাগ পাওয়া যায় সেই সময় মায়া জনজাতির মানুষ নিজেদের বসতি গড়ে তুলেছিলেন বর্তমান মেক্সিকো শহরে । ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায়, মায়া জনজাতির মানুষের পবিত্র গ্রন্থ ছিল 'পোপলভূহ' । কৃষি প্রধান মায়াদের জীবনে ভূট্টাচাষ ছিল অন্যতম । ভূট্টার বীজ বপন করা থেকে শুরু করে ফষল কেটে ঘরে তোলা ছিল তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার অন্যতম প্রধান অঙ্গ । [১৫] তাঁত বোনা, মাটির বিভিন্ন পাত্র তৈরি করাতেও ছিল তাদের সমান দক্ষতা । শুধু তাই নয়, বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে এও জানা যায় যে, তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারেও অভ্যস্ত ছিলেন । অঙ্ক শাস্ত্র , রাশি বিজ্ঞানসহ স্থাপত্য নির্মাণে ছিল তাঁদের বিশেষ দক্ষতা ও সামর্থ্য । কৃষি, বিজ্ঞান, স্থাপত্য নির্মাণ সহ ধর্মীয় ভাবনার প্রসারেও মায়া সভ্যতা বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিল । এইরূপ ধর্মীয় ক্ষেত্রে মায়া জনজাতিতে 'দান' ক্রিয়ার বিশেষ গুরুত্ব ছিল বলে বর্ণনা করা হয় ।

সমাজে প্রচলিত তত্ত্ব অনুসারে ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রটিতে কোন একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ চিন্তাভাবনা রুচি ও সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত হবে এমনটিই স্বাভাবিক । সেই একই নিয়মেই পৃথিবীর এই প্রাচীনতম মায়া সভ্যতাতেও ধর্মীয় ভাবনা তাদের নিজস্ব লোকাচার বা লোকরীতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল বলে জানা যায়, যেখানে উৎসর্গ অর্থে 'দান' ক্রিয়ার অবস্থান ছিল অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ । কারণ মায়া জনজাতির ধর্মীয় বিশ্বাসে রক্তদান এবং বলিদান প্রথার এক বিশেষ গুরুত্ব ছিল । উভয় দানকেই তাঁরা দেবতাদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতেন । মায়া জনজাতির ধর্মীয় বিশ্বাসে রক্তদান প্রথায় রাজা কিংবা অভিজাত বা বিশেষ কোন ধনী অভিজাত ব্যক্তি দেবতাদের সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে নিজেদের শরীরকে ছিন্ন করে শরীর থেকে নির্গত রক্ত একটি কাগজ কিংবা কাপড়ের বস্ত্র করে সংগ্রহ করতেন । তারপর দেবতাদের পূজার্চনার সময় তাদের সন্তুষ্টির জন্য সেই রক্তে ভেজা কাপড় বা কাগজকে পরিশুদ্ধ করে পোড়ানো হত । মায়াদের এইরূপ ধর্মীয় কার্য্যের মূলে ছিল এই বিশ্বাস যে, দেবতারা এই কাপড় বা কাগজ পোড়ানোর ধোঁয়াকে ধূপমানের মত করে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের আশীর্বাদ দান করেন । এছাড়াও অপর যে বলিদান বা আত্মদান - এর কথা মায়া জনজাতির জীবন যাপনে পাওয়া যায়, সেখানে দেখা যায় , দেবতাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোন তরুণ মহারাজার জীবন দান বা আত্ম বলিদান। আত্মবলিদান ও রক্তদান দান ক্রিয়ার এই দুই

---

১৪. *তিন সভ্যতা,* সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম অধ্যায়, পৃ: ৪১
১৫. ঐ, পৃ: ৩

ক্ষেত্রেই মায়া জনজাতিতে নিষ্ঠুর ও নির্মম প্রথার প্রয়োগ দেখা যায় । আত্মবলিদানের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উপায়ে রাজার বুক চিরে তাঁর জীবন নাশ করা হত ।

ইউরোপ ও আমেরিকার সংস্কার ও রীতি - নীতির সংমিশ্রণ এর মধ্যে দিয়ে যেসব নব সূচনা ঘটেছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল মেক্সিকো শহরে ইন্‌কা সভ্যতার প্রাপ্তি । আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপরূপে স্পেনের এরনান কোর্তেস মেক্সিকো অধিকার করেন এবং খুব স্বভাবতই মেক্সিকো থেকে গুপ্তধন প্রাপ্তির লক্ষ্যে অভিযান শুরু করেন, এই সময়েই তিনি ইনকা সভ্যতার সন্ধান পান । মায়া সভ্যতার পরে পরেই এই ইনকা সভ্যতা অপর একটি পরিচিত সমাজ বা জনগোষ্ঠী । ইনকা বলতে বোঝানো হয়, যা কিছু পবিত্র এমন। এঁরা ছিলেন প্রধানত সূর্য্য দেবতার বংশধর বা উত্তরসূরী ।[১৬] ইনকারা দক্ষিণ আমেরিকার জনজাতিদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন । সাধারণ কৃষি নির্ভর জনজীবনে বিশ্বস্ত হলেও তাদের আর্থ- সামাজিক পরিস্থিতি থেকে জানা যায়, তাদের সাহিত্য , শিল্পবোধ, রুচি, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য, রাজনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল উন্নত মানের । তাই বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান থেকে জানা যায়, সেই সময়ের সমাজ ব্যবস্থায় বাড়ি নির্মাণ করার সময় কাটা পাথরের ব্যবহার করা হত, বাড়ির বিভিন্ন অংশ আলাদাভাবে চিহ্নিত করার জন্য বর্ণময় বা রঙীন করা হত । ইনকারা ছিলেন সহজ ও সরল মানের জনগোষ্ঠী । ইন্‌কা সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল বর্তমান পেরুর কুজকো শহর। [১৭] দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় সারল্য বজায় রাখার জন্যেই এই সমাজ ব্যবস্থায় কতকগুলি ক্রমপর্যায়গত স্তরভাগ দেখা যায়, যার কোনটিই অপরটির কার্যকে ব্যহত না করে সমাজের প্রতি নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বা ভূমিকা পালন করত । ইনকাদের সমাজ ব্যবস্থায় স্বীকৃত ভাগগুলি ছিল - ধর্মীয় স্তর, কৃষি স্তর, সামরিক অঞ্চল ও প্রশাসনিক স্তর । প্রতিটি স্তরের কাজকর্ম দেখাশোনার একক দায়িত্বে ছিলেন অঞ্চল প্রশাসক । ইনকা সভ্যতার সমাজ ব্যবস্থা ছিল মূলতঃ কৃষি ভিত্তিক । বিভিন্ন রকম আলুর চাষসহ, মটর, বিন, লঙ্কা ইত্যাদি চাষ করার প্রথাও ছিল তাদের মধ্যে লক্ষ্যনীয় । এরা সমবেত উপায়েও জীবিকা যাপন করতেন, সেখানে কৃষি এবং শিকার উভয়েরই গুরুত্ব ছিল সমান ।

ইনকাদের ধর্মীয় অনুশাসনের তত্ত্ব থেকে জানা যায়, তারা বহু দেব - দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন । সূর্য্যদেবতার বংশধররূপে তাদের সূর্য্যভক্তি ও তাঁর উপাসনা ইত্যাদি ছিল আড়ম্বরপূর্ণ । অধিক ফসল ফলনের

---

১৬. *তিন সভ্যতা,* তৃতীয় অধ্যায়, পৃ: ৮২
১৭. ঐ. পৃ: ১০৭

প্রার্থনায় তারা প্রতি বছর ২১ শে জুন এই বিশেষ দিনটিতে সূর্য্যদেবতার বিশেষ পূজার্চনা করতেন। ইনকাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে এই বিশেষ দিনটি 'আপু ইনতি' নামে পরিচিত ছিল । এই অনুষ্ঠানে ইনকারা সূর্য্যদেবতার উদয়ের সময় থেকেই নানা উপচার ও প্রথায় তাঁকে সম্ভাষণ জানিয়ে স্মরণ করতেন । অনুষ্ঠানটিকে আরও বেশী বর্ণময় করে তোলার এবং সূর্য্যদেবতার অধিক সন্তুষ্টি উৎপাদনের জন্য প্রচলিত ছিল বলিদান প্রথা । তাঁর উদ্দেশ্যে চমরিগাই বলি দান করে উৎসর্গ করা হত । উল্লেখ্য যে, মায়া সভ্যতার মতো ইনকাদেরও এই বলিদানের প্রথা ছিল অত্যন্ত নির্মম । এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, এই অনুষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের কোন পুরোহিত একটি ধারালো ছুরি দিয়ে চমরিগাইয়ের বুক চিরে তাকে হত্যা করে তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ যেমন, চোখ, ফুফফুস ইত্যাদি বের করে এনে বলিদান প্রথাটিকে সম্পন্ন করতেন । ইন্‌কাদের সমাজ ব্যবস্থায় এই ধারালো ছুরিটি 'তুমি' (TUMI) নামে পরিচিত ছিল । তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে এই ছুরিটি অন্যতম পবিত্র একটি ছুরি । এরপর পুরোহিত আগুন জ্বালিয়ে তাতে 'সংখু' (Songhu) নামক বিশেষ একপ্রকার রুটি প্রস্তুত করে, যা ভূট্টার ময়দা এবং চমরিগাইয়ের রক্ত মিশিয়ে তৈরী করা হত, সূর্য্যদেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতেন । ইন্‌কাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে সূর্য্যদেবতা উৎসর্গের পোড়া গন্ধে সন্তুষ্ট হতেন । বৎসরের ২১ শে জুন তারিখটিতে 'আপু ইনতি' ছাড়াও সূর্য্যদেবতার উপাসনার জন্য ইনকাদের সমাজব্যবস্থায় ২৪ শে জুন দিনটিও বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল । এই দিনটিতে তারা 'ইনতি রায়মি' উৎসব পালন করতেন । এই দিনটি ইনকা জনগোষ্ঠীর সমাজজীবনে ঐতিহ্যপূর্ণ এক উৎসবের দিনরূপে পালিত হত । উৎসবের এই বিশেষ দিনটিতেও সূর্য্য দেবতার উদ্দেশ্যে প্রাণী বলিদান করার প্রাচীন প্রথা প্রচলিত ছিল । উৎসবে উৎসর্গের উদ্দেশ্যে আগুন জ্বালিয়ে তাতে বলিদান করা প্রাণিটির দেহ পুড়িয়ে তার পোড়া গন্ধ সূর্য্যদেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হত । এখানেও তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ছিল এই যে, এই পোড়া গন্ধে সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাদের আশীর্বাদ দান করবেন । সেই আশীর্বাদে তাদের আসন্ন বছরে যেমন অধিক ফসলের ফলন হবে তেমনি তাদের ভালমন্দও নির্ধারিত হবে । একইরকমভাবে অধিক ফসল ফলানোর জন্য তারা 'পাচামামা' র উদ্দেশ্যেও লামা বা চমরিগাই বলি দিতেন । ইনকাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে 'পাচামামা' পৃথিবীর প্রাকৃতিক দূর্যোগের দেবীরূপে পরিচিত ছিলেন । দেবীর গায়ের শ্যাম বর্ণ ইনকাদের ধর্ম ও সমাজব্যবস্থায় অমাবস্যার অন্ধকারময় রাতের সঙ্গে, মৃত্যুর ভয়াবহতার সঙ্গে তুলনা করা হত । তাই তাদের সমাজ জীবনে দেবীকে সন্তুষ্ট করে চলতে চাইতেন ইনকারা । [১৮]

মায়া ও ইনকা সভ্যতার পর লাতিন আমেরিকার অন্যতম প্রাচীন এক সভ্যতা হল 'আজতেক সভ্যতা' ।

---

১৮. *তিন সভ্যতা, ইনকা সমাজ, ধর্মীয় বিশ্বাস, লৌকিক দেবতা ও লোকাচার।*

আজতেক সভ্যতায় শিক্ষা- দীক্ষা, রুচি বোধ ও সংস্কৃতির মেল বন্ধন ঘটে । এই সভ্যতায় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা যায় যে, পরিবারের প্রধানরূপে বাবা ও মা ছিলেন সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষক । সন্তানের চৌদ্দ বছর বয়স পর্য্যন্ত তারাই শিক্ষা দান করতেন । আর এই বিষয়ে তদারকি করতেন স্থানীয় শাসক । ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় যে, এই সভ্যতা ছিল মূলতঃ কৃষি নির্ভর । দৈনন্দিন জীবন যাপনে আজতেক জনগোষ্ঠী ছিল তুলনায় সমৃদ্ধ । খাদ্যাভাসে এরা ছিলেন সহজ সরল মানের । এরা নিজেদের খাদ্য তালিকায় ভুট্টা, বিন্‌স সহ নানা ধরণের সবজি ইতাদি গ্রহণ করতেন । প্রোটিন জাতীয় খাদ্যরূপে বিভিন্ন প্রাণির মাংসের তুলনায় এরা নানা ধরণের পোকামাকড় ও পিঁপড়েকে অধিক গুরুত্ব দিতেন । [১৯] মায়া ও ইন্‌কা জনগোষ্ঠীর মতো আজতেক সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিল কিছু অতিপ্রাকৃত লোকাচার। দান প্রসঙ্গে উৎসর্গ অর্থে এক হিংস্র, নারকীয় পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায় এই সভ্যতায় । সেখানে দেখা যায়, ধারালো অস্ত্র দিয়ে দাতার শরীর ছিন্ন করে বুক চিরে রক্তদান করে দেবতাদের সন্তুষ্ট করার এক অমানবিক প্রথা এই সভ্যতাতে বর্ণিত হয়েছে । একইরকম ভাবে উৎসর্গের নিদান বর্ণিত হয়েছে খ্রীষ্ট ধর্মেও । বাইবেলের আদিপুস্তকে উৎসর্গের পোড়া গন্ধে দেবতাকে সন্তুষ্ট করার রীতি বর্ণিত হয়েছে । সেখানে দেখা যায়, সদাপ্রভুর অভিশাপে যাতে মাটি অভিশপ্ত না হয় এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রাকৃতিক নিয়ম যাতে স্বাভাবিক থাকে সেই উদ্দেশ্যে একটি বেদী নির্মাণ করে সদাপ্রভূকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রত্যেক জাতের শুচি পশু ও পাখী থেকে কয়েকটা করে নিয়ে পোড়ানো - উৎসর্গ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত । এই উৎসর্গের গন্ধে সদাপ্রভূ সন্তুষ্ট হন এবং তিনি তাঁর ভক্ত -- উপাসকদের আশীর্বাদ দান করে তাদের মনোবাসনা পূরণ করেন । [২০] লেবীয় পুস্তকেও উৎসর্গ বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা ও নির্দেশ পাওয়া যায় । এই গ্রন্থের মূল লক্ষ্য ছিল পবিত্রতা সাধন করা । সেই লক্ষ্যে মোশি তাঁর এই গ্রন্থে সদাপ্রভূকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে কতকগুলি উৎসর্গ এবং নিয়মের উল্লেখ করেছেন । যেমন - পোড়ানো - উৎসর্গ, শষ্য উৎসর্গ , যোগাযোগ - উৎসর্গ, পাপ উৎসর্গ এবং দোষ - উৎসর্গ । এই সকল উৎসর্গ দ্বারা উৎসর্গকারী সদাপ্রভূকে সন্তুষ্ট করে নিজের শুচিতা সাধন করেন । এখানে পোড়ানো উৎসর্গ - বিষয়ে গরু , ভেড়া, ছাগল এবং ষাঁড় এই সকল প্রাণির উল্লেখ হয়েছে । নিয়ম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এই সকল প্রাণির প্রতিটিকেই হতে হবে অবশ্যই ত্রুটিহীন । যে উৎসর্গকারী সদাপ্রভূকে সন্তুষ্ট করে নিজের শুচিতা সাধন করতে চান তিনি সদাপ্রভূর সামনে মিলন তাম্বুর দরজায় ঐ নির্দিষ্ট জন্তুটির মাথায় হত রেখে তার বলি প্রদান করবেন। তারপর ঐ মৃত জন্তুটির দেহ থেকে নির্গত রক্ত সদাপ্রভূর উদ্দেশ্যে নির্মিত বেদীর চারপাশে ছিটিয়ে দিয়ে মৃত

---

১৯. *তিন সভ্যতা, ইনকা সমাজ, ধর্মীয় বিশ্বাস, লৌকিক দেবতা ও লোকাচার* । পৃ: ১২৯
২০. *বাইবেল ,আদিপুস্তক* ৮। ২০- ২২

দেহের বাকী অংশ গুলিকে খন্ড করে কেটে ঐবেদীতে পুড়িয়ে ফেলতে হবে । এইরূপ আগুনে করা যেকোন পোড়ানো - উৎসর্গের গন্ধে সদাপ্রভূ খুশী হন । এইরূপ পোড়ানো উৎসর্গের নিয়মে উৎসর্গকারীকে সাহায্য করবেন পুরোহিত । এই প্রসঙ্গে পুরোহিতদের প্রতি বিশেষ নির্দেশ যে, তিনি কখনোই ঐ উৎসর্গবেদীর আগুন নিভতে দেবেন না । তিনি ঐ বেদীর আগুন সর্বদাই জ্বালিয়ে রাখবেন। প্রতিদিন সকালবেলা একটি করে কাঠ তিনি ঐ আগুনে দেবেন ।[২১] এই প্রসঙ্গে লেবীয় পুস্তকেই পুরুষ ও মহিলা উভয়ের দেহেরই যেকোন অস্বাভাবিক স্রাবকে অশুচি বলে উল্লেখ করে সেই অশুচিতা থেকে শুচি বা শুদ্ধ হওয়ার জন্য সদাপ্রভূর উদ্দেশ্যে পাপ ও পোড়ানো উভয় প্রকার উৎসর্গ অনুষ্ঠান অবশ্যনিয়ম বলে নির্দেশিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যেই সদাপ্রভূর কাছে নিজের শুচিতা প্রার্থনা করে তার উদ্দেশ্যে পুরোহিতের মাধ্যমে ঘুঘু এবং পায়রা এই দুটি পাখির একটিকে দিয়ে পাপ এবং অন্যটিকে দিয়ে পোড়ানো উৎসর্গ অনুষ্ঠান করতে হবে । এছাড়াও উভয়ের জন্য পৃথকভাবে নির্দেশিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম, যেমন - স্নান করা, ব্যবহৃত বস্ত্র ধোওয়া, আসনের শুদ্ধিকরণ করা, নির্ধারিত দিন এর নিয়ম অনুসারে যাপন করা ইত্যাদি ।[২২] একইরকমভাবে যোগাযোগ - উৎসর্গেও সদাপ্রভূকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রায় একইরকম নিয়মে খুঁত বা ত্রূটিহীন পশুর বলিদান নির্দেশিত হয়েছে । শষ্য - উৎসর্গে সদাপ্রভূকে সন্তুষ্ট করার জন্য মিহি ময়দা , তেল এবং অন্যান্য শষ্য সামগ্রী দিয়ে উৎসর্গের নির্দেশ করা হয়েছে । এই প্রকার উৎসর্গে উৎসর্গকর্তা যে পরিমাণ খাদ্যশষ্য উৎসর্গের জন্য নিবেদন করেন তার থেকে পুরোহিত এক মুঠো তুলে নিয়ে বেদীতে সদাপ্রভূর উদ্দেশ্যে পুড়িয়ে দেন । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে , সদা প্রভূর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা সকল প্রকার পোড়ানো - উৎসর্গের মধ্যে এই শস্য উৎসর্গের বাকী অংশটুকুকে মহা পবিত্র বলে লেবীয় পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে ।[২৩] জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কৃত পাপকর্মের ক্ষয় সাধন করার জন্য নির্দেশিত হয়েছে পাপ - উৎসর্গ ও দোষ- উৎসর্গ । এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে , নিজের ইচ্ছা না থাকলেও বাধ্য হয়ে জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাত সারে কোন অন্যায় করলে কিংবা সদাপ্রভূর নিষেধ অমান্য করে কোন কাজ করলে তার জন্য কর্মকর্তার পাপফল সঞ্চিত হয় । সেই পাপকর্মফল এর ক্ষয় সাধন করার জন্য ঐ ব্যক্তিকে সদাপ্রভূর উদ্দেশ্যে পাপ - উৎসর্গ ও দোষ - উৎসর্গের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এক্ষেত্রেও সেই একইভাবে খুঁতহীন পশু কিংবা পাখির প্রাণ উৎসর্গ করে তাদের মৃতদেহ সদাপ্রভূর উদ্দেশ্যে নির্মিত পোড়ানো বেদীতে পুড়িয়ে ফেলতে হবে । ঐ পোড়ানোর গন্ধে খুশী হয়ে সদাপ্রভু ঐ ব্যক্তিদের পাপক্ষয়

---

২১. *' লেবীয় পুস্তক ',* ১। ১ -১৭
২২. ঐ,. ১৫। ২ - ৩৩
২৩. ঐ, ২।১ - ২০

করবেন।[২৪] এইসকল উৎসর্গের মধ্যে দিয়ে লেবীয় পুস্তকে ব্যক্তিদের পবিত্রতা বজায় রাখারও নির্দেশ করা হয়েছে। কারণ মোশির মতে, সদাপ্রভূ পরম পবিত্র , তাই তাঁর আরাধনা করার জন্য উপাসকদেরও পবিত্র হতে হবে ।

খ্রীষ্টধর্ম ও চার সভ্যতায় দান : দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্ক এবং সমাজচিত্র :

অন্যান্য ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় বর্ণিত দানতত্ত্বের মতোই এখানেও অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্মসহ পলিনেশীয় সভ্যতার সমাজব্যবস্থায় দানতত্ত্ব যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেখানে দেখা যায় যে, দাতা ও গ্রহীতার জন্যে দান কর্মে কতকগুলি বিধি নির্দেশিত হয়েছে । যার যথাযথ প্রয়োগে উভয়ের মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে । গ্রহীতা তার নিজের জীবনের প্রয়োজন পূরণের তাগিদে দাতার উপর নির্ভরশীল হলেও দাতা তার দানজন্য কোন অহংকার প্রকাশ করবেন না । গ্রহীতাদের প্রতি অসম্মানজনক কোন মনোভাব পোষণ করবেন না । বরং দাতা যেমন গ্রহীতাদের উদ্দেশ্যে সম্মান ও মর্য্যাদার সঙ্গে দান করবেন তেমনি গ্রহীতা তা গ্রহণও করবেন সম্মান ও মর্য্যাদার সঙ্গেই । যা দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের মধ্যেই এক পারস্পরিক সুষ্ঠু, স্বাভাবিক ও সুদৃঢ় সম্পর্কের সেতু গড়ে তুলবে । বিশেষতঃ খ্রীষ্ট ধর্মের ধর্মীয় অনুশাসনে দান বিষয়ে যেভাবে পুরাতন ও নতুন নিয়মে যথাক্রমে সদাপ্রভূর উপদেশ ও পরম পিতা যীশুর মহান শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে সেখানে দেখা যায়, গ্রহীতাকে তার প্রয়োজনীয় বিষয় দান করার জন্য দাতার মনের ব্যকুলতাই তাকে নিরহঙ্কারী করে তুলবে । এইরূপ নিরহঙ্কারী ও নিঃস্বার্থ মনোভাবে যে দান তাই প্রকৃত দান। সেই দানেই ঈশ্বর খুশী হন । দাতা নিজের অজান্তেই সকল বিপদ থেকে অনায়াসে উত্তীর্ণ হন। ঈশ্বর সদা - সর্বদাই তার রক্ষা করেন । যে ঈশ্বর ও তাঁর কৃপা লাভ করার জন্য দাতার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও মনোবাসনা তাও পূর্ণ হয় । তাই দাতা ঈশ্বরকে লাভ করার পরম আকুতিতেই দান করবেন । আবার একইভাবে দান ক্রিয়ায় এইরূপ ব্যাকুলতার ও বাধ্যতার কথা পাওয়া যায় পলিনেশীয় সভ্যতায় বর্ণিত বিনিময় উপহার দান প্রথার মধ্যেও । যদিও দার্শনিক বিশেষতঃ নীতি দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে দান ব্যবস্থায় এইরূপ বিনিময় উপহার প্রদানের বাধ্যবাধকতাবোধ ‘দান’ প্রসঙ্গে কতদূর প্রচলিত অর্থে যুক্তি যুক্ত সেই প্রশ্ন থেকেই যায় । তথাপি বাধ্যতাবোধের ব্যাখ্যায় বলা যায়, শুধু পলিনেশীয় সভ্যতাতেই নয় বরং আমাদের সকলের জনজীবনেই প্রচলিত উপহার এবং বিনিময় উপহার প্রথার মূলে যেমন আছে কর্ত্তব্যবোধের গুরুত্ব তেমনি আছে আবেগ ও নৈতিকতাবোধের সহঅবস্থান । পলিনেশীয় সভ্যতায় বর্ণিত উপহার

---

২৪. *লেবীয় পুস্তক* , ২। ৪ -৫

প্রদানের ক্ষেত্রে 'বিনিময় উপহার প্রদানের বাধ্যবাধকতাবোধ' প্রকৃত অর্থে ব্যক্তি গ্রহীতার বিবেকের বাধ্যতাবোধ দাতার প্রতি তার অন্তরের আকুতির বাধ্যতাবোধ । উপহারের পরিবর্তে উপহার দেওয়া এমনটাই আমাদের সকলের মনোভাব হওয়া উচিৎ তবে তা অবশ্যই সামর্থ্যভেদে বিবেচিত হবে । কারণ সংস্কার ও রীতি- নিয়ম এইরূপ সামাজিক অনুশাসনেরই অনুসরণ করে এবং এই নিয়ম অনুসারে কেবল দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্য নয় বরং সামাজিক আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয় , যেমন - নিমন্ত্রণ বাড়ীতে প্রদত্ত উপহার এবং বিনিময় উপহার । তাই যখন কোন একজন দাতা সামাজিক অনুশাসন অনুসারে কোন একটি অনুষ্ঠানে অথবা ব্যক্তিগত ইচ্ছায় কোন ব্যক্তিকে উপহার দান করেন, তখন গ্রহীতা সেই উপহার গ্রহণ করে অন্তর থেকেই তার বিনিময়ে দাতাকে কিছু দেওয়ার ইচ্ছা বা দায় অনুভব করেন । একজন গ্রহীতা তাঁর সামর্থ্য অনুসারে দাতার কাছ থেকে যা পেয়েছেন তার থেকেও বেশী কিছু দাতাকে দিতে চান, এযেন দাতার জন্যে গ্রহীতার অন্তরের পূর্ণ দায়বদ্ধতা। এইরূপে দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় অনুশাসনে দানক্ষেত্রে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করার যে দায়বদ্ধতার উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই দায়বদ্ধতাই পলিনেশীয় সভ্যতায় বর্ণিত দানতত্ত্বে দাতার প্রতি গ্রহীতার অন্তরের বাধ্যতাবোধরূপে সামাজিক অনুশাসনের বাধ্যতা বলে উল্লিখিত হয়েছে । যার মধ্যে দিয়ে সামাজিক অনুশাসনের কঠোরতার সঙ্গে সমাজের উদার মনোভাবনার পরিচয়ও প্রকাশিত হয়েছে । শুধু তাই নয়, সমাজব্যবস্থায় যেমন বিনিময় উপহারের উপহার প্রদানের বাধ্যতাবোধ যেমন সমাজে জাতিগত বা উপজাতিগত পরিসরে দেশ, দল, গোষ্ঠী - প্রধান বা গোষ্ঠী পতি এইরূপ উল্লেখের মধ্যে দিয়ে যেমন সমাজে শ্রেণীগত অবস্থানের উল্লেখ হয়েছে তেমনি দান প্রথায় এইরূপ বাধ্যতাবোধে সেই শ্রেণীগত অবস্থানের মধ্যে সম্মান ও মর্য্যাদার সাম্য প্রতিষ্ঠারও প্রয়াস করা হয়েছে । তাই বলা যায় যে, খ্রীষ্ট ধর্ম সহ উত্তর আমেরিকার পলিনেশীয় সভ্যতায় বর্ণিত দানতত্ত্বে দান শব্দটির প্রচলিত পরিসরে এইরূপ আন্তরিক দায়বদ্ধতার সংযোজন নিঃসন্দেহেই এক নবমাত্রার সংযোজন । যার মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন সমাজে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে যে পারস্পরিক সম্মানবোধের উল্লেখ হয়েছে তেমনি তার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিজীবনের নৈতিক মূল্যমানের উৎকর্ষতাও সূচিত হয়েছে ।

বিপরীতে পৃথকভাবে মায়া, ইন্‌কা ও আজতেক সভ্যতায় বর্ণিত দানতত্ত্বে মূলতঃ ধর্মীয় মনোভাবই প্রাধান্য পেয়েছে । এই তিন সভ্যতাতেই তাদের ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে তাদের দেবতাদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ অর্থে দান ক্রিয়ায় রক্তদান, আত্মবলিদান ইত্যাদির উল্লেখ হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে কিছু বিধি - নিয়মেরও উল্লেখ হয়েছে । এইক্ষেত্রে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে তাঁর কৃপা লাভ করাই মূল লক্ষ্যরূপে গৃহীত হয়েছে । তাই এই তিন সভ্যতাতেই উল্লিখিত দানতত্ত্বে দান ক্রিয়ায় দাতা ও গ্রহীতার জন্য কোন বিধি নিয়মের উল্লেখ পাওয়া যায় না । এইরূপ উদ্দেশ্য ক্ষেত্রে খ্রীষ্ট ধর্মের সঙ্গে তিন সভ্যতায় বর্ণিত দানতত্ত্বে বিধি, নিয়ম ইত্যাদি প্রসঙ্গে উভয়ক্ষেত্রের

উৎসর্গ ক্রিয়ায় সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই আছে । সেখানে দেখা যায়, খ্রীষ্ট ধর্মসহ তিন সভ্যতাতেই এইরূপ দানকর্মে যুক্ত হয়েছে কিছু অতিপ্রাকৃত ভাবনা এবং লোকাচার। একেবারে নারকীয় পদ্ধতিতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে শরীর ছিন্ন করে বুক চিরে রক্তদান করে দেবতাদের সন্তুষ্ট করার এক অতিপ্রাকৃত প্রথা বর্ণিত হয়েছে । আরও দেখা যায় যে, শিক্ষা এবং রুচি বোধ ইত্যাদিতে এগিয়ে থাকলেও আজতেক সভ্যতাও মায়া এবং ইন্‌কা সভ্যতার মতো করেই দান ক্রিয়ার ক্ষেত্রে রক্তদান প্রথার এমন এক নিয়মে বিশ্বাসী যেখানে 'রক্তদান' শব্দটি তার পরিচিত পরিসরের সঙ্গে এক নতুন মাত্রার যোগ সাধন করেছে । রক্তদান এর মতো মহৎ দান করে যেখানে সরাসরি দাতা গ্রহীতার জীবন দান করেন , সেখানে এই দান প্রথাই উক্ত তিন সভ্যতাতেই কেবলই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করে তাঁকে সন্তুষ্ট করার অন্যতম উপায় বা মাধ্যম বলে গৃহীত হয়েছে । তাতে সরাসরি কোন ব্যক্তির জীবনের দান না হলেও তা যে তাদের জীবন যাপনের পক্ষে অনুকূল বা সহায়ক হতে পারে এমন ভাবনাই যেন এক্ষেত্রে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আবার বৈসাদৃশ্য প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রথমতঃ খ্রীষ্ট ধর্মে দান ক্রিয়া প্রচলিত পরিসর ও ব্যাপকার্থে উৎসর্গ উভয় অর্থে উল্লিখিত হলেও তিন সভ্যতায় দান ক্রিয়া কেবলই উৎসর্গ অর্থেই বর্ণিত হয়েছে । দ্বিতীয়তঃ, মায়া, ইনকা ও আজতেক এই তিন সভ্যতাতেই দেবতাদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এইরূপ উৎসর্গ অনুষ্ঠানের আয়োজন নির্দিষ্টভাবে ঐ ধর্মের অনুসরণকারীদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং প্রচলিত সংস্কার অনুসারে হলেও বাইবেলে উক্ত সকল উৎসর্গ নিয়মগুলি সদাপ্রভূর নির্দেশ বলেই উল্লিখিত হয়েছে । যদিও হিন্দু ধর্ম ও শাস্ত্রে বলিদান প্রথা রূপক অর্থে কাম, ক্রোধ ইত্যাদি রিপুর বলি অর্থে বর্ণিত হয় । তথাপি দেখা যায়, উৎসর্গ অর্থে 'দান' শব্দের পরিসরে এই যে নতুন অর্থগত ব্যবহারের সংযোজন ঘটেছে তা যেমন তার প্রচলিত ব্যবহার থেকে ভিন্নরূপে পরিবেশিত হয়েছে তেমনি এর প্রয়োগে নির্মমতাও প্রকাশিত হয়েছে। ব্যক্তি কল্যাণ কিংবা সমাজ - কল্যাণ যেকোন কারণেই হোক না কেন এইভাবে দেবতাদের উদ্দেশ্যে কোন পশু - পাখির উৎসর্গ করা কিংবা মানুষের নিজের আত্মবলিদান দেওয়া বা আত্মোৎসর্গ করা প্রসঙ্গে যেকথা অবশ্য উল্লেখ্য তাহল এইরূপ প্রথার মধ্যে দিয়ে প্রাণহরণের নিষ্ঠুরতায় 'দান' শব্দটি তার স্বরূপগত তাৎপর্য্য হারিয়েছে । কারণ 'দান' শব্দটির প্রকৃত লক্ষ্যই যদি হয় অন্যের মঙ্গল সাধন করা তাহলে কোন মানুষ হয়ে অন্য কোন মানুষের কিংবা অসহায় জীবের হত্যা করার মধ্যে দিয়ে যে কোনরূপ ব্যক্তি কল্যাণ কিংবা সামাজিক - কল্যাণ সাধিত হয় এমন তত্ত্ব যা উভয় ক্ষেত্রেই বর্ণিত হয়েছে তা আদৌ কতদূর সার্বিক কল্যাণ সাধনে গ্রহণযোগ্য হতে পারে সেই সম্বন্ধে নীতিগত ও উপযোগিতামূলক প্রশ্ন থেকেই যায় ।

তথ্যসূত্র :

- বন্দ্যোপাধ্যায় সুবীর , *লাতিন আমেরিকার তিন সভ্যতা মায়া, ইনকা ও আজতেক ,* ২০০৭, কোডেক্স, কলকাতা - ৯ ।

- *পবিত্র বাইবেল (পুরাতন ও নূতন নিয়ম), THE HOLY BIBLE,* Bengali –C.L (BBS) , BSI Version, 11.01.19, The Bible society of India. India.

- Mauss Marcel , *THE GIFT FORMS AND FUNCTIONS OF EXCHANGE IN ARCHAIC SOCIETIES* , 1966, Cohen & West Ltd . London .

সপ্তম অধ্যায়

দান প্রসঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধি ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিন্যাস

দর্শনে বিশেষতঃ নীতিদর্শনে যে উপযোগিতা তত্ত্বের আলোচনা পাওয়া যায় , তা মুলতঃ হিতসাধনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত । অন্যের হিতসাধনে যা উপযোগী কিংবা আরও সুনিশ্চিত করে বলা হয়, যে কাজ সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক পরিমাণ হিত সাধনের উপযুক্ত তাই উপযোগী । এইরূপ উপযোগিতা তত্ত্বের প্রায় সমগোত্রীয় তত্ত্ব হল পরার্থবাদ (altruism) । পরার্থবাদ হল সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিস্বার্থ নিরপেক্ষ একটি ক্রিয়া, যা জনগণের স্বার্থে বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয় । এই ধরণের পরার্থবাদে অন্যের সাহায্যার্থে টাকা - পয়সা, জমি - যায়গা সহ, সময় এবং পরিস্থিতি অনুসারে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করা এই সবই অনুমোদিত । বলা বাহুল্য যে, এইধরণের পরার্থবাদীতত্ত্ব ব্যাপক অর্থে ‘দান’ শব্দটির প্রচলিত ব্যবহারসম । বর্তমান গবেষণা পত্রের পূর্ব অধ্যায়গুলির আলোচনায় ‘দান’ শব্দটির বিভিন্ন ব্যবহার বা উল্লেখ তাৎপর্য্যসহ বর্ণিত হয়েছে । সেখানে যেমন দেখা গেছে ‘দান’ শব্দটির ব্যবহার হয়েছে দেবতার কৃপা লাভের প্রসঙ্গে , স্বধর্ম পালন প্রসঙ্গে, কোথাও কর্ত্তব্য পালন প্রসঙ্গে তেমনি আবার কোথাও বা ফলের লক্ষ্যে ব্যক্তি স্বার্থে, কোথাও বা গোষ্ঠী স্বার্থে কিংবা ব্যাপক পরিসরে সমাজের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থেও । সামাজিক বিন্যাসের পরিকাঠামোয় পরার্থবাদ ‘দান ক্রিয়া’কে অতিউপযোগী একটি অঙ্গ বলেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে । যার প্রাথমিক লক্ষ্যরূপে অন্যের মঙ্গল সাধন বা হিতসাধন নির্ধারিত বা ঘোষিত উদ্দেশ্য হলেও তা যে সবক্ষেত্রেই নিরপেক্ষভাবে সম্পাদিত হতে পারে এমন নয় এবং এই মর্মে বিভিন্ন সম্ভাবনারও উল্লেখ হয়েছে । যে সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ‘দান’ প্রসঙ্গগুলি কীভাবে জনসাধারণের হিতকল্পে পরিচালিত দান ক্রিয়াও এইরূপ প্রচলিত পরিসরের বাইরে বিভিন্ন পরিস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হয়েও ‘দান’ নামেই অভিহিত হয় । যা অবশ্যই ‘দান’ শব্দটির ব্যবহারিক পরিসরের বিস্তৃতি ঘটায় । বর্তমান অধ্যায়ের লক্ষ্য হবে এই সকল বিধি নিয়ন্ত্রিত দান পরিসর বা ক্ষেত্রগুলির উল্লেখপূর্ব্বক তার সীমাবদ্ধতার কথা যেমন আলোচনা করা তেমনি দান শব্দটির এইসকল ভিন্ন ভিন্ন অর্থগত ব্যবহারের মধ্যে কোথাও কোন সাদৃশ্যের উপস্থিতি আছে কীনা তা নির্ণয় করা । এই লক্ষ্যে সমগ্র অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় দুটি পর্বে বিন্যস্ত হয়েছে প্রথম পর্বে ভারতবর্ষের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় দান ক্রিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সূক্ষ্ম অথচ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধিগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় সেই বিধিগুলিসহ

দানের সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রগুলির আলোচনা করা হয়েছে । শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্য্যন্ত দান সম্পর্কে বর্ণিত এইসকল তথ্যের অনুসরণ ও পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, দান ক্রিয়ার মূলে আছে বিভিন্ন ভিত্তি যেমন - সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, মনোস্তাত্ত্বিক বা নৈতিক । সামাজিক ভিত্তিমূলক স্তরে দান মূলতঃ সমাজের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য । যা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার মধ্যে দিয়ে হিত সাধনের নীতির কার্য্যকরী ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । যে নীতির মূলে অন্যতম প্রধান আদর্শ হল পরার্থবাদ । তাই এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বে উপসংহার অংশে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় বর্ণিত এইসকল দান ব্যবহারের মধ্যে দানের অন্যান্য ভিত্তির মধ্যে মূলতঃ সামাজিক, ধর্মীয় এবং মনোস্তাত্ত্বিক ভিত্তির নিরিখে বর্ণিত দানতত্ত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কীরূপে তাদের মধ্যে কোন সাধারণ ধর্ম নয় বরং যেন এক প্রকার পারিবারিক সাদৃশ্যের নিরিখে এইরূপ পরার্থবাদী আদর্শ ক্ষেত্র বিশেষে চরিতার্থতা লাভ করছে আবার কোথাওবা প্রসঙ্গ বা পরিস্থিতি গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হচ্ছে সেই বিষয়ে আলোচনার মধ্যে দিয়ে দানের দার্শনিক তাৎপর্য্য নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছি ।

প্রথম পর্ব

'দানক্ষেত্রে' সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধির প্রয়োগ ও দানের সীমাবদ্ধতা

সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে সাধিত দান ও দানবিধি :

কোন অসহায় ব্যক্তির সাহায্যে তার সহায় হওয়া, তাকে যেকোনভাবে সাহায্য করে তার অসহায় পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করতে অর্থ, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় দেওয়া হল সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে সাধিত 'দান' । 'দান' শব্দটির এইরূপ প্রচলিত ব্যবহারের সঙ্গে যেমন একজন ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তির মঙ্গল সাধন করার ধারণা যুক্ত হয়ে আছে তেমনি বৃহত্তর পরিসরে সেই ক্রিয়ায় সমাজের মঙ্গল সাধনের দিকটিও জড়িত হয়ে আছে । তবে এইরূপ মঙ্গল সাধনের সম্পর্ক যে শুধুমাত্র ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির মধ্যেই সম্পন্ন হয় এমন নয় । বরং দুজন ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়াও এই মঙ্গল কর্ম সাধিত হতে পারে একজন ব্যক্তির সঙ্গে কোন গোষ্ঠীর, কোন সংঘের কিংবা কোন সম্পদায়েরও । এছাড়াও দানের অন্যান্য সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলি হল, রাজ্য, দেশ এবং দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান । এইরূপ কল্যাণ সাধন যখন কেবল দুজন

ব্যক্তির মধ্যেই স্বেচ্ছায় সাধিত হয় সেখানে দান সম্পর্কিত কতকগুলি প্রচলিত বিধি যেমন, গ্রহীতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা, দানীয় বিষয়ের মূল্যমানে নিশ্চিত হওয়া, দাতার দান বিষয়ে কোন অহংবোধ না থাকা ইত্যাদি প্রচলিত নিয়ম অতিরিক্ত কোন আইনী বিধি কিংবা বিশেষভাবে সুনির্দিষ্ট সামাজিক অথবা কোন প্রাতিষ্ঠানিক কোন অনুশাসনের প্রভাব থাকে না । কিন্তু যখন দান ক্রিয়াটি ব্যক্তি কর্তৃক গোষ্ঠী, সমাজ, কিংবা দেশ বা রাষ্ট্র অথবা কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় কিংবা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে কোন বাণিজ্য সংস্থার মধ্যে সম্পাদিত হয় তখন ঐরূপ প্রচলিত বিধিগুলির অতিরিক্ত কতকগুলি অন্যান্য বিধিরও প্রয়োজন হয়। যে বিধিগুলির মাধ্যমে সমাজের সুরক্ষাকল্পে সম্পাদিত দান ক্রিয়া পূর্ণরূপে দায়বদ্ধতার সঙ্গে পরিচালিত হতে পারে এবং তার জন্য ক্ষেত্রবিশেষে যেমন প্রয়োজন হয় আইনী হস্তক্ষেপের তেমনি আবার প্রতিষ্ঠিত সরকারের রাজনৈতিক পদক্ষেপও ।

প্রশ্ন হল, কেন সর্বাঙ্গীন কল্যাণকর্মে পরিচালিত দানক্রিয়ায় এইরূপ হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় ? সামাজিক কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, ‘দান’ নামক ক্রিয়ায় এইরূপ হস্তক্ষেপের ভাবনার মূলে যে উদ্দেশ্য কাজ করে তাহল, কতকগুলি বিধির মাধ্যমে সাধিত দান ক্রিয়ার দ্বারা সামাজিক কল্যাণ সাধনের ভাবনাকে সুরক্ষিত এবং সুনিশ্চিত করা । তাই সামাজিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সাধিত যেকোন দান ক্রিয়ার ক্ষেত্রেই উক্ত বিধিগুলির কাজ হবে - প্রথমতঃ জনগণের স্বার্থে এই পর্যন্ত সম্পাদিত দান ক্রিয়ায় কোন কোন সামাজিক সুযোগ - সুবিধা প্রদান করা হয়েছে তা জনগণের কাছে সুস্পষ্ট করা । দ্বিতীয়তঃ পরবর্তীতে আরও কী কী সুবিধা প্রদান করা হবে এবং কোন উপায়ে তার স্বার্থক রূপায়ণ সম্ভব হবে তা স্পষ্ট করা । তৃতীয়তঃ জনগণের সুরক্ষার্থে ভবিষ্যতে পরবর্তী দান ক্রিয়ায় কোন কোন সুযোগ সুবিধা প্রতিষ্ঠিত সরকার প্রদান করবেন তা সুনির্দিষ্ট করা । চতুর্থতঃ প্রচলিত দান ব্যবস্থায় অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি পরিচিত ক্ষেত্রগুলি ছাড়া নতুনভাবে আরও কোন কোন ক্ষেত্র সংযুক্ত হতে পারে তা বিচার করা । পঞ্চমতঃ সরকার অনুমোদিত অথবা অননুমোদিত কোন নির্দিষ্ট সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত দান ব্যবস্থায় সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষ কীভাবে কোন উপায়ে উপকৃত হতে পারেন তার উপায় ও বিধি সুনির্দিষ্ট করা । শুধু তাই নয়, রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে বাধ্যতামূলক কর দান ব্যবস্থাকে কীভাবে আরও নতুন উপায়ে ব্যবহার করে আরও অধিক পরিমাণে দান কর্মকে উৎসাহিত করা যায় সেই বিষয়েও বিচার - বিশ্লেষণ করা । শেষতঃ কোন নির্দিষ্ট দান ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে লক্ষ্যরূপে গ্রহীতা ছাড়াও তার পরিবার, তার গোষ্ঠী ও তার সম্প্রদায় কীভাবে উপকৃত হতে পারে সেই বিষয়েও ভাবনা - চিন্তা করা । বলা বাহুল্য যে, উল্লিখিত বিধিগুলির কার্যাবলীর উল্লেখের মধ্যে দিয়ে একথা বোঝা যায় যে, রাষ্ট্রে জনগণের স্বার্থ সুরক্ষিত করা এবং এই মর্মে বিভিন্ন প্রকল্পের গ্রহণ করা যেমন প্রতিষ্ঠিত সরকারের দায়িত্ব তেমনি তা ভোগ

করা জনগণেরও অধিকার। এই কারণেই সামাজিক কল্যাণের সুরক্ষায় 'দান' এবং প্রয়োজনীয় বিধির উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ ।

দান ক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্ব ও রাজনৈতিক প্রভাব :

প্রতিষ্ঠিত সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন কোন সংস্থা অথবা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন সংস্থা যখন সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যাপক পরিসরে কোন দান ক্রিয়ার আয়োজন করতে উদ্যোগী হন তখন তাদের কে যথাক্রমে এইবিষয়ে সরকার নির্ধারিত বিধির অনুসরণ করতে হয় অথবা কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয় । প্রয়োজনে তৈরী হয় বিভিন্ন আইনী বিধি । সংস্থাগুলি নিজেদের জনপ্রিয়তা নির্ধারণ কল্পে আরও নতুন দানক্ষেত্রের সংযোজনের প্রতি উদ্যোগী হয় । বিধি নির্ধারিত এইরূপ দান ব্যবস্থায় সংস্থাগুলি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিধি মেনে চলতে দায়বদ্ধ থাকেন হয় চুক্তি নির্ধারিত দিন পর্য্যন্ত অথবা প্রতিষ্ঠিত সরকারের শাসন ব্যবস্থা বা কার্য্যকালের পূর্ণ মেয়াদ পর্য্যন্ত। এই ধরণের দান ব্যবস্থায় মূল লক্ষ্যরূপে জনকল্যাণ সুনিশ্চিত এবং সুনির্দিষ্ট হলেও এর অন্যান্য সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলিকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না । যেমন - প্রথমত: যদি কোন সংস্থা তাদের ব্যক্তিগত প্রচারের স্বার্থে জনকল্যাণমূলক কোন প্রকল্পের দায়ভার বহন করে তবে তাতে প্রতিষ্ঠিত সরকারের জনগণের প্রতি অর্থনৈতিক দায়ভার যে হ্রাস পায় সেকথা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা যায় না । দ্বিতীয়তঃ এই ধরণের উদ্যোগকে স্বাগত করার মধ্যে দিয়ে আরও অন্যান্য সংস্থাকেও এইধরণের প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে তাদের বাণিজ্যিক পরিসরকে আরো বিস্তৃত করতেও উৎসাহিত করা হয় । তাতে রাজ্য বা রাষ্ট্রে নিত্য নতুন শিল্পের বিনিয়োগ হয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় হয় । এতে সাধারণ জনগণের কাছে প্রতিষ্ঠিত সরকার তার শাসনব্যবস্থায় যে জনদরদীভাবনার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়, সেই বার্তা সহজে পৌছে দিতে পারে । এইরূপে, প্রাতিষ্ঠানিক বা কোন ব্যবসায়িক সংগঠন বা সংস্থার এইসকল দান প্রকল্পগুলির স্বার্থক রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে সরকারের জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পায় ।

এইভাবে দেখা যায় যে, জনকল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক দান প্রকল্পগুলির সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে যেগুলিকে রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত কিংবা আকারিত করা করা যায় এমনকী ক্ষেত্রবিশেষে সীমায়িতও করা যায় । কারণ এইধরণের প্রকল্পগুলির রূপায়ণে যে সকল আইনী বিধিগুলির প্রয়োগ সরকার কর্তৃক করা হয় তাও যে জনগণের হিতার্থে তা অস্বীকার করা না গেলেও একথা বলতেই হয় যে, এই সকল বিধিগুলির মাধ্যমে প্রকল্পগুলিকে সরকারী বা রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণও করা হয় । এমনকী ক্ষেত্রবিশেষে

রাজনৈতিক স্বার্থেই এইধরণের প্রকল্পগুলিকে সীমিতও করা হয় । প্রকল্পগুলিকে কিংবা ব্যাপকার্থে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজন মতো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কখনও কখনও ব্যবহারও করা হয় । যেমন দেখা যায় যে, বন্যা, খরা , অতিবৃষ্টি কিংবা অনাবৃষ্টি বা কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ কিংবা কোন ব্যাপক পরিসরে ঘটে যাওয়া কোন দূর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় ও দরিদ্র মানুষদের উদ্দেশ্যে দাতারূপে ত্রাণ সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়ে কোন ব্যক্তি , অথবা কোন সংঘ , কিংবা কোন প্রতিষ্ঠান সরকারী অনুমোদন বা সহযোগিতা চাইলে সেখানে সরকারীভাবে প্রয়োজনীয় সাহায্য করার মধ্যে দিয়ে ঐ সকল অঞ্চলে যেমন জন সংযোগ বৃদ্ধি করা যায়, তেমনি জনগণের স্বার্থও সুরক্ষিত হয় । এইরূপে সরকারী সাহায্যকারী মনোভাব প্রসঙ্গে অনুকুল জনমত তৈরী হয় । তাতে শাসক সরকারেরই স্বার্থ সুরক্ষিত হয়, অথচ জনগণের প্রতি দায়ভার কমে । আবার এই প্রসঙ্গে ঘটা কোন ত্রুটি - বিচ্যুতিকে কেন্দ্র করে কোন বিরোধী দল যদি তাদের মনোভাব ব্যক্ত করে, তবে তাদের প্রয়োজন মত প্রসঙ্গ অনুসারী সরকারী উত্তর দানে সরকারী প্রচারও হয় । জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রকল্পগুলির উপর এইরূপ প্রভাব যে শুধু রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক দিক থেকেই বিধি কেন্দ্রিক হয় তা নয় বরং এই প্রসঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন পরিবেশ কিংবা সমাজেরও প্রভাব থাকে । বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখে দানক্ষেত্রের এইসকল প্রভাবগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যায় । যেমন - দাতা , গ্রহীতা , উপহার প্রদান ও দান ইত্যাদি ।

দাতা :

সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে পরিচালিত দানকর্মে দাতা হতে পারেন কোন ব্যক্তি বিশেষ, কোন সংঘ বা প্রতিষ্ঠান অথবা শাসক সরকার নিজে । যেহেতু সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করা অথবা সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক পরিমাণ কল্যাণ সাধন করাই এইধরণের প্রকল্পগুলির লক্ষ্য তাই সকল দাতাকেই গোষ্ঠী স্বার্থের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হয় । তবে এমন নয় যে, ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ এখানে উপেক্ষিত বা অবহেলিত হয় তবে যেহেতু গোষ্ঠী স্বার্থই সামাজিক সুরক্ষাকে অধিক পরিমাণে বলবৎ করতে পারে তাই এইধরণের দানক্ষেত্রে সকল দাতাকেই একই দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণ করতে হয় । তাই এই সকল ক্ষেত্রে দাতা যদি কোন ব্যক্তি হন বা প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে তারাও এই বিধির দ্বারাই নিজেদের দানকার্য্য পরিচালনা করেন । কারণ দানক্ষেত্রে এইধরণের বিধি প্রকল্পগুলির পক্ষে সরকারীভাবে আইনত গ্রহণ করা হয় । সেই আইনকে লঙ্ঘন করে প্রকল্পগুলির রূপায়ণ করা কোন দাতার পক্ষেই সম্ভব নয় । এই ধরণের জনকল্যাণ মূলক দান প্রকল্পে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে অনেক সময়েই দাতারূপে সরকার কর্তৃক ঐ ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর অথবা সংস্থার পক্ষে সরকারকে প্রদেয় কর মুকুব করা হয় । এইরূপে করভার মুকুব করে সরকার নিজেও এখানে দাতার ভূমিকা পালন করেন।

সরকার কর্তৃক এইরূপ সুবিধা দানের সদর্থক ও নঞর্থক উভয় দিকই আছে । যেমন কর মুকুবের সদর্থক দিকে দেখা যায় যে, কর মুকুবের কারণে অধিক সংখ্যক সংস্থা এই ধরণের প্রকল্প গ্রহণে উদ্যোগী হয় ফলে দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । আবার নঞর্থক দিকে দেখা যায়, কর মুকুবের আকর্ষণে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সংখ্যক সংস্থাগুলির ভিড়ে 'দান' ক্রিয়া গুণগত মূল্যমান হারিয়ে কিংবা আপোষ করে তাৎপর্য্যহীন কর্মে পরিণত হয় । আরও দেখা যায় যে, জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক যে ভাতা দান করা হয় তার দ্বারা জনকল্যাণ সাধিত হলেও তাও সরকারের শাসন ব্যবস্থারই পরিকল্পনা । সমাজ কল্যাণের অনুকূলে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ । সমাজতাত্ত্বিক টিটমাসের মতে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সমাজ কল্যাণের অনুকূলে দাতাদের এইরূপ অধিকার অন্যতম এক অধিকার । দাতা নির্বাচন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তার বা তাদের দানপ্রকল্পে কোন ব্যক্তি বিশেষ নাকি গোষ্ঠী স্বার্থ গৃহীত হবে । এইধরণের অধিকারে তারা যেমন ভবিষ্যতে আরও দানকর্মে উৎসাহিত হবেন তেমনি অন্যান্য ব্যক্তিরাও উৎসাহিত হবেন এইধরণের প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে দান করার জন্য । প্রাথমিকভাবে এইধরণের প্রকল্পকে স্বাধীন বলে মনে হলেও বর্তমান সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত আর্থ - সামাজিক পরিকাঠামোয় এইরূপ দানকর্মের মূলে যে ক্ষেত্রবিশেষে কিছু পরোক্ষ উদ্দেশ্যও নিহিত থাকে সেকথা অস্বীকার করা যায় না । এই প্রসঙ্গে বলা যায়, দাতা দান করে সরাসরি বা প্রত্যক্ষ্যভাবে কোন ব্যক্তির অথবা গোষ্ঠীর উপকার করে তাদের কল্যাণ সাধন করতে পারেন তেমনি আবার নিজের স্বার্থও সুরক্ষিত করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ রক্তদান - এর প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যেতে পারে । রক্তদান এক মহৎ দান । এইরূপ দানে কোন একজন দাতা অন্যের প্রাণ সুরক্ষিত করতে সাহায্য করেন , তাই তা সর্বদাই প্রশংসনীয় । এইরূপ দান কার্যে যেমন প্রত্যক্ষভাবে গ্রহীতার উপকার সাধিত হয় তেমনি আবার পরোক্ষে দাতার স্বার্থেরও পূরণ হতে পারে । যেমন, অনেক সময় দেখা যায়, এইধরণের রক্তদান এর আয়োজন করে ছোট ছোট সংস্থাগুলি দাতাদের উৎসাহিত করার জন্য বিনিময়ে কিছু উপহারের কিংবা কোন শংসাপত্রের ব্যবস্থা রাখে যা দাতাদের এই ধরণের দানে প্রলোভিত করে । আরও বলা যায়, কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের আয়োজন করা এই ধরণের উদ্যোগে কোন ব্যক্তি নিজের রক্ত দান করেন কারণ তিনি ঐ নির্দিষ্ট দলে নিজের জন্য বিশেষ সুবিধাজনক ব্যবস্থা করে নিতে চান তাই । কিংবা যাতে পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কারণে অন্য কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয় এমন ভয়ে ভীত হয়েও কেউবা এই ধরণের মহৎ দানে বাধ্য হন । আবার এমনও হতে পারে যে, কোন দপ্তর বা কার্য্যালয়ে এই ধরণের উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে কর্মরত কোন ব্যক্তি নিজের জন্য ঐ দপ্তরের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁদের কাছে নিজের প্রশংসা বা পদের উন্নতি মনে মনে আশা করতে পারেন । তবে উদ্দেশ্য বা বিধি যাইহোক না কেন রক্তদান যে নিঃসন্দেহেই এক মহৎ দান সেই বিষয়ে কোন দ্বিধা নেই ।

তাই সমাজ কল্যাণের স্বার্থে পরিচালিত ব্যক্তিরূপে কোন দাতা, কোন সংঘ বা প্রতিষ্ঠান কিংবা সরকার সকলেই সমাজের প্রতি নিজের দায়িত্ব পালন করেন ।

গ্রহীতা :

সরকারী বিধি অনুসারে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় 'দান' প্রকল্পগুলি সমাজের সকলের কল্যাণ কল্পে গৃহীত হওয়ায় দাতার কাছে গ্রহীতাকে হতে হবে অপরিচিত । তবে এমন নয় যে, পরিচিত অসহায় ব্যক্তি গ্রহীতা হতে পারেন না বরং রক্তদান থেকে শুরু করে খাদ্য, বস্ত্র , ঔষধসহ জীবনের অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির দান করা এবং গ্রহণ করার অধিকার দুজন পরপস্পর পরিচিত ব্যক্তির মধ্যেও সর্বদাই আছে ও থাকবে । তথাপি এইরূপে অপরিচিত গ্রহীতার বিধি গ্রহণ করা হয়েছে যাতে দান প্রকল্পগুলি যথাসম্ভব পক্ষপাতিত্বমূলক প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়ে সম্পন্ন হতে পারে । তাই নিয়ম অনুসারে একজন গ্রহীতাকে হতে হবে দাতার অপরিচিত । কারণ তা যদি না হয় তাতে প্রকল্পগুলির মূখ্য উদ্দেশ্য যে 'জনহিতকারিতা' বা 'জনহিত সাধন করা' তা বিঘ্নিত হতে পারে, এমনকী ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তি স্বার্থদ্বারাও চালিত হতে পারে । যেমন, ঐ ধরণের দান যদি কোন কার্য্যালয় অথবা কোন সংস্থার বা দপ্তরের পরিচিত ব্যক্তির স্বার্থে করা হয় তবে তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে হয়তোবা এমনও হতে পারে যে ঐ পরিচিত ব্যক্তির তুলনায় অন্য একজন ব্যক্তির কাছে সেই দান অধিক প্রয়োজনীয় ছিল । সেক্ষেত্রে এইধরণের দানের বিরুদ্ধে ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বজন - পোষণের অভিযোগ হতে পারে এবং ফলরূপে এইধরণের প্রকল্প সম্পর্কে সরকারী সমর্থন প্রসঙ্গে জনবিরোধী মতামত তৈরী হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দেয় । তাই সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সম্পন্ন দানক্ষেত্রে সরকারীভাবে গ্রহীতার ক্ষেত্রে বিধিরূপে অপরিচিত ব্যক্তিদের কথাই উল্লিখিত হয়েছে । এইভাবে দেখা যায় যে, দানক্ষেত্রে গ্রহীতার স্বার্থও রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ।

উপহার প্রদান ও দান :

'উপহার' শব্দটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিশেষভাবে পরিচিত একটি শব্দ । সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে কোন একজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি অনুষ্ঠানের আয়োজকের উদ্দেশ্যে অথবা তার পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশ্যে কিংবা ব্যক্তিগতভাবেই কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এই 'উপহার' প্রদান করেন । উভয়ক্ষেত্রেই শব্দটির সঙ্গে একটি প্রীতি মনোভাব জড়িত হয়ে থাকে । এখানেও থাকে একজন দাতা এবং গ্রহীতার উপস্থিতি । তবে

এই ধরণের উপহার প্রদানের অনুষ্ঠানে গ্রহীতাকে তার অসহায় অবস্থা থেকে মুক্ত করার কোন লক্ষ্য বা দায়বদ্ধতা দাতার থাকে না । বরং এই উদ্দেশ্যেই উপহার এবং দান ক্রিয়া পরস্পর পৃথক । তাই দাতা রূপে কোন বিশেষ ব্যক্তি কিংবা কোন প্রতিষ্ঠান বা সংঘ স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে যেসকল দান সম্পন্ন করেন সেই সকল ক্ষেত্রেই দানের বিষয় কি হবে বা কোন বিষয়ের উপহার তারা দান করবেন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা সর্বদাই স্বাধীন । এই সকল ক্ষেত্রেই তাদের দান কার্য্য 'উপহার প্রদান' । কিন্তু যখনই কোন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এই উপহার প্রদানের সঙ্গে যুক্ত হয় যেমন - 'সামাজিক কল্যাণ সাধন করা' ইত্যাদি তখনই তা হয় 'দান' । উপহার দানে কোন বিধি না থাকলেও দান কার্য্য সম্পন্ন করার জন্যে তার সঙ্গে যুক্ত হয় নানা বিধি, যুক্ত হয় সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের নানা প্রবণতাও । এইভাবে দেখা যায়, ব্যক্তিগত স্তরে দাতা এবং গ্রহীতার মধ্যে কেবল প্রীতি মনোভাবে সম্পন্ন দান ক্রিয়া হল উপহার দান । কিন্তু এই উপহার প্রদানমূলক ক্রিয়াকে 'দান' এই স্তরে উন্নীত হতে হলে তার সঙ্গে যুক্ত হয় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য । যেখানে সামাজিক স্তরের কতকগুলি প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না । যেমন - প্রথমতঃ ব্যক্তিগত স্তরে উপহার প্রদানের কোনরূপ সার্বিক লক্ষ্য না থাকলেও ব্যপক পরিসরে বিস্তৃত দানক্রিয়া মাত্রেই সার্বিক লক্ষ্য অবশ্যই থাকতে হবে । দ্বিতীয়ত ঃ উপহার দানে সামাজিক কল্যাণ সাধনের দায়বদ্ধতা না থাকলেও দান ক্রিয়ার সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্য অবশ্যই থাকতে হবে । তৃতীয়ত ঃ এই দান ক্রিয়া ব্যক্তিগত স্তরে সম্পন্ন হলে তা দাতার ইচ্ছানুসারে স্বাধীনভাবেই সম্পন্ন হতে পারে । কিন্তু যখনই এইধরণের দানক্রিয়াকে জনহিত সাধনের লক্ষ্যে পরিচালিত হতে হয় তখনই দাতাকে দানের বিষয়গুলির তাৎপর্য্য ও ব্যবহারিক মূল্যমান বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে । অন্যথায় তা 'দান কার্য্য' বলে বিবেচিত হবে না ।[১] তবে এমন নয় যে, ব্যক্তিগত স্তরে সম্পন্ন দান ক্রিয়ায় দানের বিষয়ের কোন মূল্যমান থাকে না । বরং বলা যায়, বাস্তবতঃ কোন দানের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট করে নির্ধারণ করে দেওয়া যায় না । কারণ তা সামাজিক পরিবেশ ও প্রেক্ষিতের উপর নির্ভর করে । [২] এইধরণের দানে ব্যক্তি অনেক সময়েই নিজের অর্জিত সম্পত্তিও অপর ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর হিত সাধনার্থে ব্যবহার করেন । যে ধারণা মহাত্মা গান্ধীর অছিতন্ত্রের আদর্শেও পাওয়া যায় । অছিতন্ত্রের আদর্শ অনুসারে ব্যক্তি তার নিজের অর্জিত সম্পত্তি কিছু অংশ নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে বাকী অংশের সমস্তটাই গোষ্ঠীস্বার্থে দান করবেন । এইরূপ কল্যাণকামী দান ভাবনার মূল আদর্শই হল উপযোগিতাতত্ত্ব । এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক রিচার্ড মরিস টিটমাসের অনুসরণে বলা যায়, 'একমাত্র উপযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখেই একজন অপরিচিত ব্যক্তি অপর একজন অপরিচিত ব্যক্তির জন্যে নিজের শ্রম ও সাধ্য ব্যয় করে হলেও নিঃস্বার্থে রক্তদান করেন । যে

---

১. *'Chaity, politics and the law ', The Politics of Charity,* Kerry O' Halloran
২. ঐ

দানে কেবল একজন অসহায়ের অভাব পূরণের চাহিদাই তাকে দানকর্মে চালিত করে এবং তা প্রদান করে দাতা ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি এবং সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের প্রতি নিজের দায়িত্ব পালন করেন । [৩] তাই বলা যায়, দান যেমনই হোক না কেন ব্যক্তিগত স্তরে অথবা সার্বিকভাবে, জনহিতসাধনের লক্ষ্যে উভয়ক্ষেত্রেই ‘দান ক্রিয়া’কে সম্পন্ন হতে হবে হিতসাধনের জন্যেই । সার্বিকভাবে জনহিতসাধনের লক্ষ্যে সম্পন্ন দান ক্রিয়া যে ক্ষেত্রবিশেষে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে । অন্যদিকে ‘উপহার প্রদান’-এর স্তর থেকে ব্যক্তিগত স্তরে সম্পন্ন দান ক্রিয়ার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, আপাতদৃষ্টিতে তা স্বাধীন ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হলেও এক্ষেত্রেও সামাজিক অবস্থানের প্রসঙ্গ বা প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা যায় না ।

বাণিজ্য সংস্থাগুলির গৃহীত দানপ্রকল্পে ও সমাজের দায়িত্ব :

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক সংস্থার সামাজিক দায়িত্ব বলতে সাধারণতঃ বোঝায় সামাজিক কল্যাণ কল্পে, সুরক্ষা কল্পে এমন কতকগুলি প্রকল্প গ্রহণ করা যার মধ্যে দিয়ে সমাজের সকল মানুষ উপকৃত হবেন , পরিবেশ মিত্রতা বজায় থাকবে এবং সেই বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিরও উপকার হবে । যদিও এইধরণের প্রকল্পগুলিতে যে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি ব্যক্তিগতভাবে সংস্থার লভ্যাংশ বজায় রেখে তাদের সামাজিক দায়িত্ব পালন করে সেকথা অস্বীকার করা যায় না । এই প্রকল্পগুলি সমাজের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা স্বরূপ । যে সমাজ বা সামাজিক পরিবেশ ঐ সংস্থাগুলিকে তাদের বাণিজ্য করতে নানাভাবে সহায়তা করে । যেমন - সমাজের সভ্য সকল সদস্য যারা ঐ সংস্থার কর্মী তারা মনোযোগ সহকারে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে , বাণিজ্যের পক্ষে অনুকূল সামাজিক পরিস্থিতি যাতে বজায় থাকে সেই মর্মে নানা বিধিবদ্ধ হয়, সংস্থার পক্ষে রাজনৈতিকভাবে প্রশাসক তার দায়িত্ব পালন করে, সংস্থার অনুকূলে পুঁজিবিনিয়োগকারীগণ নিজেদের যথাযথ সমর্থন বজায় রাখেন । এই সকল পরিস্থিতিই সংস্থার পক্ষে অনুকূল সামাজিক অবস্থান তৈরী করে । তাই সেই সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের প্রয়োজনে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করা সংস্থাগুলির নৈতিক দায়বদ্ধতাও । বাণিজ্য সংস্থাগুলির পক্ষে এইসকল সমাজকল্যাণকারী প্রকল্পগুলি গান্ধীজির অছিতন্ত্রের ধারণা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত।[৪] গান্ধীজির অছিতন্ত্রের মূল তাৎপর্য্য ছিল সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানা কৃত্রিম, মানুষের সৃষ্টি । কাজেই এই সমাজের প্রতিটি মানুষই রাজা - প্রজা , জমিদার , শিল্পপতি , সাধারণ জনগণ এরা সকলেই সমাজের

---

৩. *'Chaity, politics and the law'* , The Politics of Charity , Kerry O‘ Halloran
৪. *'Conclusion',* The Gift Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies.

সদস্য । এরা কেউই ঈশ্বর সৃষ্ট এই জগতের সকল সম্পত্তির মালিক নয় । বরং তারা প্রত্যেকেই সমানভাবে এই সমস্ত সম্পত্তির অছি বা তত্ত্ববধায়ক । তাই নিজেদের সামর্থ্যে তারা এযাবৎ যা কিছু সম্পত্তি অর্জন করেছেন তা তারা নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করে বাকি অংশের সমস্তটাই অন্যের প্রয়োজনে তাদের সেবায় ত্যাগ করবেন । এইধরণের মানব কল্যাণমূলক সামাজিক আদর্শই বাণিজ্য সংস্থাগুলিকে বিভিন্ন রকম জনহিতকর দান প্রকল্প গ্রহণে উদ্যোগী করে ।

বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির সামাজিক দায়িত্ব পালনে দানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য :

সমাজ কল্যাণমূলক প্রকল্পরূপে বাণিজ্য সংস্থাগুলি ‘দান’ ক্রিয়াকেই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমরূপে গণ্য করেন। সংস্থাগুলি এই ধরণের প্রকল্পগুলির দ্বারা সমাজ কল্যাণ সাধনে নিজেদের ভূমিকা পালন করেন । প্রশ্ন হতে পারে, বর্তমান ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থায় এই ধরণের প্রকল্পগুলির গুরুত্ব বা তাৎপর্য্য কোথায় ? উত্তরে বলা যায়, দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাণিজ্য সংস্থাগুলির এই ধরণের দান প্রকল্পের গুরুত্ব বা তাৎপর্য্য নির্ধারণ করা যেতে পারে । প্রথমতঃ কীভাবে সংস্থাগুলি এই ধরণের দান প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ হয় তা বিচার করে দেখা । দ্বিতীয়তঃ সমাজের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে কোন উপায়ে সংস্থাগুলি সমাজের সেই সকল মানুষগুলিকে চিহ্নিত করতে সমর্থ হন, যারা তুলনায় সবচেয়ে বেশী অসহায় ও চাহিদাতুর। এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, বর্তমান ভারতবর্ষে বাণিজ্য সংস্থাগুলি কতকগুলি নীতির দ্বারা চালিত হয় । যে নীতিগুলি একইসঙ্গে তাদের সংস্থার অভ্যন্তরীন কর্মবিধিসহ বিভিন্ন ধরণের সামাজিক প্রকল্প বা দায়িত্ব পালনে সাহায্য করে । এই সকল নীতি অনুসারে সংস্থার দ্বারা গৃহীত যেকোন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের রূপায়ণে যে বিষয়গুলির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে সেগুলি হল, প্রথমতঃ সমাজের সুরক্ষার্থে সংস্থাগুলিকে নির্ধারিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক নিয়ম - নীতির প্রতি বিশ্বাসী এবং অনুগত হতে হবে । দ্বিতীয়তঃ মানব অধিকারের সুরক্ষায় কর্তৃপক্ষকে যেমন সংস্থায় কর্মরত সকল কর্মী সভ্যদের সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে ; ব্যক্তি, জাতি, ধর্ম - বর্ণ নির্বিশেষে যোগ্য সকলকেই সংস্থায় উচ্চতর পদাধিকারী হওয়ার সম অধিকার প্রদান করতে হবে । তেমনি দান কর্ত্তব্য প্রসঙ্গেও তাদের সমান নীতি অনুসরণ করতে হবে । কোন শ্রেণির মানুষকে বঞ্চিত করে অন্য শ্রেণী বা ব্যক্তি বিশেষকে অধিক বেশি পাইয়ে দেওয়ার মনোভাব তারা রাখবেন না । তৃতীয়তঃ যেসকল কর্মী সদস্য তুলনামূলকভাবে কোন ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছেন তাদেরকে যথাযোগ্য অনুশীলন করার সুযোগ দিতে হবে যাতে তারাও নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ পায় । একইভাবে সমাজের

অসহায় মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করে তাদেরকেও যথাযোগ্যতায় সম্মানের সঙ্গে জীবন যাপনের সুযোগ দিতে হবে । যেমন - অনাহারীদের মধ্যে খাবার পৌঁছে দিয়ে তাদের জীবনের অধিকারকে সুরক্ষিত করতে হবে, যারা শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনায় পিছিয়ে আছেন কিংবা যেখানে শিক্ষার আলো পৌঁছতে পারেনি তাদেরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করে সমাজে তাদেরকে শিক্ষিত হতে সাহায্য করতে হবে । তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে সহায়ক হতে হবে । এই সকল লক্ষ্যে সংস্থাগুলি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য থেকে শুরু করে পড়াশোনার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয় যেমন - বই, খাতা, পেন, পেন্সিল ইত্যাদি দান করে । চতুর্থতঃ প্রশাসক বা সরকার ঘোষিত বিভিন্ন ধরণের সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পে সংস্থাগুলি প্রয়োজনীয় পুঁজিবিনিয়োগ করে পরোক্ষেও সামজিক কল্যাণ সাধনে অংশ গ্রহণ করে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা অনস্বীকার্য । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এইধরণের উচ্চতর আদর্শমূলক দান প্রকল্পে সরকারের সঙ্গে যুক্ত যুক্ত থেকে কাজ করার মধ্যে দিয়ে সংস্থাগুলির সঙ্গে সরকারের ও সমাজের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয় ।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে বলা যায়, প্রাথমিকভাবে সমাজের যেসকল মানুষ বর্ণ বা জাতিগতভাবে তুলনায় নিম্ন শ্রেণির বলে পরিচিত হন বা পিছিয়ে থাকেন তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে সমাজ ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনের দায়বদ্ধতায় উন্নীত করার মধ্যে দিয়ে যে সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি প্রচলিত ছিল সেগুলি ছাড়াও কিছু অতিরিক্ত প্রকল্প সংস্থাগুলি বর্তমানে গ্রহণ করায় বর্তমানে সেই প্রচলিত ভাবনার পরিবর্তন ঘটেছে। সেখানে দেখা যায়, যে নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় সংস্থাটি তার বাণিজ্যকরণে অনুমোদিত হয়েছে সেই সমাজের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর প্রেক্ষিতে ব্যক্তি , জাতি - বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল দুর্বল ও অসহায় মানুষদের বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে তালিকাভুক্ত করে তাদের কাছে প্রয়োজনীয় সাহায্য পৌছে দেন । বলা বাহুল্য যে, নিঃসন্দেহে এই ধরণের সমাজ কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি উচ্চতর আদর্শমূলক প্রকল্প । যা মানব সমাজকে প্রভাবিত করে । তবে উল্লেখ্য যে, কোন কোন ক্ষেত্রে এর প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কারণে এইধরণের প্রকল্পগুলি স্বার্থক রূপায়ণ না হওয়ায় তা বর্তমানে শুধুই প্রকল্পরূপে গৃহীত হচ্ছে । [৫] প্রশ্ন হল কেন এইরূপ উচ্চতর আদর্শে নীত থেকেও জনহিতকারী প্রকল্পগুলি স্বার্থকভাবে রূপায়িত হতে পারছে না ? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায়, কতকগুলি বিশেষ কারণে প্রকল্পগুলির সফল হওয়ার সম্ভাবনা ব্যাহত হচ্ছে । যেমন - প্রথমতঃ প্রকল্পগুলি সম্পর্কে জনসচেতনতার অভাব । তাই এই প্রসঙ্গে জনসচেতনতা বৃদ্ধি

---

৫. *'Conclusion'*, The Gift Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies.

করতে হবে । দ্বিতীয়তঃ প্রকল্পগুলি মূলতঃ কোন একটি দিকে এককালীন অর্থ সাহায্য প্রদানে সাধারণতঃ অভ্যস্ত । কিন্তু দারিদ্র এবং অসহায়তা দূরীকরণের সাহায্যে যেমন অর্থের প্রয়োজন তেমনি বেঁচে থাকার জন্যে অন্যান্য মৌলিক বিষয়েরও প্রয়োজন আছে । যেমন - পরিমিত খাদ্য, ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা , সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি । এককালীন অর্থ সাহায্য প্রদানে যেগুলি তাদের কাছে অধরাই থেকে যায় । তাই তাদের কাছে এই সব কিছুই প্রয়োজন মতো পৌঁছে দিতে হবে এবং দানকে হতে হবে অবশ্যই নিয়মিত কেবল উৎসবকালীন নয় । যেমনটি তৈত্তিরীয় উপনিষদেও শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের উপদেশ বাক্যের মধ্যে দিয়ে নির্দেশিত হয়েছে, 'সংবিদা দেয়ম্' । তৃতীয়তঃ যথেষ্ট পুঁজির অভাবও এই ধরণের প্রকল্পের রূপায়ণের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে । তাই এইধরণের প্রকল্পগুলির নিয়মিতকরণের আর্থিক দায়ভার যেমন সংস্থার কর্ণধারকে নিতে হবে তেমনি এই প্রসঙ্গে সেই সংস্থার পুঁজি বিনিয়োগকারীদেরকেও নিজেদের অংশের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে দায়িত্ব পালন করতে হবে । চতুর্থতঃ অনেক সময়েই এমন হয় যে, সময়ের অভাবে কিংবা জনপ্রিয়তার বিচারে এগিয়ে থাকার জন্যে কোন কোন সংস্থার গৃহীত দান প্রকল্পগুলির প্রায়োগিক রূপায়ণে স্থানীয় এলাকাকে নির্বাচন করেন । ফলে জনপ্রিয়তার বিচারে কিংবা সময়ের অভাবে প্রকল্পগুলি কাছাকাছি এলাকাভিত্তিক হওয়ায় সকলের কাছে পৌছানো সম্ভব হচ্ছে না যেমন শহরারাঞ্চলের সংস্থাগুলি তাদের সুবিধা মতো শুধুমাত্র শহরে এবং গ্রামাঞ্চলের সংস্থাগুলি শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চলের স্বল্প পরিসরে এই প্রকল্পগুলিকে গ্রহণ করে । তার ফলে এইধরণের সাহায্যকারী প্রকল্পগুলির উদ্দেশ্য সর্বাত্মকভাবে সাধিত হয়না বা সর্বাত্মক সাধনে বাধাপ্রাপ্ত হয় । তাই প্রকল্পগুলিকে হতে হবে উভয়কেন্দ্রিক এলাকাভিত্তিক । তবেই প্রকল্পগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল অনুকূল পরিস্থিতি তৈরী হবে । পঞ্চমতঃ প্রকল্পগুলি যথাযথ প্রচারের অভাবে পিছিয়ে পড়ছে। তাই এই ধরণের প্রকল্পগুলির প্রচারকার্য্যে সরকারসহ অন্যান্য সামাজিক সংস্থা এবং জনগণ সকলকেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে । যাতে সকলের প্রচেষ্টায় প্রকল্পগুলির স্বার্থক রূপায়ণ ঘটতে পারে । ষষ্ঠতঃ যথাযথ জনসংযোগের অভাব । সমাজে অসহায় ও দুর্বলদের মধ্যে সাহায্য পৌঁছে দিতে গেলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনে নিতে হবে অর্থ, খাদ্য , বস্ত্র ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ও পরিচিত বিষয়গুলি অতিরিক্ত অন্যান্য কোনও বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা তারা বোধ করছেন কিনা । সচেতনত ও সতর্কতার সঙ্গে সেই বিষয়গুলিও সংস্থাগুলি তাদের দানীয় বিষয়ের তালিকায় সংযোজন করতে পারেন কিনা সেই বিচারও করতে হবে । সবেশেষে বলা যায়, বাণিজ্যের প্রয়োজনে নয় বরং এই ধরণের প্রকল্পগুলির স্বার্থক রূপায়ণে সংস্থার কর্ণধারসহ পুঁজিবিনিয়োগকারী সকলকেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে আন্তরিকভাবে সদিচ্ছা ও স্বতোঃপ্রণোদিত মনোভাব রাখতে হবে । একমাত্র এইসকল অনুকূল পরিস্থিতির শর্তেই বাণিজ্য সংস্থাগুলির দ্বারা গৃহীত এইধরণের সমাজ কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির স্বার্থক রূপায়ণ সম্ভব হবে ।

দ্বিতীয় পর্ব

উপসংহার :

দান বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বেদ - উপনিষদ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককাল অবধি যেসকল বর্ণনা, নির্দেশ ও তথ্যাদির আলোচনা বর্তমান গবেষণাপত্রে প্রথম অধ্যায় থেকে শুরু করে সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম পর্ব পর্যন্ত আলোচিত হল তার নিরিখে দানের দার্শনিক তাৎপর্য্য নির্ধারণকল্পে একথা বলা যায় যে, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনোস্তাত্ত্বিক এর প্রতিটিই হল দানের এক একটি ভিত্তি । যে ভিত্তি বা স্তরগুলির প্রতিটিই পরস্পর থেকে ভিন্নভাবে উল্লিখিত হলেও দান সম্পর্কে তারা প্রত্যেকেই একে অপরের সঙ্গে ওতোপ্রোত সম্পর্কে যুক্ত । তবে দানের দার্শনিক তাৎপর্য্য নির্ধারণকল্পে মনোস্তাত্ত্বিক ভিত্তির আলোচনা সর্বাপেক্ষা তাৎপর্য্যপূর্ণ ।

দানের ধর্মীয় ভিত্তি :

বিভিন্ন দর্শন ও আদর্শে বর্ণিত দানতত্ত্বে যেরূপে দান - এর ধর্মীয় ভিত্তির উল্লেখ হয়েছে সেখানে ব্যক্তি কল্যাণসহ সমাজের কল্যাণও সুবিহিত হয়েছে । ঋগ্বেদে দান শব্দটি ধর্মীয় সাধনার একটি বিশেষ অঙ্গরূপে যজ্ঞ কর্মের অন্যতম মাধ্যমরূপে ধর্মীয় কর্ত্তব্য অর্থে বিবেচিত হয়েছে । যেখানে দেবতার সন্তুষ্টি সাধনে তাদের উদ্দেশ্যে বিবিধ উপচারসহ যজ্ঞাগ্নিতে বিভিন্ন হব্যের দান করার মধ্যে দিয়ে যেমন ব্যক্তির বা দাতার নিজের আধ্যাত্মিক তথা ধর্মীয় মানের উন্নতির কথা বর্ণিত হয়েছে তেমনি এইরূপ দানের মধ্যে দিয়ে সমাজে সকলের কল্যাণের লক্ষ্যে বিশেষভাবে ধর্মীয় অনুশাসনেরও নির্দেশ হয়েছে । আবার মনুসংহিতায় প্রতিগ্রহ ব্যবস্থা বিষয়ে যেরূপে দাতার জীবিকা প্রসঙ্গ এবং গ্রহীতার বিধি বিষয়ে বেদজ্ঞ হওয়ার নির্দেশ হয়েছে সেখানেও দানের মাধ্যমে ব্যক্তির পুণ্যফললাভ করে তার ধর্মীয় মানের উন্নতির কথাই বর্ণিত হয়েছে । যাজ্ঞবল্ক্য এবং অন্যান্য সংহিতানুসারেও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দান একইভাবে ব্যক্তির নিত্যকর্ত্তব্য এবং পুণ্যফলজনকতার বিচারে অন্যতম পরমদান ধর্মীয় কর্ত্তব্য অর্থেও নির্দেশিত হয়েছে । ভগবদগীতায় সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণের ভিন্নতায় 'দান' ত্রিবিধ আকারে আলোচিত হয়েছে এবং সাত্ত্বিক দান অর্থে মনুসংহিতাসহ অন্যান্য সংহিতার মতো করেই শিক্ষিত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিষ্কামভাবে দান করাই একমাত্র উত্তম শ্রেণির দান বলে বিবেচনা করা হয়েছে । যা কিনা ব্যক্তির

মোক্ষলাভেরও সহায়ক বলে বর্ণিত হয়েছে । রাজসিক ও তামসিক দান জন্য ফললাভ হতে পারে তবে তা যেহেতু কাম্য ফললাভের জনকরূপে মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় তাই সকলের শ্রেষ্ঠ দানরূপে সাত্ত্বিক দানই অধিক উৎসাহিত হয়েছে ।

অহিংস আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে জৈন দর্শনে শ্রমণ ও শ্রাবকদের জন্য মূলব্রতরূপে পঞ্চমহাব্রত ও পঞ্চঅণুব্রতের যেমন উল্লেখ হয়েছে তার মধ্যে দিয়েই গৃহী বা শ্রাবকের জীবনের ধর্মীয় মানের উন্নতি কল্পে শ্রমণদের ধর্মীয় সাধনার ধারাবাহিক ক্রমানুসারীতা বজায় রাখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । সেই উদ্দেশ্যে শ্রমণদের জীবন - যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পার্থিব বস্তুগুলির দান গৃহী বা শ্রাবকদের জন্য অন্যতম কর্ত্তব্য বলে নির্দেশিত হয়েছে । এখানে বিষয় বস্তুর দান অর্থে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান সহ ঔষধ পথ্য ইত্যাদি বিষয়ের নির্দেশ করা হয়েছে । এইরূপ দান ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে শ্রমণগণের পার্থিব চাহিদার পূরণ এবং ধর্মীয় সাধনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে গৃহী বা শ্রাবকদের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় উপদেশ দান এবং তার মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় মানের উন্নতির নির্দেশ করা হয়েছে । এইরূপ দান ব্যবস্থাতেও উভয়ের দানে উভয়ের কল্যাণ লক্ষ্যই বিবেচিত হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনে দানীয় বিষয়ের ভিন্নতায় আমিষ দান বা দ্রব্য দান এবং ধর্ম দান এইরূপ দ্বিবিধ প্রকারে উল্লিখিত হলেও ধর্মদান শ্রেষ্ঠ দানরূপে বিবেচিত এবং নির্দেশিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গেই গ্রহীতাভেদে ব্যক্তিবিশেষেকে দান বা প্রাতিপুদ্গলিক দানের তুলনায় ধর্মীয় উপদেশসহ ধর্মশিক্ষাদান এর কথা এবং নির্বাণ প্রাপ্তির সহায়রূপে ব্যক্তিদান নয় বরং সংঘদানের গুরুত্ব অধিক বলে নির্দেশিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে বিহার দান, বেণুবনদান, বৌদ্ধ সংঘের উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা দানের গুরুত্ব । বর্ণিত হয়েছে আত্ম দান অর্থে আত্মবলিদানের প্রসঙ্গ, পুণ্যদান, কালদান ইত্যাদিও । উভয় দর্শনেই এই প্রসঙ্গে দাতা ও গ্রহীতাদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিধি বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে । ইসলাম ধর্মীয় আদর্শে বর্ণিত বাধ্যতামূলক দান জাকাত এবং ঐচ্ছিক দান সাদাকাও একইভাবে ব্যক্তির ধর্মীয় মানের উন্নতির সহায়করূপে, ধর্মীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার, আল্লার বিশ্বস্ত হওয়ার, অপরাধ বা পাপ কর্মফল ক্ষয়ের এবং আল্লার পরম আশ্রয় প্রাপ্তির সহায়করূপে বর্ণিত হয়েছে । খ্রীষ্টান ধর্মাদর্শেও একইভাবে পরহিতে নিঃস্বার্থ মনোভাবে সম্পন্ন দান উপায়ে সদাপ্রভূকে এবং ভগবান যীশুকে পরম ভালবাসায় আবদ্ধ করার পক্ষে অন্যতম সহায়ক রূপে নির্দেশিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে বাইবেলের মূলভাব হল অন্যকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসা মানেই অন্তরের আকুতি ও ব্যাকুলতায় সদাপ্রভূকে বা ঈশ্বরকে ভালবাসা, যীশুকে ভালবাসা । তাই সর্বদাই অন্যকে ভালবাসার মধ্যে দিয়ে তাদেরকে দান সাহায্য করার মধ্যে দিয়ে সদাপ্রভূর এবং ঈশ্বরের করুণা প্রাপ্তি সম্ভব । ধর্মীয় মানে ব্যক্তির শুচিতা সাধনে দান প্রসঙ্গে উৎসর্গের কথা নির্দেশিত হয়েছে খ্রীষ্টিয় অনুশাসনে । এই প্রসঙ্গে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে রচিত আদি এবং লেবীয় পুস্তকে বিস্তৃত আলোচনায়

দেখা গেছে যে, খ্রীষ্ট ধর্মে উৎসর্গ যেমন সদাপ্রভূর আশীর্বাদ লাভ করার এক উপায়রূপে নির্দেশিত হয়েছে তেমনি পাপ কর্মের প্রায়শ্চিত্ত অর্থেও প্রযুক্ত হয়েছে। ব্যক্তি স্বার্থে বা বৃহত্তর মঙ্গলের স্বার্থে সদাপ্রভূর উদ্দেশ্যেও উৎসর্গের জন্যে নির্দেশ করা হয়েছে। ধর্মীয় অনুশাসনের তাৎপর্য্যে যে উৎসর্গ তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে মায়া, ইনকা এবং আজতেক পৃথিবীর অন্যতম এই তিন প্রাচীনতম সভ্যতাতেও। দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের মধ্যে দিয়ে যার উদ্দেশ্যরূপে বর্ণিত হয়েছে ব্যক্তির ধর্মীয় কল্যাণসহ সমাজের সকলের স্বার্থে অধিক ফসল ফলানোর লক্ষ্য।

দানের সামাজিক ভিত্তি :

সামাজিক ভিত্তিমূলক স্তরে দান মূলতঃ সমাজের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য। যা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার মধ্যে দিয়ে কর্মকর্তার বা দাতার মূলতঃ দুটি লক্ষ্যের সাধন হয়। প্রথমতঃ পরার্থপরতার নীতি অনুসারে অপরের হিত সাধন বা উপকার সাধন করা দ্বিতীয়তঃ সমাজের প্রতি নিজের কর্ত্তব্য বা ভুমিকা পালন করা। বলা বাহুল্য উভয় লক্ষ্যেরই মূলে থাকে যে অন্যতম প্রধান আদর্শ তাহল, পরার্থবাদ। যে আদর্শের উল্লেখ পাওয়া যায় একেবারে বৈদিক সভ্যতার উষাকাল ঋগ্বেদ সংহিতার সমাজ ব্যবস্থাতেও। সেখানে দেখা যায়, ধন ও অন্নদানের বিশেষ কর্ত্তব্যের উল্লেখ করে এই পার্থিব জগতে প্রাণির প্রাণধারণে এইরূপ দান ব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রসংশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রাজা কুরঙ্গের যথাযথরূপে দান ধম্ম সম্পাদন করার ভিত্তিতে স্বর্গলাভের অধিকারী হওয়া এবং তার দান কর্ত্তব্যের প্রশংসা করা হয়েছে। একইসঙ্গে অন্যান্য ব্যক্তিও যাতে সমাজের প্রতি নিজেদের দান কর্ত্তব্য পালন করতে তৎপর থাকেন সেই উদ্দেশ্যে সমাজে অদাতাদের উদ্দেশ্যে একপ্রকার নিন্দনীয় মনোভাব পোষণ করা হয়েছে। মনুসংহিতায় বর্ণিত দানতত্ত্বেও দেখা যায়, 'দান' সম্পর্কে সমাজে বর্ণধর্মের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুঃবর্ণের মানুষ তাদের স্বধর্ম বা কর্ত্তব্যকর্ম প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গে দাতা এবং গ্রহীতাদের জন্য নানা বিধিও নির্দেশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রতি বর্ণের জন্য বিশেষভাবে জীবিকা বৃত্তিরূপে অব্যবহিত পরবর্তীএবং ব্যবহিত পরবর্তী বৃত্তির উল্লেখ ও নির্দেশ হয়েছে। ব্রাহ্মণ বর্ণের জন্য এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে নির্দেশিত হয়েছে প্রতিগ্রহ ব্যবস্থা। যার মধ্যে দিয়ে নিজেদের জীবন - যাপনের প্রয়োজনীয়তায় কেবল বেদাধ্যপনাই নয় বরং বেদ অধ্যয়ন এবং তার তাৎপর্য্য উপলব্ধিরূপ কর্ত্তব্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রতিগ্রহ প্রসঙ্গে দাতা এবং গ্রহীতার বিধি বা সামর্থ্য নির্দেশের ক্ষেত্রেও ব্যক্তি কল্যাণসহ সমাজের সার্বিক কল্যাণের দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে এমন নির্দেশই যেন সমাজচিত্রে ফুটে উঠেছে। যদিও মনুসংহিতায় নির্দেশিত দানতত্ত্বে বর্ণানুসারে কর্ত্তব্য কর্মের দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে, তথাপি এই প্রসঙ্গে শূদ্র বর্ণের দানাধিকার

প্রশ্নে মনুর বিবিধ মন্তব্যে কিছু আপাত বিরোধী অবস্থানও যে তৈরী হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না । আবার যাজ্ঞবল্ক্য এবং অন্যান্য সংহিতাতেও যেখানে 'যাচিত' ও 'অযাচিত' প্রকারের ভেদে দান প্রসঙ্গের আলোচনা দাতারূপে ব্যক্তির জীবিকা এবং গ্রহীতা রূপে 'শ্রেষ্ঠ' ব্রাহ্মণদের দান বা সম্পূর্ণ পাত্রে দান সর্বাধিক ফলজনক বলে নির্দেশিত হয়েছে সেখানেও গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে ব্যক্তির কর্ত্তব্যের প্রতি । এই প্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাসহ হারীত, ব্যাস, শঙ্খ, উশন, অত্রি সংহিতানুসারে দান বিশেষভাবে নিত্যকর্ত্তব্যরূপে উল্লিখিত হয়েছে এবং এই বিষয়ে দাতা ও গ্রহীতার বিভিন্ন বিধিরও নির্দেশ হয়েছে। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণ মাত্রেই যে তিনি সমাজে একমাত্র অন্যতম যোগ্য ব্যক্তিরূপে বিবেচিত হবেন এমন নয়, বরং তাঁদেরও যোগ্যতা অর্জন করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে যেরূপে উত্তম, মধ্যম ও শ্রেষ্ঠ এইরূপ শ্রেণির উল্লেখ হয়েছে সেখানেও যেন সমাজের প্রতি তাঁদের বিশেষ কর্ত্তব্য সাধনের দিকটিই গুরুত্ব পেয়েছে । উপনিষদে একইভাবে স্বধর্ম অর্থে দান প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে শিক্ষার্থীকে আচার্য্যের শিক্ষাদান, শিক্ষান্তে গুরুকে দক্ষিণা দান, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দান । এইসকল দানের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীকে তার ভবিষ্যতের জন্য উপযোগীরূপে গড়ে তোলা, তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করা, তাকে তাঁর সমাজ ও পরিবারের প্রতি যথাযথ কর্ত্তব্য বিষয়ে অবগত করানোর লক্ষ্যই যেন গৃহীত হয়েছে । আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দান বিষয়ে যেরূপে পুত্র নচিকেতার হাত ধরে রাজা বাজশ্রবশের অভীষ্ট পূরণে প্রজাদের উদ্দেশ্যে উত্তমমানের বিষয় দানের কর্ত্তব্য নির্দেশিত হয়েছে সেখানেও লক্ষ্য হল সমাজের প্রতিটি মানুষকেই সমমর্য্যাদা প্রদান করা ।, অন্নদান প্রসঙ্গে জীবের জীবন ধারণে অন্নদানরূপ পরম কর্ত্তব্যের যেরূপ উল্লেখ এইপ্রসঙ্গে দাতা ও গ্রহীতার বিধি বিষয়ে যেসকল উপদেশ নির্দেশিত হয়েছে তার মধ্যে দিয়েও সেই সময়ের আশ্রম ধর্মানুসারী সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিটি আশ্রম ব্যবস্থাতেই দান কর্ত্তব্যের মধ্যে দিয়ে সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যই নির্ধারিত ও বিবেচিত হয়েছে । জৈন দর্শনে 'দান' মূলতঃ সমাজে অহিংস আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার এক অন্যতম মাধ্যমরূপে আলোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জৈন দর্শনে শ্রমণ ও শ্রাবকদের জন্য মূলব্রতরূপে পঞ্চমহাব্রত ও পঞ্চঅণুব্রতের যেমন উল্লেখ হয়েছে তেমনি উল্লেখ হয়েছে নিত্যব্রতরূপে গুণব্রত ও শিক্ষাব্রতেরও। অনাগারী শ্রমণ ও আগারী শ্রাবক উভয়েরই এইরূপ কর্ত্তব্য কর্ম পালনের মধ্যে দিয়ে বিশেষভাবে অস্তেয় এবং অপরিগ্রহব্রতে যে দানব্রতের নির্দেশ হয়েছে সেখানেও ব্যক্তির ধর্মীয় মানের উন্নতিসহ, সমাজে দুই শ্রেণীর পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য এবং সমাজের কল্যাণের দিকটিকে সুরক্ষিত করাই অন্যতম প্রধান লক্ষ্যরূপে বিবেচিত হয়েছে । একইভাবে শ্রমণ ঐতিহ্য অনুসারী বৌদ্ধ দর্শনেও বর্ণিত দানতত্ত্বে বিষয়ভেদে যেরূপে আমিষ দান বা দ্রব্য দান এবং ধর্ম দান এই দ্বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গিতে 'দানধম্ম' এবং 'ধম্ম দান' প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে সেখানেও সমাজে বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং গৃহীগণের দৈনন্দিন জীবন যাপনে পারস্পরিক প্রয়োজনীয়তা, তাদের পরস্পরের প্রতি নিত্য কর্ত্তব্য এবং তার গুরুত্ব নির্ধারিত হয়েছে ।

হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনের মতো করে ইসলাম ধর্মেও দান আবশ্যিক কর্ম বলে স্বীকৃত হয়েছে । ইসলাম আদর্শ অনুসারে ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন যাপনে তাঁরা তাদের কর্মগুণে আল্লাহর যে কৃপা পেয়েছেন সেই কৃপা তাদের সঙ্গে ঐসকল ব্যক্তিকে যারা তা থেকে এখনও বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন তাদের সঙ্গে সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে । এমনটিই আল্লাহর নির্দেশ । এইরূপ দান কর্ম নিত্যদিনের জীবন যাত্রায় প্রতি ব্যক্তির জন্যেই তাদের সামর্থ্য অনুসারে আবশ্যিক । এইরকম আবশ্যিক ও বাধ্যতামূলক দান হিসেবে ইসলাম ধর্মে 'জাকাত দান' এর বর্ণনা পাওয়া যায় । এছাড়াও পাওয়া যায় 'সাদাকা দান' এর আলোচনা যা কোন বিশেষ অনুষ্ঠান ও দিবসে সম্পন্ন করা হয় । ইসলাম আদর্শ অনুসারে ব্যক্তিকে পরশ্রীকাতরতা এবং এককভাবে বিষয়ভোগের মোহ থেকে মুক্ত করে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের দূরীকরণ ও সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চালিত জাকাত এবং সাদাকা উভয় দানেরই সামাজিক স্তরে প্রভাব অপরিসীম । খ্রীষ্টান আদর্শে দান কথার মূল অর্থ হলই ভালবাসা । এইপ্রসঙ্গে বাইবেলের পুরাতন ও নতুন উভয় নিয়মে রচিত গ্রন্থাদিতে প্রদত্ত বর্ণনা অনুসারে দেখা যায়, যে ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে পরম ভালবাসায় অপরের জন্য যেকোন পরিস্থিতিতেই দাতারূপে তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন তিনিই সদাপ্রভুকে এবং ভগবান যীশুকে পরম ভালবাসায় আবদ্ধ করতে পারেন । দান হল ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে অন্যতম পরম কর্ত্তব্য । অসহায় ও আর্তের সাহায্যার্থে দাতার নিঃস্বার্থভাবে নিজের কর্ত্তব্য করার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি যেমন সমাজের প্রতি নিজের দায়বব্ধতার পালন করেন তেমনি সমাজের কল্যাণেরও সহায়ক হন । সাম্প্রতিক কালের বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির গৃহীত দানপ্রকল্পেও একইভাবে সামাজিক দায়বব্ধতারই উল্লেখ পাওয়া যায় । যার সফল প্রয়োগে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামাজিক বিধির গুরুত্বও যে অপরিসীম এমন ভাবনাই উপস্থাপিত হয়েছে ।

দানের রাজনৈতিক ভিত্তি :

রাজনৈতিক ভিত্তিমূলক স্তরে দান বিষয়ে মনুসংহিতায় দান প্রসঙ্গে রাজার কর্ত্তব্যরূপে বিশেষভাবে নির্দেশিত হয়েছে সাম, দান, ভেদ ও দন্ডনীতির কথা । একইভাবে সমসাময়িক উন্নত ও আধুনিক রাষ্ট্রভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থে যেভাবে রাজ্যে সুষ্ঠুভাবে শাসন কার্য্য পরিচালনা করার লক্ষ্যে রাজার কর্ত্তব্যরূপে দান ও তার বিধি বিষয়ে নির্দেশ করেছিলেন তার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দান বিষয়ে কৌটিল্যের এইসকল উপদেশের লক্ষ্য ছিল রাজ্যের শাসনকার্য্য সুপরিচালিত করার উদ্দেশ্যে কূটনৈতিক রাজ্যনীতির সম্প্রসারণ । সেখানে দেখা যায়, অর্থশাস্ত্রে প্রচলিত বিষয়বস্তুর দান অর্থে যেমন 'দান' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে তেমনি আবার

রাষ্ট্র পরিচালনার এক কৌশল নীতি অর্থেও নবরূপে ব্যবহৃত হয়েছে । রাজা ‘দান’ কৌশলে শত্রুপক্ষের সঙ্গে সন্ধি করবেন এবং তাকে নিজের মিত্র পক্ষে পরিণত করবেন । এখানে ‘দান’ যেন এমন এক কৌশল যে কৌশলে বাঁধা পড়ে গ্রহীতা রাজা যেন চিরদিন দাতা রাজার কাছে উপকারের ঋণে আবদ্ধ হয়ে থাকবেন । তাই তাঁর নির্দেশে ‘দান’ উপায় এবং কৌশল উভয়ই পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে রাজার ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম অর্থেই নির্দেশিত হয়েছে । একইভাবে সাম্প্রতিককালের বাণিজ্য সংস্থাগুলির দান প্রকল্পে বাধ্যতামূলকভাবে যেরূপে অন্যান্য বিধিসহ রাজনৈতিক বিধি, তার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব এবং প্রভাব প্রসঙ্গ নির্দেশিত ও আলোচিত হয়েছে সেখানে দান প্রকল্পগুলির প্রত্যক্ষ লক্ষ্যরূপে সামাজিক কল্যাণ ঘোষিত উদ্দেশ্য হলেও পরোক্ষে ক্ষেত্রবিশেষে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থও সুরক্ষিত হচ্ছে , যা একেবারেই ‘দান’ শব্দটির প্রচলিত অর্থের পরিসরে নবকলেবর স্বরূপ । পাশ্চাত্যে উত্তর আমেরিকার পলিনেশীয় সভ্যতায় প্রচলিত দান ব্যবহারেও বর্ণিত হয়েছে আন্তরিক দায়বদ্ধতাসহ প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক বাধ্যতাবোধের তত্ত্ব । এখানে ‘দান’ শব্দটি উপহার অর্থে ব্যবহৃত হলেও উপহার গ্রহণ বা অগ্রহণের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়নি । বরং এইপ্রসঙ্গে ‘উপহার দান’ করা মানেই ‘বিনিময়ে উপহার দান’ - এর তত্ত্বে যেন একরকম বাধ্যতাবোধের কথাই বর্ণিত হয়েছে । এখানে বিনিময় দান বলতে বোঝানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট সভ্যতায় জাতিগত বা উপজাতিগত ক্ষেত্রে যেকোন অনুষ্ঠান বা পার্বণে দান ক্রিয়ার পরিবর্তে বিনিময়ে বাধ্যতামূলক দান - এর কথা । যদিও এই প্রকার বাধ্যতামূলক দানে প্রশাসনিক কোন নিয়মের বাধ্যতাবোধ নয় বরং আন্তরিক বাধ্যতাবোধের তত্ত্বই বর্ণিত হয়েছে । এখানে দাতার কোনও উপহার ‘দান’ করা এবং তার পরিবর্তে বিনিময়ে গ্রহীতার কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করা দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের জন্যেই সম্মানের সূচক । পলিনেশীয় সভ্যতায় বর্ণিত এইরূপ বিনিময় উপহার দানের তত্ত্বের বাধ্যতাবোধ যদিও সংস্কারগত বাধ্যতাবোধ তথাপি তা কখনও কখনও প্রশাসনিক মর্য্যাদার নির্ণায়কও হয় ; যেমন দেখা যায়, সমাজে উচ্চপদে আসীন কিংবা প্রশাসক পদে আসীন কোন ব্যক্তি যদি তাঁর গৃহের কোন অনুষ্ঠানে তুলনায় তার থেকে নিম্নবর্ণের অথবা নির্দিষ্ট কোন কারণে তাঁর নিজ বর্ণেরই কোন মানুষকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ না করেন কিংবা তাঁদের বাড়ীর নিমন্ত্রণ রক্ষা না করেন কিংবা কোন উপহার প্রদান না করেন অথবা তাঁদের থেকে কোন উপহার গ্রহণ না করেন তাহলে ঐসকল ব্যক্তিরা অপমানিত বোধ করেন এবং এই অপমানের ফলরূপে ঐ উচ্চপদে আসীন ব্যক্তির পদমর্য্যাদার হানি হয় । ক্ষেত্রবিশেষে তার প্রাণ সংশয়ের কারণও হতে পারে । এইভাবে ঐ সভ্যতায় সংশ্লিষ্ট সমাজব্যবস্থায় ‘দান’ শব্দটির দ্বারা সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে ‘দান’ শব্দটির গুরুত্ব প্রসঙ্গেও অবহিত হওয়া যায় । অর্থাৎ এখানে ক্ষেত্রবিশেষে ‘দান’ যেমন সুখকর তেমনি আবার ক্ষেত্রবিশেষে যে নির্মম পরিস্থিতিরও কারণ হতে পারে তারও উল্লেখ পাওয়া যায় ।

দানের মনোস্তাত্ত্বিক ভিত্তি :

দান সম্পর্কে প্রতিটি ভিত্তিমূলক স্তর যেভাবে বর্ণিত ও আলোচিত হয়েছে সেখানে দানের মনোস্তাত্ত্বিক ভিত্তি ও তার বিচার অন্যতম । কারণ দান বিষয়ে বিভিন্ন স্তর ও নির্দেশিত আদর্শে যে সকলক্ষেত্রেই দানের একইরকম ব্যবহার কিংবা প্রয়োগ বর্ণিত হয়েছে এমন নয় । বরং এই বিষয়ে দানের দার্শনিক তাৎপর্য্য নির্ধারণ করতে গেলে দেখা যায় যে, দান প্রসঙ্গে দাতা সর্বদাই যে কেবল অপরের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই চালিত হন এমন নয় বরং অপরাধবোধ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে, পাপের ক্ষয় সাধন, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব, মর্যাদা রক্ষা, খ্যাতির উদ্দেশ্যে এই সকল কারণেও দান করেন । যেমন ধর্মীয় অর্থে শুচিতা সাধনের লক্ষ্যে ইসলাম আদর্শে যে দান বর্ণনা পাওয়া যায় তার কারণই হল যেন অপরাধবোধের মুক্তি , আবার মনুসংহিতায় যাচ্ঞাকারী মাত্রেই বিধি বর্হিভূত অল্প দানের ও ইসলাম আদর্শে যে সাদাকা দানের উলেখ হয়েছে উভয়ক্ষেত্রেই লক্ষ্য হল পাপের ক্ষয় সাধন করা । আবার মহাকাব্যিক পরিসরে মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত রাজার দান ধর্ম প্রসঙ্গে পরামর্শ দান, রাজার কর্ত্তব্য অর্থে দান ইত্যাদির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হল মর্যাদা রক্ষা, খ্যাতি লাভ ইত্যাদি । এই সকল ক্ষেত্রেই দান যেরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত হয়েছে সেখানে এদের মধ্যে বহু ক্ষেত্রেই পারস্পরিক সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য উভয়ের উপস্থিতিই পরিলক্ষিত হয় । একেবারে গোড়ার দিকের আলোচনা থেকে শুরু করলে দেখা যায় যে, ঋগ্বেদে যেখানে ব্যক্তি মঙ্গল এবং তার মধ্যে দিয়ে সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে দানকর্ম চালিত হত পরবর্তীতে যথাক্রমে তা মনুসংহিতাসহ অন্যান্য সংহিতায় ও ভগবদগীতায় স্বধর্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম অর্থে পরিচালিত হয়েছে । কৌটিল্যের শাস্ত্রে রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য রাজার কর্ত্তব্য কৌশল অর্থে এবং জৈন, বৌদ্ধ ও ইসলাম আদর্শে মূলতঃ ব্যক্তি কল্যাণসহ সমাজ কল্যাণের লক্ষ্যে প্রযুক্ত হয়েছে । এইরূপ সামাজিক কল্যাণের আদর্শে পরিচালিত দান তত্ত্বের প্রতি ক্ষেত্রেই আছে যেমন সাদৃশ্য তেমনি আছে বৈসাদৃশ্য । সাদৃশ্য ক্ষেত্রগুলির উল্লেখ করলে দেখা যায় সবক্ষেত্রেই দান ক্রিয়ার প্রধান স্তম্ভরূপে আছে যেমন দাতা এবং গ্রহীতার উপস্থিতি, তেমনি আছে দানীয় দ্রব্যসহ দান সম্পর্কিত বিধির উপস্থিতি । গ্রহীতার প্রয়োজন অনুসারে দানীয় দ্রব্যের নির্বাচন করে দান করা ইত্যাদি । গ্রহীতার কল্যাণ এবং তার মধ্যে দিয়ে দাতাসহ সমাজের কল্যাণের ধারণা । আবার ভিন্নতা বা বৈসাদৃশ্যের দিকে আছে দান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধির বিভিন্নতা, স্বেচ্ছায় দানসহ বাধ্যতামূলক দানের ধারণা । সাম্প্রতিককালের বাণিজ্য সংস্থাগুলির দান প্রয়োগে বাধ্যতামূলকভাবে আইনী সহ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধি ও প্রভাবের উপস্থিতি । যেখানে দান ক্রিয়া প্রচলিত ব্যবহারিক পরিসর থেকে সম্পূর্ণভাবেই স্বতন্ত্র । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সামাজিক কল্যাণ কল্পে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির দ্বারা সাধিত মনোস্তাত্ত্বিক তথা নৈতিক বিচারে এইসকল দান বিষয়ে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিত থেকে কতকগুলি প্রশ্ন হতে পারে, যেমন - প্রথমতঃ বাণিজ্য সংস্থাগুলি যখন

দাতা, তখন তাদের দাতা হওয়ার যোগ্যতা বিষয়ে কিছু বলা হয়েছে কীনা ? দ্বিতীয়তঃ এই সকল দান প্রকল্প কী দান বিষয়ে জৈনধর্মের মাপকাঠি অনুসারে দাতারূপে 'ঐহিকফলানাপেক্ষ', 'নিষ্কপট', 'নিরহঙ্কারী' এই সকল শর্ত পূরণ করতে পারবে ? তৃতীয়তঃ দাতারূপে তারা কোনভাবে বৈড়ালব্রতিক বা বকব্রতিকের দলে অন্তর্ভূক্ত হবে কীনা ? চতুর্থত ঃ ভারতীয় দর্শনে চার্বাক ব্যতীত অপর সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ের ভোগবাদ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী । কিন্তু বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গী । সেক্ষেত্রে এই দুই পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যে দানক্রিয়া সমর্থন করা হচ্ছে তা কীভাবে সম্পূর্ণ এক অর্থে গৃহীত হয় বা হতে পারে ? উল্লিখিত প্রশ্নগুলির মধ্যে প্রথমটির উত্তরে বলা যেতে পারে বিশেষভাবে সেই অর্থে নির্দিষ্ট কোন বিধি নিয়মের উল্লেখ না হলেও সামাজিক কল্যাণ কল্পে সাধিত দান ক্রিয়ায় দাতারূপে বাণিজ্য সংস্থাগুলির লক্ষ্য হতে হবে সার্বিক কল্যাণ, সেক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থের তুলনায় গোষ্ঠী স্বার্থের প্রতিই তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবেন এমনটিই প্রশাসক কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছে । দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে একইসঙ্গে বলা যায়, বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির প্রাথমিক লক্ষ্য যেখানে বাণিজ্য করা এবং তার মাধ্যমে মুনাফা উপার্জন করা সেখানে তাদের দান প্রকল্পগুলি যে পূর্ণরূপে জৈন ধর্ম ও দর্শনে দানতত্ত্বের বিধি বিষয়ে বর্ণিত 'ঐহিকফলানাপেক্ষ', 'নিষ্কপট', 'নিরহঙ্কারী' এই সকল শর্তের পূরণ করতে সমর্থ হবে এমন নিশ্চয় করে বলা যায় না । কারণ যেখানে তাদের দান প্রকল্পগুলির প্রাথমিক উদ্দেশ্যই হল তাদের সংস্থার প্রচার, সেখানে তারা ফলের আশাতেই এইধরণের প্রকল্পে অংশগ্রহণ করেন । তাই দানক্ষেত্রে তারা যে 'ঐহিকফলানাপেক্ষ' পূর্ণরূপে হতে পারেন না, এমনটিই স্বাভাবিক । শুধু তাই নয়, বহু সময়েই একটি সংস্থা অপর একটি সংস্থার সঙ্গে প্রতিযোগিতার কারণেও এই ধরণের প্রকল্পগুলিতে অংশগ্রহণে উদ্যোগী হন, তাই সেই সকলক্ষেত্রে দানপ্রকল্পগুলি নিরহঙ্কারে যে পূর্ণরূপে সাধিত হতে পারে এমন নয় । তবে চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, ভোগসর্বস্ববাদ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতীয় দর্শনে বর্ণিত দানতত্ত্বের মতো করেই ভোগসর্বস্ববাদী বাণিজ্যসংস্থাগুলির এইরূপ দানপ্রকল্পগুলির দ্বারা গ্রহীতা যে কোন না কোনভাবে উপকৃত হচ্ছেন তা অস্বীকার করা যায় না এবং সেই সূত্রেই উভয়ক্ষেত্রে বর্ণিত দানতত্ত্ব যেন কোথাও একসূত্রে মিলিত হচ্ছে । আবার মহাকাব্যিক পরিসরে বিষয়বস্তুর দান, ধর্মদানসহ অতিরিক্ত যেসকল দানের আলোচনা পাওয়া যায় যেমন - পরামর্শ দান , সান্ত্বনা দান, সম্মতি দান , আশ্বাস দান ইত্যাদি এই সকলক্ষেত্রেই কোন বিষয় বস্তুর প্রদান না থাকলেও আছে এক স্বস্তির উপস্থিতি । সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের বিচারে দান ক্ষেত্রগুলি একে অপরের থেকে পৃথক হলেও ব্যক্তি বা সমাজের কল্যাণ কল্পে এর প্রতিটিই 'দান কর্ম' নামেই অভিহিত হয় । তাই খুব সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন হয়, এই সকল ক্ষেত্রের দান ব্যবহারের মধ্যে এমন কী কোন সাধারণ ধর্মের উপস্থিতি অথবা কোন পারিবারিক সাদৃশ্যের উপস্থিতি আছে যার ভিত্তিতে আমরা এই সকল ক্ষেত্রে বর্ণিত ভিন্ন ভিন্ন দান ক্ষেত্রকে 'দান' নামে অভিহিত করি ? যে পারিবারিক সাদৃশ্যের ধারণা পাওয়া যায়, ভাষাবিদ্ ভিটগেনস্টাইনের

ভাষাচর্চায় । ভাষাদর্শন চর্চার ইতিহাসে সমাদৃত উত্তর পর্বের পরিণত দার্শনিক ভিটগেনস্টাইন তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ Philosophical Investigations - এ দেখিয়েছেন, কোন শব্দ বা বাক্যের তাৎপর্য্য তথা ভাষার ব্যবহার হল আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের অঙ্গ বা বিন্যাস (Form of Life) । কাজেই কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থগত তাৎপর্য্য নির্ধারণ করতে গেলে অবশ্যই সেই শব্দ বা বাক্যটির ব্যবহারের প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে হবে । তাঁর মতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি বা জীবন যাপনের বিন্যাসকে অবহেলা করে কোন শব্দ বা বাক্য কিংবা কোন ভাষার তাৎপর্য্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয় । বরং দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিন্যাসের প্রেক্ষিতই কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থগত তাৎপর্য্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে একান্ত আবশ্যিক ও প্রয়োজনীয় । এই প্রসঙ্গে তিনি দর্শনচর্চার প্রথমভাগে বচনের অর্থপূর্ণতা প্রসঙ্গে বাস্তব জগতে উপাদানের উপস্থিতি, ভাষার উপাদানগত ব্যবহার এবং চিন্তার উপাদান এই তিনের মধ্যে একরূপ সম্বন্ধসহ [৬] উত্তরপর্বে ভাষা ব্যবহার বা ভাষাখেলা [৭] এবং মোটামুটি সাদৃশ্যরূপে পারিবারিক সাদৃশ্যের [৮] উল্লেখপূর্ব্বক ভাষার বা শব্দের প্রকৃত অর্থবোধ বা তাৎপর্য্যের সার্থক উপলব্ধির নির্দেশ করেছিলেন । এইরূপ পারিবারিক - সাদৃশ্যের ধারণা অনুসরণ করে পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, যেসকল ক্ষেত্রে দাতা স্বেচ্ছায় দান করছেন এবং তার মধ্যে দিয়ে গ্রহীতার মঙ্গল সাধিত হচ্ছে তা প্রচলিত অর্থে দান ক্রিয়া । এইরূপ দানের সঙ্গে যেসকল ক্ষেত্রে দান ক্রিয়া বাধ্যতামূলক কিংবা রাজনৈতিক ও সামাজিক বিধির দ্বারা প্রভাবিত তার কোনরূপ সাধারণ ধর্মের উপস্থিতি স্বীকার করা যায় না । কারণ উভয় ক্ষেত্রের দান বৈশিষ্ট্যই এখানে পৃথক । এই সকল দান ব্যবহারে ধর্মীয় মানের উন্নতি কল্পে বৈদিক ধর্মে যজ্ঞার্থে দানও যেমন দান, তেমনি আবার বর্ণ ধর্মানুসারী ব্যবস্থায় বর্ণভেদে কর্ত্তব্য কর্মও দান , ইসলাম আদর্শে বাধ্যতামূলক জাকাতের দান এবং খ্রীষ্টান আদর্শে নিঃস্বার্থ মনোভাবে স্বেচ্ছায় সম্পন্ন দানও দান । তাই দান সম্পর্কে প্রচলিত সাধারণ ধর্মের দ্বারা এই সকল ক্ষেত্রের দান কর্মগুলিকে স্বরূপগত বা অর্থগতভাবে উপলব্ধি করা যায় না । বরং তার উপলব্ধিতে প্রয়োজন হয় প্রসঙ্গ বা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ভাষাখেলাজনিত ‘পরিবার - সাদৃশ্য’ ধারণার । যে সাদৃশ্যের উপস্থিতিতে ভাষাবিদ ভিটগেনস্টাইন খেলার বিভিন্ন প্রকারের প্রতিটিকেই খেলা বলার তাৎপর্য্য বা গুরুত্ব উপলব্ধি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন । দার্শনিক তাৎপর্য্যের বিচারে দান বিষয়েও একইভাবে মনোস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতেও যেন দেখা যায় ঐরূপ এক পারিবারিক সাদৃশ্যের উপস্থিতি । যার ভিত্তিতে

---

৬. *‘ভিটগেনস্টাইনের দর্শনের দুটি পর্যায় : ট্রাক্টেটাস ও ইনভেস্টিগেসন্স্ , উত্তর - পর্বের ভিটগেনস্টাইন : ফিলোসফিকাল ইনভেস্টিগেসন্স্*

৭. *Philosophical Investigations* Ludwig Wittgenstein para- 43, সংগৃহীত পৃ -৭৯ *উত্তর - পর্বের ভিটগেনস্টাইন : ফিলোসফিকাল ইনভেস্টিগেসন্স্*

৮. *‘দৈনন্দিনের ভাষা -ব্যবহার ও পরিবার সাদৃশ্যের ধারণা’, উত্তর - পর্বের ভিটগেনস্টাইন : ফিলোসফিকাল ইনভেস্টিগেসন্স্*

ভিন্ন ভিন্ন দর্শন ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ে বর্ণিত দান ক্রিয়া একে অপরের থেকে পৃথকরূপে নির্দেশিত হলেও অধিকাংশক্ষেত্রেই তা পরার্থবাদী আদর্শের সঙ্গে সম্পৃক্ত । যে দান ব্যবস্থায় দাতার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিসুখের আত্মকেন্দ্রিকতার উর্দ্ধে উঠে মানবতাবাদের উচ্চতর আদর্শে উন্নীত হওয়ার বার্তা ঘোষণা করা হয় ।

তথ্যসূত্র :

- সরকার প্রিয়ম্বদা, *উত্তর - পর্বের ভিটগেনস্টাইন : ফিলোসফিকাল ইনভেস্টিগেসন্স্* , ২০০৭ , পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ , কলকাতা - ১৩ ।

- Chakraborty Bidyut , *CORPORATE AND SOCIAL RESPONSIBILITY IN INDIA ,* 2011, Routledge , London and New york .

- Halloran 'O Kerry , *THE POLITICS OF CHARITY,* Routledge , 2011, London and New york .

গ্রন্থপঞ্জী

১ । অনির্বাণ (শ্রী) , *ঋগ্বেদ - সংহিতা গায়ত্রী মণ্ডল ,* (প্রথম খন্ড), সম্পাদনা - রমা চৌধুরী, ২০০১, প্রকাশক - হৈমবতী - অনির্বাণ ট্রাস্ট, কলকাতা -২৯ ।

২। অনির্বাণ, *বেদ - মীমাংসা* (প্রথম খন্ড), ১৯৭৫, প্রকাশক - সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা - ১২ ।

৩। অরবিন্দ (শ্রী), *বেদরহস্য* (প্রথম খন্ড) ; ২০০১ ; প্রকাশক - শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী ।

৪। অবধূত কালিকানন্দ (সম্পাদিত) , *উপনিষদ সমগ্র,* মার্চ - ২০২১ , প্রকাশক - গিরিজা লাইব্রেরী , কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

৫। অবধূত কালিকানন্দ (সম্পাদিত) , *প্রশ্ন উপনিষদ ; উপনিষদ সমগ্র,* মার্চ - ২০২১ , প্রকাশক - গিরিজা লাইব্রেরী , কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

৬। অবধূত কালিকানন্দ (সম্পাদিত) , *কঠ উপনিষদ; উপনিষদ সমগ্র,* মার্চ - ২০২১ , প্রকাশক - গিরিজা লাইব্রেরী , কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

৭। অবধূত কালিকানন্দ (সম্পাদিত) , *মুণ্ডক উপনিষদ, উপনিষদ সমগ্র,* মার্চ - ২০২১ , প্রকাশক - গিরিজা লাইব্রেরী , কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

৮। অবধূত কালিকানন্দ (সম্পাদিত) , *মাণ্ডূক্য উপনিষদ ; উপনিষদ সমগ্র,* মার্চ - ২০২১ , প্রকাশক - গিরিজা লাইব্রেরী , কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

৯। অবধূত কালিকানন্দ (সম্পাদিত) , *তৈত্তিরীয় উপনিষদ; উপনিষদ সমগ্র,* মার্চ - ২০২১ , প্রকাশক - গিরিজা লাইব্রেরী , কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

১০। অবধূত কালিকানন্দ (সম্পাদিত) , *ঐতরেয় উপনিষদ, উপনিষদ সমগ্র,* মার্চ - ২০২১ , প্রকাশক - গিরিজা লাইব্রেরী , কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

১১। অবধূত কালিকানন্দ (সম্পাদিত) , *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ; উপনিষদ সমগ্র,* মার্চ - ২০২১ ,প্রকাশক- গিরিজা লাইব্রেরী , কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

১২। অবধূত কালিকানন্দ (সম্পাদিত) , *ছান্দোগ্য উপনিষদ ; উপনিষদ সমগ্র,* মার্চ - ২০২১ , প্রকাশক- গিরিজা লাইব্রেরী , কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

১৩ । আচার্য্য মহাস্থবির বিশুদ্ধানন্দ, *বৌদ্ধ দর্শনে সত্য দর্শন (তুলনা মূলক দার্শনিক আলোচনা),* ১৯৫৩, প্রকাশক - মহাবোধি বুক এজেন্সী ,কলিকাতা - ৭৩ ।

১৪ । গুপ্ত মিহির (অনুবাদ ও ব্যাখ্যা), সেন রণব্রত (সম্পাদনা), *ধম্মপদ ,* ১৯৭৪ , প্রকাশক- হরফ প্রকাশনী , কলকাতা - ৭ ।

১৫। গোপ (অধ্যাপক) যুধিষ্ঠির, *ঈশোপনিষদ্* , ২০০৬, প্রকাশক - সংস্কৃত বুক ডিপো , কলকাতা - ৭০০০০৬ ।

১৬ । গোপ (অধ্যাপক) যুধিষ্ঠির, *বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস,* ২০০৩, প্রকাশক - সংস্কৃত বুক ডিপো , কলকাতা - ৭০০০০৬ ।

১৭। ঘোষ শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত ও শ্রী অনিল চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক সুসংস্কৃত, *শ্রীমদ্ভগবদগীতা ,* ১৯৫৮, প্রকাশক - প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী , কলিকাতা - ৭৩ ।

১৮। চক্রবর্তী (আচার্য) ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ, *মহর্ষি বাল্মীকি'কৃত রামায়ণম্* (প্রথম খণ্ড), অনুবাদ, আলোচনা ও সম্পাদনা, ১৯৯৬ , প্রকাশক - নিউ লাইট, কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

১৯। চক্রবর্তী (আচার্য) ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ, *মহর্ষি বাল্মীকি'কৃত রামায়ণম্* (দ্বিতীয় খণ্ড), অনুবাদ, আলোচনা ও সম্পাদনা, ১৯৯৭, প্রকাশক - নিউ লাইট, কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

২০ । চৌধুরী সাধনকমল , *বিশুদ্ধ মজ্ঝিমনিকায়* , ১৪১৫ , প্রকাশক - করুণা প্রকাশনী ,কলকাতা - ৯ ।

২১। চৌধুরী (ডঃ) সুকোমল , *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন ,* ১৯৯৭, প্রকাশক - মহাবোধি বুক এজেন্সী , কলিকাতা- ৭৩ ।

২২। চৌধুরী (ডঃ) সুকোমল, *মহামানব গৌতম বুদ্ধ ,* বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ গ্রন্থমালা - ১ , ১৯৯৫, প্রকাশক - মহাবোধি বুক এজেন্সী , কলিকাতা - ৭৩ ।

২৩। ঠাকুর সত্যেন্দ্রনাথ , *বৌদ্ধধর্ম ,* ১৯০১, মহাবোধি বুক এজেন্সী , কোলকাতা - ৭৩ ।

২৪। তর্করত্ন পঞ্চানন (শ্রীযুক্ত), (ডঃ) মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত প্রাককথন, *মনুসংহিতা, ২০০০,* প্রকাশক - সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার , কলিকাতা ।

২৫। তর্কভূষণ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ সম্পাদিত, *শ্রীমদ্ভগবদগীতা ,* ২০০১, প্রকাশক - দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা - ৯ ।

২৬। দত্ত রমেশচন্দ্র (অনুবাদক) , ভূমিকা - বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীহিরণ্ময়, *ঋগ্বেদ সংহিতা* , প্রথম খন্ড, ১৯৭৬, প্রকাশক - হরফ প্রকাশনী , কলকাতা - ৭ ।

২৭। দত্ত রমেশচন্দ্র (অনুবাদক) , ভূমিকা - বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীহিরণ্ময়, *ঋগ্বেদ সংহিতা* , দ্বিতীয় খন্ড, ১৯৭৮, প্রকাশক - হরফ প্রকাশনী , কলকাতা - ৭ ।

২৮। দত্ত হীরেন্দ্রনাথ, *মনুর বর্ণাশ্রমধর্ম* , ১৯৭০ , প্রকাশক - যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা - ৩২ ।

২৯। দর্শনাচার্য্য শ্রী মন্নীলকণ্ঠ কৃতয়া ভারতভাবদীপ সমখ্যায়া টীকয়া মহানহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য - মহাকবি -পদ্মভূষণেন শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্যণে প্রণীতয়া ভারতকৌমুদী সমাখ্যায়া টীকয়া তৎকৃত বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্ , *মহাভারতম্ মহর্ষি - শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নবেদব্যাস - প্রণীতম্ শান্তিপর্ব* (খন্ড ৩২) , প্রকাশক - বিশ্ববানী প্রকাশনী, কলিকাতা - ৯ ।

৩০ । দর্শনাচার্য্য শ্রী মন্নীলকণ্ঠ কৃতয়া ভারতভাবদীপ সমখ্যায়া টীকয়া মহানহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য - মহাকবি -পদ্মভূষণেন শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্যণে প্রণীতয়া ভারতকৌমুদী সমাখ্যায়া টীকয়া তৎকৃত বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্ , *মহাভারতম্ মহর্ষি - শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নবেদব্যাস - প্রণীতম্ শান্তিপর্ব* (খণ্ড ৩৩) , প্রকাশক - বিশ্ববানী প্রকাশনী, কলিকাতা - ৯ ।

৩১ । দর্শনাচার্য্য শ্রী মন্নীলকণ্ঠ কৃতয়া ভারতভাবদীপ সমখ্যায়া টীকয়া মহানহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য - মহাকবি -পদ্মভূষণেন শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্যণে প্রণীতয়া ভারতকৌমুদী সমাখ্যায়া টীকয়া তৎকৃত বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্ , *মহাভারতম্ মহর্ষি - শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নবেদব্যাস - প্রণীতম্ শান্তিপর্ব* (খণ্ড ৩৪) , প্রথম প্রকাশ - ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ , দ্বিতীয় (বিশ্ববানী সংস্করণ) : মাঘ ১৪০০ বঙ্গাব্দ , প্রকাশক : বিশ্ববানী প্রকাশনী, কলিকাতা - ৯ ।

৩২ । দর্শনাচার্য্য শ্রী মন্নীলকণ্ঠ কৃতয়া ভারতভাবদীপ সমখ্যায়া টীকয়া মহানহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য - মহাকবি - পদ্মভূষণেন শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্যণে প্রণীতয়া ভারতকৌমুদী সমাখ্যায়া টীকয়া তৎকৃত বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্ , *মহাভারতম্ মহর্ষি - শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নবেদব্যাস - প্রণীতম্ শান্তিপর্ব* (খণ্ড ৩৫) , প্রকাশক - বিশ্ববানী প্রকাশনী , কলিকাতা - ৯ ।

৩৩ । ন্যায়তীর্থ বসু সুমিতা (ডঃ), *ধর্ম-অর্থ-নীতিশাস্ত্রসমীক্ষা,* ২০০৬, প্রকাশক - সদেশ, কলিকাতা।

৩৪ । পাহাড়ী (অধ্যাপক) অন্নদাশঙ্কর (সম্পাদনা), *মনুসংহিতা সপ্তমোহধ্যায়,* ২০০৮, প্রকাশক - সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা - ৭০০০০৬ ।

৩৫ । বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রী) অশোককুমার , *মনুসংহিতা সপ্তমোধ্যায়ঃ (রাজধর্মঃ),* ১৪০৪ ,প্রকাশক - সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা - ৭০০০০৬ ।

৩৬ । বন্দ্যোপাধ্যায় নিখিলেশ, *বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন,* ২০০৫, প্রকাশক - সদেশ, কলকাতা - ৭০০০০৬ ।

৩৭ । বন্দ্যোপাধ্যায় (ডঃ) শ্রীমতী শান্তি , *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা* , ২০০৩, প্রকাশক - সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কোলকাতা - ৬ ।

৩৮ । বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেশচন্দ্র (অনুবাদক), *মনুসংহিতা,* ১৯৯৯, প্রকাশক - আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ।

৩৯ । বন্দ্যোপাধ্যায় সুবীর , *লাতিন আমেরিকার তিন সভ্যতা মায়া, ইনকা ও আজতেক ,* ২০০৭, প্রকাশক - কোডেক্স, কলকাতা - ৯ ।

৪০ । বসু (ডঃ) যোগীরাজ, *বেদের পরিচয় ,* ২০০৯, প্রকাশক - ফার্মা কেএলেম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ।

৪১ । বসাক রাধাগোবিন্দ (সম্পাদনায়), *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র,* ১৯৬৪, প্রকাশক - জেনারেল প্রিন্টার্স, কলিকাতা ।

৪২ । বড়ুয়া (শ্রী) সুভূতি রঞ্জন, *সদ্ধর্ম - নীতি রত্নমালা ,* ১৯৬৪, প্রকাশক - মহাবোধি বুক এজেন্সী , কলিকাতা - ৭৩ ।

৪৩ । বিদ্যারণ্য (স্বামী) , *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম,* ১৯৮৪ , প্রকাশক - পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ , কলিকাতা - ১৩ ।

৪৪ । ব্রহ্মচারী (শ্রী) শীলানন্দ , *অভিধর্ম - দর্পণ (বৌদ্ধদর্শন ও মনস্তত্ত্বের আলোচনা) ,* অখন্ড সংস্করণ ১৩৯৮ ,প্রকাশক - শ্রী তপন ব্রহ্মচারী , বসুনগর উত্তর ২৪ পরগণা ।

৪৫ । ব্রহ্মচারী (শ্রী) শীলানন্দ , *সংযুক্ত নিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড),* ১৪০০ সালঃ, প্রকাশক - মহাবোধি বুক এজেন্সি, কোলকাতা - ৭৩ ।

৪৬ । ভাদুড়ী নৃসিংহপ্রসাদ, *দন্ডনীতি,* ১৯৯৮, প্রকাশক - শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি, কলকাতা ।

৪৭ । ভিক্ষু (ডঃ) এফ. *অশোকের শিলালিপির আলোকে প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা ,* দীপংকর, ২০১১, পরিবেশন: মহানন্দ সংঘরাজ বিহার, চট্টগ্রাম ।

৪৮ । ভিক্ষু শীলভদ্র (অনূদিত), *দীঘনিকায়* (অখন্ড) , সন ১৩৫৩, প্রকাশক - মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা - ৭৩ ।

৪৯ । ভিক্ষু শীলভদ্র , *সুত্ত নিপাত* , সন ১৩৮৩ খ্রীঃ, প্রকাশক - মহাবোধি বুক এজেন্সি, কোলকাতা - ৭৩ ।

৫০ । ভিক্ষু শীলভদ্র, *বুদ্ধবাণী ,* ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ, প্রকাশক - মহাবোধি বুক এজেন্সি, কোলকাতা - ৭০০০৭৩ ।

৫১ । মহাস্থবির ধর্মাধার পন্ডিত, *বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন* , ২০১৫ , প্রকাশক - মহাবোধি বুক এজেন্সী , কলিকাতা - ৭৩ ।

৫২ । মুখোপাধ্যায় (ডঃ) তপতী , *ধর্ম,অর্থ ও নীতি : প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রসমীক্ষা,* ২০০৪, প্রকাশক - চ্যাটার্জি পাবলিশার্স , কোলকাতা - ৭৩ ।

৫৩ । রায় (শ্রী)শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর (অনুদিত), *বোধিসত্ত্বাবদান - কল্পলতা ,* ক্ষেমেন্দ্র (মহাকবি) বিরচিত, ২০০০, প্রকাশক - মহাবোধি বুক এজেন্সী , কলিকাতা -৭৩ ।

৫৪ । রায় (শ্রী) তারক চন্দ্র , *ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস (প্রথম খন্ড),* ১৯৫৮, প্রকাশক - গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলিকাতা - ৬ ।

৫৫ । লোকেশ্বরানন্দ (স্বামী), *উপনিষদ,* প্রথম খন্ড, ২০০২ , প্রকাশক - আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

৫৬ । লোকেশ্বরানন্দ (স্বামী), *উপনিষদ,* দ্বিতীয় খন্ড, ২০০২ , প্রকাশক - আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭০০০০৯ ।

৫৭ । সরস্বতী শ্রীমন্ মধুসূদন কৃত টীকা, সপ্ততীর্থ পন্ডিত শ্রীযুক্তভূতনাথ (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত), *শ্রীমদ্ ভগবদগীতা* (প্রথম খন্ড), সম্পাদনা - শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, বঙ্গাব্দ - ১৩৪৫, প্রকাশক - কৃষ্ণ ব্রাদার্স, কলিকাতা ।

৫৮ । সপ্ততীর্থ শ্রীভূতনাথ (অনুবাদক), *মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য,* (বঙ্গানুবাদ), প্রথম খন্ড, ১৩৬১, কলিকাতা ।

৫৯ । সপ্ততীর্থ শ্রীভূতনাথ (অনুবাদক), *মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য,* (বঙ্গানুবাদ), দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬১, কলিকাতা ।

৬০ । সপ্ততীর্থ শ্রীভূতনাথ (অনুবাদক), *মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য,* (বঙ্গানুবাদ), তৃতীয় খণ্ড, ১৩৬১, কলিকাতা ।

৬১ । সপ্ততীর্থ শ্রীভূতনাথ (অনুবাদক), *মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য,* (বঙ্গানুবাদ), চতুর্থ খণ্ড, ১৩৬১, কলিকাতা ।

৬২ । সমন পুন্নানন্দ সামী, *রত্ন,মালা* , ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী - গ্রন্থমালা -২৪, সমন পুন্নানন্দ সামী, ১৩২৯ , প্রকাশক - ডঃ সুকোমল চৌধুরী , কলিকাতা - ১৫ ।

৬৩ । সরকার প্রিয়ম্বদা, *উত্তর - পর্বের ভিটগেনস্টাইন : ফিলোসফিকাল ইনভেস্টিগেসন্স্* , ২০০৭ , প্রকাশক - পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ , কলকাতা - ১৩ ।

৬৪ । সান্যাল ইন্দ্রাণী , শর্মা রত্না দত্ত (সম্পাদনায়), *ধর্মনীতি ও শ্রুতি,* ২০০৯, (১৪১৫), প্রকাশক - যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবোধি বুক এজেন্সী , কলিকাতা ।

৬৫ । সেন অতুলচন্দ্র , তত্ত্বভূষণ সীতানাথ, ও ঘোষ মহেশচন্দ্র (অনূদিত ও সম্পাদিত), *উপনিষদ অখন্ড সংস্করণ,* ২০২১ , প্রকাশক - হরফ প্রকাশনী , কলকাতা - ৭০০০০৭ ।

৬৬ । সেন অতুলচন্দ্র , তত্ত্বভূষণ সীতানাথ, ও ঘোষ মহেশচন্দ্র (অনূদিত ও সম্পাদিত), *বৃহদারণ্যক উপনিষদ, উপনিষদ অখন্ড সংস্করণ,* ২০২১ , প্রকাশক - হরফ প্রকাশনী , কলকাতা - ৭০০০০৭ ।

৬৭ । সেন অতুলচন্দ্র , তত্ত্বভূষণ সীতানাথ, ও ঘোষ মহেশচন্দ্র (অনূদিত ও সম্পাদিত), *কৌষীতকি উপনিষদ, উপনিষদ অখন্ড সংস্করণ,* ২০২১ , প্রকাশক - হরফ প্রকাশনী , কলকাতা - ৭০০০০৭ ।

৬৮ । সেন (ডঃ) অমূল্য চন্দ্র, *বুদ্ধকথা* ,১৯৫৫, প্রকাশক - মহাবোধি বুক এজেন্সী , কলিকাতা -৭৩ ।

৬৯ । সেন (ভাই) গিরিশচন্দ্র (অনুদিত), *কুরআন শারীফ* (বঙ্গানুবাদ) , ২০১১, প্রকাশক - হরফ প্রকাশনী , কলকাতা - ৭।

৭০ । হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, মহাভারত , ১৪০০ বঙ্গাব্দ, প্রকাশক - বিশ্ববাণী প্রকাশনী , কলিকাতা ।

৭১ । হালদার (দে) মণিকুন্তলা , *বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস* , বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ - গ্রন্থমালা - ৪ , সম্পাদক - ডঃ সুকোমল চৌধুরী, প্রথম প্রকাশ ঃ১৪০২ , প্রকাশক - মহাবোধি বুক এজেন্সী , কলিকাতা - ৭৩ ।

৭২ । *ধর্মশাস্ত্রো কা ইতিহাস,* ১৬০০, কাশ্যপ চৌবে অর্জুন (অনুবাদক), কাণে পান্ডুরঙ্গ বামন (মূল লেখক), প্রকাশক - হিন্দি সমিতি, সূচনা বিভাগ, উত্তর প্রদেশ, লখনউ ।

৭৩ । *পবিত্র বাইবেল (পুরাতন ও নূতন নিয়ম), THE HOLY BIBLE,* Bengali –C.L (BBS) , BSI Version, 11.01.19, Published by - The Bible society of India. India.

৭৪ । Acharya Umasvami, Jain Vijay.K (Eddited By) 2011 , *TATTVARTHSUTRA,* Published by - Vikalp Printers , Dehradun , India.

৭৫ । Agarwal Sanjay, First Edition : Delhi , 2010 , *DAAN AND OTHER GIVING TRADITIONS IN INDIA THE FORGOTTEN POT OF GOLD ,* Published by - Account Aid TM India , 55 - B , Pocket C, Siddharth Extension, New Delhi - 110014, India.

৭৬ । Ali Maulana Muhammad, *THE RELEGION OF ISLAM , A COMPREHENSIVE DISCUSSION OF THE SOURCES, PRINCIPLES AND PRACTICES OF ISLAM ,* 1994, Published by - Motilal Banarasidass Publishers Private Limited , Bunglow Road , Jawahar Nagar , Delhi 110007.

৭৭ । Banerjee. S.C, *A BRIEF HISTORY OF DHARMASASTRA ,* 1999, Published by - Abhinav Publications, New Delhi .

৭৮ । Chakraborty Bidyut , *CORPORATE AND SOCIAL RESPONSIBILITY IN INDIA ,* 2011, Published by - Routledge , London and New york .

৭৯ । Dixit K .K. (Translated by), First Edition : August ,1974 Second Edition : April, 2000 ,*PT. SUKHLASLJIS'S COMMENTARY ON TATTVARTHA SUTRA OF VACARA UMASVATI* , Published by – L D. Institute of Indology , Ahmedabad .

৮০ । Dutt Manmath Nath (Translated By), *ATRI SAMHITA*, *THE DHARAM SHASTRA HINDU RELIGIOUS CODES , Vol II*, 1979, Published by - Cosmo Publications , New Delhi , India.

৮১ । Dutt Manmath Nath (Translated By), *HARITA SAMHITA*, 1906, Published By- Keshub Academy, calcutta , India.

৮২ । Dutt Manmath Nath (Translated By), *US'ANA SAMHITA,* 1906, Published By- Keshub Academy, calcutta , India.

৮৩ । Dutt Manmath Nath (Translated By), *VISHNU SAMHITA, THE DHARAM SHASTRA HINDU RELIGIOUS CODES , Vol IV*, 1979, Published by - Cosmo Publications , New Delhi , India.

৮৪ । Dutt Manmath Nath (Translated By), *VYASA SAMHITA, THE DHARAM SHASTRA HINDU RELIGIOUS CODES , Vol III*, 1979, Published by - Cosmo Publications , New Delhi , India.

৮৫ । Dutt Manmath Nath (Translated By), *YA'JNAWALKYA SAMHITA,* 1906, Published by - Keshub Academy, calcutta , India.

৮৬ । Dutt Manmath Nath (Translated), *THE DHARAM SHASTRA HINDU RELIGIOUS CODES*, *Vol II*, 1979, Published by - Cosmo Publications, New Delhi , India.

৮৭ । Findly Ellison Banks, *DANA GIVING AND GETTING IN PALI BUDDHISM* , Volume- 52, First Edition : Delhi, 2003, Published by - Motilal Banarasidass, Publishers Private Limited.

৮৮ । Halloran O‘ Kerry , *THE POLITICS OF CHARITY,* Published by - Routledge , 2011, London and New york .

৮৯ । Jain Veenus (Dr.), Published-27/05/2016. *“Abhay Dana : Analysis of dana for protection from Fear”,SCOPE INTERNATIONAL SCIENCE, HUMANITIES, MANAGEMENT AND TECHNOLOGY,* Prof. Amity Institute of Social sciences, Amity University, Noida, Uttar Pradesh, India .

৯০ । Jeffery D Long, First South Asian Edition 2010 , *JAINISM AN INTRODUCTION,* Published by – I.B Tauris & Co Ltd 6 Salem Road, London W2 4BU 175 Fifth Avenue, New York NY 10010 ,

৯১ । Maganlal, A. Buch , *THE PRINCIPLES OF HINDU ETHICS ,* 1921, Published By- Kala Prakashan , Delhi, India .

৯২ । Mauss Marcel , *THE GIFT FORMS AND FUNCTIONS OF EXCHANGE IN ARCHAIC SOCIETIES* , 1966, Published by - Cohen & West Ltd . London .

৯৩ । Nath Vijay, *THE PURANIC WORLD ENVIRONMENT, GENDER , RITUAL AND MYTH,* 2009, Published by - Manohar Publishers & Distributor , New Delhi .

৯৪ । Nath Vijay, *DANA : GIFT SYSTEM IN ANCIENT INDIA A SOCIO- ECONOMIC PERSPECTIVE,* 1987, Published by -Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi .

১৫ । Shah . J. Nagin (Translated By), First Edition , 1998, *JAINA PHILOSOPHY AND RELIGION , ENGLISH 'TRANSLATION OF"JAINA DARSANA''* by – Muni Shri Nyayavijayaji , Published by - Motilal Banarasidas Publishers private Limited, Bhogilal Lehar Chand Institute of Indology & Mahattara Sadhvi Shree Mrigavatiji Foundation Delhi .

১৬ । Shah. Nathubhai , *JAINISM, THE WORLD OF CONQUERORS, VOLUME – 1,* Published by - Motilal Banarasidass Publishers Private Limited, 41 UA Bungalow Road, Jawahar Nagar, Delhi 110007 ,

১৭ । Shastry Pt.Phoolchandra Siddhant (Editor), *SARVARTHASIDDHI OF PUJYAPAD THE COMENTRY ON ACHARYA GRIDDHAPICCHA'S TATTWARTHA SUTRA,* 1955, Bharatiya Jnanapitha, Kashi .

১৮ । Singh Wazir and Singh N.K(Editted by), *SPIRITUAL VALUE OF SOCIAL CHARITY*, 2001, Published by - Global Vision Publishing Hoiuse , India ,Delhi - 110093 .